শিক্ষা মূল্যায়ন ও নির্দেশনা

এম. জামালউদ্দিন
মুহাম্মদ শহীদুল আমিন চৌধুরী

শিক্ষা মূল্যায়ন ও নির্দেশনা

এম. জামাল উদ্দিন
ও
মুহাম্মদ শহীদুল আমিন চৌধুরী

BANSDOC Library

BANSDOC Library
Accession No. 18224
Date 16.6.04

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ ১৪০৫/ আগস্ট ১৯৯৮
[অর্থ বর্ষ ১৯৯৮-৯৯ সাল]

বাএ ৩৮১৩
মুদ্রণ সংখ্যা ঃ ১২৫০
পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
সমাজবিজ্ঞান, আইন ও বাণিজ্য উপবিভাগ

প্রকাশক
গোলাম মঈনউদ্দিন
পরিচালক
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রণ
মেমোরিয়াল অফসেট প্রিন্টার্স
৬৮, যোগীনগর রোড, ওয়ারি, ঢাকা।

প্রচ্ছদ
মোতাহারুল হক চৌধুরী

মূল্য
একশত চল্লিশ টাকা মাত্র

SHIKSHA MULLAYANA O NIRDESHANA (Education : Evaluation Guidance) by M. Jamal Uddin & Mohammed Shahidul Amin Chowdhury Published by Gholam Moyenuddin Director : Textbook Division, Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. First Edition : August 1998. Price 140.00 only.

ISBN 984-07-3822-4

মুখবন্ধ

আজকের দিনে শিক্ষা ব্যক্তিগত তথা জাতীয় জীবনের প্রত্যাশা পূরণে শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে ভূমিকা রাখছে। সর্বজনস্বীকৃত বক্তব্য হচ্ছে যে জাতি যত শিক্ষিত সে জাতি তত উন্নত। এ প্রেক্ষাপটে সর্বজনীনভাবে শিক্ষার গুণগত ও পরিমাণগত মনোন্নয়নের অব্যাহত প্রচেষ্টা চলছে। দ্রুত বিকাশমান সামাজিক তথা জাতীয় চাহিদা পূরণে বাংলাদেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার ভিত্তি তৈরি করতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দেশপ্রেমিক, মননশীল, নিষ্ঠাবান, কুশলী প্রজন্মের উন্মেষ ঘটাতে দক্ষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের কোন বিকল্প নেই। জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্যসমূহ, শিক্ষাসূচি পালন ও চর্চা করে নিজস্ব স্বকীয়তা ও সৃজনশীলতা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে দক্ষ জনসম্পদ সৃষ্টির পদক্ষেপগুলো বাস্তবে রূপ দেয়া প্রয়োজন। দেশ ও জাতির এ প্রত্যাশা পূরণে উন্নতমানের শিক্ষাবিষয়ক শিক্ষাসূচির বাস্তবায়ন প্রাথমিক পদক্ষেপ।

এ ধরনের বিকাশমান প্রেক্ষাপটে বি.এড., এম.এড এবং বি.এড. (অনার্স) কোর্সের বিস্তারিত পাঠ্যসূচি অনুযায়ী লিখিত 'শিক্ষা মূল্যায়ন ও নির্দেশনা'। নতুন প্রবর্তিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এড. কোর্সের শিক্ষায় পরিমাপ ও মূল্যায়ন, শিক্ষা গবেষণা, নির্দেশনা, এম.এড. কোর্সের শিক্ষা গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশল, শিক্ষা পরিসংখ্যান এবং বি.এড. অনার্সের শিক্ষায় পরিমাপ ও মূল্যায়ন বিষয়ের পাঠ্যসূচি সম্বলিত। পুস্তকখানি যাঁদের জন্য রচিত তাঁদের যদি এতটুকু উপকারে আসে তাহলে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে মনে করব।

এই বইটি রচনায় যাঁরা সাহায্য, সহযোগিতা, উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছেন তাঁদের ঋণ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ স্বল্প সময়ে বইটি প্রকাশে যে কষ্ট স্বীকার করেছেন তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বইটির মান উন্নয়নে যে কোন মতামত ও সুপারিশ সাদরে গৃহীত হবে।

এম. জামাল উদ্দিন
ও
মুহাম্মদ শহীদুল আমিন চৌধুরী

BANSDOC Library
Accession No. 18224

সূচিপত্র

১. প্রথম অধ্যায় ঃ ভূমিকা ১

২. দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ শিক্ষায় মূল্যায়ন ৯

পরিমাপ কি?

মূল্যায়ন কি?

মূল্যায়নের স্বরূপ

পরিমাপ ও মূল্যায়নের পার্থক্য

আধুনিক মূল্যায়নের ক্রমবিকাশের ইতিহাস,

শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য ও ফলশ্রুতি

মূল্যায়নের স্তরবিন্যাস

পরিমাপের উপায় ও প্রক্রিয়া

মূল্যায়নের বিবিধ উপায়

অনুশীলনী - ২.১

সুঅভীক্ষার বৈশিষ্ট্যাবলী

যথার্থতা

নির্ভরযোগ্যতা

নৈর্ব্যক্তিকতা

আদর্শায়ন

সম্পূর্ণতা

অনুশীলনী- ২.২

৩. তৃতীয় অধ্যায় ঃ শিক্ষায় কৃতিত্বের মূল্যায়ন ৪৭

মৌখিক অভীক্ষা

রচনামূলক অভীক্ষা

নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা

বহু নির্বাচনী অভীক্ষা

অনুশীলনী-৩.১

[illegible]

[illegible]

মনোভাবের অভীক্ষা
বুদ্ধির অভীক্ষা
ব্যক্তিসত্তার অভীক্ষা
অভীক্ষা গঠনের সাধারণ নীতিমালা
আদর্শায়িত অভীক্ষা প্রস্তুতকরণ
অনুশীলনী- ৩.২

৪. চতুর্থ অধ্যায় ঃ মূল্যায়নে পরিসংখ্যানের ব্যবহার
পরিসংখ্যানের স্বরূপ ও পরিধি
শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের ব্যবহার
শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের প্রয়োজনীয়তা
অনুশীলনী- ৪.১
স্কোর বিন্যাস
অনুশীলনী -৪.২
পৌনঃপুন্য বণ্টন
অনুশীলনী-৪.৩
পৌনঃপুন্য বহুভুজ ও আয়তলেখ
অনুশীলনী- ৪.৪
কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ
অনুশীলনী- ৪.৫
সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয়,
অনুশীলনী - ৪.৬
মধ্যক নির্ণয়
প্রচুরক
গড়, মধ্যক ও প্রচুরকের ব্যবহার
অনুশীলনী-৪.৭
বিষমতার পরিমাপ ও ইহার প্রয়োজনীয়তা
বিস্তৃতি
গড় বিচ্যুতি
অনুশীলনী -৪.৮
আদর্শ বিচ্যুতি
চতুর্থাংশ বিচ্যুতি
ব্যবহার
অনুশীলনী - ৪.৯
স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্র

মনোভাবের অভীক্ষা
বুদ্ধির অভীক্ষা
ব্যক্তিসত্তার অভীক্ষা
অভীক্ষা গঠনের সাধারণ নীতিমালা
আদর্শায়িত অভীক্ষা প্রস্তুতকরণ
অনুশীলনী- ৩.২
৪. চতুর্থ অধ্যায় ঃ মূল্যায়নে পরিসংখ্যানের ব্যবহার ৯১
পরিসংখ্যানের স্বরূপ ও পরিধি
শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের ব্যবহার
শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের প্রয়োজনীয়তা
অনুশীলনী- ৪.১
স্কোর বিন্যাস
অনুশীলনী -৪.২
পৌনঃপুন্য বণ্টন
অনুশীলনী-৪.৩
পৌনঃপুন্য বহুভুজ ও আয়তলেখ
অনুশীলনী- ৪.৪
কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ
অনুশীলনী- ৪.৫
সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয়,
অনুশীলনী - ৪.৬
মধ্যক নির্ণয়
প্রচুরক
গড়, মধ্যক ও প্রচুরকের ব্যবহার
অনুশীলনী-৪.৭
বিষমতার পরিমাপ ও ইহার প্রয়োজনীয়তা
বিস্তৃতি
গড় বিচ্যুতি
অনুশীলনী -৪.৮
আদর্শ বিচ্যুতি
চতুর্থাংশ বিচ্যুতি
ব্যবহার
অনুশীলনী - ৪.৯
স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্র

অনুশীলনী - ৪.১০
সহ সম্পর্ক
সহ সম্পর্কের মান নির্ণয়
অনুশীলনী - ৪.১১
অভীক্ষার স্কেলিং পদ্ধতি
Z-স্কোর
আদর্শ স্কোর
T-স্কোর
শতাংশ স্কেল
অনুশীলনী - ৪.১২
ক্রমসমষ্টিমূলক বণ্টন ও পৌনঃপুন্য চিত্র
নির্ভরণ
তাৎপর্য নির্ণয়ের অভীক্ষা-
z-টেস্ট.
T-টেস্ট
F-অনুপাত
χ^2-টেস্ট
অনুশীলনী - ৪.১৩
২. পঞ্চম অধ্যায় ঃ শিক্ষা গবেষণা ২৪৮
গবেষণার অর্থ ও শ্রেণি বিভাগ
গবেষণার কাঠামো
অনুমিত সিদ্ধান্ত
গবেষণার সমস্যা নির্বাচন
গবেষণার প্রস্তাবনা
শিক্ষাগবেষণার প্রকারভেদ
ঐতিহাসিক গবেষণা
বর্ণনামূলক গবেষণা
পরীক্ষামূলক গবেষণা
নমুনায়ন তত্ত্ব ও পদ্ধতি
গবেষণার তথ্য সংগ্রহের কৌশল ও হাতিয়ার
প্রশ্নমালা
সাক্ষাৎকার
থিসিসের পরিকল্পনা
থিসিস লিখন

থিসিস মূল্যায়ন
অনুশীলনী-৫.১
৬. ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ নির্দেশনা
নির্দেশনার স্বরূপ ও সংজ্ঞা
নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা,
শিক্ষা ও নির্দেশনা
অনুশীলনী-৬.১
নির্দেশনার প্রকারভেদ
শিক্ষামূলক নির্দেশনা
বৃত্তিমূলক নির্দেশনা
অনুশীলনী-৬.২
সর্বাত্মক পরিচয়পত্র
অনুশীলনী-৬.৩
পরামর্শ দান-সংজ্ঞা ও স্বরূপ
নির্দেশিত পরামর্শ
অনির্দেশিত পরামর্শ
পরামর্শ দাতা
অনুসরণ পাঠ
অনুশীলনী-৬.৪
কর্মসংস্থান প্রক্রিয়া
কর্মসংস্থান সংস্থার প্রকারভেদ
অনুশীলনী-৬.৫
নির্দেশনা ও পরামর্শদান কৌশলসমূহ
অভীক্ষা ব্যতিরেকে নির্দেশনা
বিষয়ী অনুধ্যান
সাক্ষাৎকার
অনুশীলনী - ৬.৬
গ্রন্থপঞ্জি

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষা আমুল বিবর্তন ঘটাচ্ছে। ব্যক্তি বা সমাজের উন্নয়ন তথা প্রত্যাশা পূরণে শিক্ষা শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে ভূমিকা রাখছে। দ্রুত বিকাশমান সামাজিক চাহিদা পূরণ করছে। পশ্চাৎপদ অসংগঠিত জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী মানবসম্পদে রূপান্তরিত করছে। এ কারণেই আজকের দিনে শিক্ষা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিজ্ঞান। এটি শিক্ষাবিজ্ঞান নামেও পরিচিত। শিক্ষণ ও শিখন (Teaching and learning) কার্যক্রমের সবগুলো অংশ এখন একটি অখণ্ড প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করা হয়। শিক্ষণ (Teaching) এবং শিখন (Learning) দু'টি আলাদা প্রক্রিয়া। শিক্ষণের (Teaching) কাজ হল শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত শিখন (Learning) প্রক্রিয়ায় সহায়তা করা, এ দু'টো প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে কিছু পরিবর্তন ঘটায়। তার ব্যক্তি জীবনের নানান দিকে অহরহ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আর এ ধরনের তার আচরণগত সমর্থনযোগ্য পরিবর্তন সম্পর্কে শিক্ষকের জানতে হয়। এ পরিবর্তন যে ভাবেই ঘটুক বা যে কোন দিকেই হোক না কেন, তার গতি, প্রকৃতি, পরিমাণ ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষকের সচেতন দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন হয়ে উঠে।

শিক্ষার্থীর অবস্থান কোথায়? শিক্ষার্থীর বিকাশমুখী পরিবর্তনের অনুশীলন করার এ ধরনের রীতি শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রচলিত রয়েছে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বিকাশের এ নিয়ন্ত্রিত প্রকৃতি (Formal Type) অনুশীলন ব্যবস্থাই পরীক্ষা (examination) নামে শিক্ষা কার্যক্রমে ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করে। শিক্ষার্থীর শিক্ষামূলক অগ্রগতির ধারা অনুশীলন করাই এ পরীক্ষা ব্যবস্থার সাধারণ ও প্রধান উদ্দেশ্য। পরীক্ষা ব্যবস্থার কর্মকাণ্ড গোটা শিক্ষাব্যবস্থার একটা অংশ মাত্র। এ ব্যবস্থা কেবল শিক্ষাগত পারদর্শিতা বা জ্ঞানের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির বিজ্ঞানসম্মত কোন ভিত্তি নেই। বরং সম্পূর্ণ কার্যক্রমটি অভিজ্ঞানোচিত ব্যক্তিকতাদুষ্ট ও পরিকল্পনা বর্জিত। গুরুতরভাবে ত্রুটিপূর্ণ এ পরীক্ষা ব্যবস্থাকে সংস্কার, পুনর্গঠন ও উন্নত করার ব্যাপক প্রচেষ্টা অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও চলছে। আধুনিক শিক্ষামূলক পরিমাপ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীদের সাফল্য ও অসাফল্যের পরিমাপের উপায়ে বিজ্ঞানভিত্তিক রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা দেশ ও জাতির অস্তিত্বের স্বার্থে উপলব্ধি করার সময় এসেছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিমাপের একটি ব্যাপকতর ও অধিকতর পরিবর্তনশীল ধারণার প্রয়োজন। আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার গতানুগতিক পরিমাপের সঙ্কীর্ণ

পদ্ধতি ও প্রনালীর পরিবর্তে মূল্যায়নের ব্যাপকতর ও প্রগতিশীল প্রক্রিয়া প্রবর্তনের মাধ্যমেই ত্রুটিপূর্ণ পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার সাধন করা সম্ভবপর হতে পারে। যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থাকে গতিশীল ও উন্নতকরণের জন্য মূল্যায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে কিনা তা মূল্যায়নই যাচাই করে। মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চারটি বিষয়ের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এগুলো হচ্ছে ঃ উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, শিখন অভিজ্ঞতা এবং মূল্যায়ন কৌশল ও উপকরণ।

শিক্ষায় মূল্যায়ন কি তা পরিপূর্ণভাবে ধারণা লাভ করতে তিনটি পদ বেশ গুরুত্বের সাথে অনুধাবন করতে হয়। এগুলো হল অভীক্ষা (test), পরিমাপ (Measurement) ও মূল্যায়ন (evaluation)। অনেকের মতে এ শব্দ তিনটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে এগুলো সমার্থক নয়। তবে একটির সাথে অন্যটির যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। অভীক্ষা ও পরিমাপের সাহায্যেই মূল্যায়ন কর্মসূচি সম্পন্ন হয়। এ ক্ষেত্রে পরীক্ষা নেয়ার সাধারণ উপকরণ হল অভীক্ষা। আর উত্তরপত্র যাচাই করে নম্বর প্রদান করাকে পরিমাপ বলা হয়। এ পরিমাপের ভিত্তিতেই যখন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় তখন তা মূল্যায়ন। মূল্য বিচারকরণ। অথবা কোন কিছুর উপর মূল্য আরোপ করাই মূল্যায়ন। আবার কোন কিছুর মূল্য নির্ধারণের প্রক্রিয়াকেও মূল্যায়ন হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সামগ্রিকভাবে ব্যক্তির বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যতের সম্ভাব্য আচরণের উপর মূল্য আরোপ প্রক্রিয়াই মূল্যায়ন। শিক্ষা ক্ষেত্রে মূল্যায়ন কেবলমাত্র পরীক্ষা নেয়া বা পরীক্ষার উত্তরপত্রের পরিমাপই করে না, এটি শিক্ষা বিষয়ক সকল কর্মকাণ্ডের সাথে সমন্বিত বা সকল প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ। শিক্ষার্থীকে জ্ঞানদানই শিক্ষা নয়, শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ ঘটানোই শিক্ষা। তাদের শিখন ও উন্নয়নের প্রকৃতি ও বিস্তৃতি বা পরিধি নির্ণয়ের সমন্বিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হয়। আবার অনেকের মতে জ্ঞানদান করা যায় না। এটি একটি অতিরঞ্জিত শব্দ। বিষয়বস্তু ও শিক্ষা পদ্ধতিতে পারদর্শী হলেই শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করা হয়না, তাঁকে শিক্ষণ শিখনের উদ্দেশ্য ও শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত মূল্যায়ন উপকরণ তৈরি, উদ্ভাবন ও ব্যবহারে পারদর্শী হতে হয়। শিক্ষার্থীর শিখন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট থাকতে হয়। মূল্যায়নের কার্যকারিতা অনেক খানি নির্ভর করে শিক্ষক শিক্ষার্থীর কোন বৈশিষ্ট্যটি পরিমাপ করতে ইচ্ছুক বা জানা আবশ্যক বলে তিনি মনে করেন। তখনই তিনি কৌশল ও উপকরণ তৈরির পূর্বেই সে বৈশিষ্ট্যটি সুনির্দিষ্ট করে থাকেন। অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব বা পারদর্শিতার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কৃতিত্ব পরিমাপক উপকরণ নির্বাচনের পূর্বেই প্রত্যাশিত শিখনফল (Learning outcomes) সুনির্দিষ্ট করে নিতে হয়। নির্বাচিত মূল্যায়ন কৌশলটি নৈর্ব্যক্তিকতা, সঠিকতা ও ব্যবহার উপযোগী হতে হবে। এটি অবশ্যই মূল্যায়নযোগ্য শিখন ও উন্নয়ন

পরিমাপের জন্য সবচেয়ে কার্যকর কৌশল হিসাবে বিবেচিত হবে। এ ধরনের সমন্বিত মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজন নানান রকম মূল্যায়ন কৌশল। শিক্ষার্থীর জ্ঞান, উপলব্ধি ও জ্ঞানের প্রয়োগ পরিমাপের জন্য নৈর্ব্যক্তিক কৃতিত্বের অভীক্ষা, শিখন বিষয়ের প্রকাশ ক্ষমতা সংগঠনের সামর্থ্য যাচাইয়ের জন্য রচনামূলক অভীক্ষা, লিখিত প্রজেক্ট বা অ্যাসাইনমেন্ট, পারদর্শিতা বা কৃতিত্ব, দক্ষতা, আগ্রহ দৃষ্টিভঙ্গি পরিমাপের জন্য আত্মপ্রতিবেদনমূলক কৌশল ইত্যাদি ব্যবহার করতে হয়। মূল্যায়নকে কার্যকর ও অর্থবহ করার জন্য ব্যবহৃত মূল্যায়ন কৌশলের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও সচেতন থাকতে হয়।

শিক্ষণ শিখনের উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, শিখন অভিজ্ঞতা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি এ চারটি বিষয়ের সমন্বিত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেই পুরো শিক্ষামূলক কর্মসূচি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হয়। মূল্যায়ন প্রক্রিয়া কার্যকরি করতে প্রথমেই বিবেচনা করতে হয় শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যের সাপেক্ষে শিক্ষণ-শিখনের বিচারকরণ, এক একটি পাঠ শেষে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও সামর্থ্যের কতটুকু বিকাশ ঘটবে তার বর্ণনাই হল শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য। এ ক্ষেত্রে মূল লক্ষ্য শিক্ষার্থীর আচরণিক পরিবর্তন। এ আচরণগত পরিবর্তনকে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা, বোধগম্যতা বা ধীশক্তি, প্রয়োগক্ষমতা, দৃষ্টিভঙ্গি, আগ্রহ ও বিচারকরণ ক্ষমতার মাধ্যমেই বিবৃত করতে হয়। এগুলোই শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য। এটি খুব ব্যাপক। সরাসরি অর্জনযোগ্য নয়। এ কারণে শিক্ষার বিশেষ উদ্দেশ্য সনাক্ত ও বর্ণনা করতে হয়। শিক্ষাক্রমে যে সব আচরণিক উদ্দেশ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে তা সাধারণ উদ্দেশ্য। আর যে উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর বিকাশ পর্যবেক্ষণযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য পদে সুনির্দিষ্ট করে তাই আচরণিক উদ্দেশ্য। এটিকে শিক্ষণ উদ্দেশ্য বা বিশেষ উদ্দেশ্য বলা হয়।

জাতীয় জীবনের দর্শনই হল শিক্ষার প্রধান ও মূল উৎস। আর জাতির চাহিদা ও প্রত্যাশা শিক্ষার উদ্দেশ্যের উৎস। দেশের আর্থ-সামাজিক পরিবেশ, রাজনৈতিক কাঠামো এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা, জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণের পরিবর্তন ঘটে। তাদের নানাবিধ আচরণকে কয়েকটি সাধারণ শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। কোন একটি বিষয় শিক্ষণ শিখনের শেষে তারা যা করতে সমর্থ হয় তা আচরণিক উদ্দেশ্য। আচরণিক উদ্দেশ্যের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এটা পর্যবেক্ষণ যোগ্য ও পরিমাপযোগ্য। শিক্ষাবিদ ও মনোবিদ বেঞ্জামিন লম আচরণিক উদ্দেশ্যগুলোকে তিনটি ডোমেনে বিভক্ত করেছেন।

১. জ্ঞানগতক্ষেত্র (Cognitive domain)

২. আবেগিক ক্ষেত্র (Affective domain)

৩. মনোপেশীজ ক্ষেত্র (Psychomotor domain)

পরিমাপের জন্য সবচেয়ে কার্যকর কৌশল হিসাবে বিবেচিত হবে। এ ধরনের সমন্বিত মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজন নানান রকম মূল্যায়ন কৌশল। শিক্ষার্থীর জ্ঞান, উপলব্ধি ও জ্ঞানের প্রয়োগ পরিমাপের জন্য নৈর্ব্যক্তিক কৃতিত্বের অভীক্ষা, শিখন বিষয়ের প্রকাশ ক্ষমতা সংগঠনের সামর্থ্য যাচাইয়ের জন্য রচনামূলক অভীক্ষা, লিখিত প্রজেক্ট বা অ্যাসাইনমেন্ট, পারদর্শিতা বা কৃতিত্ব, দক্ষতা, আগ্রহ দৃষ্টিভঙ্গি পরিমাপের জন্য আত্মপ্রতিবেদনমূলক কৌশল ইত্যাদি ব্যবহার করতে হয়। মূল্যায়নকে কার্যকর ও অর্থবহ করার জন্য ব্যবহৃত মূল্যায়ন কৌশলের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও সচেতন থাকতে হয়।

শিক্ষণ শিখনের উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, শিখন অভিজ্ঞতা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি এ চারটি বিষয়ের সমন্বিত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেই পুরো শিক্ষামূলক কর্মসূচি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হয়। মূল্যায়ন প্রক্রিয়া কার্যকরি করতে প্রথমেই বিবেচনা করতে হয় শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যের সাপেক্ষে শিক্ষণ-শিখনের বিচারকরণ, এক একটি পাঠ শেষে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও সামর্থ্যের কতটুকু বিকাশ ঘটবে তার বর্ণনাই হল শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য। এ ক্ষেত্রে মূল লক্ষ্য শিক্ষার্থীর আচরণিক পরিবর্তন। এ আচরণগত পরিবর্তনকে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা, বোধগম্যতা বা ধীশক্তি, প্রয়োগক্ষমতা, দৃষ্টিভঙ্গি, আগ্রহ ও বিচারকরণ ক্ষমতার মাধ্যমেই বিবৃত করতে হয়। এগুলোই শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য। এটি খুব ব্যাপক। সরাসরি অর্জনযোগ্য নয়। এ কারণে শিক্ষার বিশেষ উদ্দেশ্য সনাক্ত ও বর্ণনা করতে হয়। শিক্ষাক্রমে যে সব আচরণিক উদ্দেশ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে তা সাধারণ উদ্দেশ্য। আর যে উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর বিকাশ পর্যবেক্ষণযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য পদে সুনির্দিষ্ট করে তাই আচরণিক উদ্দেশ্য। এটিকে শিক্ষণ উদ্দেশ্য বা বিশেষ উদ্দেশ্য বলা হয়।

জাতীয় জীবনের দর্শনই হল শিক্ষার প্রধান ও মূল উৎস। আর জাতির চাহিদা ও প্রত্যাশা শিক্ষার উদ্দেশ্যের উৎস। দেশের আর্থ-সামাজিক পরিবেশ, রাজনৈতিক কাঠামো এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা, জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণের পরিবর্তন ঘটে। তাদের নানাবিধ আচরণকে কয়েকটি সাধারণ শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। কোন একটি বিষয় শিক্ষণ শিখনের শেষে তারা যা করতে সমর্থ হয় তা আচরণিক উদ্দেশ্য। আচরণিক উদ্দেশ্যের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এটা পর্যবেক্ষণ যোগ্য ও পরিমাপযোগ্য। শিক্ষাবিদ ও মনোবিদ বেঞ্জামিন লম আচরণিক উদ্দেশ্যগুলোকে তিনটি ডোমেনে বিভক্ত করেছেন।

১. জ্ঞানগতক্ষেত্র (Cognitive domain)

২. আবেগিক ক্ষেত্র (Affective domain)

৩. মনোপেশীজ ক্ষেত্র (Psychomotor domain)

জ্ঞানগতক্ষেত্র বা জ্ঞান বিষয়ক ক্ষেত্রটি চিন্তনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। জ্ঞানের স্মরণ (recall) বা চেনা বা সনাক্তকরণ (recognition) এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সামর্থ্য (Intellectual abilities) ও দক্ষতার (Skill) বিকাশ জ্ঞানগতক্ষেত্রের বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত। মনোবিদ লম জ্ঞানগত ক্ষেত্রে ছয় ধরনের উদ্দেশ্য চিহ্নিত করেছেন। উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্তে সম্পাদিত কাজের জটিলতার ভিত্তিতে বিন্যস্ত এ উদ্দেশ্যগুলো সহজ থেকে জটিল আবার মূর্ত থেকে বিমূর্ত আচরণের ভিত্তিতে সাজানো । এগুলো হলো ঃ

১. জ্ঞান (Knowledge)

২. বোধগম্যতা (Comprehension)

৩. প্রয়োগ (Application)

৪. বিশ্লেষণ (Analysis)

৫. সংশ্লেষণ (Synthesis)

৬. মূল্যায়ন (Evaluation)

আবেগিক ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যসমূহ দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, আগ্রহ ও যথোচিত গুণ বিচারকরণ ক্ষমতা পরিবর্তন নিয়ে কাজ করে। কেননা শিখনের সাথে সাথে শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাব, আবেগ, অনুভূতি, প্রশংসা করার ক্ষমতা এবং যথাযথ গুণ বিচারকরণ ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটে। আবেগিক ক্ষেত্রটিকে প্রাধান্য অনুসারে চারটি উপবিভাগে বিভক্ত করা হয়।

১. গ্রহণ করা (Reception)

২. সাড়া প্রদান (Response)

৩. মূল্য বিচারকরণ (Appreciation)

৪. সংগঠন (Organisation)

মনোপেশীজ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যগুলো হাতে কলমে কাজ বা দৈহিক পরিশ্রমে সম্পাদিত কাজে দক্ষতা অর্জনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ ক্ষেত্রের উপবিভাগগুলো ঃ

১. নকলকরণ (Imitation)

২. নিপুণতার সাথে পরিচালনা (Manipulation)

৩. সঠিকতা (Precision)

৪. সমন্বয় সাধন (Articulation)

৫. বিকীকরণ বা স্বভাবীকরণ (Naturalization)

প্রচলিত ও গতানুগতিক পরীক্ষা পদ্ধতির বহু সমালোচিত ত্রুটিগুলোকে সংশোধন

করার প্রয়োজনীয়তা সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত। এ প্রচেষ্টাকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে শিক্ষা মূল্যায়ন ও পরিমাপের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত উপায় খুঁজে বের করতে হবে। শিক্ষামূলক বৈশিষ্ট্য পরিমাপের কৌশল বা শিক্ষামূলক অভীক্ষা (Educational test) উদ্ভাবন ও প্রয়োগের কলাকৌশল কাজে লাগিয়ে অগ্রসর হতে হবে। এজন্য মনোবৈজ্ঞানিক ও শিক্ষামূলক অভীক্ষার (Psychological and educational test) বিকাশ ঘটাতে হবে। শ্রেণি শিক্ষণে শিক্ষক প্রতিটি শিক্ষার্থীর মনোপ্রকৃতি বিশ্লেষণ তথা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য অনুশীলনের উপর গুরুত্ব দিয়ে দৈনন্দিন পাঠদান সম্পন্ন করবেন। তিনি তাঁর কর্মসূচিকে সক্রিয় রাখতে বিভিন্ন ধরনের পরিমাপক যন্ত্র (Measuring Instrument) যা কিছু প্রয়োগ করবেন তা শিক্ষা ও মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে অভীক্ষা (Test) নামে পরিচিত। কোন নির্দিষ্ট কাজের মাধ্যমে তিনি যে উপকরণগুলো (tools) ব্যবহার করে শিক্ষার্থী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবেন। সেগুলোও অভীক্ষা (Test)। শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের পরিমাপ, অর্জিত জ্ঞান, বুদ্ধি বা দক্ষতার নির্ভুলমাত্রা নানা প্রকার অভীক্ষা প্রয়োগ করে নিরূপণ করা হয়। এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক মূল্যায়ন অভীক্ষা নির্বাচন ও গঠনের নির্ভুলতার উপর নির্ভরশীল। অভীক্ষা প্রয়োগের আগে অভীক্ষাটির পরিমাপক ক্ষমতা (Measuring Efficiency) সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। অভীক্ষার ঐ পরিমাপ ক্ষমতা নির্ভর করে কতকগুলো কারণ বা উপাদানের (Factor) উপর। এ উপাদান বা শর্তগুলোকে সুঅভীক্ষার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of a good test) বলে। অভীক্ষার ঐ সকল বৈশিষ্ট্যাবলীর যে কোন একটির অভাব ঘটলে অভীক্ষাটি কখনও নিখুঁত পরিমাপ দিতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে সঠিক মূল্যায়নের প্রয়াস ব্যর্থ হতে বাধ্য। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার্থীর সার্বিক মূল্যায়নের সার্থকতা নির্ভর করছে সঠিক পরিমাপ কৌশল বা উপায় অবলম্বনের উপর। শিক্ষামূলক বা মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে যথার্থতা, নির্ভরযোগ্যতা, নৈর্ব্যক্তিকতা, আদর্শায়ন, প্রয়োগশীলতা, পরিমিততা ও সম্পূর্ণতা।

শিক্ষায় মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সাথে প্রত্যক্ষভাবে পারদর্শিতার অভীক্ষগুলো (Achievement test) সম্পর্কযুক্ত। পারদর্শিতা বলতে কোন কিছু সম্পাদনের দক্ষতাকে বুঝায়। সুতরাং পারদর্শিতার কৌশল অভীক্ষা বিশেষ ধরনের পরিমাপ কৌশল হিসাবে শিক্ষার্থীর কর্মসম্পাদনের দক্ষতা পরিমাপ করে। শিক্ষা ক্ষেত্রে এ ধরনের অভীক্ষা প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত অগ্রগতি পরিমাপ করা হয়। শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বিষয় সম্পর্কিত অর্জিত জ্ঞান ছাড়াও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের বিকাশের হার পরিমাপ করা প্রয়োজন। বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব ও আগ্রহ, মনোভাব সম্পাদনের ক্ষমতা ইত্যাদি পরিমাপ করা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষাকে বাস্তব ও প্রয়োগমুখী করে তুলতে শিক্ষায় নির্দেশনা অপরিহার্য। সাধারণ অর্থে নির্দেশনা শব্দটি দ্বারা নির্দেশ করা বুঝায়। অভিধানসম্মত শব্দ হল, পরিচালনা করা। আজকের দিনে শিক্ষাক্ষেত্রে নির্দেশনা আরও অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে।

স্বজন পরিবৃত্ত আদূরে শিশুটির বিদ্যালয় আগমন কিভাবে তার সামাজিক, পারিবারিক পরিবেশ ও বংশগতির উপর নির্ভরশীল অবস্থানকে নতুন করে সঙ্গতিবিধান ঘটাবে তা শিক্ষকের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিশুর ব্যক্তিসত্তাকে পাঠ্য বিষয়ে অধিক আগ্রহশীল করে তার মানসিক ক্ষমতার সামগ্রিক মনোনিবেশ সৃষ্টি নিঃসন্দেহে একটি জটিল কাজ। এক্ষেত্রে শিক্ষা নির্দেশনা শিশুর শিক্ষা জীবনে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক আবেগিক বৃত্তিসমূহকে যথাযথভাবে বিকাশ সাধনের বহিঃপ্রচেষ্টা হিসাবে কাজ করে। শিক্ষার্থীর পাঠ অভ্যাস গঠনে উৎসাহ ও প্রেরণা সৃষ্টি, সামর্থ্য ও অনুরূপ অনুযায়ী পাঠ্যবিষয় নির্বাচন বুদ্ধিমত্তার স্বাভাবিক বিকাশ ও সৃজনশীলতার সমাবেশ ঘটানো সহজ নয়। অবিরত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক তার দৈহিক মানসিক তথা চরিত্রিক বৈচিত্র চিহ্নিত করে নির্দেশনার সঠিক কলা কৌশলের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে একটি সম্ভাবনাময় জীবন গঠনে সম্ভাব্য সকল প্রকার সহায়তা করতে পারেন

শিক্ষামূলক নির্দেশনা ও শিক্ষামূলক পরামর্শ একই অর্থে ব্যবহৃত হলেও, এদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। নির্দেশনা সমগ্র সত্তা আর পরামর্শ তার একটি বিশেষ অংশমাত্র। নির্দেশনার কর্মকাণ্ডে পরামর্শের ফলাফলকেই কাজে লাগাতে হয়। যুগোপযোগী নির্দেশনা ও পরামর্শ ব্যবস্থা চালু করে যথার্থ শিক্ষা পরিবেশ সৃষ্টি করা যেতে পারে। সামাজিক অস্থিরতা, অবক্ষয়রোধ করে দেশ ও জাতির প্রত্যাশা পূরণে হতাশগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের তারুণ্যের কর্মচঞ্চলতাকে শক্তির প্রতীক হিসাবে মূলধারায় সম্পৃক্ত করার এখনই সময়। অভিভাবক সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষকবৃন্দ সচেতনভাবে পরামর্শ দাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলে বর্তমান অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটবে। শিক্ষার সাথে জীবিকা বা পেশা গ্রহণ একই সরলরেখায় চলছে না। শিক্ষা সমাপনান্তে বিদায়ী শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান দেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে একটা অপরিহার্য পদক্ষেপ যা প্রতিটি বিদ্যালয়ের সহ-পাঠক্রমিক কর্মকাণ্ডের ন্যায় সমান গুরুত্বসহকারে অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। শিক্ষাসূচিতে অংশগ্রহণকারী সকলকেই নির্দিষ্ট সমস্যার নির্দিষ্ট ব্যক্তিকেন্দ্রিক পরামর্শদান সংক্রান্ত সুযোগ সৃষ্টি করা আবশ্যক। ফলে বিদ্যালয় ত্যাগকারী শিক্ষা সমাপনী তথা মেধাবী শিক্ষার্থী সকলের জন্যই সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুসারে চাহিদাভিত্তিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে। তা ছাড়াও স্বকর্ম সংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির সুযোগ, পুঁজি বা চাহিদাভিত্তিক দক্ষ/আধাদক্ষ/অদক্ষ কর্মীদেরও সঠিক কর্মসংস্থানের সহায়তা দেয়া যেতে পারে। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও অনুরূপ পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। শিক্ষা গ্রহণকারীদের যাতে মেধার অপচয় না ঘটে সে ধরনের কর্মভিত্তিক বা পেশাভিত্তিক সম্ভাবনা যাচাইয়েরও কোন বিকল্প নেই। এ ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা যথেষ্ট সহায়ক। এ কারণেই কর্মসংস্থানের সম্ভাব্য উপায়, কৌশল, সংস্থা সম্পর্কে শিক্ষকের স্বচ্ছ ধারণা থাকা

অপরিহার্য যোগ্যতা হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। দেশের শিক্ষিত, জনপ্রিয় এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসাবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক তাঁর শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা, মেধা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে মানবসম্পদ উন্নয়নের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষকই দেশ গড়ার কারিগর।

শিখন (learning)একটি অবিরত প্রক্রিয়া। শিখনের স্থায়ী পরিবর্তিত রূপ প্রতিফলিত হয় শিক্ষার্থীর আচরণে আনুষ্ঠানিক শিখন প্রক্রিয়ায়। বিদ্যালয়সমূহে কেবলমাত্র তাৎক্ষণিক পরিবর্তন শ্রেণিভিত্তিক পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়। এ ছাড়া শ্রেণি শিক্ষক, বিষয় শিক্ষক, প্রধান শিক্ষকের লিখিত মন্তব্যের মাধ্যমে তার শিখনের একটা বিশ্লেষণমূলক মূল্যায়ন বা শিক্ষার্থীর শিক্ষা প্রক্রিয়ার একটা সামগ্রিক মূল্যায়ন বা অগ্রগতির মূল্যায়ন জানা যায়। এ মূল্যায়ন সাধারণত তিন প্রক্রিয়ায় পাওয়া যায় ঃ

১. শিক্ষার্থীর নির্দিষ্ট সম্পাদিত কাজের মাধ্যমে,
২. শিক্ষার্থীর নিজের সম্পর্কের বিবৃতিমূলক বা আত্মবিবৃতিমূলক প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে।
৩. পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে।

এ ধরনের বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে আমরা যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেছি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলো কতকগুলো সংখ্যামান বা স্কোর (Score)। এ গুলোকে চলক (Variable) বলা হয়। যে কোন পরিমাপ ও গবেষণায় চলক একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিমাপ বা মূল্যায়নের জন্য প্রাপ্ত স্কোরগুলোকে তাদের বিশেষগুণ বা ধর্ম অনুযায়ী সারি বিন্যাস বা শ্রেণিবদ্ধ করতে হয়। নানা ধরনের কৌশল এবং হাতিয়ার ব্যবহার করে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করা হয়। শিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়াকে ফলপ্রসূ করার জন্য স্কোরগুচ্ছের তাৎপর্য নির্ণয়ের জন্য প্রধানত কেন্দ্রীয় প্রবণতা ও বিষমতার পরিসংখ্যান পদ্ধতিগুলো প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু অনেকক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ সঠিক তথ্য দিতে ব্যর্থ হয়। তখন শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের চিন্তাধারা সুসংহত, নির্ভুল ও বিষয়মুখী করতে বিষমতার পরিমাপের ব্যবহার অপরিহার্য। কেন্দ্রীয় প্রবণতা যে কোন স্কোরগুচ্ছের প্রতিনিধি স্বরূপ। এ পরিমাপ থেকে শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের একটা সামগ্রিক ধারণা পাওয়া যায় মাত্র। কিন্তু কোন স্কোরগুচ্ছ কতটুকু বৈষম্যপূর্ণ (Variable) তা বিষমতার পরিমাপ থেকেই জানতে হয়। বিষমতা স্কোরগুচ্ছের মধ্যবিন্দু বা কেন্দ্রীয় প্রবণতার চারিপাশে কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত বা ছড়িয়ে আছে তার একটা সঠিক ধারণা দেয়।

এক বা একাধিক ব্যক্তিগত বা দলগত পরিমাপের পৃথক পৃথক তাৎপর্য কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ বা বিষমতার পরিমাপের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। তা সত্ত্বেও

শিক্ষামূলক বা মনোবৈজ্ঞানিক পরিমাপের ক্ষেত্রে আর একটি দিক থেকে তথ্যগুলোকে বিচার না করলে ব্যক্তির অনেক পরস্পর সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্য জানা যায় না। এভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রে কোন বিশেষ বিষয়ের পারদর্শিতা অন্য বিষয়ের পারদর্শিতার সঙ্গে কি ধরনের সম্পর্কযুক্ত হতে পারে তা শিক্ষা মূল্যায়ন ও পরিমাপের আধুনিক কর্মকাণ্ডে বিস্তারিতভাবে বিবৃত রয়েছে। দুটি চল (Variable) বা ঘটনার (Event) বা বৈশিষ্ট্যের (Characteristics) মধ্যে সম্পর্ক থাকলেও এ সম্পর্কের পরিমাণগত ও গুণগত বা প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকছে। এ ধরনের পার্থক্যের গাণিতিক সূচককেই অনুবন্ধের পরিমাপ বা সহ-সম্পর্ক বলা হয়। শিক্ষায় পরিমাপ ও মূল্যায়ন বা গবেষণায় এর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়
শিক্ষায় মূল্যায়ন

পরিমাপ কি?

পরিমাপ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নানাবিধ কাজের সাথে ওতপ্রতোভাবে জড়িত। এক মিটার কাপড় বা চুম্বকের প্রকৃতি অথবা একজন ছাত্রের বুদ্ধ্যাঙ্ক পরিমাপ করার ক্ষেত্রে অনেক পার্থক্য দেখা যাবে। প্রথম দুটি উদাহরণের ক্ষেত্রে ভৌতবিজ্ঞান এবং শেষেরটির ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের সাহায্য নেয়া হয়েছে। বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ যেমন আবশ্যিক, তেমনি পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের জন্য সঠিক পরিমাপ পদ্ধতিও তেমনি নির্ভরশীল। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় ধরনের পরিমাপযন্ত্রের ব্যবহার অপরিহার্য। কিন্তু উদাহরণের শেষের পরিমাপটির জন্য যে সকল প্রশ্ন বা প্রশ্নগুচ্ছ অথবা অভীক্ষা ব্যবহার করতে হয় তা মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষা। শিক্ষাবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত পরিমাপক বস্তু অমূর্ত। এ জাতীয় অভীক্ষা বা প্রশ্নগুচ্ছ দ্বারা বিভিন্ন ব্যক্তির পার্থক্য বা একই ব্যক্তির বিভিন্ন পরিবেশে এবং বিভিন্ন উদ্দীপকের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়ার বৈচিত্র্য নির্ণয় করা হয়। পরিমাপ হলো কোন বিশেষ বিষয়বস্তুর অংশ বিশেষের অধীত জ্ঞান বা কোন বিশেষ বিষয়ে দক্ষতা এবং ক্ষমতার পরিমাপ নির্ণয় করা। আজকাল সুশিক্ষিত দেশ বা রাষ্ট্রে প্রমোশন, নম্বরদান, পরামর্শ, শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ইত্যাদি শিক্ষাসংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ডে সঠিক পরিমাপের উপযোগিতা অস্বীকার করার উপায় নেই। এক কথায় পরিমাপই শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে অগ্রগতির সূচনায় সাহায্য করে।

আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষা কাঠামো কোন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত?

মনোবিজ্ঞানসম্মত আধুনিক শিক্ষা প্রক্রিয়ায় শিক্ষকগণকে পরিমাপের বিভিন্ন কার্যকারিতার উপর নির্ভরশীল হতে হচ্ছে। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে যে কোন শ্রেণির একাধিক শিক্ষার্থীর একই রকম আচরণের পরিবর্তন বা প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় না।

কোন শ্রেণির শিক্ষার্থীদের রুচি, আগ্রহ, প্রবণতা, দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই পার্থক্য দেখা যায়। আবার একই শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিষয়ে একই রকম পারদর্শিতা বা দক্ষতা দেখাতে পারবে না। বিভিন্ন বিষয়ে তার আগ্রহ এক নয়। এমনকি বিভিন্ন পরিবেশে সে একই উপায়ে সঙ্গতি বিধান করতে পারে না। ব্যক্তিসত্তার এ বিভিন্নতা একটি বাস্তব সত্য। আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষা কাঠামো এ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

এ কারণেই আজকের দিনে শিক্ষকের দায়িত্ব হচ্ছে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তারস্বরূপ নির্ণয় করা, পরিমাপ করা এবং শিক্ষাসূচিকে তার উপযোগী করে গড়ে তোলা। তাই, শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার আদর্শের সাথে ব্যক্তির পারদর্শিতা বা দক্ষতার সমন্বয় সাধন করা। এ সমন্বয় সাধনে পরিমাপের ভূমিকাই মুখ্য। শিক্ষার সুষ্ঠু এবং সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য পরিমাপ পদ্ধতি ও তার বিবিধ প্রয়োগ কৌশল অবশ্যই একজন শিক্ষককে জানতে হবে। তিনিই সুশিক্ষক যিনি শিক্ষার্থীর প্রয়োজন এবং সামর্থ্য অনুযায়ী তার শিক্ষা সূচি নির্ধারণ করে দিতে পারবেন। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা নেয়া, তাদের পাঠের অগ্রগতি জানা ও মেধা যাচাই করার সঠিক পরিমাপ কৌশল আয়ত্ত করা একজন শিক্ষকের অবশ্য কর্তব্য।

সংজ্ঞা ঃ শিক্ষায় পরিমাপ

শিক্ষায় পরিমাপ বলতে শিক্ষার্থীর কোন অর্জিত জ্ঞান বা কোন বিশেষ দক্ষতা বা কোন শক্তির বিশেষ দিকটির 'মাপ' (Measurement) ধরা হয়। যেমন কোন একজন শিক্ষার্থী গণিত, বাংলা বা ইতিহাস বিষয়ে কতটা জ্ঞান অর্জন করলো কিংবা যন্ত্রমূলক শক্তি বা ভাষামূলক শক্তির সে কতটা অধিকারী। এ রকম কোন জ্ঞান শক্তি বা যোগ্যতার বিশেষ দিকের পরিমাপ বা মাত্রা নির্ণয় করাই শিক্ষায় পরিমাপ।

মূল্যায়ন কি?

'মূল্যায়ন' শব্দটি আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে অতি প্রচলিত। ইহার আভিধানিক অর্থ হল কোন কিছুর উপর মূল্য আরোপ করা। "Evaluation is the act of placing value on something"। মূল্যায়ন কেবল বর্তমানে বা অতীতে শিক্ষার্থীর সম্পাদিত আচরণের উপরই মূল্য আরোপ করে না। এ প্রক্রিয়ায় ভবিষ্যতের কথাও চিন্তা করা হয়। সামগ্রিকভাবে ব্যক্তির বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যতের সম্ভাব্য আচরণের উপর মূল্য আরোপ প্রক্রিয়াই হ'ল মূল্যায়ন। ইহা শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সমন্বিত শিশুর সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ। শিক্ষার উদ্দেশ্য কি, শিশুর মধ্যে সামগ্রিক পরিবর্তন ঘটানো এবং তার সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ, সাধন করা। এ ক্ষেত্রে শিশুর মধ্যে সুনিয়ন্ত্রিত এবং সমর্থনযোগ্য পরিবর্তন আনার প্রয়োজন। ইহা সম্ভব একমাত্র শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা ও সক্রিয়তার দ্বারাই। একদিকে শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা শিশুর মনে সঞ্চারিত করা এবং অপরদিকে তার আচরণগত মূল্যায়ন এবং প্রত্যাগত তথ্য বা ফিডব্যক এ দু'য়ে মিলেই শিক্ষা ব্যবস্থা। শিশু প্রতিনিয়তই নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছে। অধীতজ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গী, পর্যবেক্ষণ, সমাজমিতি, সাক্ষাৎকার, ব্যক্তিত্ব পরিমাপক অভীক্ষা এবং চারিত্রিক গুণাবলী পরীক্ষার মাধ্যমে আচরণের যে সব পরিমাপ পাওয়া যায়

তার সুসংবদ্ধ রূপের সাহায্যে মূল্যায়ন উক্ত শিশুর ব্যক্তিত্বের একটি পরিপূর্ণ চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম। যে কোন ধরনের ব্যক্তির আচরণগত পরিবর্তনই মূল্যায়নযোগ্য এবং আধুনিক মূল্যায়নবিদগণ মনে করেন এ সার্বিক মূল্যায়ন শিক্ষার দিক থেকে একান্তভাবে প্রয়োজন। মূল্যায়ন প্রক্রিয়া নিজে উদ্দেশ্যভিত্তিক হলেও শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলোকে মূল্যায়ন সম্ভব এবং প্রয়োজনবোধে মূল্যায়ন করা হয়। এ ধারণা থেকেই আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার প্রবর্তন। মনোবিজ্ঞানীদের মতামত অনুযায়ী পরস্পর নির্ভরশীল ব্যক্তির জটিল আচরণগুলোকে বিচ্ছিন্ন পরিমাপের কৌশল দ্বারা সঠিকভাবে বিবৃত করা যায় না। এ জন্য প্রয়োজন, পরস্পর সম্পর্কযুক্ত সামগ্রিক কৌশল। আর ইহাই মূল্যায়ন। আবার মূল্যায়ন শিখন (Learning) এবং শিক্ষণ (Teaching) উভয় প্রক্রিয়ার উন্নতিতে অপরিহার্য উপায় হিসাবে কাজ করে। ফলে, মূল্যায়ন সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে এক ধরনের সচেতন ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়া হিসাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তির উন্মেষ, দক্ষতা অর্জন, তথ্য সংগ্রহ ও অভ্যাস গঠনের ব্যাপারে নয়, বরং তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন, উপলব্ধির ক্ষমতা, কৌতুহল, বুদ্ধি, অনুরাগ সৃষ্টি, ধারণা শক্তি বর্ধন, আত্মোপলব্ধি ও নিজকে সমাজ সংগঠনের সাথে মানিয়ে চলার উদ্দীপনা জাগ্রত করাও শিক্ষাবিজ্ঞানের কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। এ সকল উদ্দেশ্যাবলি শিক্ষা প্রক্রিয়ায় যথার্থভাবে নির্ধারণের পদ্ধতিসমূহ স্থির করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সঠিক মূল্যায়ন অপরিহার্য।

যে কোন দেশ বা জাতির আর্থসামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে নিয়ন্ত্রিত সচেতনতা সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাস্তবমুখী করে তোলে। তখন সে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসাবে শিক্ষাসূচি জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্যগুলোকে লালন ও চর্চা করে নিজস্ব স্বকীয়তা ও সৃজনশীলতা বজায় রেখে দক্ষ কর্মীবাহিনী তৈরি করতে সক্ষম। ক্রমশ সমাজ সংগঠন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, মননশীল শিল্প, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অবকাঠামো শিক্ষাসূচির নির্দেশিত পথেই গড়ে উঠতে থাকে। তখন সুস্থ ও সবল সামাজিক পরিবেশে ব্যক্তির জীবনে শিক্ষার সর্বাঙ্গীন বিকাশ, সার্বিক প্রস্তুতি, মান ও উৎকর্ষের সুযোগ ঘটে। দেশপ্রেমিক, মননশীল, নিষ্ঠাবান, সবল সুস্থ কুশলী প্রজন্মের উন্মেষ অনিবার্য হয়ে উঠে। শিক্ষাই বিবেচিত হয় ব্যক্তি ও সমাজ উন্নয়নের একমাত্র হাতিয়ার হিসাবে।

মূল্যায়নের আধুনিক চিন্তাধারা মনোবিজ্ঞান, কম্পিউটার প্রযুক্তি প্রভৃতি বিষয়ের সাথে সুসমন্বিতকরণের প্রচেষ্টা অধুনা উন্নত দেশসমূহে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ফলে শিশু সুসামঞ্জস্য উন্নতি ও অগ্রগতি বিধানের সহায়তামূলক মূল্যায়নের বিবিধ উপায় ও কৌশলের ক্ষেত্রে আরও সার্বিক উন্নতি ঘটবে। আশা করা যায় অদূরভবিষ্যতে গোটা শিক্ষা কাঠামোতে বৈপ্লবিক বিবর্তন ঘটবে।

সংজ্ঞা ঃ শিক্ষায় মূল্যায়ন

শিক্ষার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের সঙ্গে মূল্যায়ন নিবিড়ভাবে জড়িত। শিক্ষার্থীর পাঠাভ্যাস শিক্ষকের পাঠদান পদ্ধতি উভয়ের উপরই মূল্যায়নের প্রভাব অসীম। মূল্যায়ন কেবল বিষয়বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিমাপ নয়। শিক্ষার্থীর রুচি, প্রবণতা, দৃষ্টিভঙ্গী, আগ্রহ, ব্যক্তিত্বের ক্রমপরিবর্তন, আদর্শ, চিন্তাধারা, অভ্যাস, সার্থক সঙ্গতি বিধান প্রভৃতির দৈনন্দিন পরিমাপই মূল্যায়ন। মূল্যায়ন হল শিক্ষার্থীর দৈহিক, চারিত্রিক, মানসিক, মেজাজগত, আচরণমূলক ব্যক্তিত্বের গতিশীল পরিবর্তনের পরিমাপ। ইহা একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ বা সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইহা শুধু পরিমাপই করে না, বরং পদ্ধতির পথ নির্দেশনা দেয়। শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যভিত্তিক আচরণের মূল্য নির্ধারণের প্রক্রিয়াই মূল্যায়ন। শিক্ষার লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক যে সমবেতভাবে চেষ্টা করেছেন এবং যার ফলে শিক্ষার্থীর জীবনের দৈহিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক, প্রক্ষেভিক (Emotional), আধ্যাত্মিক, নৈতিক প্রভৃতি দিকের যে পরিবর্তন ঘটছে তাদের প্রভাবে ব্যক্তি জীবনের যে সামগ্রিক রূপটি ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে তার পরিমাপই মূল্যায়ন। মনোবিদ ওয়েজলে (Weslay) এর ভাষায় মূল্যায়নের সংজ্ঞা ঃ "It indicates all kinds of efforts and all kinds of means to ascertain the quality, value and effectiveness of desired outcomes. It is a compound of objective evidence and subjective observation. It is the total and final estimate."

মূল্যায়নের স্বরূপ

আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক মূল্যায়ন পদ্ধতির সাহায্যে শ্রেণিকক্ষের কর্মসূচি কতটুকু বাস্তবায়ন করা যায় তা যাচাই করতে হয়। মূল্যায়নেস্বরূপ আলোচনা করলে এর অর্থ ও পরিধি সম্পর্কে আরো পরিস্ফুটিত ধারণা জন্মে, কুইলেন ও হান্নার (Quillen and Hanna) মতে মূল্যায়নের স্বরূপ হল -

এক. মূল্যায়ন শিশুর আচরণ সম্যকভাবে নির্ণয় করে।

দুই. মূল্যায়ন শিশুর নিয়ত পরিবর্তনশীল বুদ্ধির পরিমাপ করে।

তিন. মূল্যায়ন শিক্ষা প্রক্রিয়াকে উন্নততর করে।

চার. মূল্যায়ন একদিকে বিবরণবহুল এবং অপর দিকে সংখ্যামানে প্রকাশিত হয়।

পাঁচ. মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর সমগ্র ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করে।

ছয়. মূল্যায়ন শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং অভিভাবকের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্বন্ধ স্থাপন করে।

মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা

১। মূল্যায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো শিক্ষার্থীর স্বতন্ত্র চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করে শিক্ষার ব্যবস্থা করা। মূল্যায়নের সাহায্যে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর বিশেষধর্মী সামর্থ্য ও দক্ষতা আবিষ্কার করা এবং শিক্ষার্থীর এ বিশেষধর্মী চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা।

২। মূল্যায়ন শিক্ষামূলক সুপরিচালনার আয়োজন করতে সাহায্য করে। উপর্যুক্ত মূল্যায়ন পদ্ধতির সাহায্যেই মানসিক শক্তির একটি নির্ভুল পরিমাপ করা এবং তার জন্য সবচেয়ে উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে তাকে নির্দেশ দেয়া সম্ভব হয়।

৩। মূল্যায়নের আধুনিক পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কর্ম ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর কি ধরনের দক্ষতা ও যোগ্যতা আছে তা নির্ণয় করা যায় এবং সেই ফলাফলের উপর নির্ভর করেই তার জন্য সবচেয়ে উপযোগী বৃত্তিটি কি হবে সে সম্পর্কে তাকে উপদেশ দেওয়া সম্ভব হয়।

৪। আধুনিক ব্যক্তিসত্তার অভীক্ষা, আগ্রহের অভীক্ষা, প্রতিফলনমূলক অভীক্ষা প্রভৃতির সাহায্যে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বহু নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় এবং সেই তথ্যগুলোকে ভিত্তি করে তার ব্যক্তিগত জীবনের বহুবিধ সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানে তাকে সাহায্য করাই মূল্যায়নের অন্যতম প্রধান কর্মসূচি।

৫। বিদ্যালয়ের সামগ্রিক শিক্ষাসূচির কার্যকারিতার বিচার করা এবং প্রয়োজন হলে সে ব্যাপারে পরিবর্তন ও সংস্কার সাধনের পরামর্শ দেয়াও মূল্যায়নের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বিদ্যালয়ের অনুসৃত শিক্ষাসূচির কোথায় দুর্বলতা বা কোথায় উপযোগিতা তা মূল্যায়নের দ্বারা নির্ধারণ করা হয় এবং সেইমত ভবিষ্যৎ শিক্ষাসূচিকে নিয়ন্ত্রিতও করা যায়।

৬। মূল্যায়নের বিভিন্ন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী সম্বন্ধে যে সব তথ্য সংগৃহীত হয় সেগুলোর বিবরণী পিতা মাতা, অভিভাবক ও বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানোর ফলে বিদ্যালয় ও বাহিরের সমাজের মধ্যে যোগাযোগটি অনেক ঘনিষ্ঠ ও উন্নত হয়ে উঠতে পারে।

মূল্যায়নের ত্রিমুখী প্রক্রিয়া

ক. **প্রথম প্রক্রিয়া ঃ** শিক্ষার লক্ষ্য কতটা অর্জিত হয়েছে তা নিরূপণ করা।

খ. **দ্বিতীয় প্রক্রিয়া ঃ** শ্রেণিকক্ষে কতটা শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা প্রদান করা উচিত তার সীমানা নির্দেশ করা।

গ. **তৃতীয় প্রক্রিয়া ঃ** শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলো কতটুকু সফল হয়েছে তা নির্ণয় করা।

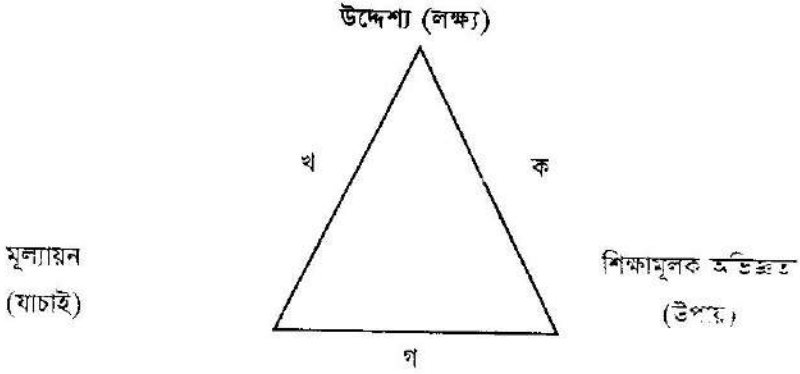

এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল শিক্ষার উদ্দেশ্যের সঙ্গে শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা এবং মূল্যায়নের ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে। শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা হচ্ছে 'উপায়' বা 'কর্ম-তৎপরতা', উদ্দেশ্য হচ্ছে 'লক্ষ্য' এবং মূল্যায়ন হচ্ছে 'যাচাই'। শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা এবং মূল্যায়নের কেন্দ্রস্থলে উদ্দেশ্যের স্থান। মূল্যায়ন শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলোকে যাচাই করতে সাহায্য করে। আবার শিক্ষার উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করেই শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতাগুলো বা কর্মতৎপরতাগুলো ঢেলে সাজানো হয়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, শিক্ষার প্রতিটি স্তরে মূল্যায়ন পথনির্দেশ দেয় কি পরিমাণ, শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীর মধ্যে কতটা পরিবর্তন আনতে সক্ষম হচ্ছে। অভিজ্ঞতা, লক্ষ্য এবং যাচাই অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। একটি ত্রিভুজ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উহাই প্রদর্শন করা হয়েছে। শিক্ষার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের উপর ভিত্তি করেই শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতাগুলোর আয়োজন করতে হয় তা 'ক' রেখা প্রকাশ করছে। মূল্যায়নের মাধ্যমে অর্জিত লক্ষ্যের পরিমাপ করতে হয় তা 'খ' রেখা দ্বারা দেখানো হয়েছে। অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হলে শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতার পরিবর্তন পরিবর্ধন করতে হবে এবং পুনর্মূল্যায়নে নির্ধারিত লক্ষ্যের পরিমাপ করতে হলে তা 'গ' রেখা দ্বারা প্রদর্শিত হয়েছে।

মনোবিদ Furst মূল্যায়নের কি কি কার্যক্রম উল্লেখ করেছেন ?

১। কোর্সের এবং কার্যক্রমের কার্যকারিতা নির্ধারণ করা।
২। প্রচলিত শিক্ষামূলক প্রক্রিয়াগুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার অবতারণা করা।
৩। শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহের ব্যাখ্যা করা।
৪। শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ বাছাই করা এবং মান নিরূপণ করা।

২ শিক্ষা গ্রহণের অসুবিধাগুলো বোঝা বা আবিষ্কার করা।
৩ শিক্ষা গ্রহণের প্রেষণা সৃষ্টি করা।
৪ শিক্ষণে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।
৫ নির্দেশনা প্রদান করা।
৬ যোগ্যতার অবস্থান নির্দেশ করা।
১০। বাছাই করা।
১১। প্রত্যায়ন করা।
১২। শিক্ষকদের কর্মকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

মূল্যায়ন কিভাবে শিক্ষাকে কার্যকর, তৃপ্তিদায়ক এবং সুসম্পূর্ণ করে তোলে ?

শিশু প্রতিদিনই কিছু নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এ ভাবেই সে শিক্ষা সঞ্চয় করে। শিক্ষাদান প্রক্রিয়াতে দীর্ঘদিনের আয়োজন প্রয়োজন। একদিনে যেমন শিক্ষাদান সম্ভব নয়, তেমনি শিশুর প্রতিদিনের পরিবর্তনের মূল্যায়নের বিকল্প কেবলমাত্র একটি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে তার সামগ্রিক বিচার সম্ভব নয়। এজন্য শিক্ষাদানের পূর্বে শিক্ষার্থীর অবস্থান কোথায় ছিল এবং সে অবস্থানের পটভূমিকায় শিক্ষাদান সময়ে শিক্ষার্থীর যে উত্তরোত্তর বিকাশ ঘটছে, তার মূল্যায়নের উপায় এবং পদ্ধতি নিরূপণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে শিশুর পরিবর্তন করতে গেলে তার প্রারম্ভিক অবস্থা সম্বন্ধে শিক্ষকের নিখুঁত জ্ঞান থাকা দরকার। শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় সামগ্রিক সফলতার ক্ষেত্রে মূল্যায়নের বিবিধ উপায় এবং কৌশল এর যথার্থ প্রয়োগ একজন সুশিক্ষকের মূল চাবিকাঠি।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে মূল্যায়নের সবচেয়ে বড় কাজ হলো এ দুটি স্তরের উদ্দেশ্যগুলো কতটা পূর্ণ হলো তার পরিমাপ করা। আধুনিক মূল্যায়নের সাহায্যেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীদের স্বাতন্ত্র্য চাহিদা অনুযায়ী তাদের উপযোগী শিক্ষাসূচির সূচনা করা যায়। এ স্তরসমূহের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যাবলীর পরিমাপ করা সম্ভব। আবার ঐ সকল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সঠিক শিক্ষাসূচির প্রবর্তন সহজ হয়ে উঠে। আধুনিক মূল্যায়নের সাহায্যে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কেবল শিক্ষার্থীর শিক্ষার অগ্রগতিই পরিমাপ করা যায় না। তার সর্বাঙ্গীন বিকাশ কতটা সংঘঠিত হলো তাও সুষ্ঠভাবে নির্ণয় করা সম্ভব। শিক্ষার্থীর শিক্ষাসূচি তথা ভাবী কর্মজীবনের ব্যর্থতারোধ করে অগ্রগতি নিশ্চিত করা সম্ভব। সমগ্র শিক্ষাসূচিই তখন শিক্ষার্থীর কাছে বোঝাস্বরূপ না হয়ে কর্ম জীবনের সম্বল হিসাবে ধরা দেয়। তার কাছে শিক্ষাই জীবন বা শিক্ষাই প্রগতি। এক কথায় মূল্যায়ন শিক্ষাকে কার্যকর, তৃপ্তিদায়ক এবং সুসম্পূর্ণ করে তোলে।

পরিমাপ ও মূল্যায়নের পার্থক্য

পরিমাপ ও মূল্যায়ন - এ দুটি প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রকৃতিগত কোন পার্থক্য নেই পার্থক্য হচ্ছে প্রধানত পরিধিগত এবং পদ্ধতিগত। বস্তুত শিক্ষাক্ষেত্রে এর দু'টি পৃথ ধারণা। পরিমাপের অর্থ অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ, মূল্যায়নের ধারণা ব্যাপক। মূল্যায়নে জন্য বিভিন্ন ধরনের পরিমাপও যেমন প্রয়োজন হয়, তেমনি আচরণের গুণগত দি বিচারকরণের প্রয়োজন হয়। 'পরিমাপ' ও 'মূল্যায়ন' সমার্থক বলে অতীতে কেহ কে মনে করতেন। কিন্তু মনোবিদ মনরো (Monroe) ইহাদের মধ্যে যে পার্থক্য আছে পরিস্ফুটিত করেন। Monroe বলেছেন, "In measurement the emphasis upon single aspect of subject matter, achievement of specific skil and abilities. Whereas in evaluation the emphasis is upon broa personality changes and major objectives of educational programme

মূল্যায়ন ও পরিমাপের এ পার্থক্যগুলো নিচে দেয়া হল

মূল্যায়ন	পরিমাপ
১. মূল্যায়ন উদ্দেশ্যভিত্তিক এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন।	১. পরিমাপ সবসময় উদ্দেশ্য সচেতন নয়।
২. মূল্যায়ন সামগ্রিক গুণসম্পন্ন।	২. পরিমাপ বিচ্ছিন্ন ধর্মী।
৩. মূল্যায়নে কোন বৈশিষ্ট্যের পরিমাণগত ও গুণগত উভয়দিক বিচার করা হয়।	৩. পরিমাপে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কেবল পরিমাণগত দিক বিচার করা হয়।
৪. মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মূল্যমান আরোপ করা হয়।	৪. পরিমাপ নিছক নৈর্ব্যক্তিক।
৫. মূল্যায়ন অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া।	৫. পরিমাপ তাৎক্ষণিক ও সাময়িক ব্যবস্থা।

আধুনিক মূল্যায়নের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস

আধুনিক মূল্যায়নের ব্যাপক ধারণার সঙ্গে শিক্ষাবিদদের কোনও পরিচিতি উনবিং শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ঘটেনি। তখন শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিমাপের প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণভা একটি সংকীর্ণ পরিধিতেই আবদ্ধ ছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে ধীরে ধী

পরিমাপের ক্ষেত্র ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হতে থাকে। এ শতাব্দীর মাঝামাঝি আধুনিক মূল্যায়নের নতুন ও প্রগতিশীল ধারণাটি আত্মপ্রকাশ করে। অতি সাম্প্রতিককালে বিশ্বব্যাপী মূল্যায়নের দ্রুত বহুমুখী বিকাশ ঘটতে থাকে। মূল্যায়নের এ ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসটি কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়।

প্রথম পর্যায় ঃ বিনের বুদ্ধি অভীক্ষার আবিষ্কার (১৯০০-১৯১০)

দ্বিতীয় পর্যায় ঃ বিভিন্ন শিক্ষামূলক অভীক্ষার গঠন (১৯১০-১৯২০)

তৃতীয় পর্যায় ঃ আদর্শায়িত অভীক্ষার (Standardised test) প্রসার (১৯২০-১৯৩০)

চতুর্থ পর্যায় ঃ মূল্যায়নের নতুন ধারণার আত্মপ্রকাশ (১৯৩০-১৯৫০)

পঞ্চম পর্যায় ঃ মূল্যায়নের দ্রুত ও বহুমুখী বিকাশ (১৯৫০-১৯৭০)

শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য ও ফলশ্রুতি

শিক্ষার উদ্দেশ্য কি?

শিক্ষা প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে ইহাকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

ক. শিক্ষার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকে নির্ধারণ করা,

খ. সে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকে রূপ দেয়ার জন্য বিষয়বস্তু ও পদ্ধতির যথাযথ ব্যবহার করা,

গ. এ কার্যক্রম থেকে কি ফল পাওয়া গেল তা বিচার করা বা মূল্যায়ন করা।

শিক্ষার মূল্যায়ন করার পূর্বে শিক্ষা কি এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য কি তা অবশ্যই জানা প্রয়োজন। জ্ঞানকে কাজে লাগাবার কৌশল বা শক্তি অর্জনই শিক্ষা। এ শক্তি অর্জনের জন্যই স্কুল কলেজে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদান করা হয়। কতটুকু শিক্ষালাভ হ'ল তা পরিমাপ করতে হলে কোন শিক্ষার্থীর দু'টি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে তার আচরণের তুলনা করতে হবে। এ দুই সময়ে তার যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে, সেটাই হবে তার শিক্ষালাভ। অবশ্য শিক্ষা বলতে সবসময় কাঙ্ক্ষিত বা সমর্থনযোগ্য পরিবর্তনকে বোঝায়। সমাজে যে পরিবর্তন কাম্য নয়, তাকে শিক্ষা বলা যাবে না।

শিক্ষাদানের ফলে শিক্ষার্থীদের আচরণের পরিবর্তনকেই পরিমাপ করার প্রচেষ্টা চালাতে হয়। এজন্য প্রথমেই লক্ষ্য রাখতে হবে কোন ধরনের পরিবর্তন সমর্থনযোগ্য এবং পরিমাপযোগ্য। মানুষের নানাবিধ আচরণকে কয়েকটি সাধারণ শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। ফলে পরিমাপ পদ্ধতি নির্ণয় করা সহজতর।

কোন একটি বিষয় শিক্ষণ (teaching) বা শিখন (learning) শেষে শিক্ষার্থীরা যা করতে সমর্থ হয়, তাকে আচরণিক উদ্দেশ্য বলা যায়। আচরণিক উদ্দেশ্যের দুটি প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য হল -- পর্যবেক্ষণযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য। বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ও মনোবিজ্ঞানী বেন্‌জামিন লম এ আচরণিক উদ্দেশ্যকে তিনটি ডোমেইনে ভাগ করেছেন। এগুলো হলো ঃ

১। মানসিক বা বুদ্ধিবৃত্তি বা চিন্তা শক্তির বিকাশ বিষয়ক (Cognitive domain)

২। দৃষ্টিভঙ্গী বা ভাবাবেগ বা অনুভব বিষয়ক (Affective domain)

৩। শারীরিক কৌশল ও দক্ষতা বিষয়ক (Psychomotor domain)

এ তিন প্রকার শিক্ষণীয় উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে কেবল মানসিক বিকাশ সাধনের সর্বজনীন প্রচেষ্টাই, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রধান উদ্দেশ্য। মানসিক বিকাশ সম্পর্কিত ডোমেইনে শিক্ষার্থীর শেখা কোন বিষয়ের পুনঃস্মরণ (Recall) বা প্রত্যাভিজ্ঞতা (Recognition) এবং বুদ্ধিগত সামর্থ্য ও দক্ষতার বিকাশ বা উন্নয়ন পরিমাপ করতে হয়। এ কারণেই সব ধরনের আনুষ্ঠানিক পরীক্ষায় পরিমাপযোগ্য মানসিক বিকাশ (Cognitive domain) সম্পর্কিত উদ্দেশ্যকে বেন্‌জামিন ব্লুম নিম্নোক্ত ছয়টি স্তরে বিভক্ত করেছেন ঃ

১। জ্ঞান (Knowledge)

২। অনুধাবন বা উপলব্ধি (Comprehension or Understanding)

৩। প্রয়োগ (Application)

৪। বিশ্লেষণ (Analysis)

৫। সংশ্লেষণ (Synthesis)

৬। মূল্যায়ন (Evaluation)

উপরিউক্ত মানসিক বিকাশ সম্পর্কিত ডোমেইনের স্তরগুলো একে অপরের বিস্তৃতি। তবে, বেন্‌জামিন ব্লুমের এ নীতি অনুসরণ করা সাধারণ শ্রেণি শিক্ষকের পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক ও পরিশ্রমসাধ্য। এক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক শিক্ষাগত উদ্দেশ্যকে অন্তর্ভুক্ত করলে শ্রেণি শিক্ষকগণ মূল্যায়নের প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ সাফল্যের সাথে পরিচালনা করতে সক্ষম হবেন।

শিক্ষাগত মূল্যায়নের জন্য উদ্দেশ্যের তালিকা

১। জ্ঞান (Knowledge) ঃ পরিভাষা, বিশেষ তথ্য, সাধারণ নীতি, পদ্ধতি।

A-18224

২। উপলব্ধি (Understanding)	ঃ	নতুন পরিস্থিতিতে জ্ঞানের ব্যবহার, কার্যকরণ সম্পর্ক নির্ধারণ, বিশেষ পদ্ধতি বা কৌশল ব্যাখ্যাকরণ।
৩। সাধারণ দক্ষতা (General skill)	ঃ	পরীক্ষাগারে কাজ করার বিশেষধর্মী কর্মসম্পাদনের (নাচ, গান, অঙ্কন, অভিনয়, আবৃত্তি ইত্যাদি), মনের ভাব ব্যক্ত করা, কাজ করা, গঠনের দক্ষতা, সামাজিক প্রতিক্রিয়া সম্পাদন।
৪। চিন্তন দক্ষতা (Thinking skill)	ঃ	প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে সামান্যকরণ, সামান্যকৃত ধারণার মূলভিত্তি নির্ণয়, প্রদত্ত তথ্যের অসুবিধা নির্ণয়।
৫। মনোভাব (Attitude)	ঃ	সামাজিক, বৈজ্ঞানিক।
৬। অর্থোপলব্ধি (Appreciation)	ঃ	কোন যুক্তিসমৃদ্ধ তথ্যের, কোন অভিনব সৃষ্টির।
৭। সঙ্গতিবিধান (Adjustment)	ঃ	প্রক্ষোভিক, সামাজিক।

উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন

শিশুর সমর্থনযোগ্য আচরণের পরিবর্তনকেই শিক্ষার উদ্দেশ্য বলা হয়। কাজেই শিশুর আচরণগত পরিবর্তন কিভাবে আসে তা প্রত্যেক সুশিক্ষককে অবশ্য অবশ্যই জানতে হয়। এ পরিবর্তন আসে প্রধানত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। কিন্তু শিক্ষার্থীরা কিভাবে এ অভিজ্ঞতা অর্জন করে ? শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে অভিজ্ঞতা বলা যায় না। কোন শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করে **চিন্তন,** অনুধাবন, অনুকরণ ও ক্রিয়ার মাধ্যমে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর চিন্তা ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি বা আচরণ হঠাৎ সৃষ্টি হয় না। শিক্ষক শিক্ষার্থীর সামনে উদ্দীপক উপস্থাপিত করেন আর শিক্ষার্থী তাতে সক্রিয়ভাবে সাড়া দেয়। এভাবে শিক্ষার্থী বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যা অর্জন করে তা অভিজ্ঞতা। একটা অভিজ্ঞতা থেকে আর একটা অভিজ্ঞতা প্রভাবিত হয়। একটা ক্ষমতা থেকে আর একটা ক্ষমতা উজ্জীবিত হয়। ফলে শিক্ষার্থীর মনে একটা স্থায়ী কাঠামো ধীরে ধীরে গড়ে উঠে। ইহাই শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা। শিক্ষার্থীদের অর্জিত অভিজ্ঞতার প্রবাহের সাথে শিক্ষকের উপস্থাপিত উদ্দীপকের ধারাবাহিকতা বজায় রাখাই তাঁর অন্যতম একটা কৌশল ও দায়িত্ব। শিক্ষার উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করতে গেলে তাঁকে (শিক্ষককে) নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

ক. যে সকল ব্যবস্থা শিক্ষক অবলম্বন করেছেন তা থেকে যেন ঈপ্সিত পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়।

খ. শিক্ষককে ঐ অভিজ্ঞতার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।

গ. অভিজ্ঞতাগুলো যেন বয়সের উপযোগী হয়।

ঘ. একটি উদ্দেশ্য সফল করতে বিভিন্ন রকম অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হতে পারে।

ঙ. একটি অভিজ্ঞতা হতে শিক্ষার বহুবিধ উদ্দেশ্য লাভ করা সম্ভব।

পাঠ প্রস্তুত করার সময় উদ্দেশ্য নির্ণয় করা হয়। কিন্তু সে সময় লক্ষ্য রাখা উচিত যাতে উদ্দেশ্য সঠিক ভাষায় ও সঠিকভাবে প্রকাশিত হয়। উদ্দেশ্য উল্লেখ করার সময় শিক্ষককে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

ক. উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর আচরণগুলো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করবে।

খ. উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর বয়সের উপযোগী হবে।

গ. উদ্দেশ্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট থাকবে।

ঘ. প্রতিটি উদ্দেশ্য স্ব স্ব ক্ষেত্রে অন্যগুলো হতে স্বতন্ত্র হবে।

উদ্দেশ্যের মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামগ্রিক পরিবর্তন আনা ও তাদের সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করাই হল শিক্ষার উদ্দেশ্য। একমাত্র শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই তাদের সুনিয়ন্ত্রিত ও সমর্থনযোগ্য পরিবর্তন আনা সম্ভ । শিক্ষা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে কতটা বা কি পরিমাণ পরিবর্তন এসেছে তা পরিমাপ করা প্রয়োজন। মূল্যায়নের সাহায্যে নির্ণয় করা হয়, শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলো কতটুকু সফল হয়েছে। সুতরাং উদ্দেশ্যের সঙ্গে শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা এবং মূল্যায়নের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। উদ্দেশ্য বলে দিবে একজন শিক্ষক কতটুকু পড়াবেন, আর পড়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কতটুকু জ্ঞান অর্জন করলো তা তিনি মূল্যায়নের সাহায্যে জানতে পারবেন। শিক্ষার্থীরা শিক্ষার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কোন পদ্ধতিতে অগ্রসর হচ্ছে তা উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সহায়ক কি না তা শিক্ষককে মূল্যায়নের মাধ্যমেই জেনে নিতে হবে। এদিকে শিক্ষার্থীর মনে শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত করা এবং অপরদিকে তার পরিবর্তনের মূল্যায়ন করা এ দুই মিলেই শিক্ষা ব্যবস্থা।

শিক্ষার উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়ার উপায় কি? এ প্রশ্নের সরাসরি জবাব হচ্ছে বিষয়বস্তু। বিভিন্ন বিষয় পাঠ এবং নানাবিধ কার্যাবলির অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণগত পরিবর্তন ঘটে। সমর্থনযোগ্য পরিবর্তন না আসলে উপস্থাপনের ত্রুটি মনে করতে হবে। আচরণগত পরিবর্তন সমর্থনযোগ্য কি না মূল্যায়নের মাধ্যমেই জানা সম্ভব। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পাঠক্রম বা বিষয়বস্তু পরিবর্তন আবশ্যিক হয়ে পড়ে। সঠিক

শিক্ষার উদ্দেশ্য জেনে সে মতে উপনীত হওয়ার সম্ভাব্য পরিবেশ সৃষ্টির বিভিন্ন অভিজ্ঞতা প্রদান ও কার্যাবলির ব্যবস্থা রাখতে হবে, যাতে করে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করা যায়।

বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য

বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরের চাহিদা এক নয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের উদ্দেশ্যগুলো কতটা পূর্ণ হয় তা মূল্যায়নের মাধ্যমেই নির্ধারণ করা হয়। আধুনিক শিক্ষাবিদগণ শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার বিভিন্ন উদ্দেশ্যের যে একটি তালিকা দিয়েছেন তা নিম্নরূপ। এ উদ্দেশ্যগুলোতে পৌঁছানই হলো প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য।

ক. স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও শারীরিক বিকাশ,

খ. সামাজিক ও প্রক্ষেভমূলক বিকাশ,

গ. নৈতিক আচরণ, ব্যক্তিগত এবং নীতিগত মানের উন্নয়ন,

ঘ. নেতৃত্ব করার শক্তি, বিবেচনার সঙ্গে নেতা নির্বাচন এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন।

ঙ. বাড়িতে এবং বৃহত্তর সমাজে সুনাগরিক হয়ে গড়ে উঠা,

চ. বহির্জগৎ অর্থাৎ পশু-পাখি, গাছপালা, বিজ্ঞান, প্রকৃতি, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির জ্ঞান অর্জন।

ছ. সৃজনকারী এবং উপভোগকারী উভয় রূপেই সৌন্দর্যবোধের বিকাশ,

জ. কথা বলা, কথা শোনা, পড়া, লেখা প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের যোগ্যতা অর্জন।

ঝ. গণনা করা, ওজন করা, পরিমাপ করা ও বিচার করার দক্ষতার বিকাশ।

উপরের বর্ণিত উদ্দেশ্যগুলোতে সঠিকভাবে পৌঁছাতে পারলেই প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে বলে মনে করা যাবে।

অনুরূপভাবে মাধ্যমিক স্তরের বিভিন্ন উদ্দেশ্যের একটি তালিকা যা আধুনিক শিক্ষাবিদগণ দিয়েছেন তা সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১। চিন্তন শক্তির বিকাশ,

২। সামাজিক সচেতনতার বিকাশ,

৩। নাগরিক ও সামাজিক ধারণার বিকাশ,

৪। সাহিত্য ও চারুকলার উপলব্ধি,

৫। বিভিন্ন আগ্রহের বিকাশ, এবং

৬। ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিকাশ।

মূল্যায়নের স্তরবিন্যাস

আজকের দিনে শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব লক্ষণীয়। মূল্যায়ন একটি জটিল প্রক্রিয়া। বিদ্যালয়ে এ প্রক্রিয়াকে কার্যকরি করতে হলে শিক্ষককে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অনেক বেশি সক্রিয় হতে হবে। গতানুগতিক পরীক্ষা (Examination) বা পরিমাপের (Measurement) জন্য শিক্ষককে যে কাজগুলো করতে হয়ে তা খুবই সাময়িক এবং বিচ্ছিন্ন। কিন্তু মূল্যায়নের একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে কার্যকরিভাবে বাস্তবায়িত করতে হলে শিক্ষককে অনেক বেশি সক্রিয় এবং সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে অগ্রসর হতে হয়। মূল্যায়নের স্তরের বিন্যাস নিম্নরূপ ঃ

১. **শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয় ঃ** মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হয়। কারণ উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষণ (Teaching) ও শিখনের (Learning) যাচাইকরণই হলো মূল্যায়ন।

২. **উদ্দেশ্যের সংজ্ঞা নির্ণয় ঃ** মূল্যায়নের কাজে সুবিধার জন্য শিক্ষার ব্যাপক লক্ষ্যগুলো বিশেষধর্মী আচরণগত উদ্দেশ্যের মাধ্যমে প্রকাশ করার প্রয়োজন। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এ পর্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ স্তরে শিক্ষার লক্ষ্যগুলোকে আচরণগত উদ্দেশ্যের মাধ্যমে প্রকাশ করে তাদের নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতিতে পরিমাপ করা সম্ভব।

৩. **শিক্ষার্থীর সুনিয়ন্ত্রিত কার্যাবলির বিবরণ সংগ্রহ ঃ** শিক্ষার্থীদের আচরণগত পরিবর্তনগুলো পরিমাপ করার জন্য শিক্ষককে উপযুক্ত কৌশল নির্বাচন এবং প্রয়োজনবোধে নানা ধরনের কৌশল বা অভীক্ষা উদ্ভাবন করতে হয়। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল কর্মকান্ডে নিয়োজিত করে বিভিন্ন কার্যাবলির মাধ্যমে মূল্যায়নের সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করা সম্ভব।

৪. **পরিমাপের জন্য পর্যবেক্ষণ ও অভীক্ষা সংগ্রহ করা ঃ** বিভিন্ন ধরনের পরিমাপ কৌশল নির্বাচন করতে গিয়ে শিক্ষক একটি বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছেন। এক্ষেত্রে শিক্ষকের দায়িত্ব সকল রকম আচরণগত বৈশিষ্ট্য বা পরিবর্তন পরিমাপ করার উপযোগী অভীক্ষা প্রস্তুত করা বা পরিমাপ কৌশল উদ্ভাবন করা। মূল্যায়নের এ পর্যায়টিকে একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র পর্যায় হিসাবে বিবেচনা না করে তৃতীয় পর্যায়ের পরিপূরক হিসাবেও বিবেচনা করা যেতে পারে।

৫. **মূল্যায়নের সঠিক উপায় নিরূপণ ঃ** এটি হলো মূল্যায়নের সক্রিয় স্তর। এ স্তরে মূল্যায়নের উপযোগী নির্বাচিত কৌশলগুলোকে পর্যায়ক্রমে প্রয়োগ করতে হবে এবং সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া হিসাবে মূল্যায়নের

জন্য যত বেশি পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করা যাবে মূল্যায়ন তত সার্থক হবে। মূল্যায়নের সঠিক উপায় নিরূপণ করার সময় শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে –

১। শিক্ষার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য পরিমাপ করছে ?

২। সঠিক বিবরণ সংগ্রহ করতে সক্ষম কিনা ?

৩। বিভিন্ন পরীক্ষককে একই পরিমাপ দিতে সমর্থ কি না ?

৪। প্রয়োগ করা সহজ কি না ?

৫. **সঠিক প্রয়োগ ও তথ্য সংগ্রহ ঃ** এ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্যগুলোকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে। বিভিন্ন মূল্যায়ন কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জীবন বিকাশের ব্যক্তিগত চাহিদা জানতে পারবেন। প্রাপ্ত তথ্যগুলোকে সুবিন্যস্তভাবে উপস্থাপন করে বা প্রয়োজনমতে তাৎপর্য নির্ণয় করে তা যথাযোগ্য কাজে লাগানোর জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

৭. **সমালোচনা ও মতামত ঃ** মূল্যায়নের সর্বশেষ স্তর হলো তথ্যসমূহের তাৎপর্য নির্ণয়। এক্ষেত্রে শিক্ষক বিশেষভাবে শিক্ষার আচরণগত উদ্দেশ্যগুলোই বিবেচনা করবেন। শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলো ফলপ্রসূ হয়েছে কিনা তার বিচারকরণই মূল্যায়নের প্রকৃত লক্ষ্য। শিক্ষার্থীর বিকাশের সঠিক মূল্যায়ন ও তাৎপর্য নির্ণয়ের উপরই নির্ভর করছে।

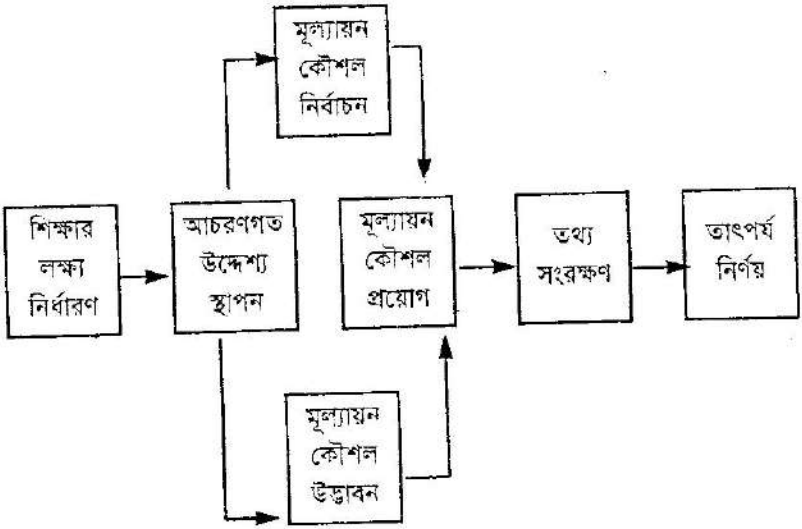

পরিমাপের উপায় ও প্রক্রিয়া

আমাদের দেশে প্রচলিত পরীক্ষা গ্রহণের বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহ সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ। সামগ্রিক পরীক্ষা ব্যবস্থার আধুনিক পরিমাপ বিজ্ঞানসম্মত পূনর্গঠন আবশ্যক। এ প্রয়াসে শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীর মনোবৈজ্ঞানিক ও শিক্ষামূলক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিমাপের নানাবিধ উন্নত উপকরণ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং সেগুলোর কার্যকারিতা ও নির্ভরযোগ্যতা অত্যন্ত উন্নত ও উচ্চ মানের।

পরিমাপ ও মূল্যায়নের কোন বিশেষ একটি উপায় নেই। বিভিন্ন উপায়ের সাহায্যে পরিমাপ ও মূল্যায়ন করতে হয়। আমাদের বিদ্যালয়ের প্রচলিত পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের আংশিক পরিমাপ ও মূল্যায়ন হয়। শিক্ষকের সামনে পরিমাপ ও মূল্যায়নের বিভিন্ন প্রকার উপায় থাকে। কোন উপায় অবলম্বন করতে হবে শিক্ষককে তা সঠিকভাবে জানতে হবে। এজন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষক প্রশিক্ষণ।

পরিমাপ ও মূল্যায়নের উপায় হিসাবে কি কি উপকরণ ব্যবহৃত হয়? পরিমাপ ও মূল্যায়নের উপকরণ হিসাবে যা ব্যবহৃত হয় তা হচ্ছে ঃ

ক. অভীক্ষা (Test)

খ. অভীক্ষা বর্জিত উপায় (Non Test tool)

গ. কৌশল (Technique)

অভীক্ষা যা সাধারণত প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষার্থীদের উপর প্রয়োগ করা হয় এর শ্রেণি বিভাগ

১. অর্জিত জ্ঞানের অভীক্ষা

২. বুদ্ধির অভীক্ষা

৩. ব্যক্তিত্বের অভীক্ষা

৪. আগ্রহের অভীক্ষা ইত্যাদি।

অভীক্ষা বর্জিত উপায়গুলোর মধ্যে সর্বাত্মক পরিচয়পত্র, প্রোগ্রেস রিপোর্ট কার্ড ইত্যাদি। আর কৌশল হল যেমন তথ্য সংগ্রহ, কেস স্টাডি, সাক্ষাৎকার ইত্যাদি।

শিক্ষাক্ষেত্রে পরিমাপের জন্য যে সব ধরনের অভীক্ষা ব্যবহৃত হয় তা দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

১. মৌখিক অভীক্ষা ২. লিখিত অভীক্ষা

আবার লিখিত পরীক্ষার শ্রেণি বিভাগ ঃ রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক।

মূল্যায়নের বিবিধ উপায় ও উপকরণ

ক কর্মের মাধ্যমে প্রয়োগমুখী কৌশল

১। শিক্ষামূলক অভীক্ষা (Educational test)

ক. মৌখিক পরীক্ষা (Oral test)

খ. লিখিত পরীক্ষা (Written test)

গ. শ্রেণিকক্ষে ব্যবহৃত অভীক্ষা বা শিক্ষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত অভিক্ষা (Non Standardised teacher made test)

ঘ. আদর্শায়িত পারদর্শিতার অভীক্ষা (Standardised Achievement test)

ঙ. নির্ণায়ক অভীক্ষা (Diagonostic)

২। মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষা (Psychological test)

ক. বুদ্ধির অভীক্ষা (Intelligence test)

খ. বিশেষ সম্ভাবনা পরিমাপক অভীক্ষা (Special Aptitude test)

গ. বিশেষ মানসিক ক্ষমতা পরিমাপক অভীক্ষা (Special Ability test)

ঘ. প্রতিক্ষেপক অভীক্ষা (Projective test)

খ। আত্মবিবৃতিমূলক কৌশল (Self Reporting technique)

৩। সাক্ষাৎকার (Interview)

ক. অসংগঠিত সাক্ষাৎকার (Unstructured Interview)

খ. সংগঠিত সাক্ষাৎকার (Structured Interview)

৪। প্রশ্নগুচ্ছ (Questionnaire) ঃ

ক. অনুরাগের নির্ণায়ক অভীক্ষা (Interest Inventories)

খ. মনোভাব নির্ণায়ক অভীক্ষা (Attitude Scale)

গ. ব্যক্তিসত্তার পরিমাপ অভীক্ষা (Personality questionnaire)

ঘ. সামাজিক বৈশিষ্ট্য পরিমাপ প্রশ্নগুচ্ছ (Sociometric qustionnaire)

গ। পর্যবেক্ষণমূলক কৌশল (Observational Technique)

৫। অ্যানেকডোটেল রেকর্ড (Anecdotal Record)

৬। চেক লিস্ট (Check list)

৭। রেটিং স্কেল (Rating scale)
৮। সোসিও মেট্রিক কৌশল (Sociometric technique)
৯। সোসিওগ্রাম (Sociogram)
১০। পরিস্থিতি নির্ভর অভীক্ষা (Situation test)

অনুশীলনী ২.১

১। পরিমাপ কি? পরিমাপ আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে কিভাবে প্রভাবিত করছে ?

২। অতীতকালে কি ধরনের পরিমাপ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল ?

৩। শিক্ষাবিদগণ কখন এবং কিরূপে আধুনিক পরিমাপ পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন ?

৪। শিক্ষার বিশেষ কোন কোন ক্ষেত্রে পরিমাপের ব্যাপক পরিচালনা পরিলক্ষিত হয় ?

৫। আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষা কাঠামো কোন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ?

৬। মূল্যায়ন কি? আজকাল শিক্ষাবিদগণ কেন পরিমাপ শব্দটির পরিবর্তে মূল্যায়ন শব্দটি বেশি ব্যবহ করেন ?

৭। কুইলেন ও হান্না মূল্যায়নের স্বরূপ প্রসঙ্গে কি বলেছেন ?

৮। শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

৯। মূল্যায়ন একটি ত্রিমুখী প্রক্রিয়া। ব্যাখ্যা করুন।

১০। মূল্যায়ন কিভাবে শিক্ষাকে কার্যকর, তৃপ্তিদায়ক ও সুসম্পন্ন করে তোলে ?

১১। পরিমাপ ও মূল্যায়নের পার্থক্য কি ?

১২। শিক্ষার উদ্দেশ্য কাকে বলে? ইহা কয়ভাগে ভাগ করা যায় ও কি কি ?

১৩। শিক্ষার উদ্দেশ্য কতটুকু সফল হয়েছে তা কি কিভাবে নির্ণয় করা যায় ?

১৪। শিক্ষার উদ্দেশ্যের সাথে মূল্যায়নের কি সম্পর্ক আছে ?

১৫। শিক্ষার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন কিভাবে সম্ভব ?

১৬। পরিমাপ ও মূল্যায়নের জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা হয় ?

১৭। শিক্ষাক্ষেত্রে পরিমাপের জন্য কি কি ধরনের অভীক্ষা ব্যবহার করা হয় ?

১৮। মূল্যায়নের বিবিধ উপায় ও উপকরণের বর্ণনা দিন।

সুঅভীক্ষার বৈশিষ্ট্যাবলী

পরিমাপক যন্ত্র (Measuring Instrument) হিসাবে মনোবৈজ্ঞানিক ও শিক্ষামূলক অভীক্ষাগুলোর কতকগুলো বিশেষ যোগ্যতা থাকে। এগুলোর মধ্যে ত্রুটিহীনতা একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। আবার ত্রুটিহীন অভীক্ষাগুলোর ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দিতে পারে। কারণ অভীক্ষা কেবলমাত্র ত্রুটিমুক্ত হলেই ব্যবহারিক দিক দিয়ে সুবিধা থাকবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। এ কারণে সুঅভীক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলোকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ

১. ত্রুটিহীনতা সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যাবলী ঃ (Characteristics related to error)

২. ব্যবহারিক দিক সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যাবলী ঃ (Characteristics related to usabilility)

ক. অভীক্ষার ত্রুটিহীনতামূলক বৈশিষ্ট্যাবলী

সাধারণ শিক্ষামূলক ও মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষার ক্ষেত্রে চার প্রকারের ভুল বা ত্রুটি দেখা যায়। এ ভুল বা ত্রুটি না থাকাই সুঅভীক্ষার বৈশিষ্ট্য। ত্রুটি বা ভুলগুলো হলো ঃ

১. স্থায়ী ত্রুটি (Constant error)

২. পরিবর্তনশীল ত্রুটি (Variable error)

৩. ব্যক্তিগত ত্রুটি (Personal error)

৪. সংব্যাখ্যানমূলক ত্রুটি (Interpretative error)

১. স্থায়ী ত্রুটি ঃ অভীক্ষার বিষয়বস্তু বা সংগঠনের ত্রুটি থেকে এ ধরনের ত্রুটি বা ভুল দেখা যায়। মনোবৈজ্ঞানিক পরিমাপ পদ্ধতি সব সময়েই পরোক্ষ। মানুষের বুদ্ধি বা ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্ট্য সরাসরি পরিমাপ করা যায় না। অভীক্ষা তৈরি করার সাথে অবাস্তব বা অসংলগ্ন উপকরণ বিষয়বস্তুর মধ্যে অনু-প্রবেশ করার সুযোগ থাকছে। আবার অনেক সময়ে ভুল পরিমাপক যন্ত্র নির্বাচন করা হয়। এ ধরনের কারণে পরিমাপের ক্ষেত্রে যে ভুল বা ত্রুটি দেখা যায়, তাকেই স্থায়ী ত্রুটি বা ভুল বলা হয়।

ভূগোল বা বিজ্ঞানের অভীক্ষাতে বানান ভুল বা খারাপ হাতের লেখার জন্য নম্বর কাটার নির্দেশ থাকলে সে ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা বিষয়গত তথ্যাবলির পরিপূর্ণ ও সঠিক পরিবেশনের তুলনায় ভাষাগত শুদ্ধাশুদ্ধিসহ ধীরে ধীরে সুন্দরভাবে লিখতে যেয়ে হয়তো অভীক্ষাটির উত্তর দেয়া নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করা যাবে না। আবার পরীক্ষক যখন বানান ভুল ও অসুন্দর হাতের লেখার জন্য নম্বর কাটবেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার্থীরা

সঠিক উত্তর দিয়ে কম নম্বর পাবে, অথবা অসম্পূর্ণ উত্তরের জন্য যথাযথ নম্বর লাভে হবে। ইহাই অভীক্ষার স্থায়ী ত্রুটি।

২. **পরিবর্তনশীল ত্রুটি ঃ** একদল শিক্ষার্থীর উপর একই অভীক্ষা বার বার প্র করে ভিন্ন ভিন্ন স্কোর পাওয়া গেলে অভীক্ষাটির যে ত্রুটি ধরা হলো, তা পরিবর্তন ত্রুটি। সাধারণত পরিবর্তনশীল ত্রুটিযুক্ত একই অভীক্ষা একই দলের উপর প্রয়োগ ক একই ফল মিলবে না। পরিমাপযন্ত্রের সাংগঠনিক ত্রুটির জন্য যন্ত্রটি একই জিনি পরিমাপ বিভিন্ন রকম দিতে থাকে। একটি ত্রুটিপূর্ণ ঘড়ি কখনও ফাস্ট আবার কখ স্লো চলে, সঠিক সময় নির্ণয় করা এ ঘড়ির দ্বারা সম্ভব নয়। পরিমাপ যন্ত্রের এ ধর ত্রুটিকেই পরিবর্তনশীল ত্রুটি বলা হয়।

৩. **ব্যক্তিগত ত্রুটি ঃ** পরিমাপক যন্ত্রের ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণে ত্র হয়ে থাকে। পরীক্ষক পরীক্ষার্থীদের উত্তরগত বিচার করার সময় নিজেদের ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য ও মতামতের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ কোন স্থানের তাপমা একই থার্মোমিটারের দ্বারা বিভিন্ন জনে পাঠ নিলে তা বিঘ্ন হবে এ ধরনের ত্রুটি শিক্ষামূলক অভীক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ত্রুটি বা পর্যবেক্ষণের ত্রুটি বলা হয়।

৪. **সংব্যাখ্যানমূলক ত্রুটি ঃ** একই পরিমাপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কাছে সমান অর্থ নয়। কোন নির্দিষ্ট স্কোরের প্রতি বিভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য থাকতে পারে। শি ও মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ঐ ধরনের ত্রুটি সবচেয়ে বেশি ঘটে। একে সংব্যাখ্যানমূলক তাৎপর্য নির্ণয় ত্রুটি বলা যেতে পারে।

স্থায়ী ভুলের মাত্রা কম থাকা বা স্থায়ী ত্রুটিমুক্ত থাকা সুঅভীক্ষার অন্যতম প্রধা বৈশিষ্ট্য। শিক্ষামূলক বা মনোবৈজ্ঞানিক ত্রুটি দূর করেই অভীক্ষার যথার্থতা আনয় করতে হয়।

অভীক্ষার আকস্মিক কারণে সৃষ্ট পরিবর্তনশীল ত্রুটিমুক্ত করে উহাকে নির্ভরযো (Reliable) অভীক্ষা করে তুলতে হয়। এ অর্জিত গুণকে নির্ভরযোগ্যতা (Reliability বলা হয়। ব্যক্তিগত বা পর্যবেক্ষণগত ত্রুটিমুক্ত করতে হলে অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকত (Objectivity) আনয়ন করতে হয়।

সংব্যাখ্যানমূলক ত্রুটিকে নিয়ন্ত্রিত করতে অভীক্ষার আদর্শায়নে (Standardisation) প্রয়োজন। এর ফলে অভীক্ষাটির নির্ভুল সংব্যাখ্যান দেয়া এব অভিক্ষার্থীদের মধ্যে তুলনা করা সম্ভব হয়।

উপরে বর্ণিত মনোবৈজ্ঞানিক পরিমাপের মৌলিক ত্রুটি এবং তা দূর করার বিভিন্ন পদ্ধতির তালিকা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

ত্রুটির প্রকৃতি	দূরীকরণের উপায়	সুঅভীক্ষার বৈশিষ্ট্য
স্থায়ী ত্রুটি	অভীক্ষার যথার্থতা নির্ণয়	যথার্থতা
পরিবর্তনশীল ত্রুটি	অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয়	নির্ভরযোগ্যতা
ব্যক্তিগত ত্রুটি	অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকরণ	নৈর্ব্যক্তিকতা
সংব্যাখ্যানমূলক ত্রুটি	অভীক্ষার আদর্শায়ন	আদর্শায়ন

সু-অভীক্ষার বৈশিষ্ট্যাবলী

শিক্ষামূলক বা মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো একান্তভাবেই থাকা প্রয়োজন। এইগুলোর অভাব ঘটলে কোন অভীক্ষাকেই নিখুঁত ও নির্ভরযোগ্য বলা যাবে না।

ক. অভীক্ষার ত্রুটিহীনতা সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যাবলী ঃ

১। অভীক্ষার যথার্থতা (Validity of test)
২। অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা (Reliability of test)
৩। অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা (Objectivity of test)
৪। অভীক্ষার আদর্শায়ন (Standardisation of test)

খ. অভীক্ষার ব্যবহারিক দিক সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যাবলী ঃ

৫। অভীক্ষার প্রয়োগশীলতা (Administratility of test)
৬। অভীক্ষার পরিমিততা (Economy of test)
৭। অভীক্ষার সম্পূর্ণতা (Adequacy of test)

১. যথার্থতা (Validity) ঃ

শিক্ষামূলক ও মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য হলো যথার্থতা। একটি অভীক্ষা নিখুঁত ও নির্ভরযোগ্য হবে যখন ঐ অভীক্ষাটি যে শক্তি বা

বৈশিষ্ট্য পরিমাপের জন্য গঠিত হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে সঠিকভাবে পরিমাপ করছে। কোন অভীক্ষার এ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বা গুণটিই হলো অভীক্ষার যথার্থতা (Validity of test)। এ ধরনের বৈশিষ্ট্য অভীক্ষার সংগঠন ও প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। এ কারণে অভীক্ষার যথার্থতা বিচার একটি জটিল কাজ। বস্তুত যে পরিমাপের জন্য যথার্থতা সম্পন্ন একটি অভীক্ষা তৈরি করা হয়, সে গুণাগুণ বা বৈশিষ্ট্য ছাড়া অন্য কিছু পরিমাপ করে না। যে কোন শিক্ষামূলক বা মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষার বিভিন্ন বিষয়বস্তুগত ও সংগঠনগত ত্রুটি দেখা যায়। পরিমাপের ক্ষেত্রে এ ধরনের স্থায়ী ত্রুটিমুক্ত করাই হলো যে কোন অভীক্ষার যথার্থতা অর্জন করা। একটি উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রচলিত পরীক্ষার ইতিহাস, ভূগোল বা বিজ্ঞানের জন্য প্রস্তুতকৃত অভীক্ষাতে (প্রশ্নপত্র) ঐ সকল বিষয়ভিত্তিক অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপ ছাড়া ও অন্যান্য কতকগুলো বৈশিষ্ট্য যথা- রচনাশৈলী, হাতের লেখা, বানান, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি পরিমাপ করা হয়। ফলে, অভীক্ষাগুলোর যথার্থতা হ্রাস পায় বা মোটেই যথার্থতা থাকে না। আবার অন্যভাবে বলা যায়, সমাজবিজ্ঞানের একটি পারদর্শিতার অভীক্ষা (Achievement test) বিজ্ঞান, ভূগোল বা ইতিহাস বা অন্য কোন বিষয়ের পরিমাপ না করে, তবে ইহাকে পারদর্শিতার পরিমাপক হিসাবে সমাজবিজ্ঞানের একটি যথার্থ অভীক্ষা বলা যাবে।

শিক্ষামূলক বা মনোবৈজ্ঞানিক পরিমাপের ক্ষেত্রে যথার্থতার ধারণা

ক. যথার্থতা একটি অভীক্ষার গুণ। অভীক্ষার যথার্থতা না বলে ইহাকে প্রাপ্ত পরিমাপের যথার্থতাই বলা শ্রেয়।

খ. শিক্ষামূলক অভীক্ষার ক্ষেত্রে উচ্চমানের যথার্থতা, মধ্যমানের যথার্থতা, নিম্নমানের যথার্থতা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। কেননা যথার্থতার ধারণা মাত্রাসাপেক্ষ। শূন্য থেকে ১ (এক) এর মধ্যে সংখ্যামান দ্বারা ইহাকে বোঝানো যায়।

গ. প্রয়োগ ক্ষেত্রে বা উপযোগীতা অনুযায়ী শিক্ষামূলক বা মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষার যথার্থতা বিচার করতে হয়।

ঘ. অভীক্ষার্থীদের প্রকৃতির পরিস্থিতি অনুযায়ী শিক্ষামূলক অভীক্ষার যথার্থতা আপেক্ষিক। অভীক্ষার যথার্থতা হ্রাসের কারণ ঃ

(ক) অভীক্ষার ত্রুটির কারণে যথার্থতার অভাব ঃ

প্রশ্নের ভাষা, সহজ বা কঠিন সমস্যা নির্বাচন, মানসিক তৎপরতার চেয়ে বিষয় জ্ঞানের উপর প্রাধান্য দেয়া, অভীক্ষার নির্দেশপত্র সংক্রান্ত জটিলতা ইত্যাদি কারণে অভীক্ষার যথার্থতার অভাব ঘটে।

(খ) প্রশ্নাবলির বিষয়বস্তুর প্রকৃতির দরুন যথার্থতা হ্রাস ঃ গঠিত জ্ঞানের পুনরাবৃত্তি, স্মৃতিশক্তি, বোধগম্যতার স্তর, জ্ঞান-প্রয়োগের ক্ষমতা ইত্যাদি তথ্যসমূহের সঠিক বিচারকরণের অভাবে যে কোন অভীক্ষায় যথার্থতা কমে যায়।

(গ) শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়ার কারণে যথার্থতা হ্রাস পায় ঃ শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতির পরিবেশ বিঘ্নিত, মানসিক প্রস্তুতির অভাব, অভীক্ষা গ্রহণে বিচলিত মনোভাব, প্রশ্নের জবাব দেয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রবণতার বশবর্তী বা প্রাদুর্ভাব ইত্যাদি কারণে যথার্থতা কমে যায়।

যথার্থতার শ্রেণি বিভাগ

ক. বাহ্যিক যথার্থতা (Face Validity)

খ. বিষয়গত যথার্থতা (Content Validity)

গ. ভবিষ্যৎ ইঙ্গিতমূলক যথার্থতা (Predictivevalidity)

ঘ. গঠনমূলক যথার্থতা (Constructive Validity)

(ক) বাহ্যিক যথার্থতা ঃ প্রত্যেকটি শিক্ষামূলক অভীক্ষা বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হয়। অভীক্ষাটির বিষয়বস্তুর সাথে যে বৈশিষ্ট্য বা গুণাগুণের যে মিল বা সংগতি অর্জিত হয় তাকেই বাহ্যিক যথার্থতা বলা হয়। অভীক্ষা গঠনের প্রাথমিক স্তরেই বাহ্যিক যথার্থতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে মূল প্রশ্নাবলি নির্বাচন করা হয়। অভীক্ষা গঠনের কার্যাবলি সমাপনীর সাথে সাথেই বাহ্যিক যথার্থতার গুরুত্ব শেষ হয়ে যায়।

(খ) বিষয়গত যথার্থতা ঃ

বিষয়গত যথার্থতার ক্ষেত্রে যে কোন অভীক্ষার অন্তর্ভুক্ত পদগুলো স্বতন্ত্রভাবে বা সমষ্টিগতভাবে বিচার করতে হয়। অভীক্ষার অন্তর্গত পদগুলোর প্রত্যেকটিই যে বৈশিষ্ট্য

বা গুণাবলী পরিমাপ করছে তার এক একটি নমুনা বিশেষ। এ জাতীয় যথার্থতা নি করার ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক, পাঠ্যসূচি, জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি কমিটির সুপারি জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের রিপোর্ট ইত্যাদির সাথে অভীক্ষাটির তুলনামূ বিচার করার প্রয়োজন হয়। অভীক্ষাটির প্রত্যেকটি পদের প্রযোজ্যতার সাফল্য ব্যর্থতা উভয় দিক দিয়েই পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতির সাহায্যে ঠিক করে দিতে হয়।

গ. ভবিষ্যৎ ইঙ্গিতমূলক যথার্থতা ঃ এ জাতীয় যথার্থতা নির্ণয়ের মাধ্যমে শিক্ষা সম্ভাব্য সফলতার বা ব্যর্থতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। একটি অভীক্ষা কতটি সঠিকভ কোন ভবিষ্যৎ পারদর্শিতার বিচার করতে পারে, তা বোঝানোর জন্য উক্ত অভীক্ষ প্রয়োগ থেকে প্রাপ্ত স্কোরগুচ্ছের যথার্থতা নির্ণয় করতে হয়। ইহাই ভবিষ্যৎ ইঙ্গিতমূ যথার্থতা। একটি বিশেষ নির্ণায়ক অভীক্ষাটির ফলাফলের সাথে বর্তমান অভীক্ষার ফলাফলের তুলনামূলক বিচারের মাধ্যমে গাণিতিক পদ্ধতিতে এ জাতীয় যথার্থতা নি করা হয়।

ঘ. গঠনমূলক যথার্থতা ঃ কোন অভীক্ষা কোন বৈশিষ্ট্য যতটুকু পরিমাপ ক পারে, ঠিক ততটুকুই ঐ অভীক্ষার গঠনমূলক যথার্থতা। বুদ্ধি সম্পর্কিত ধারণা, যুক্তি সংক্রান্ত ধারণা, গাণিতিক সম্ভাবনা, আবেগ বা উৎসাহ প্রকাশের স্বরূপ বা প্রকৃতি ইত্ এবং একটি সংগঠন বা মনোবৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিশেষ কতগ আচরণের তথ্য বা তাৎপর্য নির্ণয় করা যায়। এ রকম প্রত্যেকটি সংগঠন সংক্রান্ত ধার মূলে এক একটি নীতি বা তত্ত্বের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর পরিবর্তন ব্যাখ্যা করা সম্ভব কারণে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সৃষ্ট বৈশিষ্ট্য বা গুণাগুণের সংগঠনের সঠিক ব সংগ্রহ করা যায়। গঠনমূলক যথার্থতা নির্ণয়ের জন্য কর্ণব্যাক ও মিহল (Cornb and Meell) এর কয়েকটি সোপান এখানে দেয়া হলো-

এক. অভীক্ষাটি একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করছে বলে ধরে নেয়া।

দুই. ঐ বৈশিষ্ট্য অর্জনের ফলে ব্যক্তিগত আচরণের পরিবর্তন নির্ধারণ করা

তিন. অভীক্ষাটির সাথে ঐ সকল আচরণের কতটা মিল থাকছে তা নির্ধারণ কর

যদি দেখা যায় এ দুয়ের মধ্যে প্রত্যাশিত সম্পর্ক বা মিল পাওয়া যাচ্ছে, তা অভীক্ষাটির গঠনমূলক যথার্থতা আছে বলে ধারণা করা যাবে। অন্যথায় ব্য পদ্ধতিটি যথার্থতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হচ্ছে বলে মনে করা যাবে।

যথার্থতা নির্ণয়ঃ

সাধারণত সহ-সম্পর্কের মান বের করে বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতিতে যথার্থতা নির্ণয় করা হয়। সবগুলোই পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি। যথার্থতা নির্ণয়ের চারটি পদ্ধতি নিম্নে দেয়া হলো।

ক. সাধারণ সহ-সম্পর্ক (Simple correlation)

খ. দ্বিমাত্রিক সহ-সম্পর্ক Bi-Serial correlation)

গ. চতুর্মাত্রিক সহ-সম্পর্ক (Tetrachloric correlation)

ঘ. বহুরাশিক সহ-সম্পর্ক (Multiple correlation)

(ক) সাধারণ সহ-সম্পর্ক (Simple correlation)

ইহা যথার্থতা নির্ণয়ের একটি সহজ পদ্ধতি কোন একটি শিক্ষামূলক অভীক্ষার যথার্থতা নির্ণয় করতে হলে অন্য একটি নির্ণয়ক অভীক্ষার সাথে প্রথম অভীক্ষাটির সহ সম্পর্কের মান বের করে নিতে হয়। এর নির্ণেয় সহ সম্পর্কের মানের উপরই প্রদত্ত অভীক্ষার কতটুকু যথার্থতা হবে তা নির্ভর করছে।

(খ) দ্বিমাত্রিক সহ-সম্পর্ক (Bi-Serial correlation)

যখন কোন প্রদত্ত অভীক্ষার স্কোরের সঙ্গে অন্য দ্বিমাত্রিক পরিমাপের সহ-সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়। তখন এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। দ্বিমাত্রিক পরিমাপ বলতে সেই জাতীয় পরিমাপকে বোঝায় যেখানে অভীক্ষার্থীদের আচরণকে দু'টি মাত্র ভাগ বা শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। পাশ ও ফেল, ভাল ও মন্দ সন্তোষজনক ও অসন্তোষজনক ইত্যাদি জাতীয় শ্রেণীকরণের ক্ষেত্রে দ্বিমাত্রিক সহ-সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়। শিক্ষামূলক অভীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে অভীক্ষার্থীদের পাশ ও ফেল এ দু'টি ভাগে ভাগ করে অভীক্ষার স্কোরগুলোর দ্বিমাত্রিক সহ-সম্পর্কের মান বের করে অভীক্ষাটির যথার্থতা নির্ণয় করা হয়।

যথার্থতা নির্ণয়ের সূত্র হলো ঃ

$$r = \frac{M_p - M_F}{\sigma} \times \frac{P_F}{u}$$

(গ) চতুর্মাত্রিক সহ-সম্পর্ক (Tetrachloric Corelation)

যখন দুটি পরিমাপকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করে তাদের সহ-সম্পর্কের মান নির্ণয় করে, তখন চতুর্মাত্রিক সহ-সম্পর্ক বের হয়। দু'টি পরিমাপকে দু'ভাগে ভাগ করে

সাজালে চতুষ্কোণ একটি তালিকা তৈরি হয়। এ কারণে এর নামকরণ হয়েছে চতুর্মাত্রি সহ-সম্পর্ক। এ পদ্ধতি থেকে সহ-সম্পর্কের খুব সূক্ষ্ম মান বের হয়।

(ঘ) বহুরাশিক সহ-সম্পর্ক (Multiple correlation)

যখন দু'টি বা তারও বেশি পরিমাপকে একত্র করে একটি সহ-সম্পর্কের মান নির্ণ করা হয়। তখন এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। সাধারণত সহ-সম্পর্কের পদ্ধতিতে দু' স্কোরমালার সম্পর্ক বের হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে একটি স্কোরগুচ্ছের সঙ্গে দুই বা ততোধি পরিমাপের যৌথ রূপের সঙ্গে সম্পর্ক বের হয়। আংশিক সহ-সম্পর্কের (Parti correlation) মান নির্ণয়ের মাধ্যমে বহুরাশিক সহ-সম্পর্ক (Multiple correlation মান নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

২. নির্ভরযোগ্যতা (Reliability)

আধুনিক শিক্ষামূলক ও মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ব গুণ হলো উন্নতমানের নির্ভরযোগ্যতা। শিক্ষামূলক বা মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষা পরিবর্তনশীল ত্রুটি অপসারণের জন্য অভীক্ষার এ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটিকে বিচার করে হয়। যথার্থতার মত নির্ভরযোগ্যতারও চরম মান নির্ধারণ করা বেশ কঠিন কাজ শিক্ষামূলক ও মনোবৈজ্ঞানিক পরিমাপের নির্ভরযোগ্যতা সংশ্লিষ্ট পরিমাপের সামঞ্জস্যপূ স্থিরতার মাত্রাকে বুঝায়। এখানে নির্ভরযোগ্যতা আপেক্ষিক।

কোন অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা বলতে বুঝায় অভীক্ষার পরিমাপ কতটা নির্ভুল ব নিখুঁত। যে বৈশিষ্ট্য বা গুণাগুণ পরিমাপের জন্য অভীক্ষাটি সঠিক তা কতটা সঙ্গতি সাথে ইহা সেই বৈশিষ্ট্য বা গুণাগুণ পরিমাপ করেছে। আবার অভীক্ষার পরিবর্তনশী ত্রুটি বা ভুলের ধারণা থেকেই নির্ভরযোগ্যতার ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ধরনের ত্রুটি পরিমাপ পদ্ধতির আকস্মিক কারণে দেখা যায়। কোন অভীক্ষার পরিমাপ যত নির্ভরযোগ্য, শিক্ষার্থীর স্কোর ততবেশি নিখুঁত। এর ফলে পরিবর্তনশীল ত্রুটি তত কম হবে। এ কারণে সংশ্লিষ্ট অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা তত বেড়ে যাবে। একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা দেয়া যায়। একই অভীক্ষা কিছুদিন ব্যবধানে অন্তত দু'বার একদল শিক্ষার্থীর উপর প্রয়োগ করা হলো। প্রাপ্ত স্কোর থেকে যদি দেখা যায় ফলাফল একই রকম। তাহলে সহ-সম্পর্কের মান বেশ উঁচু হবে এবং অভীক্ষাটি নির্ভরযোগ্য হবে। কে কোন অভীক্ষার দু'ধরনের ত্রুটির উপর নির্ভর করে। এগুলো হলো অভীক্ষার নমুন নির্বাচনের ত্রুটি এবং পরিমাপের ত্রুটি আবার নির্ভরযোগ্যতা পরিমাপের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত স্কোরের সঙ্গতির উপর নির্ভর করছে প্রত্যাশিত অভীক্ষার কাঠামোগত প্রকৃতি ও

[illegible] অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা কি হবে তা নির্ভর করছে স্কোরের সঙ্গতির উপর। [illegible] স্কোরের সঙ্গতির অনেকগুলো দিক আছে। এ কারণেই অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা [illegible] হয় না। অভীক্ষাগুলোর ভিন্ন জাতীয় নির্ভরযোগ্যতার প্রত্যেকটির নিজস্ব [illegible] ও উপযোগীতা আছে এবং অভীক্ষাটির প্রকৃতি, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং প্রয়োগ করার [illegible] উপর নির্ভর করে কোন জাতীয় নির্ভরযোগ্যতার প্রয়োজন আছে।

নির্ভরযোগ্যতা সংক্রান্ত ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

ক. অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা মনে না করে পরিমাপের নির্ভরযোগ্যতা ধরে নিতে হবে।

খ. পরিমাপের উদ্দেশ্য অনুসারে কোন অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতার ধারণাটি স্থির না হয়ে বিভিন্ন তাৎপর্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন হবে।

গ. কোন অভীক্ষা নির্ভরযোগ্য হলেই তার যথার্থতা থাকবে এমন কোন কারণ নেই, বরং কোন অভীক্ষার যথার্থতা থাকলে, অবশ্যই তা নির্ভরযোগ্য হবে।

ঘ. কোন অভীক্ষার বা পরিমাপের নির্ভরযোগ্যতা কেবল গাণিতিক পদ্ধতিতে নির্ণয় করা হয়।

অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা হ্রাসের কারণ

১. অভীক্ষার মধ্যে অন্তর্নিহিত নির্ভরযোগ্যতা হ্রাসের কারণসমূহ।

২. পরীক্ষার্থীদের দিক থেকে সৃষ্ঠু নির্ভরযোগ্যতা হ্রাসের কারণসমূহ।

৩. পরীক্ষক নির্ভরতার কারণে অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা হ্রাস পায়।

(ক) অভীক্ষার মধ্যে অন্তর্নিহিত নির্ভরযোগ্যতা হ্রাসের কারণ

১. অভীক্ষার দৈর্ঘ্য কম হলে নির্ভরযোগ্যতা কমে যায়।

২. সামঞ্জস্যহীন অভীক্ষা পদ সংযোজনে অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা হ্রাস করে।

৩. অভীক্ষার পদগুলো (Test Items) ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে সাজানো হলে অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা কমে যায়।

৪. একই প্রশ্ন বিভিন্ন রূপে অভীক্ষার মধ্যে বার বার সংযোজিত হলে অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতার মান হ্রাস পায়।

(খ) পরীক্ষার্থীদের দিক থেকে সৃষ্ট নির্ভরযোগ্যতা হ্রাসের কারণ ঃ

১। পরীক্ষার্থীদের শারীরিক অসুস্থতা,

২। পরীক্ষার্থীদের মানসিক প্রস্তুতির অভাব,

৩। অভীক্ষা প্রয়োগকালীন সময়ে পরীক্ষার্থীদের দক্ষতা,

৪। অভীক্ষার প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়ার কৌশল সম্পর্কে পরীক্ষার্থীদের অজ্ঞত এবং

৫। পরীক্ষার্থীর প্রক্ষোভমূলক ভারসাম্যের অভাব।

(গ) পরীক্ষক নির্ভরতার কারণে অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা হ্রাস

১. উত্তরপত্রের মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাব ব পছন্দ/অপছন্দ।

২. অভীক্ষার প্রয়োগ ক্ষেত্রে পরীক্ষকের যথেষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাব।

৩. অভীক্ষা প্রয়োগের পূর্ব মুহূর্তে পরীক্ষার্থীর কাম্য মানসিক প্রস্তুতির পরিবেশ সৃষ্টি করতে পরীক্ষকের ব্যর্থতা।

অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয়

শিক্ষামূলক ও মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষার নির্ভযোগ্যতা সাধারণত দু'ধরনের গাণিতিক কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়। অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা সহ-সম্পর্কের সহগ এবং আদর্শ ত্রুটি (Standard Error) নির্ণয়ের মাধ্যমে অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয় করা হয়। নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয়ের তিনটি পদ্ধতি হলো ঃ

ক. পুনঃপরীক্ষা পদ্ধতি (Test-retest Method)

খ. সমান্তরাল অভীক্ষা পদ্ধতি (Parallel test Method)

গ. অন্তর্দ্বিখণ্ডিত পদ্ধতি (Inter split Half Method)

ক. পুনঃপরীক্ষা পদ্ধতি ঃ একটি অভীক্ষা একই দলের উপর কিছুদিন ব্যবধানে দু'বার প্রয়োগ করলে দু'টি স্কোরগুচ্ছ পাওয়া যাবে। প্রাপ্ত স্কোরগুচ্ছদ্বয়ের মাঝে মিল ও অমিল উভয় প্রকারের অবস্থা দেখা যাবে। স্কোরগুচ্ছদ্বয়ের মিলের পরিমাণটুকুই হবে অভীক্ষাটির নির্ভরযোগ্যতার পরিমাপ অভীক্ষাটির প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় প্রয়োগ ক্ষেত্রের

প্রাপ্ত স্কোরদ্বয়ের সহ-সম্পর্কের সহগ নির্ণয় করা হলে ইহাই হবে নির্ভরযোগ্যতার স্বরূপ। এ পদ্ধতিতে সময়ের ব্যবধান এবং অভীক্ষা দু'বার প্রয়োগের ফলে ত্রুটি দেখা দেয়।

খ. সমান্তরাল অভীক্ষা পদ্ধতি ঃ সমান্তরাল অভীক্ষা পদ্ধতি উপরে বর্ণিত পুনঃপরীক্ষা পদ্ধতির ত্রুটিগুলো সংশোধন করার জন্য উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে একই অভীক্ষা দ্বিতীয় বার ব্যবহার না করে উহার একটি সাদৃশ্য বা সমান্তরাল অভীক্ষা প্রয়োগ করা হয়। এ সমান্তরাল অভীক্ষাটি আকৃতি, সংগঠন প্রকৃতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে প্রথম অভীক্ষার মতই হবে। উল্লেখিত অভীক্ষা অনেক ক্ষেত্রে অভিন্ন এ কারণে এদেরকে সমান্তরাল অভীক্ষা বলা হয়। উভয় অভীক্ষাকে পৃথক পৃথকভাবে কিছুদিনের ব্যবধানে প্রয়োগ করে প্রাপ্ত দু'টি স্কোরগুচ্ছের সহ-সম্পর্কের সহগ বা মান নির্ণয় করলেই নির্ভরযোগ্যতার মান বলে ধরে নেয়া হয়।

গ. অন্তর্দ্বিখণ্ডিত পদ্ধতি ঃ এ পদ্ধতিতে সমগ্র অভীক্ষাটিকে সদৃশ সমান দুই অংশে বিভক্ত করা হয়। অংশ দু'টির প্রাপ্ত ফলাফলের সহ-সম্পর্কের মান নির্ণয় করে নিতে হয়। মূল অভীক্ষাটিকে বিভক্ত করার সময়ে অভীক্ষা পদগুলো অযুগ্ম ও যুগ্ম এ দুই ভাগে ক্রমিক নম্বর অনুসারে সাজাতে হবে। যেমন প্রথম অংশে অভীক্ষার পদগুলোর ১ নম্বর, ৩ নম্বর, ৫ নম্বর ইত্যাদি দ্বিতীয় অংশে ক্রমিক নম্বর ২ নম্বর, ৪ নম্বর, ৬ নম্বর ইত্যাদি এভাবে সাজিয়ে নিতে হবে। প্রাপ্ত অংশদ্বয়ের নির্ভরযোগ্যতা থেকে পূর্ণদৈর্ঘ্য অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয় করতে হয়। এজন্য স্পিয়ারম্যান ব্রাউনের (Spearman Brown) সূত্রের সাহায্যে পূর্ণদৈর্ঘ্য অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয় করতে হয়।

অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয় করার সূত্রটি হলো ঃ

$$r_{12} = \frac{2r'}{1 + r'}$$

এখানে r = সহ-সম্পর্কের সহগ।

r' = অংশ দু'টির সহ-সম্পর্কের সহগ।

৩. নৈর্ব্যক্তিকতা (Objectivity)

আমাদের দেশের প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে যে কঠোর সমালোচনা হচ্ছে তার মূলে রয়েছে পরীক্ষকদের ব্যক্তিগত ত্রুটি (Personal error) বা পর্যবেক্ষণমূলক ত্রুটি (Observational error)। যে কোন অভীক্ষা প্রয়োগের বাস্তব ক্ষেত্রে অভীক্ষকের এ

ধরনের ত্রুটি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। শিক্ষামূলক বা মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বা পর্যবেক্ষণমূলক ত্রুটি উপেক্ষা করা যায় না। এ ধরনের ত্রুটি দূর করার জন্যই অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা নিশ্চিত করতে হয়। যে কোন অভীক্ষা গঠন করার ক্ষেত্রে সাংগঠনিকভাবে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তি মুখী না করে বিষয়মুখী করতে পারলেই উহা বস্তুনিষ্ঠ, পরিমাপের জন্য অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতার মান বৃদ্ধি পাবে।

কোন অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা বলতে বুঝায় তার গঠন, প্রয়োগ বা ফলাফল নির্ণয় অভীক্ষকের কোন নিজস্ব প্রভাব থাকে না। কোন কিছু পরিমাপ করার সময় পরীক্ষকের নিজস্ব ইচ্ছা, ধারণা, অভিমত, পছন্দ, অভিজ্ঞতা স্বাভাবিকভাবেই প্রভাবিত হয় অভীক্ষাটির নৈর্ব্যক্তিকতা বিপর্যস্ত হয়। এটা পর্যবেক্ষণমূলক ত্রুটি, অভীক্ষাটিকে সব দিক থেকে এ ধরনের পর্যবেক্ষক ঘটিত বা ব্যক্তিগত ত্রুটি মুক্ত করে নৈর্ব্যক্তিকতা অর্জন করা যায়। বিভিন্ন অভীক্ষার একই রকমের স্কোর মান দিয়ে অভীক্ষকের পরিমাপে সকল কর্মসূচিতে নৈর্ব্যক্তিকতা উন্নতি ঘটাতে পারে। এ ধরনের অভীক্ষা গঠনের ফলে ঐ অভীক্ষাটি একই ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করে বিভিন্ন অভীক্ষক বা পরীক্ষক যদি একই স্কোর দেন, তাহলেই তাকে নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা বলা যাবে। অতএব কোন অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা উহার প্রয়োগক্ষেত্রের ফলাফলে বিভিন্ন পরীক্ষকের একই ধরনের স্কোর দেয়ার মাত্রাকে বুঝায়।

শিক্ষামূলক ও মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষার ক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিকতার ধারণা

১। অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতার ক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিকতা প্রাপ্ত পরিমাপটিকে বুঝায়।

২। যে কোন নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার পরিমাপ নির্ভরযোগ্য।

৩। কোন অভীক্ষার যথার্থতাকে বাদ দিয়ে নৈর্ব্যক্তিকতার বিচার করা অর্থহীন।

৪। নৈর্ব্যক্তিকতা নির্ধারণের কোন গাণিতিক নিয়ম এখনও উদ্ভাবিত হয় নি বিভিন্ন ধরনের সাংগঠনিক ও পদ্ধতিগত ব্যবস্থার মাধ্যমে অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা নিশ্চিত করা হয়।

অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা হ্রাসের কারণ

ক. অভীক্ষা পদের সাংগঠনিক ও প্রকৃতিগত কারণ এবং

খ. অভীক্ষায় প্রতিক্রিয়ার মান নির্ণয়গত কারণ।

ঃ অভীক্ষা পদের সাংগঠনিক ও প্রকৃতিগত কারণ

- অভীক্ষার অন্তর্গত পদগুলোর প্রশ্নমালা এমনভাবে তৈরি করা হয় এদের উত্তর এক বা একাধিক শব্দ বা একটি সম্পূর্ণ বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায়। কিন্তু উত্তরটির মান নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে পরীক্ষককে তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্কোর দিতে হয় বলে ব্যক্তিকতার প্রভাব থাকছে।

২ অভীক্ষার পদগুলোর পরিমাপযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছাড়া আনুষ্ঠানিক বৈশিষ্ট্যগুলোর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। রচনামূলক প্রশ্নের ক্ষেত্রে বিষয় জ্ঞানের সাথে ভাষাজ্ঞান, প্রকাশভঙ্গি ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। এসব ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেয়ার জন্য পরীক্ষক সঠিক সমতা রক্ষা করতে পারেন না বলে পরিমাপের নৈর্ব্যক্তিকতার অভাব দেখা যায়।

৩ শিক্ষামূলক অভীক্ষার ক্ষেত্রে ভাষাগত ত্রুটি নৈর্ব্যক্তিকতা হ্রাস করে।

৪ অভীক্ষার সঠিক নির্দেশের অভাবে অভীক্ষার্থী ও পরীক্ষক উভয়েরই বিভ্রান্তি অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা হ্রাস পায়।

৫। একই অভীক্ষাপদের বহুসংখ্যক সমস্যা বা প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত থাকলে জটিল অভীক্ষা পদগুলো ইহার নৈর্ব্যক্তিকতা কমিয়ে দেয়।

খ) **প্রতিক্রিয়ার মান নির্ণয়গত কারণে নৈর্ব্যক্তিকতা হ্রাস ঃ** শিক্ষামূলক ও মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা হ্রাসের অন্যতম একটি প্রধান কারণ উত্তরপত্রের মান নির্ণয়ের পদ্ধতি সংক্রান্ত ত্রুটি। এ ধরনের যে সকল ত্রুটি অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা হ্রাস করে সেগুলো হলো -

১। কোন অভীক্ষার একটি পদ বা প্রশ্নে কতকগুলো অংশ থাকলে, প্রত্যেকটি অংশের জন্য নির্দিষ্ট স্কোর মান না থাকলে পরিমাপের নৈর্ব্যক্তিকতা হ্রাস পাবে।

২। কোন অভীক্ষার পদগুলির প্রশ্ন বা সমস্যা এমনভাবে প্রদান করা হলো যাতে করে বিভিন্ন উপায়ে উত্তর দেয়ার সুযোগ থাকে। সে ক্ষেত্রে পূর্ব নির্ধারিত মান নির্ণয়ের ছক না থাকলে অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা কমে যায়।

৩। অভীক্ষার মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অভীক্ষকের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা না হলে উহার নৈর্ব্যক্তিকতা হ্রাস পাবে।

অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা সংরক্ষণ ঃ

শিক্ষামূলক বা মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা কোন গাণিতিক পদ্ধতিতে নির্ণয় করা যায় না। ইহা প্রয়োগের পর উত্তরপত্রের মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পরীক্ষকের যে

ব্যক্তিগত প্রভাব আসার সম্ভাবনা থাকে সে গুলোকে যদি রোধ করা যায়, তাহলেই অভীক্ষাটি নৈর্ব্যক্তিক হবে। কোন অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা হ্রাসের কারণগুলো বন্ধ করতে পারলে ইহার নৈর্ব্যক্তিকতা সংরক্ষণ করা যাবে। এজন্য অভীক্ষার পদগুলোর সাংগঠনিক ত্রুটি রোধ এবং মান নির্ণয়ের স্থিরতার অভাব দুর করতে পারলে অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা সংরক্ষণ করা যাবে এবং অভীক্ষা পদগুলোর সাংগঠনিক ত্রুটি দূর করা যাবে-

(১) প্রচলিত রচনাধর্মী পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সংস্কার সাধন করে।

(২) অভীক্ষার পদ হিসাবে বাস্তবধর্মী বিষয়মুখী প্রশ্ন ব্যবহার করে এবং

(৩) সংক্ষিপ্ত উত্তর সম্বলিত প্রশ্ন ব্যবহার করে।

অপরপক্ষে, উত্তরপত্রের মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাব দূর করার জন্য-

(৪) একই নিয়মে প্রত্যেক পরীক্ষক যাতে উত্তরপত্রের মান নির্ণয় করতে পারেন সে জন্য নির্দেশিকার ব্যবস্থা করা

(৫) বিষয়াত্মক বা উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্নপত্রের জন্য মান নির্ণয়পত্র চালু করা, এবং

(৬) সকল ধরনের অভীক্ষার জন্য আদর্শমান নির্ধারণ করা।

৪. আদর্শায়ন (Standardisation)

আধুনিক শিক্ষামূলক ও মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষাগুলো আদর্শায়িত। ফলে, এগুলো ত্রুটিপূর্ণ ও গতানুগতিক প্রচলিত অভীক্ষার তুলনায় বেশি যথার্থ, নির্ভরযোগ্য, নৈর্ব্যক্তিক, ত্রুটিমুক্ত ও কার্যকর। কোন অভীক্ষার গঠন, প্রয়োগ ও স্কোরিং পদ্ধতির মধ্যে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যবিধানে যে কৌশলগত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়, তাকেই অভীক্ষার আদর্শায়ন বলে। প্রয়োগ পদ্ধতির মধ্যে সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য আনার অর্থ হলো যে পরিস্থিতিতে অভীক্ষাটি প্রয়োগ করা হচ্ছে সেই পরিস্থিতির বিভিন্ন দিক যেন বিভিন্ন সময়ে অপরিবর্তিত থাকে। আদর্শায়নের জন্য এ ধরনের অপরিবর্তনীয় ও সামঞ্জস্য বিধান অপরিহার্য। কারণ এভাবেই সংব্যাখ্যানমূলক ত্রুটি দূর করা যায়। আদর্শায়ন অভীক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ইহার একটি সর্বজনীন মান বা নর্ম (Norm) থাকে। ইহা নির্ণয় সাপেক্ষ। কোন অভীক্ষার এ ধরনের নর্ম (Norm) বা আদর্শ মান নির্ণয়ের পদ্ধতি হলো আদর্শায়ন। সাধারণত চার ধরনের প্রক্রিয়ায় অভীক্ষার আদর্শমান (Standard Value) নির্ণয় করা হয়। প্রত্যেক প্রক্রিয়ার আদর্শমান ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন- শ্রেণিভিত্তিক আদর্শমান (Grade Norm), বয়সভিত্তিক আদর্শমান (Age Norm), শতাংশ আদর্শমান (Percentile) এবং আদর্শ স্কোরমান (Standard Score Norm)।

যে কোন আদর্শায়িত অভীক্ষা নিয়ন্ত্রিত। ইহার বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

(১) আদর্শায়িত অভীক্ষার পদগুলো (Test item) বিশেষ নীতি অনুযায়ী নির্বাচিত।

প্রত্যেকটি অভীক্ষা পদ তাদের কাঠিন্যমান (Difficulty Value) পৃথকীকরণ (Descriminating Value) ইত্যাদি বিচার করে গঠন করা হয়।

(২) পূর্ব নির্ধারিত নীতি অনুসারে অভীক্ষার প্রয়োগ পদ্ধতি এবং স্কোরিং পদ্ধতি পরিচালিত হয়।

(৩) প্রাপ্ত স্কোরের তাৎপর্য নির্ণয় করে আদর্শমান (Norm) নির্ধারণ করা হয়।

(৪) ফলাফল তুলনামূলকভাবে বিচার করার জন্য প্রয়োজন অনুসারে সমান্তরাল অভীক্ষার (Parallel test) ব্যবস্থা রাখা হয় এবং

(৫) নির্দেশপত্র (Test Manual) অনুযায়ী অভীক্ষা প্রয়োগ করা হয়।

৫. প্রয়োগশীলতা (Administrability)

কোন অভীক্ষার প্রয়োগশীলতা বলতে বুঝায় অভীক্ষার সহজ ও সরল প্রয়োগবোধ। অভীক্ষার প্রয়োগ ক্ষেত্রে এমন কিছু না ঘটে যাতে করে ইহার ফলাফল ও উপযোগিতা ব্যর্থ হয়ে না যায়। অভীক্ষা প্রয়োগ করার সময় পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে আয়ত্তে রাখার মত সুবিধাজনক পরিস্থিতি অনুসারে ঠিক করে নিতে হয়। কষ্টসাধ্য বা জটিল প্রয়োগ পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক অভীক্ষাগুলো সহজ ও সরল বিধির মাধ্যমে উহার নির্ভরযোগ্যতা বজায় রাখতে সক্ষম।

৬. পরিমিততা (Economy)

শিক্ষামূলক বা মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষার পরিমিততা বলতে বুঝায় উহার রচনা, প্রয়োগ বিচার ইত্যাদি ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব কম সময়, অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয় করা। যদি আধুনিক অভীক্ষা গঠনে সময় একটু বেশি প্রয়োজন হলেও উহার প্রয়োগ ও মূল্যায়নে খুবই কম সময় লাগে। তা ছাড়া উত্তরপত্র পরীক্ষা করার কাজটি অত্যন্ত সরল ও সহজ। এ কাজে যে কোন স্বল্পজ্ঞানসম্পন্ন লোক দিয়ে নির্ভুলভাবে সমাধা করানো যায়। উত্তরপত্র মূল্যায়নে স্কোর বোর্ড বা স্কোরিং কি (Score Board or Scoring Key) ব্যবহার করা হয়। উন্নত দেশে কম্পিউটার এর সাহায্যে অতি অল্প সময়ে নির্ভুলভাবে স্কোরিং কি ব্যবহার করে অভীক্ষার সম্পূর্ণ সঠিক ফলাফল পাওয়া যায়। দূর শিক্ষণে বি.এড. কোর্সের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের মূল্যায়নের জন্য বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডিস্ট্যান্স এডুকেশন (বাইড), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা এ আধুনিক কম্পিউটার প্রোগ্রামিং প্রযুক্তিকে প্রথম বারের

মত আমাদের দেশে সাফল্যজনকভাবে ব্যবহার করেছেন। এর ব্যবহার উপযোগীতা আমাদের দেশে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্রের সঠিক প্রয়োগ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে একটি নতুন প্রসার লাভের দিক দর্শনহিসাবে কাজ করছে।

৭. সম্পূর্ণতা (Adequacy)

মনোবৈজ্ঞানিক ও শিক্ষামূলক অভীক্ষার ক্ষেত্রে কোন পরিমাপকেই চরম-হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। কোন অভীক্ষা কতটা সঠিকভাবে বা নির্ভুলভাবে শিক্ষাগত বৈশিষ্ট্য বা মানসিক গুণাগুণ পরিমাপ করবে, তা সঠিকভাবে বিচার করার প্রয়োজন হয়। এজন্য পরীক্ষাটির প্রয়োগ পদ্ধতি এবং স্কোরিং (Scoring) পদ্ধতির মধ্যে যতদূরসম্ভব সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য (Uniformity) রক্ষা করা দরকার। আবার অভীক্ষার প্রয়োগ থেকে প্রাপ্ত স্কোরগুচ্ছের যথাযথ ব্যাখ্যা এবং সেগুলোর পরস্পরের নির্ভরযোগ্যভাবে তুলনা করার প্রয়োজন আবশ্যিক হয়ে পড়ে। অভীক্ষার এ ধরনের উপযোগিতা, সংব্যাখ্যান ও তুলনীয়তাকে পরিমাপ বিজ্ঞানসম্মত যে উপায় প্রকাশ করা হয় উহাই অভীক্ষার সম্পূর্ণতা (Adequacy) নামে পরিচিত।

কোন অভীক্ষার প্রয়োগের যথার্থভাবে সম্পূর্ণ করার পরে যে স্কোরগুলো পাওয়া যায় সেগুলোকে যথাযথ ব্যাখ্যা করা, সে গুলোর মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরযোগ্যতা তুলনা এবং পরিশেষে এমন একটি মান বের করতে হয়, যা সার্বজনীনভাবে যে কোন পরীক্ষার্থীর কৃতিত্বের স্কোরের সাথে তুলনাযোগ্য। এ সার্বজনীন মানকে অভীক্ষার মান বা নর্ম (Norm) বলে। বিভিন্ন ধরনের আদর্শমান বা নর্ম দ্বারা অভীক্ষার প্রাপ্ত ফলাফলের এক সার্বজনীন সিদ্ধান্তে পৌছার যথোপযুক্ততাকেই অভীক্ষার সম্পূর্ণতা বলা হয়।

অভীক্ষার আদর্শমানে সম্পূর্ণতা ঃ (Adequacy of test Norm)

অভীক্ষার তাৎপর্য নির্ণয় সংক্রান্ত ত্রুটি দূর করার জন্য আদর্শায়ন (Standardisation) প্রয়োজন। আদর্শায়নের উদ্দেশ্য হলো একটি আদর্শমান নির্ণয় করা যার সাহায্যে প্রত্যেক পরীক্ষক অভীক্ষায় প্রাপ্ত স্কোরের তাৎপর্য নির্ণয় করতে পারেন। শিক্ষামূলক ও মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের আদর্শমান ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন রকম তাৎপর্য সংক্রান্ত ত্রুটি থাকলে ও উহাদের যথোপযুক্ততা বিচার করার প্রয়োজন রয়েছে। যে সকল বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আদর্শমানকে বিচার করা হয় তা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

(১) কোন ধরনের পরিমাপ প্রয়োজন তা বিবেচনা করেই কোন অভীক্ষার পরিমাপ উদ্দেশ্যমুখী আদর্শমান নির্ণয় করা হয়। যখন অভীক্ষাটি প্রয়োগ করা হয়

তখনকার পারিপার্শ্বিকতার প্রেক্ষিতে আদর্শমানের ভিত্তি ঠিক করে নেয়া হয়। এটি জাতীয় ভিত্তিক, প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক বা স্থানীয় ভিত্তিক হতে পারে।

(২) যে কোন অভীক্ষার আদর্শমান সম-সাময়িক হওয়া উচিত। দীর্ঘ দিন পূর্বে গৃহীত আদর্শমানের ভিত্তিতে বর্তমানে প্রাপ্ত স্কোরের তাৎপর্য নির্ণয় ত্রুটিপূর্ণ হতে বাধ্য।

(৩) যে কোন আদর্শমান প্রতিনিধিত্বশীল হওয়া উচিত। আদর্শমান সার্বজনীন হওয়ার জন্যই ইহার প্রতিনিধি দলের প্রাপ্ত স্কোরের ভিত্তিতে নির্ণয় করা উচিত।

(৪) আদর্শমান মানেই তুলনাযোগ্য।

(৫) যখন কোন অভীক্ষা প্রয়োগের জন্য নির্বাচন করা হয়, তখন দেখে নেয়া দরকার অভীক্ষার নির্দেশপত্রে নিম্নের নিয়মাবলি আছে কিনা -

ক. কিভাবে প্রতিনিধিদল নির্বাচন করা হচ্ছে

খ. কতজন শিক্ষার্থী নিয়ে প্রতিনিধিদল গঠিত হয়েছে

গ. প্রতিনিধিদলে অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার্থীদের বয়স, শিক্ষাগতযোগ্যতা, অন্যান্য মানবিক বৈশিষ্ট্য কিরূপ ছিল,

ঘ. আদর্শায়নের জন্য অভীক্ষাটি প্রয়োগের সময় কি নীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

ঙ. কোন সময় উহা আদর্শায়িত করা হয়েছে। অভীক্ষা ব্যবহারের জন্য ঐ ধরনের গুণাগুণ দরকার কিনা?

কোন একটি অভীক্ষা যথার্থ হলে নির্ভরযোগ্য হবে কি না কিংবা নির্ভরযোগ্য বলে যথার্থ হবে কিনা ঃ

কোন অভীক্ষা হয়তো নির্ভরযোগ্য কিন্তু তার যথার্থতা নাও থাকতে পারে। কিন্তু কোন অভীক্ষার যথার্থতা থাকলে তা অবশ্যই নির্ভরযোগ্য হবে। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়। যেমন একজন লোক খুব সুন্দর করে গুছিয়ে মিথ্যা বা কল্পকাহিনী বর্ণনা করলেন, তার বর্ণনা নিখুঁত ও নির্ভরযোগ্য এর মাধ্যমে তার বক্তব্যের নির্ভরযোগ্যতা থাকলেও তার মধ্যে কোন সততা নেই। অর্থাৎ বক্তব্যের নির্ভরযোগ্যতা থাকলেও যথার্থতা নেই। অনুরূপ ভাবে ঐ ব্যক্তি অন্য একটি সত্য ঘটনা ব্যক্ত করলেন এখানে ঘটনার সততা বিদ্যমান। সুতরাং যথার্থতা থাকছে বলে ইহার নির্ভরযোগ্যতা অবশ্যই থাকবে। অর্থাৎ কোন অভীক্ষার যথার্থতা থাকলে অবশ্যই তা নির্ভরযোগ্য হবে। কিন্তু নির্ভরযোগ্য হলে তা যথার্থ হতেও পারে কিংবা নির্ভরযোগ্য হলে যথার্থ নাও হতে পারে।

প্রচলিত এস,এস,সি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে অভীক্ষার এ বৈশিষ্ট্যগুলো কতটুকু প্রতিফলিত হচ্ছে ঃ

আমাদের দেশের প্রচলিত এস,এস,সি পরীক্ষা বিভিন্ন কারণে বহু সমালোচিত। এ সমালোচনার অধিকাংশ কারণ হলো সুঅভীক্ষার নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর অনুসারে এ পরীক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা করা হচ্ছে না। ব্যবস্থাপনা ও পদ্ধতিগত ভাবে সুঅভীক্ষার নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর কোন কোনটি আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করে অনুশীলন করা হচ্ছে। সুঅভীক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলো যথার্থতা, নির্ভরযোগ্যতা, নৈর্ব্যক্তিকতা, আদর্শায়ন প্রয়োগশীলতা পরিমিততা ও সম্পূর্ণতা।

বর্তমানে এস.এস.সি. পরীক্ষার প্রশ্ন পত্রের গঠন, পাঠ্যপুস্তক, পাঠ্যক্রম বা পাঠ্যসূচি তথা জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সম্পৃক্ত করে নুতনভাবে চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে। শিক্ষাদান ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রশিক্ষণের দ্রুত প্রসারের মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের পঠিত জ্ঞানের পুনরাবৃত্তিও ব্যবহারের সুযোগ কমিয়ে প্রশ্নপত্রে যথার্থতা আনয়নের প্রক্রিয়া উন্নয়নের দিকে ধাবিত হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের সঠিক পথে জ্ঞান অর্জনের নিমিত্তে প্রশ্নপত্র ক্রমশঃ সংস্কারের মাধ্যমে বহুমুখী করে তোলা হচ্ছে। কিন্তু এস.এস.সি. পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের নির্ভরযোগ্যতা বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্য শূন্যের কোঠায় এসে নামছে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সাংগঠনিক ও গুণগত মান বাড়লেও আর্থসামাজিক কারণে নির্ভরযোগ্যতার দ্রুত অবনতি ঘটছে। বরং পরীক্ষা ব্যবস্থার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রসংগ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী। তবে প্রশ্নপত্রের নৈর্ব্যক্তিকতার দ্রুত উন্নয়ন বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইতিমধ্যেই এস.এস.সি. পরীক্ষায় শতকরা ৫০ নম্বর নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। উন্মুক্ত বিশ্ব বিদ্যালয়ের বি.এড. পরীক্ষা ও বি.সি.এস. পরীক্ষাসহ অনেক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্রের বাস্তবমুখী প্রয়োগের ফলে এস.এস.সি. সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানিক পরীক্ষায় ইহার ব্যবহারের সাফল্যতা অর্জিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহার অভীক্ষার যথার্থতা, নির্ভরযোগ্যতা, নৈর্বক্তিকতা ও প্রয়োগশীলতাকে কার্যকরভাবে প্রতিফলিত করা হচ্ছে। দেশ ও জাতির স্বার্থে পরীক্ষা ব্যবস্থাপনার সমালোচিত ত্রুটিসমূহ দূরীকরণে প্রচেষ্টা বাস্তবায়িত হবে। এস.এস.সি. পরীক্ষার ব্যবস্থাপনা ও প্রয়োগক্ষেত্রে জটিল ত্রুটিযুক্ত ব্যবহারিক দিকগুলো অচিরেই পরিবর্তন করার সুযোগ ঘটবে। এ প্রয়াসে শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুঅভীক্ষার বৈশিষ্ট্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মূল্যায়নের বিভিন্ন কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়নের জন্য উন্নত শিক্ষাদান পদ্ধতি ও পাঠক্রম সংশোধনের প্রশ্ন জড়িত। যাতে করে অচিরেই এস.এস.সি. পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পুরাপুরি যথার্থ, নির্ভরযোগ্য ও নৈর্ব্যক্তিক করা যায়। বর্তমানে প্রচলিত এস.এস.সি. পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে সবচেয়ে বেশি বিষয়াত্মক বা নৈর্ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্যটি সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু পরীক্ষা অব্যবস্থাপনার জন্য এ সাফল্য ধরে রাখা যাচ্ছে না।

আমাদের দেশের কোন পরীক্ষার প্রশ্নপত্রই আদর্শায়িত নয়। ফলে আদর্শায়ন সম্পূর্ণতার অভাবে এস.এস.সি. পরীক্ষার প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের সঠিক মেধা যাচাই করতে ব্যর্থ প্রশ্নপত্রের যথার্থতা, নির্ভরযোগ্যতা ও নৈর্ব্যক্তিকতা আনয়ন করা অনেকটা সফল্যের সাথে অগ্রসর হয়েছে বটে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে পরীক্ষা ব্যবস্থাপনার ত্রুটির জন্য ঐ সুফল এস.এস.সি. পরীক্ষার ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করা যাচ্ছে না। প্রচলিত এস.এস.সি. পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে যথার্থতা, নির্ভরযোগ্যতা, প্রয়োগশীলতা ও পরিমিততার অভাব ঘটছে । নৈর্ব্যক্তিকতা অনেকটা উন্নত হওয়ার ধারায় থাকলেও ফলাফলের বিচারটা ব্যক্তি সাপেক্ষ, পরীক্ষার কোন সঠিক নর্ম। (Norm) নেই এবং যুক্তি অপেক্ষা স্মৃতির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রকৃত জ্ঞানের পরিসর পরিমাপ না করে কেবল খণ্ডিত অংশের পরিমাপ করে। শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশের পরিমাপ না করে বরং একটা অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করছে।

বর্তমানে শিক্ষা বিভাগ সমগ্র দেশব্যাপী এস.এস.সি. পরীক্ষাসহ সকল প্রতিষ্ঠান পরীক্ষায় (Public Examination) বাঞ্ছিত পরিবেশ সৃষ্টি করতে কম্পিউটার পদ্ধতির ব্যবহারসহ বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এটির সাফল্য নির্ভর করছে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকসহ সকল শিক্ষক সমাজের উপর। পরীক্ষা পদ্ধতির পূনর্গঠনের যাবতীয় পরিকল্পনায় আধুনিক বিষয়াত্মক বা নৈর্ব্যক্তিক ও আদর্শায়িত প্রশ্ন পত্রের ব্যবহার অদূর-ভবিষ্যতে নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য শিক্ষকদের সকলকেই মূল্যায়ন পদ্ধতির সাথে সুপরিচিত হতে হবে। এ ক্ষেত্রে সবধরনের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সগুলোতে মূল্যায়ন পদ্ধতির গুরত্ব দিতে হবে। বাস্তবক্ষেত্রে মূল্যায়ন পদ্ধতি ত্রুটিমুক্ত করতে পারলেই সু-অভীক্ষার বৈশিষ্ট্যসমূহ এস.এস.সি. পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে প্রতিফলিত করা যাবে। বর্তমানের পরীক্ষা নামক এ দুষ্ট আবর্ত থেকে দেশ জাতি মুক্তি পাবে। এ সম্ভাবনাপূর্ণ পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে হলে শিক্ষক সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে এবং বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে।

অনুশীলনী -২.২

১। সুঅভীক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

২। একটি শিক্ষামূলক বা মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষায় সাধারণত কি কি ত্রুটি দেখা যায়? উহাদের কি কি উপায়ে সংশোধন করা যেতে পারে।

৩। কোন একটি অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে আপনি কি রূপে নিশ্চিত হতে পারেন?

৪। কোন একটি অভীক্ষা নির্ভরযোগ্য হলে তা কি যথার্থ হবে, কিংবা যথার্থ হলে কি নির্ভরযোগ্য হবে?

৫। কোন অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা বলতে কি বোঝেন? কি ভাবে উহা অর্জন করা যায়?

৬। পরীক্ষার যথার্থতা, নির্ভরযোগ্যতা, নৈর্ব্যক্তিকতা ও সম্পূর্ণতা বলতে কি বোঝেন? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

৭। বর্তমান এস.এস.সি. পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে সু অভীক্ষার এ বৈশিষ্ট্যগুলো কতটুকু প্রতিফলিত হচ্ছে তা আলোচনা করুন।

৮। কোন অভীক্ষার যথার্থতা বলতে কি বোঝেন? উহা কত প্রকার ও কি কি? কি কি উপায়ে কোন অভীক্ষার বিভিন্ন প্রকার যথার্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে?

৯। কোন একটি অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা কি ভাবে আনয়ন করা যাবে? রচনাধর্মী ও নৈর্ব্যক্তিক উভয় প্রকার অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

তৃতীয় অধ্যায়

শিক্ষায় কৃতিত্বের মূল্যায়ন

শিক্ষায় মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পারদর্শিতা যাচাইয়ের অভীক্ষাগুলো (Achievement test) সম্পর্কযুক্ত। পারদর্শিতা বলতে কোন কিছু সম্পাদনের দক্ষতাকে বোঝায়। সুতরাং পারদর্শিতার অভীক্ষা বিশেষ ধরনের পরিমাপক কৌশল হিসাবে কোন ব্যক্তির কর্মসম্পাদনের দক্ষতা পরিমাপ করে। শিক্ষাক্ষেত্রে এ ধরনের অভীক্ষাগুলোকে শিক্ষামূলক অভীক্ষা (Educational test) হিসাবেই বিবেচনা করা যেতে পারে। নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে বিদ্যালয়ে শিক্ষণের প্রভাবে শিক্ষার্থীদের যে শিক্ষাগত অগ্রগতি সাধিত হয়, তা পরিমাপ করাই পারদর্শিতার অভীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। শিক্ষার্থীদের শিক্ষামূলক অগ্রগতির যে কোন পরিমাপের প্রচেষ্টাকে পারদর্শিতার অভীক্ষা বলা যায়। আজকাল শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষাকে পারদর্শিতার অভীক্ষা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষাগুলোকে তাদের সাংগঠনিক ও উদ্দেশ্যগত দিক থেকে নানা শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে।

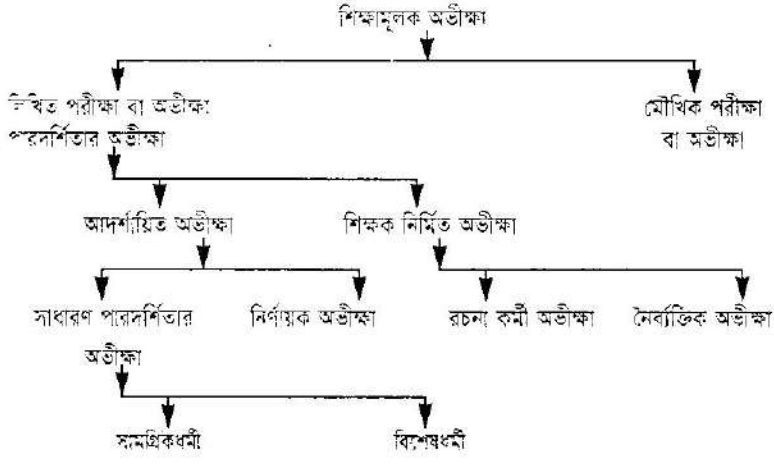

মৌখিক অভীক্ষা

প্রত্যেক শিক্ষার্থী কতটা তথ্য স্মরণ রাখতে পারে আবার তার অর্জিত জ্ঞান সে কতটা মনে রাখতে পারে অথবা শ্রেণিকক্ষে পঠিত বিষয়ে তার সাফল্য কতটুকু, এসব

দিক বিবেচনা করে শিক্ষক/ শিক্ষিকাগণ শ্রেণিকক্ষে মৌখিক অভীক্ষা ও পরীক্ষার ব্য করে থাকেন। শিক্ষকগণ শ্রেণিকক্ষে সাধারণত প্রতিদিনের পাঠ বা কোন নির্দিষ্ট সম পাঠ্যাংশ হতে ধারাবাহিকভাবে বা এলোমেলোভাবে প্রশ্ন করে উত্তর আদায়ের করেন। অনেক সময় কোন কবিতা বা পাঠ্যাংশের অংশ বিশেষ মুখস্ত বলতে বা আ করতে বলে থাকেন। এ রকম নানা ধরনের কার্যাবলীর মাধ্যমে এ জাতীয় অভী প্রয়োগ করা হয়। এ ছাড়া চাকুরি ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও এ জাতীয় অভীক্ষা প্রচলি মৌখিক অভীক্ষা বা পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনেকেই সমর্থন করেন। তবে এর পক্ষে বিপক্ষে বিভিন্ন ধরনের মতামত রয়েছে।

মৌখিক অভীক্ষার পক্ষে মতামত

১. শিক্ষার্থীর উচ্চারণ শব্দ বা ভাব প্রয়োগ, উপস্থিত জ্ঞান, গণিতের সহজ সমস্য সমাধান, উপস্থিত বুদ্ধি প্রভৃতি ক্ষেত্রে পরিমাপের অত্যন্ত কার্যকরী উপায়।

২. অনেক শিক্ষার্থী না বুঝে মুখস্থ করে কিছু কিছু বা অনেক লিখতে পারে, মৌখিক পরীক্ষায় তার সঠিক অবস্থান ধরা পড়ে ।

৩. প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজ নিজ অর্জিত জ্ঞান সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা লাভ ক পারে।

৪. শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব, তার শারীরিক ও মানসিক অবস্থান, রং চেহারা ও সাম কৃতিত্বের একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়।

মৌখিক অভীক্ষার বিপক্ষে মতামত ঃ মনোবিজ্ঞানী হোরাসম্যান এর মতে

১. সব শিক্ষার্থীকে সমানভাবে বিচার করা যায় না।

২. কর্মপরিধি সংকীর্ণ এবং এর সাহায্যে যে মাপ পাওয়া যায় তা ত্রুটিপূর্ণ।

৩. সময় লাগে অত্যন্ত বেশি।

৪. অভীক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাব বিদ্যমান।

৬. প্রশ্নের কাঠিন্যের মাত্রা ঠিক থাকে না।

৭. পক্ষপাতিত্বের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। ফলে নির্ভরযোগ্যতা অনেক সময় কমে য

মৌখিক অভীক্ষার বৈশিষ্ট্যাবলী

১. এ জাতীয় অভীক্ষা শিক্ষক/ শিক্ষিকাগণ যখন তখন ইচ্ছানুযায়ী প্রয়োগ ক পারেন।

২. বিভিন্ন শিক্ষার্থীর উপযোগী বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করার অবাধ সুযোগ ও অধিকার থাকে।

৩. পরীক্ষা নেয়ার সময় ও স্থান প্রয়োজন মতো পরিবর্তন করার সুযোগ থাকে।

রচনামূলক অভীক্ষা (Essay -Test)

সাধারণত ৮থেকে ১০টি প্রশ্ন নিয়ে রচনামূলক অভীক্ষার প্রশ্নমালা তৈরি করা হয়। প্রশ্নগুলোর উত্তর রচনা আকারে লিখিতে হয়। উত্তর লিখার জন্য তিন থেকে চার ঘণ্টা সময় দেয়া হয়। শিক্ষার্থীদের অধীত পাঠ্য বিষয়ের জ্ঞান থেকে উত্তরগুলো দিতে হয়। কে, কখন, কোথায়, কি বা কেন ব্যবহার করে প্রায় সব প্রশ্নগুলো তৈরি করা হয়। আবার কখনও কখনও বর্ণনা, সংজ্ঞা দিতে, তুলনা করতে, কারণ দর্শাতে, তাৎপর্য নির্ণয় বা ব্যাখ্যা করতে বলা হয়।

রচনামূলক অভীক্ষার বৈশিষ্ট্যাবলী

১. প্রত্যেক শিক্ষার্থী আবার প্রশ্নের উত্তর লিখতে সুযোগ পায়।

২. প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নিজস্ব ভাষাজ্ঞান, রচনাশৈলী ভাবপ্রকাশের ধরন ইত্যাদি পরিমাপ করা যায়।

৩. প্রত্যেক শিক্ষার্থীর যুক্তি ও বিচারশক্তি প্রয়োগের সুযোগ থাকে।

৪. প্রদত্ত প্রশ্নমালা থেকে বাছাই করে শিক্ষার্থীর পছন্দকৃত প্রশ্নের উত্তর লিখার সুযোগ থাকে।

অনেক ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা এবং শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে পরীক্ষা পদ্ধতি নির্বাচন করা হয়। রচনামূলক পরীক্ষা পদ্ধতি বিশ্বস্ততার সাথে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে অবাধে ব্যবহৃত হয়।

ক. সাহিত্য রচনা ও সমালোচনা, খ. সাংবাদিকতা, গ. স্বাধীন চিন্তাধারা ও প্রকাশভঙ্গী, ঘ. যুক্তি প্রয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ধারণা গ্রহণ, ঙ. বিমূর্ত চিন্তা ও দর্শন, চ. আরোহী ও অবরোহী যুক্তির প্রয়োগ ছ. তুলনা ও তাৎপর্য নির্ণয়, জ. কল্পনা শক্তির বিকাশ প্রভৃতি।

রচনামূলক অভীক্ষার ত্রুটি

বহুল প্রচলিত রচনামূলক অভীক্ষার নিম্নোক্ত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ত্রুটি ঃ

ক. প্রশ্ন করার ত্রুটি, খ. নম্বর দানের ত্রুটি এবং গ. মুখস্থ করার বিপদ।

(ক) প্রশ্ন করার ত্রুটি ঃ পাঠ্যসূচির সমস্ত অংশ থেকে রচনামূলক অভীক্ষার প্রশ্ন করা যায় না। এ কারণে শিক্ষার্থীর বিস্তৃত এবং সামগ্রিক জ্ঞানের পরিমাপ করার পরিবর্তে একটা খণ্ডিত অংশের পরিমাপ করা যায় মাত্র। ফলে শিক্ষাদান ও শিক্ষার প্রসার উভয় ক্ষেত্রেই অসম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ইহা সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে প্রভাবিত করে।

(খ) নম্বর দানের ত্রুটি ঃ নম্বর দানের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভীক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাব কার্যকরী হয়। এ প্রসংগে বিখ্যাত মনোবিদ সাভিফোড বলেছেন নম্বর দান ঘন্টায় ঘন্টায় এবং খাওয়ার আগে ও পরে পরিবর্তিত হয়।

(গ) মুখস্ত করার বিপদ ঃ যেহেতু সমগ্র পাঠ্যক্রমের মাত্র কয়েকটি অংশ থেকে প্রশ্ন করা হয় সেহেতু অধিকাংশ শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রশ্ন মুখস্ত করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে থাকে। ফলে, শিক্ষার্থীদের সফলতা বা বিফলতা দৈব নিয়ন্ত্রিত হিসাবে পরিচিত।

সুঅভীক্ষার বৈশিষ্ট্যাবলীর প্রেক্ষিতে রচনামূলক পরীক্ষার অসুবিধাসমূহ ও সীমাবদ্ধতা

যথার্থতা কম

সাধারণ রচনামূলক পরীক্ষার সাহায্যে শ্রেণিকক্ষে যা শিখানো বা পড়ানো হয় তার অধিকাংশের মূল্যায়নই সম্ভব হয় না। রচনামূলক পরীক্ষায় প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর বেশ দীর্ঘ হয় বলে কোন পরীক্ষায় অধিক সংখ্যক প্রশ্ন করা সম্ভব হয় না। শিক্ষার্থীর অধীত অধিকাংশ বিষয়বস্তুই মূল্যায়নের বাইরে থেকে যায়। এ প্রচলিত পদ্ধতিতে অধিকাংশ পরীক্ষার্থী পরীক্ষার পূর্বে কিছুদিন বাছাই করা কতিপয় প্রশ্ন তৈরি করে পরীক্ষায় এ দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে । তাছাড়া অধিকাংশ পরীক্ষাতেই যে কোন বিষয় মূল্যায়নের সময় পরীক্ষার্থীর ভাষাজ্ঞান এবং প্রকাশভঙ্গীর উপর গুরত্ব দেয়া হয়। এখানে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন বিষয়মুখী না হয়ে সে কিভাবে তা প্রকাশ করছে সেভাবে তার মূল্যায়ন হয়। এ কারণেই এস.এস.সি পরীক্ষার যথার্থতা কমে যায়।

নির্ভরযোগ্যতাও খুব কম

রচনামূলক পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা নানা কারণে খুব কম হয়ে থাকে। প্রধানত অধিকাংশ পরীক্ষকই প্রশ্নোত্তর ভালভাবে পড়ে দেখে না। অনেক পরীক্ষক প্রশ্নোত্তরের দৈর্ঘ্য দেখে, অনেকে হাতের লেখা দেখে, অনেকে প্রথম ২/৩ পৃষ্ঠা পড়ে, অনেকে প্রথম এবং শেষে কিছুটা পড়ে নম্বর দেন। এর ফলে শুধু যে বিভিন্ন পরীক্ষকের নম্বরের তফাত হয় তাই নয় বরং বিভিন্ন সময়ে দেখা যায় একই পরীক্ষকের নম্বরের মধ্যেও পার্থক্য দেখা যায়।

পরীক্ষার খাতা ভালভাবে পড়ে দেখলেও বিভিন্ন পরীক্ষকের নম্বরের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। কারণ কোন কোন পরীক্ষক শিক্ষার্থীদের নিজের তৈরি প্রশ্নোত্তরের মূল্য বেশি দেন আবার কোন পরীক্ষক শিক্ষার্থীদের নোট বই থেকে মুখস্ত করা নির্ভুল প্রশ্নোত্তরে বেশি নম্বর দেন। কোন কোন পরীক্ষকের প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে নিজস্ব মতামত ও ধারণা রয়েছে যা তারা অপরিবর্তনীয় বলে মনে করেন এবং শিক্ষার্থীদের উত্তর তাদের মনের মত না হলে সে খাতায় তারা নম্বর কম দেন।

অন্যদিকে শিক্ষার্থীগণও রচনামূলক পরীক্ষায় তাদের অজ্ঞতাকে ঢাকা দেয়ার জন্য নানা ফন্দির আশ্রয় নেয়। কোন কোন পরীক্ষার্থী প্রশ্নের সাথে সম্পর্কহীন কথাবার্তা লিখে যায়, কেউ প্রশ্নের সংগে অত্যন্ত ক্ষীণ সম্পর্কগুলোকে অধিক ফলাও করে লিখে যায় এবং সত্যিকার বিষয় এড়িয়ে যায়। আবার কোন কোন পরীক্ষার্থী চাতুর্যে সম্পর্কবিহীন বিষয়বস্তুকেও সম্পর্কযুক্ত করার প্রয়াসে আংশিক জয়যুক্ত হয়। এইরূপ নানা কারণে রচনামূলক পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা অত্যন্ত কম হয়।

ব্যবহারোপযোগিতা (Usability)

রচনামূলক পরীক্ষার ব্যবহারোপযোগিতা অত্যন্ত কম। এ কারণে পরীক্ষা পরিচালনার জন্য বহু সংখ্যক পরীক্ষক, নিরীক্ষক ও সমীক্ষক নিয়োগ করতে হয়। এটা অত্যন্ত ব্যয় ও সময় সাপেক্ষে। এ ধরনের প্রচলিত পরীক্ষা এত বেশি গতানুগতিক ও পুথিসর্বস্ব হয়ে গেছে যে পরীক্ষার্থীকে নকল থেকে বিরত করার কোন উপায় খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রচুর সংখ্যক পুলিশ আনসার ও উচ্চপদস্থ কর্মচারি কর্মকর্তা নিয়োগ করেও বহুমুখী দুর্নীতি থেকে এ পরীক্ষা ব্যবস্থাকে মুক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না।

এ ধরনের পরীক্ষার ফলাফলের বিচার ব্যক্তি সাপেক্ষে তার উর্ধ্বে নয় এবং এর কোন সঠিক মান নেই। অধিকন্তু এ পরীক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু ভালভাবে উপলব্ধি করার চেয়েও পরীক্ষায় পাশ করার উপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। যুক্তির চেয়ে স্মৃতির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সমগ্র পাঠ্য বিষয়ের উপর অধিক জ্ঞানের পরিসর পরিমাপ করার পরিবর্তে খণ্ডিত অংশ বিশেষের পরিমাপ করা হয়। শিক্ষার্থীদের সারা বছরের পরিশ্রম ও পারদর্শিতার কোন মূল্য দেয়া হয় না। অভিভাবকদের গৃহ শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে অধিকতর অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে শিক্ষার্থীদেরকে বিষয়বস্তু ঠিকমত উপলব্ধির পরিবর্তে মুখস্ত করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

পরিশেষে রচনামূলক অভীক্ষার ক্ষেত্রে সু অভীক্ষার বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে যথার্থতা নির্ভরযোগ্যতা, প্রয়োগশীলতা ও সময় বেশি লাগে বলে পরিমিততার অভাব ঘটছে বলে

উল্লেখ করা যায়। অধিকন্তু এ ধরনের প্রশ্নপত্রের ফলাফলের বিচার ব্যক্তিসাপেক্ষ তথা এর কোন সঠিক মান (Norm) নেই। শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশের পরিমাপসহ বিভিন্ন শিক্ষার্থীর ফলাফলের তুলনা করা সম্ভব নয়।

রচনামূলক পরীক্ষার সুবিধা

রচনামূলক পরীক্ষার উপরে বর্ণিত অসুবিধা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এর কিছু সুবিধা রয়েছে।

১। শিক্ষার্থীর অধিত জ্ঞান সহজে পরিমাপ করা যায়।

২। শিক্ষার্থী স্বাধীনভাবে তার দৃষ্টিভঙ্গী ও মতামত প্রকাশ করার সুযোগ পায়।

৩। শিক্ষার্থীর ভাষাজ্ঞান, রচনাশৈলী, ভাব প্রকাশের ভঙ্গী ইত্যাদি পরিমাপ করা যায়

৪। শিক্ষার কতকগুলো ব্যাপক ও বিস্তৃত ফলাফল এ ধরনের পরীক্ষার মাধ্যমে বিচার করা যায়।

৫। শিক্ষার্থী যুক্তি ও বিচার শক্তির প্রয়োগ করতে পারে।

৬। প্রশ্নপত্র তৈরির ক্ষেত্রে তেমন কোন পারদর্শিতার প্রয়োজন হয় না।

৭। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা ছাড়াও প্রশ্ন করা যায়।

৮। কোন বিষয়বস্তুকে গুছিয়ে লেখার মানসিক প্রশিক্ষণ পায়।

রচনামূলক অভীক্ষা উন্নয়নের উপায়

রচনামূলক অভীক্ষাকে ত্রুটিমুক্ত করে উন্নয়ন সাধনের জন্য নিম্নোক্ত উপায়গুলো পালন করা দরকার ঃ

ক) উন্নতমানের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও

খ) নৈর্ব্যক্তিক নম্বর দান।

(ক) উন্নতমানের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন

প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি সচেতন থাকতে হবে।

১। প্রশ্নপত্র তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় সময় নিয়ে অভীক্ষা গঠনের কাজ সম্পন্ন করা উচিত। তাড়াহুড়া করে প্রশ্ন করা উচিত নয়। ধীরে সুস্থে তৈরি করা উচিত।

২। রচনামূলক প্রশ্নের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হওয়া উচিত এবং কোনরূপ ভুল বোঝার অবকাশ যেন না থাকে।

৩। কম সংখ্যক অথচ দীর্ঘ উত্তর হবে এমন প্রশ্ন না করে অধিক সংখ্যক অথচ কম উত্তর হবে এমন ধরনের প্রশ্ন করা উচিত।

৪। প্রশ্নগুলো এমন ভাবে দিতে হবে যাতে করে যে বিষয়ের প্রশ্ন যেন ঠিক সে বিষয়ের অধীত জ্ঞানই পরিমাপ করে।

৫। প্রশ্নগুলো এমনভাবে করতে হবে যাতে করে নির্দিষ্ট সময়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব হয়।

৬। প্রশ্নের উত্তর রচনা করবার ধারা সম্বন্ধে ভিত্তি নির্দেশ করে দিতে হবে যেন বিভিন্ন পরীক্ষার্থী বিভিন্ন ধারায় প্রশ্নোত্তর না লিখে।

উদাহরণ- মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের তিনটি মূল কারণ কি কি? (দুর্বল) মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের তিনটি মূল কারণ কি কি? কারণ তিনটির বর্ণনা ও ব্যাখ্যা কর। (উন্নত)

৭। পাঠদানের বিভিন্ন উদ্দেশ্য মূল্যায়নের জন্য ওয়াইডম্যান উন্নত মানের রচনামূলক প্রশ্নমালার ১১টি প্রকারভেদ রচনা করেন। প্রশ্নপত্র তৈরি করার সময় এদিকে অবশ্যই দৃষ্টি রাখতে হবে। নিম্নে ১১টি প্রকারভেদ দেয়া হলোঃ

১. কি, কে, কখন, কোন এবং কোথায়, ২. নামকরণ করা, ৩. রূপ রেখা, ৪.বর্ণনা করা, ৫. পার্থক্য করা ৬. তুলনাকরা, ৭. ব্যাখ্যা করা, ৮. আলোচনা করা, ৯. ভাব-সম্প্রসারণ করা, ১০. সারাংশ নির্ণয় করা এবং ১১. মূল্যায়ন করা।

৮। রচনামূলক প্রশ্নপত্র পরীক্ষার্থীদের খুব বাছাই বা নির্বাচনের সুযোগ দেয়া ঠিক নয়, তাতে প্রত্যেক পরীক্ষার্থী একই মানে পরীক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়। উদাহরণস্বরূপ ১০টি প্রশ্ন দেয়া আছে। যে কোন ৫টির উত্তর দিতে হবে। এখন একজন পরীক্ষার্থী ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিল, অন্যজন সে ৫টি না দিয়ে অন্য ৫টির উত্তর দিল। এর ফলে দেখা গেল, ঐ দু'জন পরীক্ষার্থী ভিন্ন ভিন্ন দুটো পরীক্ষা দিল। এর ফলে, পরীক্ষার্থী দু'জনের তারতম্য বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এখানে মেধার সঠিক বিচার করা সম্ভব নয়। তাদের কৃতিত্বের তুলনা করা যায় না।

৯। প্রশ্নপত্রে প্রশ্নগুলো এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে করে, প্রশ্নগুলো সহজ থেকে কঠিন ক্রমানুসারে থাকে। অন্যথায় পরীক্ষার্থীর মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে।

১০। উন্নতমানের প্রশ্নপত্র তৈরির সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তির অবশ্যই নিজ নিজ বিষয়ে জ্ঞান, দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ থাকতে হবে।

১১। রচনামূলক প্রশ্নপত্রের প্রতিটি প্রশ্ন প্রয়োগের মাধ্যমে বাছাই করে দেয়া উচিত।

(খ) নৈর্ব্যক্তিক নম্বর দান

রচনামূলক পরীক্ষায় নম্বর দানে নৈর্ব্যক্তিকতা বজায় রাখতে প্রত্যেক পরীক্ষককে নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি নজর রাখতে হবে।

১। প্রশ্নপত্র তৈরি করার সময়ই প্রশ্নকর্তা বা অভীক্ষককে একটি নমুনা উত্তরপত্র তৈরি করা উচিত।

২। প্রতিটি উত্তরপত্র নমুনা উত্তরপত্রের সাথে মিল রেখে মূল্যায়ন করা উচিত।

৩। পক্ষপাতিত্বের অপবাদ থেকে মুক্ত থাকার জন্য একদল পরীক্ষক একত্রে বসে সবগুলো উত্তরপত্রের কেবল একটি প্রশ্নের উত্তর এক এক জন দেখবেন। এভাবে যতটি প্রশ্ন ঠিক ততজন পরীক্ষক নিয়ে এক একটি দল গঠিত হলে পরীক্ষকের পক্ষপাতিত্বের অপবাদ আর থাকবে না।

৪। পরীক্ষার্থীর নাম বা রোল নং না জেনে উত্তরপত্রে নম্বর প্রদান করতে হবে।

৫। অধিক সংখ্যক পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্রের মূল্যায়নের মানদণ্ড ঠিক রাখার জন্য প্রয়োজনবোধে নমুনা উত্তরপত্র বা পূর্বের পরীক্ষিত উত্তরপত্র দেখে নিতে হবে।

৬। যে সকল প্রশ্নে অধিক সংখ্যক তথ্য বর্তমান সেগুলোর তালিকা তৈরি করা উচিত।

৭। নম্বর দেয়া শেষ করে পুনরায় তুলনামূলকভাবে খাতাগুলোর বিচার করা প্রয়োজন।

৮। প্রকাশভঙ্গী বা বর্ণনার চাতুর্যে মুগ্ধ না হয়ে বিষয়বস্তুর জ্ঞান বা প্রয়োগ ইত্যাদি পরীক্ষার উদ্দেশ্যের প্রতি নজর রেখে উত্তরপত্রে নম্বর প্রদান করতে হবে।

৯। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের জন্য একই খাতা একাধিক পরীক্ষকের দেখা উচিত।

১০। মূল্যায়ন সম্পর্কে পরীক্ষকদের সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়। রচনাধর্মী প্রশ্নমালার সবগুলো ত্রুটি সম্পূর্ণরূপে কখনো দূর করা সম্ভব নয়। আর এ জাতীয় প্রশ্নের প্রয়োজনীতাও অস্বীকার করা যায় না। কাজেই যতদূর সম্ভব বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে এর নৈর্ব্যক্তিতার হার বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে।

নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা (Objective Test)

অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা (Objectivity of Test) বৃদ্ধি করতে হবে, অভীক্ষার মধ্যে এমন প্রশ্ন নির্বাচন করতে হবে, যার কেবল নির্দিষ্ট একটি উত্তর থাকে। এ বিষয়ে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন (Objective Question) সহায়তা করে। এ সব প্রশ্নে বা অভীক্ষপদে শিক্ষার্থী এবং পরীক্ষক উভয়েরই ব্যক্তিগত প্রভাব আসার সম্ভবনা থাকে না। এ ধরনের প্রশ্নমালা বা অভীক্ষাকে নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা বলা হয়। নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার ক্ষেত্রে

পরীক্ষার্থীদের স্বাধীনতা এবং উত্তরপত্র পরীক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষকের বিচার বিবেচনা কাজে লাগানোর কোন সুযোগ নেই। অভীক্ষার সাংগঠনিক দিক থেকে কাঠামোগত অবস্থান অত্যন্ত দৃঢ় ও মজবুত। এখানে পরীক্ষার্থীদের কেবল নির্দিষ্ট কয়েকটি শব্দ (Word) প্রয়োগ করে বা কতকগুলো ধারণা নির্বাচন করে উত্তরের কাজটি সম্পন্ন করতে হয়। মনোবিদগণের মতে এ জাতীয় প্রশ্নের দ্বারা শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তুর জ্ঞান সঠিকভাবে পরিমাপ করা সম্ভব। শিক্ষামূলক পরিমাপের ক্ষেত্রে জ্ঞান পরিমাপের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হলে এ জাতীয় প্রশ্নমালা অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য পরিমাপ দিতে পারে। এ জাতীয় অভীক্ষা বা প্রশ্নমালা দ্বারা অনেক বেশি বিস্তৃত ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অধীত জ্ঞানকে পরিমাপ করা সম্ভব।

নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার সুবিধা

১। নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তা বস্তুনিষ্ঠ বা নৈর্ব্যক্তিক।
২। পরীক্ষক বা পরীক্ষার্থীর ব্যক্তি সাপেক্ষতা এ পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।
৩। নম্বর দান পদ্ধতি সহজ ও নির্ভুল এবং পক্ষপাতিত্বের দোষমুক্ত।
৪। অভীক্ষা প্রয়োগে সময় ও পরিশ্রম অনেক কম লাগে।
৫। সমগ্র পাঠ্যসূচি বা পাঠ্যপুস্তক থেকে প্রশ্ন নির্বাচন করা হয়।
৬। শিক্ষার্থীদের অল্প সংখ্যক বাছাই করা প্রশ্ন মুখস্থ করার প্রবণতা থেকে রক্ষা করে।
৭। অভিজ্ঞ অভীক্ষক ছাড়াও যে কেহ নির্ভুলভাবে নম্বর প্রদান করতে পারে।

নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার সুবিধা

১। এ জাতীয় পরীক্ষাতে কেবল তথ্যগত জ্ঞানের পরীক্ষা করা হয়।
২। ভাব, ভাষা, প্রকাশভঙ্গী বা রচনাশৈলীর উপর কোন প্রকার গুরুত্ব দেয়া হয় না।
৩। প্রশ্নপত্র তৈরি করা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।
৪। প্রশ্নপত্র অভিজ্ঞ বা বিশেষজ্ঞ ছাড়া কেহ তৈরি করতে পারে না।
৫। প্রশ্নপত্রের আকার বিরাট হয় বলে ব্যয়বহুল।
৬। অভীক্ষা প্রয়োগে যথেষ্ট দক্ষতা ও পারদর্শিতার প্রয়োজন।
৭। পরীক্ষার্থী স্বাধীনভাবে মতামত বা ভাবপ্রকাশ করতে পারে না।
৮। এ জাতীয় পরীক্ষাতে শিক্ষার্থীর জ্ঞানে সঠিকভাবে পরিমাপ করা সম্ভব হয় না।
৯। অনেক সময় শিক্ষার্থীরা অনুমানের উপর নির্ভর করে উত্তর দিতে সচেষ্ট হয়।
১০। ফলাফলের ব্যাখ্যা বা তুলনা করা সম্ভব হয় না।

উপরে বর্ণিত অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও এ জাতীয় অভীক্ষা প্রচলিত রচনাধর্মী অভীক্ষার চেয়ে অনেক শ্রেয়। কারণ ইহা গতানুগতিক পরীক্ষার চেয়ে অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য, যথার্থ ও বস্তুনিষ্ঠ বা নৈর্ব্যক্তিক। রচনামূলক অভীক্ষা অত্যন্ত বেশি মাত্রায় ব্যক্তিসাপেক্ষ। কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা ঐ দোষ থেকে মুক্ত। রচনাধর্মী অভীক্ষার উন্নতির ক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এ কারণে প্রচলিত গতানুগতিক পদ্ধতির পরিবর্তে এ জাতীয় অভীক্ষার সাহায্যে পরীক্ষা গ্রহণ করলে মূল্যায়ন বা পরিমাপ আরো উন্নত হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বহুল সমালোচিত ও ত্রুটিপূর্ণ পরীক্ষা পদ্ধতির একটা সংস্কার সাধন সম্ভব হবে।

রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার তুলনা

মূল বৈশিষ্ট্য	রচনামূলক প্রশ্ন	নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন
১। শিক্ষাগত ফলশ্রুতি	১। বিষয়বস্তুর জ্ঞান সঠিকভাবে পরিমাপ করতে পারে না। কিন্তু বিষয়বস্তু সমন্বয়ের ক্ষমতা সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা ইত্যাদি পরিমাপ করতে পারে।	১। বিষয়বস্তুর জ্ঞান সঠিক-ভাবে পরিমাপ করতে পারে। কিন্তু বিষয়বস্তুর বিন্যাস সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা, প্রকাশ ভঙ্গি ইত্যাদি পরিমাপ করতে পারে না।
২। প্রশ্ন গঠন	২। প্রশ্ন গঠন করা অপেক্ষাকৃত সহজ।	২। প্রশ্ন গঠন পরিশ্রমসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ।
৩। বিষয়বস্তুর বিস্তৃতি	৩। প্রশ্নের সংখ্যা কম থাকে বলে সম্পূর্ণ পাঠ্যাংশ থেকে প্রশ্ন রচনা করা যায় না।	৩। সমস্ত পাঠ্যাংশ থেকে প্রশ্ন করা সম্ভব। কারণ এ প্রশ্নের সংখ্যা অনেক বেশি থাকে।
৪। শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া	৪। শিক্ষার্থীদের উত্তরের দৈর্ঘ্য নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।	৪। শিক্ষার্থীদের উত্তরের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত।
৫। মান নির্ণয়	৫। মান নির্ণয় করা খুবই দুরূহ, পরিশ্রমসাধ্য এবং এখানে ব্যক্তিগত প্রভাব থাকে।	৫। মাননির্ণয় অপেক্ষাকৃত সহজ ও তাড়াতাড়ি করা যায়।

মূলবৈশিষ্ট্য	রচনামূলক প্রশ্ন	নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন
৬। শিক্ষণ-সহায়তা	৬। রচনামূলক প্রশ্নমালা শিক্ষার্থীদের অংশ বিশেষ বিস্তারিত পাঠে অনুপ্রাণিত করতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা না বুঝে মুখস্ত করে বা পরীক্ষার হলে নকল করতে চেষ্টা করে।	৬। এ জাতীয় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নগুলোর শিক্ষার্থীদের পরোক্ষভাবে বিষয়ের সমগ্র অংশ পাঠে অনুপ্রাণিত করে।

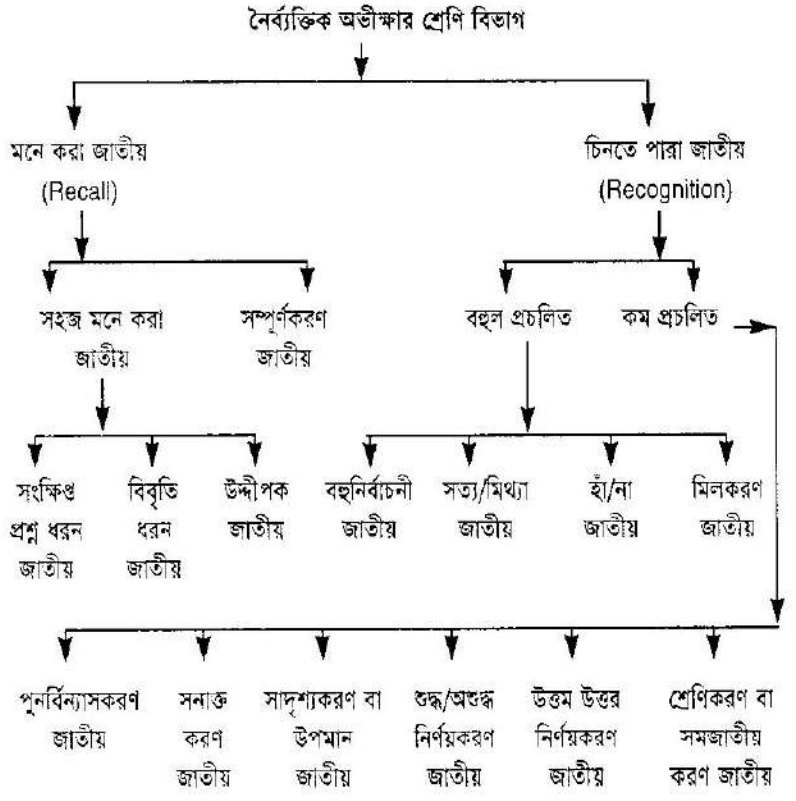

ক) সহজ মনে করা জাতীয় (Simple recall)

কোন কিছু শোনার পর তা কতটুকু মনে থাকে বা অতীতের কোন ঘটনা বা বিষয় ঠিকমত বলতে বা লিখতে পারা যায় কিনা তা জানার জন্য এ জাতীয় অভীক্ষার প্রয়োগ করা হয়। এ জাতীয় অভীক্ষা তিন প্রকারের ঃ

১. সংক্ষিপ্ত উত্তর সম্বলিত প্রশ্ন বা প্রশ্ন ধরনের,

২. বিবৃতি ধরনের এবং

৩. উদ্দীপক জাতীয়

১. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন বা প্রশ্ন ধরনের

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের জ্ঞানমূলক পারদর্শিতা পরিমাপ করা যায়। যাতে শিক্ষার্থী একটি বা দুইটি শব্দ ব্যবহার করে উত্তরটি উপস্থাপন করতে পারে। এখানে অভীক্ষা পদটি সরাসরি প্রশ্নের আকারে থাকে এবং এর কোন উত্তর বা কোন অল্প কথায় লিখা যায়। প্রয়োজন মতে উত্তরটি লিখার জন্য পার্শ্বে একটি নির্দিষ্ট স্থান থাকে।

উদাহরণ ঃ ক. কত খ্রিষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়?

(উত্তর).....

খ. প্রথম সার্ক সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয় ?

উত্তর.....

২. বিবৃতি ধরনের

এ ধরনের অভীক্ষায় কোন কবিতা বা প্রবন্ধ থেকে ২/১টি লাইন উদ্ধৃত করে ত কোথা থেকে নেয়া হয়েছে তা বলতে বলা হয়। যেমন-

"স্বাধীনতা তুমি রবিঠাকুরের অজত কবিতা, অবিনাশী গান" এ উদ্ধৃতিটি কো কবির ও কোন কবিতা থেকে নেয়া হয়েছে?

৩. উদ্দীপক জাতীয়

এ ধরনের অভীক্ষায় এমন প্রশ্ন করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর মাঝে একটা উদ্দীপনা সৃষ্টি করে যেমন -

নিচে তিনজন বৈজ্ঞানিকের নাম দেয়া হলো তাদের বিখ্যাত অবদানের নামও ডান পাশে লিখতে হবে।

বৈজ্ঞানিকের নাম	বিখ্যাত অবদান
ক. নিউটন	ক. ----------
খ. মার্কনি	খ. ----------
গ. আইনস্টাইন	গ. ----------

খ. সম্পূর্ণকরণ জাতীয় (Completion)

সম্পূর্ণকরণ জাতীয় প্রশ্নে সাধারণত একটি অসম্পূর্ণ বিবৃতি দেয়া হয়। উপযুক্ত শব্দ (Word) বা শব্দ সমন্বয় ধারা বিবৃতির অসম্পূর্ণ অংশটি পূর্ণ করে দিতে হয়।

উদাহরণ

১. পৃথিবী একটি ..... ।

২. তাপমাত্রা মাপার জন্য ব্যবহার করা হয় .....।

গ. চিনতে পারা জাতীয়

অতীতে চেনা, জানা বা দেখা কোন ঘটনাকে পুনরায় দেখে চিনে বের করতে বলা হয় যে সব অভীক্ষায় সেগুলোই চিনতে পারা জাতীয়। এ ধরনের অভীক্ষা প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায় ঃ (১) বহুল প্রচলিত ও (২) কম প্রচলিত।

১. **বহুল প্রচলিত ঃ** এ জাতীয় অভীক্ষাকে সাধারণত চার ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে এবং অহরহ যার ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ক. **বহু নির্বাচনী অভীক্ষা ঃ** এ ধরনের অভীক্ষার একটি প্রশ্নের সাধারণত চারটি বা পাঁচটি সম্ভাব্য উত্তর দেয়া থাকে। তার মধ্যে কেবল একটি উত্তরই সঠিক বা সর্বোত্তম। পরীক্ষার্থীদেরকে সঠিক উত্তর বের করতে বলা হয়। যেমন ঃ

প্রশ্নঃ পলাশীর যুদ্ধ কোন সালে সংঘটিত হয়েছিল?

ক) ১৮৫৭

খ) ১৮৬১

গ) ১৭৫৭

ঘ) ১৭৮৫

খ. সত্য/মিথ্যা জাতীয় অভীক্ষা ঃ

এ ধরনের অভীক্ষায় বাক্যটি বা উদ্ধৃতিটির সত্য/মিথ্যা যাচাই করতে বলা হয়। যেমন

১) পৃথিবী চাঁদের চার পাশে ঘুরে। সত্য/মিথ্যা

২) জলের চেয়ে বরফ হাল্কা। সত্য/মিথ্যা

গ. হাঁ/না জাতীয় অভীক্ষা ঃ

সত্য/মিথ্যা জাতীয় অভীক্ষার মতই হাঁ/না জাতীয় অভীক্ষার প্রশ্ন করা হয়ে থাকে। যেমন

১) পদ্মা নদী বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় নদী। হাঁ/না

২) পানির চেয়ে সরিষার তৈলের ঘনত্ব কম। হাঁ/না

ঘ. মিলকরণ জাতীয় অভীক্ষা ঃ

মিলকরণ জাতীয় অভীক্ষা এক ধরনের নির্বাচনী প্রশ্ন। এখানে দু'টি কলামে সম্পূর্ণ প্রশ্নটিকে উপস্থাপন করা হয়। এ দুইটি স্তম্ভের একটিতে থাকে কোন বিবৃতি বা প্রশ্ন অপর স্তম্ভে থাকে ঐ বিবৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ধারণা বা প্রশ্নের উত্তর। পরীক্ষার্থীর কাজ হলো ঠিকমত ১ম কলামের সাথে ২য় কলামের সামঞ্জস্যপূর্ণ সাজানো। যেমন ঃ

১ম কলাম	২য় কলাম
১। কাজী নজরুল ইসলাম	১। সাঁঝের মায়া
২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২। নকসী কাঁথার মাঠ
৩। জসীমউদ্দিন	৩। সঞ্চয়িতা
৪। শামসুর রাহমান	৪। সঞ্চিতা
৫। সুফিয়া কামাল	৫। বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখে
	৬। নিজ বাস ভূমে।

২। কম প্রচলিত ঃ

কম প্রচলিত অভীক্ষা সাধারণত ছয় ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। এগুলোর ব্যবহার বহুল প্রচলিত না হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে এগুলোর ব্যবহার করা হয় যেমন ঃ

ক) পূণর্বিন্যাসকরণ জাতীয় অভীক্ষা ঃ

এ ধরনের অভীক্ষায় একটি বাক্যের শব্দগুলোকে এলোমেলোভাবে সাজিয়ে রেখে পরীক্ষার্থীদেরকে সঠিকভাবে সাজাতে বলা হয়। যেমন ঃ মইন বাড়িতে সাথে মারামারি কাহারও করে না।

খ) সাদৃশকরণ জাতীয় অভীক্ষা ঃ

এ জাতীয় অভীক্ষাতে সাধারণত কোন প্রদত্ত তথ্যের জ্ঞান থেকে নতুন পরিস্থিতিতে তা প্রয়োগ করার ক্ষমতা যাচাই করা হয়।

উদাহরণ

১) দিনের সাথে রাতের যে সম্পর্ক আলোর সাথে --- সে সম্পর্ক।

২) পিতার সঙ্গে পুত্রের যে সম্বন্ধ, শিক্ষকের সঙ্গে --- সে সম্পর্ক।

গ) সনাক্তকরণ জাতীয় অভীক্ষা ঃ

এ ধরনের অভীক্ষায় প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি আরও কয়েকটি বেঠিক উত্তর মিশিয়ে দিয়ে সঠিক উত্তরটি বের করতে বলা হয়। যেমন ঃ

১) বাংলাদেশের প্রথম পররাষ্ট্র মন্ত্রী হলেন ---

আবদুস সামাদ আজাদ/খন্দাকার মোশতাক আহমদ/এ.এইচ.এম কামরুজ্জামান/ মনসুর আলী।

২) বায়ুর চাপ পরিমাপক যন্ত্রের নাম হল থার্মোমিটার / ল্যাকটোমিটার / ব্যারোমিটার/ ক্যালোরিমিটার।

ঘ) শুদ্ধ/অশুদ্ধ নির্ণয়করণ জাতীয় ঃ

এ জাতীয় অভীক্ষার এমন একটি বাক্য দেয়া থাকে যা শুদ্ধ বা অশুদ্ধ যে কোন একটি উত্তর সঠিক হবে। পরীক্ষার্থীদেরকে যেটি সঠিক তার নিচে দাগ দেয়া বা ডান পাশে টিক চিহ্ন দিতে বলা হয়। যেমন ঃ

১) নারায়ণগঞ্জ বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। শুদ্ধ/অশুদ্ধ।

২) সীসা লোহা অপেক্ষা ভারি। শুদ্ধ/অশুদ্ধ।

ঙ) উত্তম উত্তর নির্ণয়করণ অভীক্ষা ঃ

এ জাতীয় অভীক্ষার একটি প্রশ্নের একাধিক সম্ভাব্য উত্তর দেয়া থাকে। যে উত্তরটি সর্বাধিক যুক্তিসঙ্গত তার ডান পাশে টিক চিহ্ন দিতে বলা হয়। যেমন ঃ

১) কোন কারণে ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী ঠিক করা হয়েছে।

ক) অবস্থান

খ) জলবায়ু

গ) যাতায়াত ব্যবস্থা

ঘ) জনসংখ্যা

২) বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গতি দ্রুত ত্বরান্বিত করতে সবচেয়ে উপযোগী ব্যবস্থা কোনটি?

ক) বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার,

খ) জনসংখ্যা সীমিতকরণ

গ) কৃষিজসম্পদ বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচি

ঘ) শিল্প ক্ষেত্রের অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করা।

চ) শ্রেণিকরণ বা সমজাতীয়করণ জাতীয় অভীক্ষা ঃ

এ ধরনের অভীক্ষার কয়েকটি সমশ্রেণিভুক্ত শব্দের সাথে একটি অসমশ্রেণিভুক্ত শব্দ দিয়ে বলা হয় কোন শব্দটি সমশ্রেণিভুক্ত নয় বা কোনটি অন্য রকম? (যেটি সমশ্রেণিভুক্ত নয়, সেটি বাদ দিতে হবে)

১) ঢাকা, চট্টগ্রাম, পদ্মা, খুলনা।

২) পরীক্ষার্থী, পরীক্ষক, অডিটর, সমীক্ষক।

সম্পূর্ণকরণ বা শূন্যস্থান পূরণ জাতীয় অভীক্ষা

এ জাতীয় প্রশ্নে কতকগুলো অসম্পূর্ণ বাক্য বা ধারণা উপস্থাপন করা হয়। ঐ সকল অসম্পূর্ণ অংশগুলোকে পরীক্ষকদের তার অভিজ্ঞতা বা বিষয়ের অধীত জ্ঞান থেকে পূর্ণ করা হয়। এটা এক প্রকার প্রশ্নে কতকগুলো বাক্য বা অনুচ্ছেদ দেয়া হয় যা থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ, বাক্য বাক্যাংশ অথবা শব্দগুচ্ছ বাদ রাখা হয়। ঐ শূন্যস্থানগুলোই পূরণ করতে দেয়া হয়। বাক্যগুলো সম্পর্কযুক্ত অথবা সম্পর্কহীন অনুচ্ছেদ হতে পারে। এখানে শিক্ষার্থীর পুনরুদ্রেক বা মনে করা (Recall) প্রক্রিয়া বিশেষভাবে কাজ করে।

উদাহরণ

১) ১৯৭১, সনের --- ডিসেম্বর বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়।

২) পৃথিবী একটি ----।

৩) বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য তৎকালীন পূর্ব বাংলার ছাত্র জনতা ---- সনের ---- শে ফেব্রুয়ারী যে ঐতিহাসিক আন্দোলনের সফলতা অর্জন করেন তা ---- আন্দোলন নামে বিখ্যাত বা স্মরণীয়।

৪) ঢাকা ---- নদীর তীরে অবস্থিত।

বৈশিষ্ট্য ঃ

১) ভাব ও ভাষার উপর শিক্ষার্থীদের কতখানি দক্ষতা রয়েছে তা যাচাই করা।

২) শিক্ষার্থীদের সাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার পরিমাপ করা।

সম্পূর্ণকরণ বা শূণ্যস্থান পূরণ প্রশ্ন রচনার নীতি

১) সম্পূর্ণকরণ প্রশ্নের বিবৃতিতে একটি মাত্র অসম্পূর্ণ অংশ থাকা বাঞ্ছীয়। আবার এ অসম্পূর্ণ অংশ বা শূণ্যস্থান যাতে বিবৃতিটির শেষে থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

২) সঠিক উত্তর পাওয়ার জন্য যথোপযুক্ত বাক্যমালা দ্বারা অভীক্ষা রচনা করতে হবে।

৩) উত্তরগুলোকে এমনভাবে সজ্জিত করতে হবে যেন সহজে নম্বর প্রদান করা যায়।

৪) প্রশ্নের শূণ্যস্থানগুলো যাতে একই দৈর্ঘ্য সম্পন্ন থাকে সেদিকে নজর রাখা উচিত।

৫) অনির্দিষ্ট বাক্য গঠন পরিহার করা উচিত।

৬) তুচ্ছ কোন শব্দ, তারিখ বা বাক্যাংশ বাদ না রেখে অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাদ দিয়ে প্রশ্ন তৈরি করা উচিত।

৭) সরাসরি পাঠ্য বই এর ভাষা দিয়ে বা বাক্য তুলে দিয়ে এ ধরনের অভীক্ষা তৈরি করা ঠিক নয়।

৮) প্রশ্ন করার সাথে উত্তরমালাও তৈরি রাখা উচিত।

৯) মাত্রাতিরিক্ত বাক্যাংশ শূন্য রেখে প্রশ্ন রচনা করা ঠিক নয়।

বহু নির্বাচনী অভীক্ষা

এ জাতীয় অভীক্ষার প্রশ্নমালার মূলত দু'টি অংশ থাকে, এক অংশে থাকে প্রশ্ন অপর অংশে থাকে সম্ভাব্য উত্তরমালার তালিকা। প্রত্যেক প্রশ্ন দ্বারা, প্রশ্নসূচক প্রশ্নের দ্বারা, অথবা অসম্পূর্ণ বাক্যের দ্বারা অথবা বাক্যের শেষাংশ বাদ দিয়ে প্রশ্ন উপস্থাপন করা হয়। প্রশ্নের এ অংশকে প্রশ্নের মুখ্য অংশ বলা হয়। দ্বিতীয় অংশে উত্তরমালা দেয়া থাকে, এদের একটিকে মাত্র যথার্থ উত্তর বা অন্যান্য উত্তরগুলো হতে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ উত্তর এবং অন্যান্য উত্তরগুলো সম্ভাব্য কিন্তু সঠিক উত্তর নয়। প্রত্যেকটি প্রশ্নে কেবলমাত্র একটি উত্তরই সঠিক থাকবে।

সুবিধা ঃ বহু নির্বাচনী অভীক্ষা সকল রকম নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কার্যকর। আজকাল শিক্ষামূলক ও মনোবৈজ্ঞানিক পরিমাপের ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। উচ্চতর মানসিক বৃত্তিগুলো মূল্যায়নের জন্যও এ জাতীয় প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হয়। শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব মূল্যায়নে ইহা ব্যবহৃত হয়। যে কোন প্রশ্নের উত্তরমালা যথাযথ বিন্যস্ত করে এর কাঠিন্য মাত্রা (Difficulty Value) এবং ব্যবধান মাত্রা (Discriminative Value) নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এ জাতীয় প্রশ্ন দ্বারা শিক্ষার্থীর জ্ঞান, উপলব্ধি, জ্ঞানের প্রয়োগ তথা উচ্চতর মানসিক স্তরের প্রয়োগ পরীক্ষা করা যায়। এ ধরনের প্রশ্নে শিক্ষার্থীর মনে অনুরাগ সৃষ্টি হয় এবং চিন্তার উদ্রেক হয়। উত্তরপত্রে দ্রুত ও সহজে নম্বর প্রদান করা যায়। সাধারণত প্রশ্নপত্রের প্রতিটি সঠিক উত্তরের জন্য একই নম্বর নির্ধারণ করলে উত্তরপত্রে নম্বর প্রদানের কাজটি সহজ হয়। নম্বর দেয়ার জন্য একটি উত্তরপত্র (Scoring key) থাকে। কোন কোন পরীক্ষার্থী আন্দাজে উত্তর দিলে, নিচের সূত্রের সাহায্যে সংশোধন করা হয়।

এখানে,

$$S = R - \frac{W}{O - ১}$$

S = সংশোধিত নম্বর

R = নির্ভুল উত্তরের সংখ্যা

W = ভুল উত্তরের সংখ্যা

O = প্রত্যেক প্রশ্নের সাথে প্রদত্ত সম্ভাব্য উত্তরের সংখ্যা

অসুবিধা ঃ বহু নির্বাচনী অভীক্ষায় প্রশ্নমালা প্রস্তুত করা কঠিন। একই প্রকৃতির চার পাঁচটি সম্ভাব্য উত্তর খুঁজে বের করা বেশ কষ্টের কাজ। উপযুক্ত যত্নসহ এ ধরনের প্রশ্ন রচনা না করলে সঠিক উত্তরগুলো বাছাই করা পরীক্ষার্থীদের কাছে সহজ হয়ে পড়ে।

উদাহরণ

১। কোনটি সূর্য্যের নিকটতম গ্রহ?

ক. বুধ, খ. শুক্র, গ. পৃথিবী, ঘ. মঙ্গল।

২। নিম্নের কোনটি রাসায়নিক যৌগ?

ক. অক্সিজেন, খ. হাইড্রোজেন, গ. এমোনিয়া, ঘ. নাইট্রোজেন।

৩। ১৬ এর ২৫% কত?

ক. ২, খ. ৪, গ. ৬, ঘ. ৮।

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন গঠনের নীতি

১. বহু নির্বাচনী অভীক্ষার মূল কাঠামো (Stem) অর্থপূর্ণ হওয়া উচিত। প্রশ্ন এমনভাবে করা উচিত যাতে করে তার মূল অংশটি বিকল্প উত্তরগুলো ছাড়াই অর্থপূর্ণ হয়ে উঠে।

২. প্রশ্নের মূল অংশে (Stem) যত বেশি তথ্য থাকে, তত ভাল। তবে অতিরিক্ত অপ্রয়োজনীয় যেন কিছু না থাকে। সে দিকে নজর রাখতে হবে।

৩. বিশেষভাবে প্রয়োজন না হলে প্রশ্নের মূল অংশে নাবোধক বাক্য ব্যবহার করা ঠিক নয়।

৪. ব্যাকরণগত দিক থেকে উত্তরমালা শুদ্ধ থাকতে হবে।

৫. প্রশ্ন এবং উত্তরে একই শব্দ ব্যবহার করা ঠিক নয়।

৬. প্রশ্নের উত্তরগুলোকে বিশেষ কোন নিয়মে না সাজিয়ে এলোমেলোভাবে সাজাতে হবে যাতে পরীক্ষার্থীরা বিশেষ কোনক্রম বা ধারা অনুযায়ী উত্তর দেয়া থেকে বিরত থাকে।

৭. উত্তরগুলো এমনভাবে রচনা করতে হবে যেন সবগুলো সম্ভাব্য উত্তর হতে পারে। এরূপ না হলে পরীক্ষার্থীদের পক্ষে খুব সহজেই উত্তরটি আন্দাজ করে বাছাই করার সুযোগ থেকে যাবে।

৮. কোন সংজ্ঞার ধারণা মূল্যায়ন করতে হলে প্রথমে শব্দটি এবং পরে সংজ্ঞাটি দেয়াই সমীচীন। এতে শিক্ষার্থীদের মুখস্থ করার প্রবণতা হ্রাস পায়।

৯. উত্তরদানের সহজ পদ্ধতি ব্যবহার করলে একটি নির্দিষ্ট স্থানে উত্তর সংখ্যা বা উত্তর অক্ষরে লিখে দেয়ার রীতি আজকাল চালু আছে।

১০. উচ্চতর মানসিক বৃত্তিগুলোর মূল্যায়ন করতে হলে সম্ভাব্য উত্তর অধিকতর সাদৃশ্য করে লিখতে হবে।

১১. অনেক সময় বহুনির্বাচনী অভীক্ষার প্রশ্নে উত্তরের ক্ষেত্রে "কোনটি নয় বা সবগুলোই" ইত্যাদি বিকল্প সম্ভাব্য উত্তর ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু এর সংখ্যা বেশি হবে না।

১২. যে সকল প্রশ্ন দ্বারা অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ ক্ষমতা বা তাৎপর্য নির্ণয়ের ক্ষমতা পরিমাপ করতে হবে। সেখানে প্রশ্নের মধ্যে নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে।

সত্য মিথ্যা অভীক্ষা

এ ধরনের প্রশ্নে একটি নিদিষ্ট সম্পূর্ণ বিবৃতি থাকে। বিবৃতিটি সত্য বা মিথ্যা ভুল বা নির্ভুল তা পরীক্ষার্থীদের নির্ধারণ করতে হয়।

উদাহরণ	১। ৩২ এর ৫০% হলো ৮।	সত্য/মিথ্যা
	২। তিমি স্তন্যপায়ী প্রাণী।	সত্য/মিথ্যা
	৩। ১৮৫৭ সনে পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়।	সত্য/মিথ্যা

সুবিধা ঃ এ জাতীয় প্রশ্ন রচনা করা সহজ, উত্তরপত্রে নম্বর দেয়াও খুবই সহজ এবং নৈর্ব্যক্তিক। প্রায় সব বিষয়েই এ ধরনের অভীক্ষা ব্যবহৃত হয়। শ্রেণিকক্ষের পরিবেশে এ ধরনের প্রশ্ন অত্যন্ত উপযোগী।

অসুবিধা ঃ এ ধরনের প্রশ্নমালার আন্দাজে উত্তর দেয়ার সম্ভাবনা বেশি। অবশ্য শুদ্ধিপত্র ব্যবহার করলে এ সম্ভাবনার কুফলরোধ করা যায়।

বৈশিষ্ট্য ঃ ১। শিক্ষার্থীদের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির সাথে আগ্রহ সৃষ্টি করে পাঠে প্রলুব্ধ করা যায়।

২। বুদ্ধিমত্তার সাথে সাধারণ জ্ঞানের প্রয়োগের সহায়তা করে।

অভীক্ষা গঠনের নীতি

১ শুদ্ধ উত্তর নির্ণয়ে সাহায্য করে এরূপ কোন ইঙ্গিত দেয়া ঠিক নয়।

২ অসামঞ্জস্য সংখ্যক হাঁ বা না বাক্য ব্যবহার করা যাবে না।

৩। পাঠ্যপুস্তকের ভাষা হুবহু তুলে দেয়া যাবে না।

৪। ব্যাকরণগত ত্রুটি থাকা ঠিক নয়।

৫। অনিশ্চিত বাক্য ব্যবহার করা যাবে না।

৬। প্রশ্নের ভাষা সহজ ও সরল হতে হবে।

৭। উত্তর দেয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান ঠিক করে দিতে হবে।

মিলকরণ বা সামঞ্জস্য বিধান অভীক্ষা

এ ধরনের অভীক্ষার প্রশ্নগুলো দুই কলামে সাজানো থাকে। প্রথম কলামে প্রশ্নগুলো এবং দ্বিতীয় কলামে উত্তরগুলো এলোমেলোভাবে সাজানো থাকে। শিক্ষার্থীরা নির্দেশিত ছকে এক কলামের প্রশ্নমালাকে অন্য কলামের উত্তর মালার সাথে জোড় মিলাবে।

বৈশিষ্ট্য

নানা রকম সাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার জন্য শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করা হয়। সংযোগমূলক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা হয়।

উদাহরণ ঃ বাম কলামের দেশের সাথে ডান কলামের সে দেশের প্রচলিত মুদ্রার নামের সাথে মিল করুন।

১. বাংলাদেশ	১. ইয়েন
২. জাপান	২. কিয়াট
৩. বার্মা	৩. টাকা
৪. সৌদি আরব	৪. ডলার
৫. সুইডেন	৫. দিনার
৬. চিন	৬. রুবল
৭. ফ্রান্স	৭. রিয়াল
৮. নেদারল্যান্ড	৮. মার্ক
	৯. ফ্রাংক
	১০. গিল্ডার
	১১. উয়ান
	১২. রুপি

প্রশ্নমালা রচনা নীতি

১। একটি সামঞ্জস্য বিধান প্রশ্নে বিষয়গুলো যাতে সমরূপ হয়, সেদিকে নজর দেয়া দরকার।

২। জোড়ের প্রত্যেক সদস্যকে বার বার পরীক্ষা করে দেখতে হবে যাতে করে প্রশ্নের ধারায় কোন সংকেত না থাকে।

৩। প্রশ্নমালার প্রথম কলামের চেয়ে দ্বিতীয় কলাম বড় করে নির্বাচন করতে হবে।

৪। জোড়ের সম্পর্ক মিলাতে গিয়ে কোন কোন ভিত্তিতে মিলাবে, তা যেন উল্লেখ থাকে।

৫। একটি প্রশ্ন একই পৃষ্ঠায় থাকা বাঞ্ছনীয়। উপরের খোজে বার বার পৃষ্ঠা উল্টানো বিরক্তিকর এবং সময় সাপেক্ষ।

৬। একটি প্রশ্নের কোন কলামে পাঁচটির কম পনেরটির বেশি তথ্য যেন সরবরাহ করা না হয়।

অনুশীলনী ৩.১

১। শিক্ষামূলক অভীক্ষা বলতে কি বোঝেন?

২। রচনামূলক অভীক্ষা বলতে কি বোঝেন? এর বৈশিষ্ট্যগুলো সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

৩। সুঅভীক্ষার বৈশিষ্ট্যাবলীর প্রেক্ষিতে রচনামূলক অভীক্ষার ত্রুটি বা বিচ্যুতি আলোচনা করুন এবং কিভাবে উন্নয়ন সাধন করা যায় তা লিখুন।

৪। বিভিন্ন প্রকার নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা ছকের সাহায্য দেখিয়ে সবগুলোর একটি উদাহরণ লিখুন।

৫। শূন্যস্থান পূরণ বা সম্পূর্ণকরণ অভীক্ষা কি? এর সুবিধা অসুবিধা বর্ণনা করুণ।

৬। বহু নির্বাচনী অভীক্ষা বলতে কি বোঝেন? ইহা গঠন করার নীতি বর্ণনা করুন। ইহার সুবিধা অসুবিধাগুলো লিখুন।

৭। আপনার পছন্দ মত বিদ্যালয়ের একটি বিষয়ের উপর চারটি সম্ভাব্য উত্তর বিশিষ্ট ৫০টি বহু নির্বাচনী অভীক্ষা তৈরি করুন।

৮। টীকা লিখুন ঃ

ক. মৌখিক অভীক্ষা খ. মিলকরণ অভীক্ষা গ. সত্য/মিথ্যা অভীক্ষা।

৯ রচনামূলক অভীক্ষা ও নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা উভয়ের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

১০ সুত্রভীক্ষার বৈশিষ্ট্যাবলীর প্রেক্ষিতে রচনামূলক পরীক্ষার ত্রুটিসমূহ আলোচনা করুন। বর্তমান এস.এস.সি. পরীক্ষার উন্নতিকল্পে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়? উক্ত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের মাধ্যমে শতকরা পঞ্চাশ নম্বরের মূল্যায়নের ব্যবস্থা করলে কি কি সুফল দেখা দিতে পারে ব্যাখ্যা করুন।

উন্নত মানসিক প্রক্রিয়া পরিমাপক অভীক্ষা
(Test of higher mental process)

শিক্ষণ ও শিখনের প্রভাবে একদিকে যেমন শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়, তেমনি অন্যদিক তার আগ্রহের ক্ষেত্র বিস্তৃত হয় চিন্তন প্রক্রিয়া সক্রিয় হয়ে উঠে। তখন তার পাঠ্যবিষয় কেন্দ্রিক জ্ঞান, বোধগম্যতা ও অনুধাবন শক্তি অধীত জ্ঞানের প্রয়োগ, অধীত জ্ঞানের মাত্রা সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ বা মূল্যায়ন করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে মনোবিদ বেঞ্জামিন ব্লুম (Benjamin Bloom) এর জ্ঞানমূলক স্তরের উদ্দেশ্যাবলী পরিমাপ করতে হচ্ছে। এখানে জ্ঞান- পরিমাপক, উপলব্দি পরিমাপক, প্রয়োগক্ষমতা পরিমাপক এবং উচ্চতর প্রয়োগ ক্ষমতা পরিমাপক এ চার প্রকারের অভীক্ষার নমুনা দেখা হচ্ছে। উচ্চতর প্রয়োগ ক্ষমতা পরিমাপক অভীক্ষার ক্ষেত্রে সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন এ তিন মানসিক স্তরকে একত্রে সম্মিলিতভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে।

(ক) জ্ঞান (Knowledge) পরিমাপক অভীক্ষা

জ্ঞান পরিমাপক অভীক্ষা বলতে এমন একটি অভীক্ষা বোঝায় যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর যে সকল আচরণবিধি অর্থাৎ কোন ধারণা বস্তু বা বিষয়কে পুনরুল্লেখ (Recall) এবং সনাক্তকরণ (Recognition) দ্বারা কতটুকু স্মরন রাখতে সক্ষম হয়েছে সে পরিমাপ এ ক্ষেত্রে সংগৃহীত বিভিন্ন তথ্যের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন এবং বিচার বিশ্লেষণই মূলকথা। প্রকারান্তরে বিমূর্ত এবং সার্বজনীন বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন বলতে বিভিন্ন তথ্যের মধ্যে অন্তঃস্থিত সম্পর্ক এবং ধারা নির্ণয় ও তার তথ্যাবলীকে একত্রিত করে বিন্যস্ত করার শক্তি বোঝাবে।

উদাহরণ

১) কোনটি অন্যাগুলো থেকে উপাদানগতভাবে আলাদা?

ক. বাতাস, খ. পানি, গ. লবণ, ঘ. চুন।

২) নবাব সিরাজ উদ্দৌলার রাজধানী যে স্থানে ছিল তার নাম কি?

ক. কলিকাতা, খ. সোনারগাঁও, গ. মুর্শিদাবাদ, ঘ. পলাশী।

৩) কোনটি জৈব পদার্থ?

ক. চুন, খ. বালি, গ. লবণ, ঘ. স্পিরিট।

খ) অনুধাবন শক্তি (Comprehension or Understanding) পরিমাপক অভী

অনুবাদকরণ ঃ অনুবাদকরণ বলতে বোঝায় বিমূর্ত ধারণাকে সহজভাবে বাস্তব মূর্ত উদাহরণের সাহায্যে প্রকাশ করা। কোন সংজ্ঞাকে সহজ ভাষায় প্রকাশ করা কোন ধারণাকে ব্যাখ্যা করা ইত্যাদিকে বোঝাবে।

ব্যাখ্যাকরণ ও অনুমিতিকরণ

কোন ছক বা লেখা থেকে তথ্যের ব্যাখ্যা ও অনুমিতি করা যেতে পারে। সম্ভাব্য পরিমাণ, জনসংখ্যার অভিক্ষেপ ক্রয় বিক্রয় সম্পর্ক সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করা এ ধরে অভীক্ষার স্তর বোঝাবে।

উদাহরণ

১। একটি পেরেকের চর্তুদিকে তার পেচিয়ে তড়িৎ চুম্বক তৈরি করা হলো। আ তার পেচানো হলে কি ঘটবে।

ক. চুম্বকটি আরো বেশি শক্তিশালী হবে।

খ. চুম্বকটি আরো বেশি দুর্বল হয়ে পড়বে।

গ. চুম্বকটি কর্মক্ষম করতে ব্যাটারি দরকার।

ঘ. পেরেকটি বেশ গরম হবে।

২। 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতায় কবি স্বাধীনতাকে মুক্তি সেনার চোখের কোন বি দিকটির সাথে তুলনা করছেন?

ক. মনি খ. চাহনি গ. তারা ঘ. ঝিলিক।

৩। বর্তমান বাংলাদেশের ১৯৫১ সনে সাড়ে তিনকোটি, ১৯৬১ সনে পাঁচকে ১৯৭১ সনে সাড়ে সাতকোটি এবং ১৯৮৯ সনের সাড়ে দশ কোটি জনসংখ্যা ১৯৯১ সনে বাংলাদেশের সম্ভাব্য জনসংখ্যা কত?

ক. ১১ কোটি খ. ১২ কোটি গ. ১৩ কোটি,ঘ. ১৪ কোটি।

গ) প্রয়োগ ক্ষমতা (Application) পরিমাপক অভীক্ষা ঃ

প্রয়োগ ক্ষমতা দুই রকমের হতে পারে যেমন ঃ মানসিক শক্তির প্রয়োগ এবং শারীরিক শক্তির প্রয়োগ।

উদাহরণ

(১) ১০০ টাকার ১ বৎসরের সুদ ৭ টাকা হলে ৫০০ টাকার ৩ বৎসরের সুদ কত?

ক. ৯০, খ. ১০৫, গ. ১২০ টাকা, ঘ. ১৩৫ টাকা।

২) কারেন্ট $(A) = \frac{\text{পাওয়ার } (W)}{\text{ভোল্টেজ } (V)}$ হলে বা $W = VA$

যখন $A = ২০$ অ্যামপিয়ার এবং $V = ২৫০$ ভোল্ট, তখন $W =$ কত?

ক. ২৫০ ওয়ার্ট খ. ৫০০ ওয়ার্ট গ. ৭৫০ ওয়াট ঘ. ১০০০ ওয়াট।

৩। কোন পরীক্ষার ছাত্র সংখ্যা ৫০ জন, তাদের $Efd^2 = ২০০$ হলে, আদর্শ বিচ্যুতি কত?

ক. ৪ খ. ৩ গ. ২ ঘ. ১ ।

ঘ) উচ্চতর প্রয়োগক্ষমতা পরিমাপক অভীক্ষা (Higher Application)

উদাহরণ

১। কোন বণ্টনের মধ্যবর্তী স্কোরসমূহ অব্যবহৃত রেখে কেবল চরম স্কোরদ্বয়ের নিম্নসীমা ও উচ্চসীমা প্রকাশ করে যে পদ্ধতিতে তা কোনটি?

ক. চতুর্থাংশ বিচ্যুতি খ. আদর্শ বিচ্যুতি গ. গড় বিচ্যুতি ঘ. বিস্তৃতি।

২) ৫, ০, ৩, ০, ২ স্কোরগুচ্ছের আদর্শ বিচ্যুতি কত?

ক. ২.১ খ. ১.৯ গ. ১.৮ ঘ. ১.৭।

৩) কোন অভীক্ষার পদগুলোর প্রশ্ন বা সমস্যার উত্তর বিভিন্নভাবে প্রদান করা হলে এবং পূর্ব নির্ধারিত মান নির্ণয়ের ছক না থাকলে সুঅভীক্ষার কোন বৈশিষ্ট্যটির হ্রাস পাবে।

ক) যথার্থতা খ) নির্ভরযোগ্যতা গ) নৈর্ব্যক্তিকতা ঘ) আদর্শায়ন

উত্তর ঃ - ১ (ঘ) ২ (খ) ও ৩ (গ)

আগ্রহ পরিমাপক অভীক্ষা (Interest test)

কোন একটি বস্তুর মধ্যে কোন একটি কাজ করার সঙ্গে ব্যক্তির এক ধরনের তৃ বা আনন্দের অনুভূতিকে বলা হয় আগ্রহ (Interest)। ব্যক্তির শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূল পরিচালনার জন্য তার কোন বিষয়ে বা কাজে আগ্রহ আছে, তা জানা একান্ত প্রয়োজন মনোবিজ্ঞানীরা শিক্ষাকে আগ্রহ ভিত্তিক করতে মত দিয়েছেন এবং আগ্রহ পরিমাপে নানা উপায় উদ্ভাবন করেছেন।

আগ্রহ নানা কারণে সৃষ্টি হতে পারে যেমন- জৈবিক চাহিদা, মানসিক চাহিদ মনোযোগ, কৌতূহল অনুকরণ সামাজিক রাজনীতি ইত্যাদি যে কোনও কারণের জন আগ্রহ সৃষ্টি হোক না কেন, আগ্রহ সৃষ্টি হলে তা একটি শক্তিশালী মানসিক সংগঠনে রূপ দেয়। আগ্রহ কেবলমাত্র ব্যক্তির মনোযোগকেই নিয়ন্ত্রণ করে না, বরং ব্যক্তি আচরণধারা, প্রেষণা প্রভৃতি সবকিছুতেই আগ্রহ বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। এ জন ব্যক্তির শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক পরিচালনার জন্য তার কোন কোন বিষয়ে বা কা আগ্রহ আছে, তা জানা একান্ত প্রয়োজন। যে কাজ বা বিষয়ে ব্যক্তির আগ্রহের পরিম বেশি সেই কাজ বা বিষয় অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করলে নিঃসন্দেহে সুফল পাও যাবে।

আগ্রহ পরিমাপ করার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো ব্যক্তিকে তার আগ্রহ সম্ব সরাসরি প্রশ্ন করা। কিন্তু এ ধরনের উত্তরগুলো বিভিন্ন কারণে বাস্তবধর্মী বা নির্ভরযো হয় না। যেমন —

১) ছোট ছোট শিশুরা তাদের কোন বিষয়ে কোন কাজে আগ্রহ আছে, তা নি বোঝতে পারে না।

২) তারা যদি কোন কাজ বা বিষয়ের আগ্রহের কথা বলেও থাকে সে কাজ বা বি সম্বন্ধে তাদের জ্ঞানের পরিধি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হতে পারে।

৩) অনেক ছেলে মেয়েরা তাদের অভিভাবক বা শিক্ষকের ইচ্ছানুযায়ী কোন বি বা কাজে আগ্রহ দেখায়।

৪) বিভিন্ন বিষয় বা বৃত্তি সম্বন্ধে যে সমস্ত ধারণা প্রচলিত আছে বা অধিকাংশ লে ঐ সমস্ত বিষয় বা বৃত্তি সম্বন্ধে ধারণা পোষণ করে থাকে। শিশুরা সে সকল ধারণার দ্ব সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়ে থাকে। ফলে অধিকাংশ শিশু, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বা ' তারকারদের আয় সম্বন্ধে একটা ধারনা পেয়ে ঐ বৃত্তিগুলো গ্রহণ করতে চায় বটে, কি প্রকৃতপক্ষে তাদের ঐ সকল পেশাভিত্তিক আগ্রহ বাস্তবে কোন অবদান রাখতে পারে এ কারণেই প্রত্যক্ষভাবে প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে আগ্রহ পরিমাপ পরিহার ক

মনোবিদগণ পরোক্ষ এবং প্রচ্ছন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করছেন। সবচেয়ে সাফল্যজনক অভীক্ষা উদ্ভাবন করেছেন E.K Strong jr. নামক মনোবিজ্ঞানী। তাঁর অভীক্ষাটির নাম হলো Vocational Interest Blank বা VIB. তিনি পাঁচটি অংশে বিভক্ত করে অভীক্ষাটির দ্বারা আগ্রহ নির্ণয় করতে ব্যবস্থা রেখেছেন। ঐ পাঁচটি হলো বৃত্তি, স্কুলপাঠ্য বিষয়সমূহ, আমোদ-প্রমোদ, নানা-রকম কাজ-কর্ম এবং অপরের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যসমূহ এতে প্রত্যেকটি উক্তি বা প্রশ্নের পাশে লেখা পছন্দ, উদাসীন এবং অপছন্দ মতামতের যে কোন একটি উত্তর সংগ্রহের ব্যবস্থা রেখেছেন। যেমন-

প্রশ্ন বা উক্তি	পছন্দ	উদাসীন	অপছন্দ
১. যন্ত্রপাতি দিয়ে কাজকর্ম করা			
২. অংক করা			
৩. সিনেমায় যাওয়া			

অতি সম্প্রতি কুডার (Kuder) নামক একজন মনোবিদ আগ্রহ পরিমাপের একটা অভীক্ষা তৈরি করেছেন। Strong এর অভীক্ষার সাথে এটির অনেক দিক দিয়ে পার্থক্য রয়েছে। এতে শিক্ষার্থীর কতকগুলো ব্যাপক ক্ষেত্রে আগ্রহ পরিমাপের সুবিধা রয়েছে। কুডার (Kuder) তিন ধরনের রেকর্ড তৈরি করেছেন। সেগুলো হলো বৃত্তিমূলক (Vocational), পেশাগত (Occupational), ব্যক্তিগত (Personal)। এ তিন ধরনের রেকর্ডই (Kuder Preference record) ব্যবহৃত পদগুলো বাধ্যতামূলক, প্রত্যেকটি পদে সবচেয়ে বেশি পছন্দ ও সবচেয়ে বেশি অপছন্দ এ দুটির একটি নির্বাচন করতে হয়। কুডার প্রেফারেন্স রেকর্ডের একটি উদাহরণ নিচে দেয়া হলো ঃ

শিশুদের আগ্রহ ঃ

যেটি পছন্দ বা অপছন্দ সেটির ছকে টিক (√) চিহ্ন দাও।

	পছন্দ	অপছন্দ
১। মানুষের চিত্রে রং দেয়া	----------	----------
২। পিয়ানো বাজনা শেখা	----------	----------
৩। শহীদ মিনার পরিদর্শন করা	----------	----------
৪। পানিতে সাঁতার কাঁটা	----------	----------
৫। আলোকচিত্র সংগ্রহ করা	----------	----------

মনোভাবের অভীক্ষা
(Attitude scale)

এক ধরনের আত্মবিবৃতিমূলক কৌশল যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তির, বিশেষ বস্তু ধারণা, পরিস্থিতি ইত্যাদির প্রতি কি পরিমাণ ধনাত্মক বা ঋণাত্মক মনোভাব গড়ে উঠছে তা পরিমাপ করার অভীক্ষাকে মনোভাবের অভীক্ষা (Attitude scale) বলে। মনোভাবকে সাধারণত পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতিতে গুণগত দিক দিয়ে পরিমাপ করা হয়। কিন্তু মনোভাবের অভীক্ষায়, মনোভাবকে পরিমাণগত দিক থেকে পরিমাপ করা হয়। এ জাতীয় অভীক্ষায় স্কোর হিসাবে সংখ্যামান ব্যবহার করা হয়। একটি নির্দিষ্ট ক্রমে কতকগুলো বিবৃতি সাজানো থাকে। সম্পূর্ণ অভীক্ষাকে একটি স্কেলের আকারে বিবৃতিগুলো স্কোর মান অনুযায়ী সাজানো হয়। বিভিন্ন মনোবিদ বিভিন্নভাবে মনোভাবের অভীক্ষা তৈরি করেছেন। এদের মধ্যে তিনটি মৌলিক পদ্ধতি হলো ঃ

১) থার্সস্টোনের পদ্ধতি (Thurstone Method), ২) লিকার্টের পদ্ধতি (Likert's Method) এবং ৩) রেমারের পদ্ধতি (Remmer's Method)। এ জাতীয় কয়েকটি স্কেলের মধ্যে লিকার্ট মনোভাব স্কেলটি স্বতন্ত্র।

লিকার্টের মনোভাব স্কেল

এ পদ্ধতিটিকে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য মনে করা হয়। এতে একটি উক্তির পাঁচটি বিকল্প উত্তর দেয়া থাকে (১) ভীষণভাবে সমর্থন করি (Strongly Agree বা SA), (২) সমর্থন করি (Agree বা A), (৩) অনিশ্চিত (Undecided বা U), (৪) সমর্থন করি না (Disagree বা D) এবং (৫) ভীষণভাবে সমর্থন করি না (Strongly Disagree বা S.D)। এ পাঁচটি বিকল্পের স্কোর হলো ৫, ৪, ৩, ২, এবং ১। লিকার্টের পদ্ধতি অনুসারে নিচে তিনভাবে স্কেলটি দেখানো হলো।

১। বিবৃতি ঃ বিদ্যালয় একটি আনন্দের জায়গা।

স্কেল ঃ নিশ্চয় হ্যাঁ বলা যায় না না আদৌ না

২) বিবৃতি ঃ বিদ্যালয় একটি আনন্দের জায়গা (ধনাত্মক)

৫ ৪ ৩ ২ ১

স্কেল ঃ অবশ্যই হ্যাঁ ঠিকা বলা যায় না না মোটেই না

৩) বিবৃতি ঃ বিদ্যালয়ে যাওয়া মানেই সময় নষ্ট। (ঋণাত্মক)

৫ ৪ ৩ ২ ১

স্কেল ঃ আদৌ না না বলা মুশকিল সত্য অতি সত্য কথা

মনোভাব একটি বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে তৈরি হয়। আবার মনোভাব গঠিত হলে ব্যক্তির আচরণে একটি স্থায়ী ধারা দেখা দেবে। একটি উদাহরণ নিম্নে দেয়া গেল। এরূপ খেলাধূলা, বিজ্ঞান, পরিবার পরিকল্পনা, সাহিত্য, সংস্কৃতি সম্বন্ধে মনোভাব স্কেল গঠন করা যায়।

গণিতের প্রতি মনোভাব

নির্দেশ ঃ নিচে বিবৃতিগুলোর মধ্য দিয়ে গণিতের প্রতি মনোভাব প্রকাশ পাবে। বিবৃতিগুলোর প্রতি মনোভাব পাঁচ পয়েন্ট স্কেলে প্রকাশ করতে হবে।

পয়েন্টগুলো নিম্নরূপ ঃ

(১) দৃঢ়ভাবে সমর্থন করলে (SA), (২) সমর্থন করলে (A), (৩) অনিশ্চিত (U), (৪) সমর্থন না করলে (D) এবং দৃঢ়ভাবে সমর্থন না করলে (SD)। বিবৃতি গুলোর পাশে ফাঁকা জায়গায় বসাতে হবে যথাক্রমে SA, A, U, D, SD, এর যে কোন একটি।

১) গণিতের শ্রেণিকক্ষে আমি সবসময়ে অত্যন্ত অস্বস্থিবোধ করি। .....

২) আমি অঙ্ক করা পছন্দ করি না এবং উহা শিখতে ভয় পাই। .....

৩) আমার কাছে অঙ্ক খুবই আনন্দদায়ক এবং উপভোগ করি। .....

৪) আমার কাছে গণিতের সমস্যা আকর্ষণীয় এবং মজাদার। .....

৫) যখন আমি অঙ্ক কষি তখন আমার মন উদাস হয়ে যায়। আমি কোন কিছু ভাবতে পারি না। .....

৬) গণিতের সমস্যা আমাকে অস্থির, অধৈর্য এবং অস্বাভাবিক করে তোলে। .....

৭) গণিত আমাকে এমন অনুভূতি দেয় যেন আমি সংখ্যার অরণ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলি এবং সেখান থেকে বের হবার পথ খুঁজে পাই না। .....

৮) গণিত এমন একটি বিষয় যা আমি মনে প্রাণে উপভোগ করে থাকি। .....

৯) প্রকৃতপক্ষে আমি গণিত খুবই পছন্দ করি। .....

১০) দৈনন্দিন জীবনে যা কিছু করি, মনে হয় গণিতের এক একটি সমস্যা। .....

১১) গণিত এমন একটি বিদ্যালয় পাঠ্যবিষয় যা আমি সবসময় আগ্রহের সাথে অধ্যয়ন করি। .....

১২) গণিতের কোন সমস্যা সমাধানের কথা চিন্তা করলেই আমি দুর্বল হয়ে পড়ি। .....

১৩) আমি কখনও অঙ্ক পছন্দ করি না। তাই গণিত বিষয়টা আমার কাছে অত্যন্ত আতংকের বিষয়। .....

১৪) অন্য কোন শ্রেণিকক্ষের তুলনায় গণিতের শ্রেণিতে বেশি তৃপ্তি পাই। .....

১৫) দৈনন্দিন কাজে আমি যে সকল বস্তু ব্যবহার করি, তখন আমার মনে হয় ইহা একটি জ্যামিতিক চিত্রের মডেল। .....

১৬) আমি যখন সোজা হয়ে দাঁড়াই, তখন মনে হয়, আমি লম্বভাবে দাঁড়িয়েছি। আমার উভয় পার্শ্বে এক একটি সমকোণ সৃষ্টি হয়েছে। .....

১৭) আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অনেকটাই জ্যামিতির এক একটি চিত্রের মডেল বা আকার। .....

১৮) যখন দোকানে জিনিসপত্র ক্রয় করি, তখন অনেক সময় হিসাবে দোকানীর কাছে ঠকে যাই। .....

১৯) একশত গ্রাম চিনি কিনতে যেয়ে অনেক সময় দেড়গুণ মূল্য দিয়ে ফেলি। হিসাব করে এক কিলোগ্রামের দর থেকে একশো বা দুইশো গ্রামের মূল্য সঠিকভাবে বের করতে পারি না। .....

২০) ঘর বাড়ি নির্মাণ কাজ বা যে কোন ধরনের কাজ এ ব্যবহৃত গাণিতিক সমস্যার প্রয়োগ আমি সহজেই সমাধান করতে পারি। .....

২১) আমার মনে হয় গণিত একটি নির্ভেজাল ও নিখুঁত বিষয় যা সব ক্ষেত্রে সমস্যার সঠিক সিদ্ধান্ত ও দিক নির্দেশনা দেয়। .....

বুদ্ধির অভীক্ষা (Intelligence)

শিক্ষামূলক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পাঠ্যবিষয়ের অধীত জ্ঞান ছাড়াও অন্যান্য মানসিক বৈশিষ্ট্যের বিকাশের হার পরিমাপ করতে হয়। মানসিক বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে বুদ্ধির পরিমাপ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

বুদ্ধির সংজ্ঞা ঃ

বিভিন্ন মনোবিদগণ বুদ্ধির সংজ্ঞা বিভিন্নভাবে দিয়েছেন। বুদ্ধির সংজ্ঞা হিসাবে স্পীয়ারম্যান (Spearman) ও রেক্সনাইটের সংজ্ঞা দুটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ সংজ্ঞা হিসাবে গ্রহণ করা যায়।

স্পীয়ারম্যানের মতে ঃ

বুদ্ধি হলো নিজের মনের প্রক্রিয়াগুলোকে লক্ষ্য করার ক্ষমতা জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সম্বন্ধ আবিষ্কারের ক্ষমতা, পারস্পরিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে কোনটি অনুরূপ বা কোনটি বিপরীত বলতে পারার ক্ষমতা।

রেক্স-নাইটের মতে ঃ

বুদ্ধি হলো কোন লক্ষ্যে পৌছানোর সহায়ক হিসাবে সম্বন্ধমূলক এবং সৃজনমূলক চিন্তন।

বুদ্ধির সাধারণ বৈশিষ্ট্য

১। বুদ্ধি হলো মৌখিক শক্তি বা ক্ষমতা।

২। বুদ্ধি ব্যক্তিকে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বিধানে সাহায্য করে।

৩। বুদ্ধি কোন বস্তুর বা অবস্থার বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ নিরূপণ করে।

৪। অমূর্ত চিন্তন শক্তির এবং চিন্তন শক্তির উন্নত ব্যবহার বুদ্ধির পরিচায়ক।

৫। বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে সমন্বয়সাধিত হয় বুদ্ধির সাহায্যে।

৬। মানসিক কাজ দ্রুত সম্পাদন করা বুদ্ধির জন্যই সম্ভব হয়।

বুদ্ধির অভীক্ষার বিবর্তন

পৃথিবীর প্রথম সফল বুদ্ধির অভীক্ষা তৈরি করার কৃতিত্ব হলো আলফ্রেড বিনে (Alfred Binet) নামক একজন ফরাসী মনোবিদের। তার প্রথম বুদ্ধির অভীক্ষাটি

প্রকাশিত হয় ১৯০৫ সালে। তারপর তিনি নিজেই এটির সংস্কার করে নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেন ১৯০৮ ও ১৯১১ সালে। বিনে ১৯১১ সালে মারা যান। বিনের ১৯১১ সালের অভীক্ষার উপর ভিত্তি করে ১৯১৬ ও ১৯৩৭ সালে দু'টি অভীক্ষা প্রকাশিত হয়। ইহাই ষ্টান্ফোর্ড বিনে স্কেল-১৯১৬ ও ১৯৩৭ নামে পরিচিত। ১৯৬০ সনে আবার উহাদের সংস্করণ বের হয়।

বুদ্ধ্যাঙ্ক বা (Intelligence Quotient বা I. Q)

প্রকৃত বুদ্ধির পরিমাণ জানার জন্য বিনে মানসিক (Mental) বয়স ও সময়গত (Chronological) বয়সের অনুপাত বের করেন। মানসিক বয়সকে (MA) সময়গত বয়সকে (CA) ধরে, বুদ্ধ্যাঙ্ক IQ = $\frac{MA}{CA}$ হয়। কিন্তু এ অনুপাত প্রায়ই ভগ্নাংশ হয়। ভগ্নাংশে এড়াবার জন্য টারম্যান (Terman) তাকে ১০০ দিয়ে গুণ করলেন। বর্তমানে বুদ্ধ্যাঙ্ক নির্ণয়ের সূত্র হলোঃ

$$\text{বুদ্ধ্যাঙ্ক (IQ)} = \frac{\text{মানসিক বয়স (MA)}}{\text{সময়গত বয়স (CA)}} \times 100$$

উদাহরণ ঃ- একটি বালকের সময়গত বয়স ৮ বৎসর এবং মানসিক বয়স ৯ বৎসর। তার বুদ্ধ্যাঙ্ক নির্ণয় করুন।

$$\text{বুদ্ধ্যাঙ্ক (IQ)} = \frac{\text{মানসিক বয়স (MA)}}{\text{সময়গত বয়স (CA)}} \times ১০০ = \frac{৯}{৮} \times ১০০ = ১১২.৫$$

২। একটি বালকের C.A = ৮ বৎসর এবং M.A = ৮ বৎসর IQ=?

$$(IQ) = \frac{MA}{CA} \times ১০০ = \frac{৮}{৮} \times ১০০ = ১০০$$

শিক্ষাঙ্ক (Educational Quotient)

বুদ্ধ্যাঙ্কের মত শিক্ষামূলক বয়স থেকে বের করা হয়,

$$\text{শিক্ষাঙ্ক (E.Q)} = \frac{EA}{CA} \times ১০০$$

এখানে EA = শিক্ষামূলক বয়স, CA = সময়গত বয়স।

আবার অর্জনাঙ্ক (Achievement Quotient) অনুরূপভাবে বের করা যায়।

$$\text{অর্জনাঙ্ক (EQ)} = \frac{EA}{MA} \times ১০০$$

এখানে EA = শিক্ষামূলক বয়স, MA = মানসিক বয়স।

বুদ্ধ্যাঙ্কের শ্রেণি বিন্যাস

বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী টারম্যান অসংখ্য শিশুর পরীক্ষার পর নিম্নরূপ বুদ্ধ্যাঙ্ক বিতৃতির উল্লেখ করেছেন।

বুদ্ধ্যাঙ্ক	শ্রেণি	শতকরা হার
১৪০ এবং উপরে	অতিমানব	১
১৩০ থেকে ১৪০	অতি প্রতিভাবান	৬
১১০ থেকে ১২০	প্রতিভাবান	১৩
৯০ থেকে ১১০	স্বাভাবিক বুদ্ধিমান	৬০
৮০ থেকে ৯০	স্বল্প বুদ্ধি	১৩
৭০ থেকে ৮০	প্রান্তীয় স্বল্প বুদ্ধি	৬
৫০ থেকে ৭০	মেরোন ০.৭৫	
২০ থেকে ৫০	ইমবেবাইল ০.১৯ ক্ষীণ বুদ্ধি	১
২০ এর নিচে	ইডিয়ট ০.০৬	
	১.০০	১০০

বুদ্ধির বৃদ্ধি

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি বাড়ে। কিন্তু একটা সীমা আছে। সাধারণত ৫/৬ বছরের পর থেকে বুদ্ধি দ্রুত হারে বাড়ে। বৃদ্ধি ১৩/১৪ বৎসর পর্যন্ত। ১৬ বৎসরের মানসিক পরিণতিই (MA) হচ্ছে সাধারণ সুস্থ মানুষের বুদ্ধির শেষ সীমা।

ব্যক্তিসত্তার অভীক্ষা (Personality test)

আধুনিককালে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে গেলেই ব্যক্তিসত্তার কথা বলতে হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্যে পৌঁছানো মানে ব্যক্তিসত্তার বিকাশ সাধন করা। এ কারণে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার বিকাশ পরিমাপ করতে হচ্ছে। বিভিন্ন মনোবিদগণ বা ব্যক্তিসত্তা বিকাশের নানা প্রকারের পরিমাপ কৌশল ও অভীক্ষা উদ্ভাবন করেছেন। বর্তমান যুগে ব্যক্তিত্ব পরিমাপের জন্য যে সমস্ত পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে, তার মধ্যে কতগুলো নিচে দেয়া হল।

সাক্ষাৎকার (Interview)

ব্যক্তির সামনা সামনি বসে তার অভ্যন্তরীণ প্রকৃতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে তার কা থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করার নাম হল সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়ন্ত্রিত অনিয়ন্ত্রিত এ দু'ভাগে হতে পারে। এ পদ্ধতিতে মূলত ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ এব নৈর্ব্যক্তিক তাৎপর্য নির্ণয়ের উপর নির্ভর করে। সাক্ষাৎকারে, পরীক্ষার্থী এবং পরীক্ষক উভয়ের দিক থেকে ত্রুটি আসা সম্ভব। পরীক্ষার্থী ইচ্ছা করলে নিজের সম্পর্কে অনেক তথ্য গোপন রাখতে পারে এবং ভুল তথ্য পরিবেশন করতে পারে। আবার পরীক্ষক ব্যক্তিগত মানসিকতার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন।

২) কেস স্টাডি পদ্ধতি (Case study method)

এ পদ্ধতি অনুযায়ী ব্যক্তির অতীত আচরণ, শৈশবকালীন অভিজ্ঞতা, অভ্যাস বংশগত বৈশিষ্ট্য, সামাজিক পরিবেশ, গৃহ পরিবেশ, বন্ধু বান্ধব ও প্রতিবেশি, শিক্ষ জীবনের গতিধারা প্রভৃতি নিরপেক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এবং এ তথ্যের উপর ভিত্তি করে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করতে চেষ্টা করা হয়। এ পদ্ধতি সাধারণত মানসিক বিকারগ্রস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অনুসরণ করা হয়।

৩) রেটিং স্কেল (Rating Scale)

কোন একজন ব্যক্তির গুণ বৈশিষ্ট্য বা কার্যাবলি সম্পর্কে পর্যবেক্ষণের মতামত ব ফলাফলকে একটি নির্দিষ্ট মাত্রা অনুযায়ী সুসংহতরূপে প্রকাশ করার একটি বিশেষ পদ্ধতিকে রেটিং স্কেল বলে। এ পদ্ধতিতে ব্যক্তির কোন একটি বিশেষগুণ বা বৈশিষ্ট্যর সঠিক পরিমাপ নির্ণয় করার জন্য তার সেই গুণ বা বৈশিষ্ট্যটি ব্যক্তির পরিসর রেখার ঠিক কোন জায়গাতে অবস্থিত তা দেখা যায়। একেই স্কেল বলে। সাধারণত দু'টি বিপরীত গুণকে দুই প্রান্তে রেখে স্কেল তৈরি করা হয়। যেমন -

বিবৃতি ঃ লোকটি অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে চায়।

রেটিং স্কেল ঃ ১।	২।	৩।	৪।	৫।
হাঁ সব	হাঁ প্রায়ই	বিশেষ বিশেষ	না প্রায়ই	না কখনও
সময়	চায়	ক্ষেত্রে চায়	চায় না	চায় না

অভীক্ষা গঠনের সাধারণ নীতিমালা

আমাদের দেশের অধিকাংশ শ্রেণি শিক্ষকের প্রশ্নপত্র তৈরি করা সম্পর্কে কোন প্রশিক্ষণ নেই। মোটামুটি সন্তোষজনক প্রশ্নপত্র তৈরি করতে যে সব নীতিমালা অনুসরণ করতে হয় তা নিম্নে আলোচনা করা হল।

অভীক্ষা গঠনের উদ্দেশ্য ঃ অভীক্ষা গঠনের উদ্দেশ্য অভীক্ষা গঠনকারীকে জানতে হবে এবং মনে মনে যে ধারনা পোষণ করে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য গুলো অনুসরণ করতে হবে।

১ বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয়ে স্থিরীকৃত নুন্যতম, জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হল কিনা তা প্রমাণ করা। পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের সফলতা নির্ণয় করা।

২ স্থিরীকৃত মান দণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের কৃতকার্যতার মাত্রার সংগে শিক্ষকের শিক্ষাদানগত নৈপূণ্যের মাত্রা নিরূপণ করা।

৩ শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবনে পড়াশুনা বা পেশাগত বিষয়ের উপর কৃতকার্যতা সম্বন্ধে পূর্বাভাস প্রদান করা।

৪ পুথিগত জ্ঞান ছাড়াও পরীক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির কতিপয় গুণাবলীর মাত্রা মোটামুটিভাবে নিরূপণ করা যেতে পারে।

৫ পরীক্ষা গ্রহণকে শিক্ষাদান পদ্ধতির একটি অপরিহার্য অংশ হিসাবে মেনে চলা।

৬। পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক নিজের শিক্ষাদান পদ্ধতিতে পরিলক্ষিত দোষ ত্রুটির মাত্রা নিরূপণপূর্বক সংশোধন করতে পারেন। পরীক্ষা শিক্ষার্থীর কার্যসম্পাদনের একটি সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরে। শিক্ষক পরীক্ষার্থীর সফলতা ও দুর্বলতার মাত্রা নিরূপণ করে তদানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

নীতিমালার আবশ্যকতা

তিনটি কারণে অভীক্ষা গঠনে শিক্ষকের দক্ষতা অর্জন আবশ্যক।

১. শিক্ষক নিজের তৈরি প্রশ্নমালা শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করতে পারেন।

২. অনভিজ্ঞ লোক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রশ্নপত্র দ্বারা রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার ফলাফল খুবই অসন্তোষজনক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৩. দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক কর্তৃক অভীক্ষা তৈরি করলে তা প্রায় আদর্শায়িত অভীক্ষার সমপর্যায়ের যথার্থ নির্ভরযোগ্যতা অর্জন করে । পরিসংখ্যানের পদ্ধতি প্রয়োগ থেকে এ তথ্য জানা গেছে। শ্রেণিকক্ষে ব্যবহারযোগ্য অভীক্ষা গঠনের মোটামুটি চারটি স্তর হলোঃ

ক) পরিকল্পনা, খ) প্রস্তুতি, গ) প্রাথমিক পরীক্ষা গ্রহণ, এবং ঘ) মূল্যায়ন।

ক) অভীক্ষার পরিকল্পনা

অভীক্ষার পরিকল্পনা বলতে সতর্কতার সাথে প্রশ্নপত্রের সীমা নির্ধারণ এবং বিষয়বস্তুকে প্রসংগভিত্তিক ছোট ছোট অংশে ভাগ করা বোঝায়। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই মনে করতে হবে শিক্ষকের পক্ষে একটি সন্তোষজনক পরিমাপক সরঞ্জাম মেপে গৃহীত অভীক্ষা গঠনের চাইতে কঠিন কাজ আর কিছুই হয় না। সন্তোষজনক অভীক্ষা গঠনের ক্ষেত্রে সুস্থ মস্তিষ্কের ধীরস্থির চিন্তা প্রসূত সময় সাপেক্ষে একটি জটিল কাজ। অভীক্ষা গঠনের কাজটি সুবিস্তৃত না হলেও এর পরিকল্পনা গ্রহণের সময় শিক্ষককে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য ও অভীক্ষা প্রয়োগের আবশ্যকতা সম্বন্ধে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। অভীক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীর পাঠ গ্রহণের মাত্রা নির্ণয় হল শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যের মাত্র সম্বন্ধে অনুধাবন ও পরিকল্পনার একটি অঙ্গ। নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়কে শিক্ষাদানে উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করা যায়।

১। বিষয়বস্তুর উপর ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ।

২। চিন্তা শক্তির বিভিন্ন স্বরূপ উদঘাটন।

৩। শিক্ষার্থীর অভিপ্রেত আচরণ ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য লাভ।

৪। শিক্ষার্থীর উৎসুক ও প্রবণতার স্বরূপ নির্ণয়।

৫। শিক্ষার্থীর কর্মদক্ষতা ও নৈপুণ্যের বৃদ্ধির হার নির্ণয়।

৬। শিক্ষার্থীর সৃজনশক্তি বিকাশের মাত্রা নির্ণয়।

৭। শিক্ষার্থীর সামাজিক মনোভাবের উৎকর্ষ সাধন এবং

৮। জীবন দর্শনের উপর বোধোদয়।

অভীক্ষা গঠনে শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে করে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দা শিক্ষার্থীর মানসিক বৃত্তিসমূহ যেন সক্রিয় হয়। শিক্ষার্থীর আচরণগত বৈশিষ্ট্য নিরূ করাই শিক্ষকের পরীক্ষা গ্রহণের প্রধান উদ্দেশ্য। শিক্ষা গ্রহণে শিক্ষার্থীর আচ আবশ্যকীয় পরিবর্তন ঘটানো একটি উপায় তা যেন শিক্ষক মনে প্রাণে উপলব্ধি ক এবং তা যেন অভীক্ষায় প্রতিফলিত হয়।

খ) প্রস্তুতি ঃ

অভীক্ষা গঠনের দ্বিতীয় স্তর হল প্রস্তুতির বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ। অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় অভীক্ষা গঠনে নিম্নোক্ত বিধিমতে অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছণীয় ঃ

১ প্রথমেই অভীক্ষার প্রাথমিক খসড়া তৈরি করতে হবে। অনেক শিক্ষক দৈনন্দিন পাঠদানের সংগে অগ্রসর হতে হতে যেসব প্রশ্ন পরীক্ষায় দেন তা লক্ষ্য রেখে কোর্স সম্পন্ন করেন।

২ অভীক্ষায় একাধিক নমুনার প্রশ্ন দেয়া উচিত।

৩ অভীক্ষায় প্রত্যেকটি প্রশ্ন যেন খুব সহজ বা কঠিন যেন না হয়। প্রত্যেক প্রশ্ন যেন দলের ৫০% অথবা তার কিছু কম বা বেশি পরীক্ষার্থী ঠিক উত্তর দিতে পারে।

৪ অভীক্ষার খসড়া কিছুদিন যাবৎ সমালোচকের দৃষ্টিতে পুনর্গঠন করা যেতে পারে।

৫। চূড়ান্তভাবে অভীক্ষা গঠনের জন্য যত সংখ্যক প্রশ্ন থাকা উচিত বলে মনে করা যায়, প্রাথমিক খসড়ায় তার দ্বিগুণ সংখ্যক প্রশ্ন তৈরি করতে হবে। পারস্পরিক ভিত্তিক বিশ্লেষণে ত্রুটিমুক্ত প্রশ্ন বাছাই করে নিলে অনেকটা উন্নতমানের প্রশ্ন পাওয়া যাবে।

৬। অভীক্ষার একই নমুনার সবগুলো প্রশ্ন একত্রে রাখা আবশ্যক। এতে পরীক্ষার্থী ও পরীক্ষক উভয়েরই সুবিধা হয়।

৭। ভাষার কলাকৌশলের চেয়ে ভাবের প্রধান্য প্রশ্নপত্রে ফুটে উঠা আবশ্যক।

৮। অভীক্ষার প্রশ্নসমূহ সহজ হতে কঠিনের ক্রমানুসারে সাজিয়ে লিখতে হবে।

৯। অভীক্ষা গ্রহণের নির্দেশমালা সুস্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত হওয়া আবশ্যক।

গ) প্রাথমিক পরীক্ষা গ্রহণ

পরিকল্পনা মোতাবেক অভীক্ষা গঠনের পর একে সঠিকভাবে প্রয়োগের উপযুক্ততা যাচাই করে নেয়া আবশ্যক। চূড়ান্তরূপ দেয়ার জন্য নিচের চার নীতিকে ভিত্তি হিসাবে নিতে হবে।

১। পরীক্ষা গ্রহণের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার ব্যাপারে নিশ্চিত থেকে অভীক্ষা পরিচালনা করতে হবে।

২। অভীক্ষার উপর প্রাথমিক পরীক্ষা গ্রহণে পর্যাপ্ত সময় নেয়া আবশ্যক। কারণ এ স্তরে প্রশ্নসমূহ অনুমানভিত্তিক থাকায় সহজ বা কঠিনের মাত্রা বিজ্ঞানসম্মত উপায় সাজানো থাকে না।

৩। অভীক্ষার নম্বর প্রদান পদ্ধতি সহজ হওয়া আবশ্যক। প্রাথমিক পরীক্ষা অনুমানভিত্তিক উত্তরকে নাকচ করতে নিম্নোক্ত সূত্র ব্যবহার করতে হবে।

$$S = R - \frac{W}{O - 1}$$

৪। সাফল্যাংক নির্ণয় করার পূর্বে নিয়মাবলিসহ একটি উত্তরপত্র তৈরি করা আবশ্যক রচনামূলক উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য নির্দিষ্ট নিয়মাবলি প্রণয়ন ও পালন ক অপরিহার্য।

ঘ) অভীক্ষার মূল্যায়ন ঃ (Evaluation of Test)

অভীক্ষার মূল্যায়নের মাধ্যমে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

১। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার অগ্রগতি নির্ণয়ে সহায়তা করে।

২। শিক্ষার্থীদের উত্তরপত্র বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করে প্রত্যেক প্রশ্নের অভীক্ষ অন্তর্ভুক্ত করার উপযুক্ততা নির্ধারণ। প্রশ্নটি খুব কঠিন, না খুব সহজ। ইহা মেধাবী মাঝারী বা নিম্নমেধার শিক্ষার্থীদের পার্থক্য নিরূপণে সক্ষম কিনা। অভীক্ষার মূল্যায়নে জন্য এর যথার্থতা, নির্ভরযোগ্যতা এবং প্রয়োগ সম্বন্ধে জানা আবশ্যক।

অভীক্ষার গুণাগুণ যাচাই করতে নিম্নের কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা দরকার।

১। যে সকল প্রশ্ন ৫০% বা এর কাছাকাছি সংখ্যক পরীক্ষার্থী নির্ভুল উত্তরদানে সক্ষ হয়, সেগুলো দিয়ে অভীক্ষা গঠিত হলে পরিমাপের জন্য উত্তম বলে বিবেচি হবে।

২। শুধু ৫০% পরীক্ষার্থী নির্ভুল উত্তর দিলেই তাকে উত্তম প্রশ্ন বলা যাবে না। এখা মেধাবী, মাঝারী ও নিম্ন মেধার পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যথেষ্ট রকম পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়।

৩। পরীক্ষার্থীদের দ্বারা অভীক্ষার সমালোচনা করানো একটি সক্রিয় পদক্ষেপ।

৪। সম্ভব হলে অভীক্ষার ফলাফল অন্যকোন আদর্শায়িত বা সমান্তরাল অভীক্ষ ফলাফলের সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

৫। অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা থাকা আবশ্যক। তবে একে উপযুক্ত পরি সরঞ্জামরূপে গ্রহণ করতে হলে এর যথার্থতা থাকছে কিনা তা দেখতে হবে।

আদর্শায়িত অভীক্ষার প্রস্তুতকরণ
(Construction of Standardised test)

শিক্ষামূলক অভীক্ষার ক্ষেত্রে দু'ধরনের অভীক্ষার কথা জানা যায়। একটি হলো শিক্ষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত অভীক্ষা আর অপরটি হলো আদর্শায়িত অভীক্ষা। এ দু'শ্রেণির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। একটি অভীক্ষা আদর্শায়িত করতে নিম্নোক্ত কয়েকটি পর্যায়ের মাধ্যমে অগ্রসর হতে হয়।

১. কার্যকরী ধারণা গঠন, ২. অভীক্ষার পদ সংগ্রহ, ৩. অভীক্ষাপদের পূর্ণ বিশ্লেষণ ও বিচারকরণ, ৪. নমুনা অভীক্ষা গঠন, ৫. নমুনা অভীক্ষার সময় নির্ধারণ, ৬. নমুনা অভীক্ষার প্রয়োগ, ৭. পদবিশ্লেষণ, ৮. অভীক্ষার সর্বশেষ রূপদান ৯. অভীক্ষার পুনঃপ্রয়োগ, ১০. অভীক্ষার যথার্থতা নির্ণয় ১১. অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতার মান নির্ণয় ১২. আদর্শমান নির্ণয় এবং ১৩. মান নির্ণয়ের নীতি নির্ধারণ।

১. কার্যকরী ধারণা গঠন

যে কোন অভীক্ষা গঠন করতে হলে প্রথমেই যে কাজটি করতে হয়, তাহলো কার্যকরী ধারণা গঠন। যে বিশেষ শিক্ষামূলক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য পরিমাপের জন্য অভীক্ষাটি গঠন করা প্রয়োজন তা কার্যকরি ধারণা গঠন করতে গিয়ে তিনটি পর্যায়ে কাজ করতে হয়।

ক. শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ধারণ, খ. উদ্দেশ্যের আচরণগত উদ্দেশ্য নির্ধারণ এবং গ. আচরণ মূল্যের সমবায়ে কার্যকরী ধারণা গঠন।

২. অভীক্ষা পদ সংগ্রহ

অভীক্ষা গঠনের দ্বিতীয় পর্যায় হলো - প্রশ্ন/ সমস্যা বা অভীক্ষাপদ (Test Items) সংগ্রহ। প্রশ্ন সংগ্রহের সময় কয়েকটি নীতি অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়।

ক) এ পর্যায়ে সংগৃহীত প্রশ্নের সংখ্যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত হবে। যতগুলো প্রশ্ন অভীক্ষার জন্য প্রয়োজন তার প্রায় দ্বিগুণ প্রশ্ন সংগ্রহ করা উচিত।

খ) প্রশ্ন বা অভীক্ষাপদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মানসিক ক্ষমতা এবং শিক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতা উভয়ের কথাই বিচার করা দরকার। শিক্ষক শিক্ষণের সময়ে যে ভাবে বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ করেছেন, প্রশ্ন তার পরিপ্রেক্ষিতে গঠন করা উচিত।

গ) সংগৃহীত প্রশ্নগুলোকে পৃথক পৃথকভাবে এক একটি কার্ডে লিখে নিলে পরবর্তী পর্যায়ে কাজ করতে সুবিধা হয়।

৩. অভীক্ষাপদের পুনঃবিশ্লেষণ ও বিচারকরণ

অভীক্ষাপদগুলোর মাঝে ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। এ কারণে এগুলোর পুনঃবিশ্লেষণ ও বিচারকরণ প্রয়োজন। অভীক্ষা পদগুলোর বিচার করতে হবে শিক্ষার্থীদের কথ বিবেচনা করে। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো বিবেচনা করা দরকার।

ক) অভীক্ষাপদের উদ্দেশ্যমুখীতা ঃ প্রত্যেক অভীক্ষাপদ শিক্ষণের উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিনা, তা যাচাই করে দেখতে হবে। কোন বিশেষ অভীক্ষাপদ ব প্রশ্ন শিক্ষণের পূর্বনির্ধারিত কোন উদ্দেশ্যের সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত নয়, তাহ'লে তাকে বাদ দিতে হবে।

খ) অভীক্ষাপদের স্পষ্টতা ঃ প্রত্যেক প্রশ্ন এমন হওয়া উচিত যাতে সক পরীক্ষার্থী বুঝতে পারে। ভাষার জটিলতা পরিবর্তন করতে হবে।

গ) অভীক্ষাপদের সাংগঠনিক সামঞ্জস্যতা ঃ অসামঞ্জস্যপূর্ণ অভীক্ষাপদ বা প্র পরিমাপের নির্ভরযোগ্যতা হ্রাস করে দেয়। অভীক্ষাপদ পুণর্বিবেচনাকরণে জন্য নিম্নোক্ত নীতিগুলো হলো ঃ

১. নির্বাচিত অভীক্ষাপদগুলোর দ্বারা কি সমগ্র শিক্ষণ ফলশ্রুতি পরিমাপ ক সম্ভব হবে ?

২. নির্বাচিত অভীক্ষাপদগুলো কি সম্পূর্ণ পাঠ্যাংশকে অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষ হবে ?

৩. নির্বাচিত অভীক্ষাপদগুলোর কাঠিন্য বিষয়বস্তুর প্রকৃতি ও শিক্ষার্থীদে প্রকৃতির সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে কি ?

৪. অবশিষ্ট অভীক্ষাপদগুলোর মধ্যে পারস্পরিক পুনরাবৃত্তি আছে কি না

৪. নমুনা অভীক্ষা গঠন

সংগৃহীত অভীক্ষাপদগুলোর সুসামঞ্জস্যপূর্ণ বিন্যাসই হবে পূর্ণঅভীক্ষ পরিমাপযোগ্য বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্যের উপর এ বিন্যাসের রীতি নির্ভর কে মনোবিদগণের মতামত অনুসারে নিম্নরূপ ক্রমিক পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণির অভীক্ষা স্থাপন করতে হবে ঃ

প্রথম - সত্য/ মিথ্যা প্রশ্ন,
দ্বিতীয় - মিলকরণ প্রশ্ন,
তৃতীয় - সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন,

চতুর্থ - বহুনির্বাচনী প্রশ্ন,

পঞ্চম - তাৎপর্য নির্ণায়ক অনুশীলনী

ষষ্ঠ - রচনামূলক প্রশ্ন,

এরপর প্রতিটি অংশের অন্তর্গত প্রশ্নগুলোর আবার কাঠিন্য অনুসারে সাজাতে হবে। এটি হলো নমুনা অভীক্ষাপত্র।

৫. নমুনা অভীক্ষার নির্দেশপত্র ও সময় নির্ধারণ

অভীক্ষা গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হলো নির্দেশপত্র প্রস্তুতকরণ এবং সময় নির্ধারণ। নির্দেশপত্র নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিক্ষককে নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি নজর রাখতে হবে।

এক. অভীক্ষাপত্রের উপরে অভীক্ষা বা পরিমাপের উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি বিবৃতি থাকা বাঞ্ছনীয়। বিবৃতি যত সংক্ষিপ্ত তাৎপর্যপূর্ণ হবে, ততই পরীক্ষার্থীরা অভীক্ষা গ্রহণে আগ্রহী এবং যথোপযুক্ত প্রেষণা সঞ্চার করতে পারে।

দুই. নির্দেশপত্রে পরবর্তী অংশে অভীক্ষপদ বা প্রশ্নগুলো কি ভাবে উত্তর করতে হবে তার সাধারণ নির্দেশ থাকবে। নমুনা সমাধান পদ্ধতিও থাকতে পারে।

তিন. অভীক্ষাটির উত্তর করার জন্য মোট কত সময় লাগবে তাও এ পর্যায়ে নির্ধারণ করতে হবে। এ কাজ সঠিকভাবে করতে হলে প্রতিটি প্রশ্নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় পৃথকভাবে বিচার করতে হবে। পরে মোট সময়সীমা অভীক্ষাপত্রের উপরে লিখে দিতে হবে।

চার. নমুনা অভীক্ষাপত্রে শিক্ষার্থীদের উত্তরের মান কিভাবে নির্ধারণ করা হবে, তার একটি নীতি ঠিক করে দিতে হবে।

৬. নমুনা অভীক্ষার প্রয়োগ

নমুনা অভীক্ষাটি প্রয়োগ করে বাস্তব পরিস্থিতি যাচাই করতে হবে। নমুনা অভীক্ষাটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নীতিগুলো অনুসরণ করতে হবে।

এক. অভীক্ষা প্রয়োগের পূর্বে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে করে পরীক্ষার্থীদের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট না হয়।

দুই. সাধারণ নির্দেশ দেওয়ার সময় উত্তর সম্পর্কে কোন সংকেত দেওয়া যাবে না।

তিন. শিক্ষার্থীরা যাতে কোন রকম অসদুপায় অবলম্বন করতে না পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

চার. শিক্ষার্থীদের অনুমানের জন্য সংশোধনী সূত্র ব্যবহার করতে হবে-

$$S = R - \frac{W}{0 - 1}$$

৭. পদ-বিশ্লেষণ

নমুনা অভীক্ষার প্রয়োগলব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে বিশেষ কৌশল প্রয়োগ করে অভীক্ষা পদগুলোর কার্যকারিতা বিচার করতে হবে।

এক. প্রত্যেকটি অভীক্ষাপদের কাঠিন্য মান বের করতে হবে।

দুই. প্রত্যেকটি অভীক্ষাপদের পার্থক্য নির্ণয়ক মান বের করতে হবে।

তিন. অভীক্ষাপদ বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রশ্নগুলোর অভ্যন্তরীণ সংগঠন ঠিক আছে কিনা তা বিচার করতে হবে। এজন্য অভীক্ষাপদগুলোর কাঠিন্য মান, পার্থক্য নির্ণয়ক মান এবং অভীক্ষাপদের অভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য নির্ণয় করতে হবে।

৮. অভীক্ষার সর্বশেষ রূপদান

যে সব অভীক্ষাপদ বা প্রশ্নের পার্থক্য নির্ণয়ক ক্ষমতা কম সে গুলোকে অভীক্ষার পুনরূপ থেকে বাদ দিতে হবে। আর যে সব অভীক্ষাপদের অভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য কম সেগুলোকে পরিবর্তন করতে হবে।

৯. অভীক্ষার পুনঃপ্রয়োগ

অভীক্ষাটি সর্বশেষ রূপদানের পর সেটিকে পুনরায় প্রয়োগ করতে হবে। এ প্রয়োগের জন্য একটি নির্বাচিত প্রতিনিধি দল গঠন করতে হবে। এ অভীক্ষা যখন প্রয়োগ করা হবে তখন একই সঙ্গে একই গুণ বা বৈশিষ্ট্য পরিমাপক অপর একটি আদর্শায়িত অভীক্ষার ঐ দলটির উপর প্রয়োগ করতে হবে। এ অভীক্ষাটি নির্ণায়ক অভীক্ষা হিসাবে ব্যবহৃত হবে। নতুন অভীক্ষা এবং অপর অভীক্ষাটির উত্তরগুলোর পূর্ব নির্ধারিত নীতি অনুসরণ করে মান নির্ণয় করতে হবে। পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেকটি পরীক্ষার্থীর দুই অভীক্ষায় প্রাপ্ত স্কোরগুলোকে পাশাপাশি স্তম্ভে তালিকাবদ্ধ করতে হবে।

১০. অভীক্ষার যথার্থতা নির্ণয় ঃ

পূর্বোক্ত দুটি অভীক্ষার স্কোর এর সহ-সম্পর্কের মান বের করে অভীক্ষার যথার্থতা নির্ণয় করতে হবে। সহ-সম্পর্কের সহগাঙ্ক দ্বারাই অভীক্ষার যথার্থ সহগাঙ্ক প্রকাশ করা হয়।

১১. নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয় ঃ

এর অভীক্ষার প্রাপ্ত স্কোরের নির্ভরযোগ্যতা নির্ধারণের জন্য অভীক্ষাটির নির্ভরযোগ্যতারসূচক নির্ণয় করতে হবে। নির্ভরযোগ্যতার মানও অভীক্ষার নির্দেশিকাপত্রের সঙ্গে দেয়া হয়।

১২. আদর্শমান নির্ণয় ঃ

অভীক্ষার আদর্শমান (Norm) নির্ণয়ের জন্য পুনঃপ্রয়োগের ফলে প্রাপ্ত স্কোর বণ্টনকে কাজে লাগাতে হবে। ঐ স্কোরগুলোর ভিত্তিতে আদর্শমান নির্ধারণ করতে হবে। প্রয়োজনমতে বয়সভিত্তিক ও শ্রেণিভিত্তিক আদর্শমান নির্ণয় করতে হবে।

১৩) মান নির্ণয়ের নীতি নির্ধারণ ঃ

আদর্শায়িত অভীক্ষার যথার্থতার নির্ভরযোগ্যতার মান এবং আদর্শমান সবই উত্তরপত্রের মান নির্ণয়ের উপর নির্ভরশীল। যে পদ্ধতিতে অভীক্ষা গঠনের সময় উত্তরপত্রগুলির মান নির্ণয় করা হয়েছে, পরবর্তীকালে পরীক্ষকরা যাতে মান নির্ণয়ের সময় অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করেন। সে উদ্দেশ্যে মাননির্ণয়পত্র গঠন করতে হবে তা লিপিবদ্ধ থাকবে। অভীক্ষাটি কিভাবে প্রয়োগ হবে তার বিস্তারিত নির্দেশ এ অংশে থাকবে। মান নির্ণয়ের এ পত্রটিও নির্দেশিকায় থাকবে।

আদর্শায়িত অভীক্ষা ও সাধারণ অভীক্ষার তুলনা ঃ

বৈশিষ্ট্য	আদর্শায়িত অভীক্ষা	সাধারণ অভীক্ষা
১। পরিমাপযোগ্য বিষয়বস্তু	সাধারণধর্মী বিষয়বস্তুর শিক্ষাগত ও মানসিক বৈশিষ্ট্যাবলী পরিমাপ করা হয়।	এখানের পদগুলি বিশেষধর্মী শিক্ষার্থীদের বিশেষ চাহিদা অনুসারে তৈরী করা হয়।
২। অভীক্ষা পদের গুণগতমান	অভীক্ষাপদগুলো বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গঠিত এবং প্রয়োগের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নির্বাচিত।	অভীক্ষাপদগুলো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নির্বাচিত গুণগতমান অজানা।
৩। নির্ভরযোগ্যতা	নির্ভরযোগ্যতা বেশি।	নির্ভরযোগ্যতা জানা নেই
৪। প্রয়োগ পদ্ধতি ও মান নির্ণয় পদ্ধতি।	প্রয়োগপদ্ধতি আদর্শায়িত ও মান নির্ণয় পদ্ধতি পূর্ব নির্ধারিত।	প্রয়োগপদ্ধতি পরিবর্তনশীল।
৫। তাৎপর্য নির্ণয়	আদর্শমান নির্ধারণ করা থাকে এবং তুলনা করা যায়।	তাৎপর্য নির্ণয়ে পার্থক্য থাকে, তুলনা করা অসুবিধাজনক।

অনুশীলনী-৩.২

১। আগ্রহ কি? আগ্রহ সৃষ্টির পিছনে কি কি কারণ থাকে?

২। মনোভাব কি? কিভাবে একটি মনোভাব স্কেল তৈরি করা হয়?

৩। একজন শিক্ষক কি উদ্দেশ্যে অভীক্ষা গঠন করবেন?

৪। টীকা লিখুন ঃ ক) আগ্রহের অভীক্ষা, খ) মনোভাবের অভীক্ষা, গ) বুদ্ধির অভীক্ষ ব্যক্তিসত্তার অভীক্ষা, ঙ) আদর্শায়িত অভীক্ষা।

৫। একটি আদর্শায়িত অভীক্ষার গঠনপ্রণালী বর্ণনা করুন।

৬। একটিশ্রেণি কক্ষ উপযোগী অভীক্ষা কিভাবে প্রস্তুত করিবেন বর্ণনা করুন।

৭। বিদ্যালয়ের উপযোগী ও পঠিত কোন বিষয়ের উপর উচ্চতর মানসিক স্তরের চারটি স উত্তর সমন্বিত ৫০টি বহুনির্বাচনী অভীক্ষা তৈরি করুন। জ্ঞান অনুধাবনশক্তি, প্রয়োগ ও উচ্চতর প্রয়োগমূলক এ চার ভাগের প্রত্যেকটিতে কমপক্ষে ১০টি পদ থাকবে।

চতুর্থ অধ্যায়

মূল্যায়নে পরিসংখ্যানের ব্যবহার

পরিসংখ্যানের স্বরূপ ও পরিধি

ইংরেজি স্টেট (State) শব্দটি থেকেই স্ট্যাটিস্টিকস্ (Statistics) এসেছে। পরিসংখ্যানবিদ পি.সি মহলানবিশ ইংরেজি Statistics শব্দের বঙ্গানুবাদ করেছেন পরিসংখ্যান। প্রাচীনকালে রাজ্য পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রীয় তথ্যমালা যথা- কর আদায়, সৈন্য সংখ্যা, লোক গণনা, যুদ্ধ সামগ্রি ইত্যাদি বুঝবার জন্য ব্যবহার হতো। তখন Statistics বা পরিসংখ্যান শুধু রাষ্ট্রীয় তথ্যের সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

পরবর্তীকালে এমন সব পরিবর্তনশীল পরিমাপসম্পন্ন তথ্য বুঝাতে স্ট্যাটিস্টিকস্ কথাটি ব্যবহৃত হতে লাগল। যেগুলো সুনিশ্চিত করে আগে থেকে কিছু বলা যায় না। এগুলো হচ্ছে জন্ম-মৃত্যু বা বিবাহের স্ট্যাটিস্টিকস্, দুর্ঘটনার স্ট্যাটিস্টিকস্ ইত্যাদি। ঐ একই অর্থে এখনও উহা ব্যবহৃত হচ্ছে। আজকের দিনে এর ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ছে জীববিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, প্রকৌশল, কলাকৌশল, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, চিকিৎসা বিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান, শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান সহ সব ধরনের শিক্ষা ধারায়। পরিসংখ্যান যখন অন্য "শিক্ষা ধারায়" সাহায্যকারী হিসাবে ব্যবহৃত হয় তখন এর একটি নতুন নামকরণ পরিসংখ্যানবিদগণ দিয়েছেন, নিম্নের ছকে তার বিবরণ দেয়া হলঃ-

যে বিষয়ের তথ্যমালা বিশ্লেষণ করা হয়	পরিসংখ্যান পদ্ধতিসম্মত নতুন নামকরণ
জীববিজ্ঞান	বায়োমেট্রিক
পদার্থ বিজ্ঞান, প্রকৌশল, শিল্পকলা	টেকনোমেট্রি
অর্থনীতি	ইকোনোমেট্রিক
মানুষের জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ইত্যাদি জনসংখ্যা সম্পর্কিত	ডেমোগ্রাফি
সমাজবিজ্ঞান	সোসিওমেট্রি
চিকিৎসাবিজ্ঞান	বাইওস্টাটিস্টিকস
শিক্ষাবিজ্ঞান	শিক্ষা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান

সংজ্ঞা ঃ পরিসংখ্যান মূলত একটি প্রয়োগমূলক বিজ্ঞান। এটা বহুক্ষেত্রে ব্যবহৃত গণিতের একটি শাখা, বিভিন্ন গাণিতিক কৌশলে ব্যবহৃত কতকগুলো সংখ্যমান বা রাশি বিজ্ঞান। অন্য যে কোন বিজ্ঞানের ন্যায় পরিসংখ্যান বিজ্ঞানেরও একক সংজ্ঞা নেই। সাধারণভাবে পরিসংখ্যান অর্থে কোন বিষয়ে পরিমাণগতমানের বা মাপের ওপর নির্ভর করে গণিতের নীতি অনুসারে বিচার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি বুঝায়। তবে আর.এ. ফিসরের মতে "পরিসংখ্যান একটি 'শিক্ষাধারা' যার দ্বারা তথ্যবিশ্ব ও তথ্যমালার ভেদ বা তারতম্য (Variation) অনুশীলন (Study) করা হয়। তথ্যমালায় বিশালত্বকে ক্ষুদ্রাকারে ও সহজ বোধগম্যভাবে প্রকাশ করা হয় এবং আরোহী যুক্তির দ্বারা নমুনা হতে তথ্যবিশ্ব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়"।

তথ্যবিশ্ব ও নমুনা এ দুইটি বিষয় পরিসংখ্যান পাঠে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তথ্যসংগ্রহ করার ক্ষেত্র বিশাল হলে, সেখান থেকে প্রতিনিধিত্বমূলক তথ্য বাছাই করে সংগ্রহ করে নিতে হয়। পুরো তথ্য ক্ষেত্রকে তথ্য বিশ্ব আর প্রতিনিধিত্বশীল তথ্যকে নমুনা বলা হয়। একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়, যদি বাংলাদেশের দশ বছর বয়সের সব বালকের গড়, ওজন বের হয়,তখন বাংলাদেশের সব ১০ বছর বয়সী বালকদেরকে খুঁজে ওজন নিয়ে গড় করার অনেক অবাস্তব ব্যাপার হয়ে পরে। সে ক্ষেত্রে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ঐ বয়সী প্রতিনিধিত্বশীল বালকদের ওজন সংগ্রহ করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দশ বছর বয়সের সকল বালকগণই তথ্যবিশ্ব আর প্রতিনিধিত্বশীল বালকেরা তথ্যবিশ্বের নমুনা। তথ্যবিশ্বে নমুনা থেকে প্রাপ্ত গুণাগুণ গণিতের তত্ত্ব অনুযায়ী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া পরিসংখ্যানের একটি প্রধান কাজ।

পরিসংখ্যানের পদ্ধতি

প্রত্যেক বিজ্ঞান তার নিজস্ব শিক্ষাধারা অনুযায়ী বিভিন্ন ঘটনার পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরিসংখ্যান একই সঙ্গে পরীক্ষামূলক ও প্রয়োগমুলক বিজ্ঞান। নিজস্ব কতকগুলো পদ্ধতি অনুসরণ করে পরিসংখ্যান প্রাকৃতিক বিভিন্ন ঘটনার অনুশীলন করে। এ পদ্ধতিগুলো নিম্নে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হল।

১। **তথ্য সংগ্রহ ঃ** কোন বস্তু বা মানুষ সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমে তার সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এ তথ্যের ভিত্তিতে পরবর্তীকালে বস্তুটির বা ব্যক্তিটির সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এই তথ্য দু'ধরনের, যথা- গুণগত ও পরিমাণগত। পরে ঐ তথ্যটিকে সংখ্যামানে প্রকাশ করা হয়। এ সংখ্যামানকে স্কোর (Score) বলা হয়।

২। **স্কোর বিন্যাস ঃ** প্রাথমিক অবস্থায় প্রাপ্ত সংখ্যামান বা স্কোরগুলোকে অবিন্যস্ত বলা হয়। প্রাথমিকভাবে প্রাপ্ত কাঁচা স্কোর বা অবিন্যস্ত স্কোরের ক্রমমান অনুসারে সাজিয়ে বিন্যস্ত করা হয়।

৩। **স্কোরের শ্রেণি বিন্যাস ঃ** প্রাপ্ত স্কোরের সংখ্যা বেশি হলে কয়েকটি ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ করে ঐ স্কোরগুলোকে শ্রেণি বিন্যাস করা হয়।

৪। **তথ্য বিশ্লেষণ ঃ** প্রাপ্ত বিন্যস্ত স্কোরগুলোকে বিভিন্ন গাণিতিক কৌশলে বিশ্লেষণ করা হয়। কৌশল হলো কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ, বিষমতার পরিমাপ, সহ-সম্পর্ক ইত্যাদি।

৫। **স্কোরের তাৎপর্য নির্ণয় ঃ** স্কোরগুলোর সামগ্রিক তাৎপর্য নির্ণয় করা হয়।

৬। **সম্ভাব্য ত্রুটির পরিমাপ নির্ণয় ঃ** স্কোরের তাৎপর্য নির্ণয়ের সময় পরিমাপের ত্রুটি ধরা পড়লে তা নির্ণয় করা হয়। এটাই সম্ভাব্য ত্রুটি।

শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানে পরিসংখ্যানের ব্যবহার

বর্তমানে শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানে পরিসংখ্যানের ব্যবহার অপরিহার্য বলে পরিগণিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের কয়েকটি উপযোগিতা উল্লেখ করা হল ঃ

১। **পরীক্ষণ পদ্ধতির পরিপূরক ঃ** সকল বিজ্ঞানেই পরীক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ অপরিহার্য। শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানেও এই পরীক্ষণ পদ্ধতির বহুল ব্যবহার হয়ে থাকে। সব ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের সাহায্যে পরীক্ষণের বিষয়বস্তু, প্রকৃত কারণ বা তথ্য বের করা সহজ হয়। শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানে পরীক্ষণ পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা দূর করতে পরিসংখ্যানের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলো অনেকটা সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

২। **সুনির্দিষ্ট ও নিখুঁত বর্ণনা ঃ** শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের সাহায্যে মানব আচরণের প্রয়োগমূলক ও তত্ত্বমূলক বর্ণনাগুলো নির্ভুল, নিখুঁত ও সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব হয়েছে। সুনির্দিষ্ট ও নিখুঁত বর্ণনা দিতে পরিসংখ্যানের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে যাচ্ছে।

৩। **নৈর্ব্যক্তিক, বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি ও চিন্তাধারার প্রয়োগ ঃ** পরিসংখ্যান পদ্ধতির প্রয়োগে শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতিগুলো অনেক বেশি নৈর্ব্যক্তিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক হয়ে উঠেছে। এ সব ক্ষেত্রে ব্যক্তিকতাদুষ্ট ও অনুমান নির্ভর বহুলাংশে দূর হয়েছে। কেবল পদ্ধতিই নয় পরিসংখ্যানের সহায়তায় শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের চিন্তার ধারাও অনেক বেশি সুসংহত ও বিষয়মুখী হয়ে উঠেছে।

৪। **পরীক্ষালব্ধ তথ্যরাশির সংক্ষিপ্তকরণ ও অর্থপূর্ণ সুবিন্যাস ঃ** পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্যরাশি পরিমাপ ও বিভিন্নতার দিক দিয়ে বিপুল ও

বিচিত্রধর্মী। এগুলোকে ব্যবহারযোগ্য বা অর্থপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া বা অর্থপূর্ণ ব্যাখ্য দেয়া বা তথ্যরাশিকে সুসংহত করা কেবল পরিসংখ্যানের সাহায্যেই সম্ভব। এ কারণেই শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানসহ সকল আধুনিক বিজ্ঞানেই পরিসংখ্যান পদ্ধতির সাহায্যে তথ্যরাশির সংক্ষিপ্তকরণ, সুবিন্যাস ও অর্থপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

৫। **সামান্যধর্মী সিদ্ধান্ত গঠন ঃ** সব ধরনের প্রাপ্ত রাশির অর্থপূর্ণ সামান্যধর্মী সিদ্ধান্ত গঠনে পরিসংখ্যান সহায়তা করে। গবেষকগণ বা তথ্যবিশ্লেষকগণ সহজেই সামান্যধর্মী সূত্র বা সিদ্ধান্ত গঠন করতে পারেন।

৬। **ভবিষ্যৎ ফলাফল গণনা ঃ** আধুনিক বিজ্ঞানের সব ধরনের কর্মকাণ্ডে পরিসংখ্যানের সবচেয়ে বড় অবদান হল ভবিষ্যৎ ফলাফল সম্বন্ধে অনেক বেশি নির্ভুল, নিখুঁত ও নির্ভরযোগ্য খবর দেয়া সম্ভব। আধুনিক পরিসংখ্যানবিদগণ ব্যক্তির বর্তমান কাজ পর্যবেক্ষণ করে তার ভবিষ্যৎ কাজের স্বরূপ ও মাত্র নির্ভরযোগ্যভাবে নির্ণয় করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের অর্জিত জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা সাপেক্ষে যে কোন ধরনের শিক্ষাসূচিতে সাফল্য অর্জন করবে, তা পূর্বাহ্নে নির্ধারণ করা যায়। শিক্ষা বা বৃত্তির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী ভবিষ্যৎ গণনা অনেক নিখুঁতভাবে করা সম্ভব হচ্ছে। এক কথায় পরিসংখ্যান শিক্ষ পরিকল্পনায় সুষ্ঠু রচনা, সংগঠন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে অতিমূল্যবান সহায়তা করে পারে।

৭। **আধুনিক উপাদান বিশ্লেষণ ঃ** আধুনিক উপাদান বিশ্লেষণ পদ্ধতিটি শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যার নতুন ও অর্থপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে পারে। এ ফলে শিক্ষা সংক্রান্ত জটিল সমস্যা সমাধানে অনেক উন্নত প্রকৃতির বিজ্ঞানভিত্তি ও নির্ভরযোগ্য অভীক্ষা গঠন করা সম্ভব হচ্ছে। আজকাল মানসিক গুণাবলীর যথা স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য জানা সম্ভব হয়েছে।

শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের প্রয়োজনীয়তা

আধুনিক শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম অনেক ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানকে আধুনিক শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের ভিত্তি বলে বিবেচনা ক হয়। শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের প্রয়োজনীয়তা মোটামুটি নিম্নরূপ

১। শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে প্রাপ্ত অবিন্যস্ত স্কোরগুলো ব্যবহার উপযোগী করে সমালোচনা বা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য পরিসংখ্য পদ্ধতির সাহায্যে প্রয়োজনীয় কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া হয়।

২। পরিসংখ্যানের সাহায্যে বহিঃপরীক্ষার ফলাফল থেকে শিক্ষার্থীদের তুলনামূল যোগ্যতার মান পাওয়া যায়। বিভিন্ন বৎসরের ফলাফলের তুলনামূলক অবস্থ

থেকে যোগ্যতার উন্নতি অবনতির পরিমাপ পাওয়া যায়। আবার একই পরীক্ষার ফলাফল থেকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের যোগ্যতার তুলনামূলক বিচার করা হয়।

৩ অনেক তথ্য জনসাধারণের বোধগম্য হওয়ার প্রয়োজন হয়। সে সব জটিল পরিসংখ্যানিক তথ্য লেখচিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করলে তা সকলেই সহজে বুঝতে পারবেন। শিক্ষাক্ষেত্রের উন্নতি, অবনতি, শিক্ষার্থীদের দক্ষতা, যোগ্যতা, কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি বা দক্ষতাসহ বিভিন্ন তথ্য চার্ট, মডেল, লেখচিত্রের মাধ্যমে অত্যন্ত সহজভাবে দেখানো এবং ব্যাখা করা যায়। এখানে প্রাচীন চীনদেশীয় একটি প্রবাদ উল্লেখ্য --- একখন্ড চিত্র দশ সহস্র শব্দের সমতুল্য। লেখচিত্রের মাধ্যমে যে কোন তথ্যকে দৃষ্টি আকর্ষণীয় ও পরিস্ফুটিত করা এবং স্মরণ রাখতে সাহায্য করা যায়।

৪ শিক্ষণ পদ্ধতির তুলনামূলক গুণাগুণ পরিসংখ্যানের মাধ্যমে জানা যায় এবং উত্তম পদ্ধতি শিক্ষা ক্ষেত্রে চালু করতে সাহায্য করে।

৫ সর্বাত্মক পরিচয়পত্র বা প্রোফাইল প্রস্তুতকরণ ও সংরক্ষণে পরিসংখ্যান যথেষ্ট সাহায্য করে।

৬ যে কোন তথ্য সংরক্ষণ বা বিভিন্ন ধরনের তথ্যের তুলনামূলক বিচারকরণের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানই একমাত্র দিক নির্দেশক ও সাহায্যকারী।

৭। পরিসংখ্যান পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষক শিক্ষার্থীর উন্নতি অবনতি যাচাই করে সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে পারেন।

৮। পরিসংখ্যান পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অনুবন্ধ বা সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়।

৯। শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক গুণাগুণ পরিসংখ্যানের সাহায্যে যাচাই করা হয়।

১০। পরিসংখ্যান পদ্ধতির প্রয়োগের মাধ্যমেই বিভিন্ন বিষয়ের অভীক্ষাগুলো আদর্শায়িত করে এদের কার্যকারিতা নির্ধারণ করা হয়।

১১। অভীক্ষার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাবলীর তাৎপর্য নির্ণয় করে পরিসংখ্যান ভবিষ্যৎ পথ নির্দেশ দিতে সহায়তা করে।

১২। বুদ্ধিমত্তা, ব্যক্তিত্ব, আগ্রহ ও মনোভাব পরিমাপক অভীক্ষাসমূহ দ্বারা শিক্ষার্থীর সঠিক স্বতন্ত্র অবস্থান জেনে প্রত্যেকের নিজ নিজ চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষাসূচির ব্যবস্থা করা যায়।

১৩। পরিসংখ্যানের মাধ্যমেই এলাকাভিত্তিক শিক্ষার্থীদের অবস্থান, চাহিদা, সংখ্যা বা অনুপাত অনুযায়ী নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা সহজ হয়।

১৪। আজকের দিনে সভ্য সমাজের দৈনন্দিন কর্মসূচি পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিসংখ্যা প্রয়োজনীয়তা কেহই আর উপেক্ষা করতে পারবে না।

১৫। বিভিন্ন শিক্ষার্থীর শ্রেণিবিভাগ, সাফল্য অসাফল্যের শতকরা হার, বয়স ও অনুযায়ী অভীক্ষা প্রস্তুত এবং প্রয়োজন মতে স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচি সাহায্যে এগুলোকে প্রকাশ করে যথাযথ কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়াই পরিসংখ্ পদ্ধতির অন্যতম উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি।

১৬। শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য কতটুকু সফল হয়েছে বা লক্ষ্য কতটুকু অগ্রসর হওয়া যাচ্ছে, তার একটা সঠিক চিত্র তুলে ধরতে প পরিসংখ্যান। এ কারণেই এ দুই ক্ষেত্রে মূল্যায়নের গুরুত্ব অত্যন্ত অপরিসীম মূল্যায়নের প্রধান সহায়ক হলো পরিসংখ্যান।

অনুশীলনী - ৪.১

১। পরিসংখ্যানের স্বরূপ ও পরিধি আলোচনা করুন।

২। বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক ব্যবহৃত পরিসংখ্যান পদ্ধতির নামগুলো লিখুন।

৩। পরিসংখ্যানের সংজ্ঞা কি?

৪। তথ্যবিশ্ব ও নমুনা বলতে কি বুঝেন?

৫। শিক্ষাবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানে পরিসংখ্যানের কাজগুলো বর্ণনা করুন।

৬। শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের প্রয়োজনীয়তা কি কি?

স্কোর বিন্যাস

স্কোর ঃ বস্তু বা ব্যক্তির কোন বৈশিষ্ট্যকে যখন পরিমাপ করা হয়, তখন ঐ বৈশি বিশেষ একটি সংখ্যার দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এ সংখ্যাটি ঐ বস্তুর বা ব্যক্তির স্কোর হয়। পরীক্ষায়প্রাপ্ত এক একটি নম্বরকে স্কোর বলে। পরীক্ষার ফলাফল, বুদ্ধাঙ্ক, ব্য উচ্চতা, মাসিক বেতন ইত্যাদি স্কোরের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। ব্যক্তির পরিবর্তন ধর্ম, গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে স্কোর দিয়ে প্রকাশ করা যায়। কিন্তু সার্বজনীন বৈশিষ্ট্যগুলে স্কোর দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। স্কোর বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। যেমন ওজনের গ্রাম, কিলোগ্রাম, আবার উচ্চতার জন্য মিটার বা গজ ইত্যাদি দিয়ে প্রকাশ করা পরীক্ষার সাফল্যের ক্ষেত্রে ২৫, ৩০, ৪০, ৫০ ইত্যাদি সংখ্যার সাহায্যে শিক্ষার্থীর প্রকাশ করা হয়।

সারি বা অবস্থান বিন্যাস ঃ দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন ধরনের পরিমাপ প্রত্যেকের প্রয়োজন হয়। উচ্চতা অনুযায়ী কিছু লোককে সাজানো যায় আবার পরী

নম্বর অনুযায়ী শিক্ষার্থীদেরকে সাজানো। এখানে ব্যক্তির কোন একটা গুণ অনুসারে পর পর সজ্জনকে সারি বিন্যাস (Rank Order) বলা হয়। আলোচ্য উদাহরণে সবচেয়ে লম্বা ব্যক্তিকে সর্ব প্রথমে তারপর তার চেয়ে কম লম্বা, এভাবে সবশেষে উচ্চতায় সবচেয়ে ছোট ব্যক্তিকে রাখা। অনুরূপভাবে সবচেয়ে বেশি নম্বর প্রাপ্ত অনুযায়ী শিক্ষার্থীদেরকে সাজিয়ে দিলে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, ইত্যাদি স্থান অনুযায়ী শিক্ষার্থীগণ নিজ নিজ অবস্থান বিন্যাস তৈরি করবে। এটি সারি বা অবস্থান বিন্যাস।

স্কেল ঃ ব্যক্তির স্কোর কতকগুলো সমদূরত্ব বিশিষ্ট সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা যায় ১, ২, ৩, ৪, ৫, বা ২০, ৩০, ৪০, ৫০ এ শ্রেণি দুটিতে সংখ্যাগুলো পরস্পরের সঙ্গে সমদূরত্বসম্পন্ন। এ ধরনের সমদূরত্বসম্পন্ন সংখ্যাগুলো যখন পাশাপাশি সাজান হয় তখন তাকে স্কেল (Scale) বলা হয়। কোন একটি স্কেলের পাশাপাশি দুটি সংখ্যার বিয়োগফলই হলো সেই স্কেলের একক বা ইউনিট (Unit)। উপরে বর্ণিত প্রথম সারির একক হল ১ এবং দ্বিতীয় সারির একক হল ১০।

সাধারণত প্রত্যেক স্কেলের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য থাকে। প্রথম বৈশিষ্ট্যটি হল প্রত্যেক স্কেলে সংখ্যামানের দূরত্বে ব্যবধান একটি নির্দিষ্ট একক এবং দ্বিতীয় হল স্কেলটি আরম্ভ হবে শূন্য বিন্দু (Zero point) থেকে। যে কোন একটি মিটার বা স্কেল বা ফিতা লক্ষ্য করলে এ সত্য দুটির প্রমাণ মিলবে।

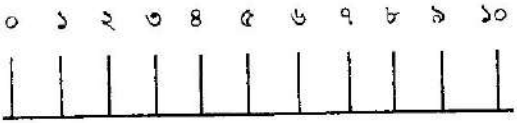

কিন্তু শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের ব্যবহৃত স্কেলে একক বা ইউনিট সমান থাকলে ও স্কেলটি শুধু শূন্য (Zero) থেকে হয় না। মনোবিজ্ঞানের স্কেল এককের দূরত্বের সমতা প্রকাশ করে না। সাধারণ স্কেলে দেখা যায় ২৫ এর দিগুণ ৫০। কিন্তু শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানে এরূপ বলা যাবে না। যোগ্যতা বা মানসিক দক্ষতার পরিমাপ একই কারণে শূন্য (Zero) হবে না। কোন ব্যক্তির যোগ্যতা (ability) শূন্যের কোঠায় আসতে পারে না।

চলক (Variable) : ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য, গুণ বা কর্মদক্ষতা পরিবর্তন বলে এদেরকে স্কোর দিয়ে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু যে সকল বৈশিষ্ট্য সকলের জন্য সমান, তা স্কোর দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। যেমন মানুষের দু'খানা হাত বা চার পা বিশিষ্ট- প্রাণী ইত্যাদি। কেবল স্কেল বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনশীল এবং সেগুলোকে স্কোর দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

সেগুলোকে সে কারণে চলক (Variable) বলা হয়। উদাহরণ ব্যক্তির বয়স, ওজন, জ
মৃত্যুর হার, সময়। চলক (Variable) দুই প্রকার ঃ

১। অবিচ্ছিন্ন সারি (Continuous Series)

২। বিচ্ছিন্ন সারি (Discrete Series)

অবিচ্ছিন্ন সারি ঃ দুটি স্কোরের মধ্যে যে ব্যবধান বা বিরতি থাকে তা যদি প্রয়োজন ম
কোন ক্ষুদ্রতম অংশে বিভক্ত করা চলে, তখন ঐ স্কোর গুচ্ছকে অবিচ্ছিন্ন সারি বলা যায়
যেমন ১ টাকা, ২ টাকা, ৩ টাকার মধ্যে অর্থবোধক ক্ষুদ্র অংশ কল্পনা করা যায়। সেগুলে
১.২৫, ২.৫০ ইত্যাদি দ্বারা প্রকাশ করা যায়।

বিচ্ছিন্ন সারি ঃ কিন্তু বিচ্ছিন্ন সারিতে দুটি স্কোরের মধ্যবর্তী ব্যবধানকে ক্ষুদ্রতম কে
অর্থবোধক অংশে প্রকাশ করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ ১ জন বালক, ২ জন বালক,
জন বালক। এদের মধ্যবর্তী ব্যবধান ১.৫০ জন বালক, ১.৭৫ জন বালক, ২.২৫ জ
বালক হবে না।

অবিচ্ছিন্ন সারিতে স্কোরের অর্থ

অবিচ্ছিন্ন সারিতে পর পর দুটি স্কোরের মধ্যে যে ব্যবধান সেটি প্রকৃতপক্ষে শূ
বা ফাঁকা জায়গা নয়। এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি স্কোরকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে,
ফাঁকা জায়গাটি ভরাট হয়ে যাবে। পরীক্ষায় প্রদত্ত স্কোরগুলোকে অবিচ্ছিন্ন ধারায় চলে
এ কারণে কোন স্কোরকে যথার্থ ঐ স্কোর না ধরে এর উচ্চতম ও নিম্নতম সীমা নির্ধা
করতে হবে। আবার স্কোরকে তার দুই সীমার মধ্যবর্তী একক দূরত্বকে বুঝাবে। ও
স্কোরটির প্রকৃত স্কোর হবে ৫৯.৫ থেকে ৬০.৫ পর্যন্ত যে, দূরত্ব তার ঠিক মধ্যবিন্দু। ও
স্কোরটির প্রকৃত মধ্যবিন্দু নিম্নে দেখান হলো।

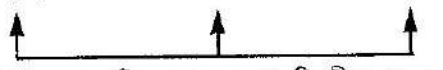

৬০ স্কোরটির সবচেয়ে নিচের ৫৯.৫ কে নিম্নসীমা (Lower limit) বলা হ
আবার সবচেয়ে উপরের সীমা ৬০.৫ কে উচ্চ সীমা (Upper Limit) বলা হ
অনুরূপভাবে যে কোন স্কোরকেই কল্পনা করা যেতে পারে।

অনুশীলনী-৪.২

১। ১০ মাইল দৌড় প্রতিযোগিতায় তুহিন ৫৫ মিনিটে, হাসেম ৫২ মিনিটে, শাহীন
মিনিটে, সুমন ৫৭ মিনিটে, রবিন ৬০ মিনিটে এবং সেলিম ৫৭ মিনিটে অতিক্রম করে

সম্মান ক্রম কত? ১ম, ২য়, ও ৩য় স্থান অধিকারীগণকে সারি বিন্যাস অনুসারে সজ্জিত করুন

২। নিম্নের বিষয়গুলো হতে চলকগুলো বের করুন-

ক কয়েকটি পাখীর ডানার সংখ্যা

খ. মইন গণিতে ৮৫ নম্বর পেয়েছে,

গ. একটি খাসীর ওজন ১৬ কেজি,

ঘ. মানুষের হাতের সংখ্যা,

ঙ. হাতীর পায়ের সংখ্যা.

চ. নকিবের বুদ্ধাঙ্ক-১১০

ছ. দৌড় প্রতিযোগিতায় হাবিব ৩০ সেকেন্ডে ৫০০ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছে।

জ. বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা।

৩। উপরে ২নং প্রশ্নের বৈশিষ্ট্যগুলো হতে কোনগুলোকে স্কোর দিয়ে প্রকাশ করা যায়?

৪। নিম্নোক্ত চলকগুলো হতে বিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছিন্ন সারি নির্দেশ করুন ঃ

ক. শিক্ষার্থীর বয়স

খ. পরীক্ষার খাতায় নম্বর প্রদান

গ. বুদ্ধাঙ্ক

ঘ. সময়

ঙ. পরিবারের লোকসংখ্যা

চ. একটি বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন স্কেল।

ছ. ক্রিকেটের রান সংখ্যা

জ. পাসপোর্ট নম্বর।

৫। নিম্নলিখিত স্কোরগুলোতে উচ্চসীমা ও নিম্নসীমা বের করুন ঃ

১, ৩, ৮, ৩৫, ৫০, ৬৪, ৭২, ৭৯, ৮৩, ৯০

পৌনঃপুন্য বণ্টন (Frequency distribution)

এক গুচ্ছ স্কোরকে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে এর মধ্যে কোন স্কোরটি মাত্র একবার এসেছে, কোনটি আবার একাধিকবার এসেছে, কোনটি আবার একবারও আসে নি। কোন একটি স্কোরের এ আবির্ভাবের বার বা সংখ্যাকে ঐ স্কোরের ফ্রিকোয়েন্সি বা পৌনঃপুন্য বলে। স্কোরটি একবারও আসেনি তার পৌনঃপুন্য ০। একগুচ্ছ স্কোরকে তাদের পৌনঃপুন্য অনুযায়ী সাজালে যে ছক বা বণ্টন পাওয়া যায় তাকেই পৌনঃপুন্য বণ্টন বলা হয়। আবার পরিসংখ্যানে এ জন্য কোন পরিমাপ থেকে প্রাপ্ত স্কোরগুলোকে ছোট ছোট দলে সাজিয়ে নিতে হয়। স্কোরগুলো সাজানো অবস্থায় না থাকলে সেগুলোকে অবিন্যস্ত (Ungrouped) স্কোর বলা হয় এবং সাজানো অবস্থায় থাকলে বিন্যস্ত (Grouped) স্কোর বলা হয়। সাধারণত পরিসংখ্যানে স্কোরগুলোকে যে নিয়মে সাজিয়ে সুশৃংখলভাবে রাখা হয়, তাকেই ফ্রিকোয়েন্সি বণ্টন (Frequency Distribution) বা পৌনঃপুন্য বণ্টন বলে।

পৌনঃপুন্য বণ্টন গঠনের নিয়ম

স্কোরগুলোকে পৌনঃপুন্য বণ্টনে সাজানোর সময় নিম্নের নিয়মগুলো অনুসরণ করতে হবে।

বিস্তৃতি বা রেঞ্জ (Range)

প্রথমেই স্কোরগুলোর বিস্তৃতি বা রেঞ্জ নির্ণয় করতে হয়। বিস্তৃতি বলতে বুঝায় স্কোরগুলো কতদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে অবস্থান করছে। স্কোরগুচ্ছের বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম স্কোরের ব্যবধান বা সারির সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন স্কোরের পার্থক্যকে বিস্তৃতি (Range) বলে। বিস্তৃতি বা (Range) = (বৃহত্তম স্কোর-ক্ষুদ্রতম স্কোর) +১

শ্রেণি ব্যবধান (Class Internal)

দ্বিতীয়তঃ স্কোরগুলোকে সাজানোর জন্য এদের কতকগুলো ছোট ছোট সুনির্দিষ্ট দল বা শ্রেণিতে ভাগ করতে হয়। এগুলোকে শ্রেণি ব্যবধান (Class Interval) বলে। একটি বণ্টনে শ্রেণি ব্যবধানের সংখ্যা কত হবে এবং প্রত্যেকটি শ্রেণি ব্যবধানের আয়তন কত হবে তা আগেই ঠিক করে নিতে হয়। শ্রেণি ব্যবধানের দৈর্ঘ্য সংখ্যা সাধারণত স্কোরের বিস্তার এবং কিছুটা স্কোরের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। কোন বণ্টনে শ্রেণি ব্যবধানের সংখ্যা ৭ হতে ২০ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখাই শ্রেয়। ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ১০, এবং ২০ এর যে কোন একটি শ্রেণি ব্যবধানের দৈর্ঘ্য বা আকৃতি বলা হয়। ইংরেজি ছোট হাতের

অক্ষর দ্বারা (i) শ্রেণী ব্যবধান দৈর্ঘ্য বা আকৃতি প্রকাশ করা যায়। স্কোর গুচ্ছের বিস্তৃতি অনুযায়ী শ্রেণি ব্যবধান দৈর্ঘ্য ও শ্রেণি ব্যবধান সংখ্যা প্রয়োজন মাফিক আগেই ঠিক করে নিতে হয়। স্কোরের বিস্তৃতি ও শ্রেণি ব্যবধান দৈর্ঘ্য হতে শ্রেণি ব্যবধান সংখ্যা নিচের সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়।

$$\text{শ্রেণি ব্যবধান সংখ্য} = \frac{\text{বিস্তৃতি}}{\text{শ্রেণি ব্যবধান দৈর্ঘ্য}}$$

ট্যালী (Tallies)

তৃতীয়ত ঃ প্রত্যেকটি স্কোর যে শ্রেণি ব্যবধানের অন্তর্ভুক্ত সেই শ্রেণি ব্যবধানে সেটিকে তালিকাভুক্ত করতে হয়। তালিকাভুক্ত করার সময় শ্রেণি ব্যবধানের স্কোরটি অন্তর্ভুক্ত হবে সেই শ্রেণি ব্যবধানের পাশে স্কোরটির জন্য একটি দাগ দিতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তালিকাভুক্ত স্কোরটিকে ক্রস চিহ্ন দিয়ে রাখতে হবে যাতে স্কোরটি পুনরায় অন্তর্ভুক্ত হতে না পারে। এভাবে ট্যালী দাগ কেটে দিতে হবে। প্রত্যেকটি স্কোরকে তার নির্দিষ্ট শ্রেণিব্যবধানের আওতাভুক্ত করতে হবে। ঐ দাগ গুলোকে গণনা করলেই জানা যাবে এক একটি শ্রেণী ব্যবধানে কতটি করে স্কোর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ ধরনের দাগ গুলোকে ট্যালী বলে। এভাবে স্কোরগুলোর যে বিন্যস্ত রূপটি পাওয়া যায় তাকেই পৌনঃপুন্য বণ্টন বলে। প্রত্যেক শ্রেণি ব্যবধানের স্কোরগুলোর আবির্ভাবের সংখ্যাকে পৌনঃপুন্য বলে এবং ইহা f অক্ষর দ্বারা সূচিত হয়।

নিচে পৌনঃপুন্য বণ্টন গঠনের কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো।

উদাহরণ-১

৫৩, ৭০, ৮৬, ৬৪, ৩৮,৪০, ৪৫, ৫৬, ৫৯, ৫০,

৪৩, ৪৬, ৫৪, ৪৭, ৯৩, ৮০, ৭৫, ৬৯, ৪৮, ৪৪,

৬১, ৬৪, ৮৮, ৭৫, ৭৬, ৮৪, ৫৫, ৫৮, ৮০,

৭৭, ৬৩, ৬৬, ৫৭, ৬৪, ৬৭, ৬১, ৫০, ৫৬, ৬৮,

৬৬, ৭৪, ৬৪, ৫৫, ৬৪,, ৭৩, ৭২, ৬৩, ৬২,

প্রথমে স্কোরগুলোর বিস্তৃতি বের করতে হবে। বৃহত্তম স্কোর ৯৩ থেকে ক্ষুদ্রতম স্কোর ৩৮ বিয়োগ করে বিয়োগ ফলের সঙ্গে এক যোগ করতে হবে। উপরের স্কোরগুলোতে ৯৩, এর উর্ধ্ব সীমা হল ৯৩.৫ এবং ৩৮ এর নিম্ন সীমা ৩৭.৫।

সুতরাং বিস্তৃতি = বৃহত্তম স্কোর- ক্ষুদ্রতম স্কোর

= ৯৩.৫ - ৩৭.৫ = ৫৬

সংক্ষেপে, বিস্তৃতি = (বৃহত্তম স্কোর-ক্ষুদ্রতম স্কোর) + ১

= (৯৩ - ৩৮) + ১

= ৫৬।

দ্বিতীয় ধাপে শ্রেণি ব্যবধান বের করে ব্যবধান সংখ্যা নির্ণয় করতে হয়। এখানে শ্রেণি ব্যবধান ৫ নেয়া হলে শ্রেণি ব্যবধান সংখ্যা মোটামুটি ১২ টি হবে।

$$\text{শ্রেণি ব্যবধান সংখ্যা} = \frac{\text{বিস্তৃতি}}{\text{শ্রেণি ব্যবধান দৈর্ঘ্য}} = \frac{৫৬}{৫} = ১১.২$$

১১.২ একটি অবিচ্ছিন্ন সংখ্যা। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কোন ভগ্ন শ্রেণি ব্যবধান সংখ্যা দিয়ে সাধারণত পরিসংখ্যানে কোন পদ্ধতিতে ব্যবহার হয় না। শ্রেণি ব্যবধান সংখ্যা ভগ্নাংশের জন্য পূর্ণ সংখ্যা ধরে নিতে হয়। এখানে ১১.২ টি শ্রেণি ব্যবধান সংখ্যার পরিবর্তে ১২টি হবে।

শ্রেণি ব্যবধানের শুরু

প্রদত্ত স্কোর গুচ্ছের মধ্যে সর্বনিম্ন স্কোর নিয়ে শ্রেণি ব্যবধান শুরু করা হলেও পৌনঃপুন্য বণ্টন গঠন করতে একটি সাধারণ নিয়ম মেনে চলতে হয়। যে দৈর্ঘ্যের শ্রেণি ব্যবধান নেয়া হবে তার যে গুণিতকটি স্কোর গুচ্ছের সর্বনিম্ন স্কোরের নিকটতম হবে, সেটি দিয়ে শ্রেণি ব্যবধান আরম্ভ করা সুবিধাজনক। স্কোরগুচ্ছের সর্বনিম্ন স্কোর ২০, শ্রেণি ব্যবধান দৈর্ঘ্য -৩ নিলে ১৮ দিয়ে শ্রেণি ব্যবধান শুরু করতে হবে। আর যদি সর্বনিম্ন স্কোর ৪৩ হয় তবে শ্রেণি ব্যবধান দৈর্ঘ্য ৩ এর জন্য শ্রেণি ব্যবধান ৪২ থেকে শুরু। আবার শ্রেণি ব্যবধান দৈর্ঘ্য ৫ হলে, শ্রেণি শুরু করতে হবে ৪০ থেকে। যদি সর্বনিম্ন স্কোর ৩৮ হয় আর শ্রেণিব্যবধান দৈর্ঘ্য ৩, ৪, ৬, হলে শ্রেণি ব্যবধান শুরু হবে ৩৬ থেকে শ্রেণি ব্যবধান দৈর্ঘ্য ৫ এর জন্য ৩৫ থেকে এবং ১০ এর জন্য ৩০ থেকে শ্রেণি শুরু হবে।

১নং টেবিল ঃ

শ্রেণি ব্যবধান	ট্যালি	পৌনঃপুন্য
৯০-৯৪	/	১
৮৫-৮৯	//	২
৮০-৮৪	///	৩
৭৫-৭৯	////	৪
৭০-৭৪	////	৪

৩২-৩৯	///\ /	৬
৩০-৩৪	///\ ///\	১০
২৫-২৯	///\ //	৭
২০-২৪	///\	৫
১৫-১৯	////	৪
১০-১৪	///	৩
০৫-০৯	/	১
		N = ৫০

পৌনঃপুন্য বণ্টনের প্রথম স্তম্ভটিতে (Column) শ্রেণি ব্যবধানের সবচেয়ে ক্ষুদ্র স্কোরটি সর্বনিম্নে তার উপরে তার চেয়ে বড়টি, এমনিভাবে সবার উপর সবচেয়ে বড় স্কোরটি অবস্থান করে। প্রত্যেকটি শ্রেণি ব্যবধানে পাঁচটি করে স্কোর আছে। যেমন ৩৫-৩৯ প্রথম শ্রেণি ব্যবধানে ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯ এ ৫টি স্কোর, দ্বিতীয় শ্রেণি ব্যবধানে ৪০-৪৪ এর মধ্যে ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪ এ পাঁচটি করে স্কোর আছে। আবার সর্বশেষ শ্রেণি ব্যবধান ৯০-৯৪ এ ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪ এ ৫টি স্কোর। পৌনঃপুন্য বণ্টনের দ্বিতীয় স্তম্ভের ধাপগুলোকে ট্যালী বলে। ট্যালীদাগের মাধ্যমে স্কোরগুলোকে নির্দিষ্ট শ্রেণি ব্যবধান অর্ন্তভুক্ত করা হয়। যখনই একটি স্কোরকে এর নির্দিষ্ট শ্রেণি ব্যবধানে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হয়, তখনই তার জন্য একটি ট্যালী দাগ দিতে হয়। এভাবে প্রদত্ত অবিন্যস্ত স্কোরমালার প্রথম স্কোরটি ৫৩, ৫০-৫৪ শ্রেণি ব্যবধানে অন্তর্ভুক্ত হবে, দ্বিতীয় স্কোর ৭০, ৭০-৭৪ শ্রেণি ব্যবধানে অন্তর্ভুক্ত হবে। এভাবে ৫০টি স্কোরকে পর পর ট্যালি দাগ কেটে নিজ নিজ শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তালিকাভুক্ত প্রত্যেক শ্রেণি নিজ নিজ শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তালিকাভুক্ত প্রত্যেক শ্রেণি ব্যবধানের ট্যালীগুলিকে যোগ করে পৌনঃপুন্যের সংখ্যা পাওয়া গেল। যেমন ৩৫-৩৯ শ্রেণি ব্যবধান মাত্র একটি স্কোর তালিকাভুক্ত হয়েছে। তার পৌনঃপুন্য বা f হলো ১, এরূপে ৪০-৪৪ শ্রেণি ব্যবধানে পৌনঃপুন্য হলো ৩, ৪৫-৪৯ শ্রেণি ব্যবধানে ৪, ৬০-৬৪ শ্রেণি ব্যবধানে ১০ ইত্যাদি। প্রত্যেক শ্রেণির পৌনঃপুন্য তৃতীয় স্তম্ভে f দ্বারা সুচীত হয়েছে। শ্রেণির পৌনঃপুন্যের সমষ্টি N দ্বারা সূচিত হয়েছে। এখানে N দ্বারা মোট স্কোর বুঝায়। ফলে N =৫০ দেখানো হয়েছে।

উদাহরণ-২

৭৩, ৪৮, ৫৭, ৪৭, ৬০, ৫৩, ৬৪, ৬৯, ৪৯, ৬৫,

৬২, ৫৭, ৫০, ৬৮, ৭১, ৫৯, ৬২, ৫১, ৫৭, ৭০,

৬৪, ৫২, ৬৫, ৬১, ৫৭, ৬৮, ৬৪, ৭৮, ৫৪,

৭২, ৭৯, ৮২, ৫৮, ৬১, ৬৬, ৫৭, ৬০, ৫৮, ৭০

উপরে বর্ণিত অবিন্যস্ত স্কোরগুলোকে বিন্যস্ত করা হলো।

এখানে সর্বোচ্চ স্কোর ৮২ এবং সর্বনিম্ন ৪৭

এখানে বিস্তৃতি = ৮২.৫ - ৪৬.৫ = ৩৬

সংক্ষেপে বিস্তৃতি = (৮২ - ৪৭) + ১

= ৩৫ + ১ = ৩৬।

শ্রেণি ব্যবধান দৈর্ঘ্য = ৩ ধরলে

$$\text{শ্রেণি ব্যবধান সংখ্যা} = \frac{\text{বিস্তৃতি}}{\text{শ্রেণি ব্যবধান দৈর্ঘ্য}} = \frac{৩৬}{৩} = ১২$$

প্রত্যেকটি স্কোরকে তাদের নির্দিষ্ট শ্রেণি ব্যবধানে সরাসরি লিখে ট্যালি দাগে মাধ্যমে নির্দিষ্ট শ্রেণি ব্যবধানে তালিকাভুক্ত করা হলো এবং স্কোরগুলো কতবার এসেছে তা লিপিবদ্ধ করা হলো।

২নং টেবিল

শ্রেণি ব্যবধান	স্কোর	ট্যালি	পৌনঃপুন
৮১ - ৮৩	৮২	/	১
৭৮ - ৮০	৭৮, ৭৯	//	২
৭৫ - ৭৭			০
৭২ - ৭৪	৭৩, ৭২	//	২
৬৯ - ৭১	৬৯, ৭১, ৭০, ৭০	////	৪
৬৬ - ৬৮	৬৮, ৬৮, ৬৬	///	৩
৬৩-৬৫	৬৪, ৬৫, ৬৪, ৬৫, ৬৪	~~///~~	৫
৬০ - ৬২	৬০, ৬২, ৬২, ৬১, ৬১, ৬০	~~///~~ /	৬
৫৭ - ৫৯	৫৭, ৫৭, ৫৯, ৫৭, ৫৭, ৫৮, ৫৭, ৫৮	~~///~~ ///	৮
৫৪-৫৬	৫৪	/	১
৫১-৫৩	৫৩, ৫১, ৫২	///	৩
৪৮-৫০	৪৮, ৪৯, ৫০, ৫০	////	৪
৪৫-৪৭	৪৭	/	১

N = ৪০

শ্রেণি ব্যবধানের সীমা নির্ণয়

পৌনঃপুন্য বণ্টনে স্কোরগুলোকে তালিকাভুক্ত করার সময় শ্রেণি ব্যবধানগুলোর প্রকৃত প্রান্ত বা সীমা নির্ণয় করে নিতে হয়। যে কোন একটি স্কোর কোন শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত হবে তা প্রত্যেকটি শ্রেণির নিম্ন প্রান্ত বা ঊর্ধ্ব প্রান্ত বিচার করে ঠিক করে নিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ ৩৫-৩৯ শ্রেণির সব চেয়ে নিচে ৩৫ স্কোরটি এবং উপরে ৩৯ স্কোরটি। অনুরূপভাবে ৪০-৪৫ শ্রেণিটির ব্যাখ্যা করলে ৩৯.৫ - ৪৪.৫, ৪৫ - ৪৯ শ্রেণিটির ৪৪.৫ - ৪৯.৫, ৫০ - ৫৪ শ্রেণিটির ৪৯.৫ - ৫৪.৫ ইত্যাদি। কোন স্কোরটি কোন শ্রেণি ব্যবধানে তালিকাভুক্ত হবে তা নির্ণয় করতে উপরে বর্ণিত নিয়মগুলো অনুসরণ করতে হবে।

শ্রেণি ব্যবধানের মধ্যবিন্দু (Midpoint) নির্ণয়

সাধারণত যে কোন শ্রেণি ব্যবধানের প্রতিনিধিমূলক মানরূপে ঐ শ্রেণি ব্যবধানটির মধ্যবিন্দুটিকে গ্রহণ করা হয় এবং ঐ শ্রেণির অনুগত স্কোরগুলোর প্রত্যেকটির মান ঐ মধ্যবিন্দুর সমান হিসাবেই গণ্য করা হয়। ইতিপূর্বে গঠিত ১ নম্বর টেবিল এর পৌনঃপুন্য বণ্টনটিতে ৪০-৪৪ শ্রেণিতে ৩টি স্কোর তালিকাভুক্ত হয়েছে। এ ৩টি স্কোরের প্রতিনিধিত্বকারী একটি স্কোর বের করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে ঐ শ্রেণির ৩টি স্কোরের মান হল ঐ শ্রেণি ব্যবধানের মধ্যবিন্দু ৪২। মধ্যবিন্দু নির্ণয়ের সূত্র ঃ

$$\text{মধ্যবিন্দু} = \text{শ্রেণী ব্যবধানের নিম্নতম সীমা} + \frac{\text{শ্রেণি ব্যবধানের উচ্চতম সীমা} - \text{শ্রেণি ব্যবধানের নিম্নতম সীমা}}{২}$$

উপরের সূত্রটি ব্যবহার করে ৪০-৪৪ শ্রেণি ব্যবধানের মধ্যবিন্দু

$$= ৩৯.৫ + \frac{৪৪.৫ - ৩৯.৫}{২}$$

$$= ৩৯.৫ + \frac{৫}{২}$$

$$= ৩৯.৫ + ২.৫$$

$$= ৪২$$

মধ্যবিন্দু নির্ণয়ের সূত্র ঃ-

$$\text{মধ্যবিন্দু} = \frac{\text{শ্রেণি ব্যবধানের নিম্নতম সীমা} + \text{শ্রেণি ব্যবধানের উচ্চতম সীমা}}{২}$$

উক্ত সূত্র অনুযায়ী ৪০-৪৪ শ্রেণি ব্যবধানের মধ্যবিন্দু

$$= \frac{৩৯.৫+৪৪.৫}{২} = \frac{৮৪.০০}{২} = ৪২.০০ = ৪২$$

শ্রেণি ব্যবধান গঠনের তিনটি পদ্ধতি

শ্রেণি ব্যবধান কিভাবে গঠন করা হয়, তা একটি পদ্ধতির মাধ্যমে বর্ণনা ক হয়েছে। এছাড়াও আরো দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করে শ্রেণি ব্যবধান গঠন করা যায় যেমন ৩৫-৪০ এ শ্রেণি ব্যবধান (ক) ৩৫ থেকে ৪০ (খ) ৩৪.৫ থেকে ৩৯.৫ এবং (গ ৩৫ থেকে ৩৯, এ তিন ধরনের পদ্ধতিতে লেখা যায়। এদের মধ্যে (খ) পদ্ধতি সবচেয়ে নির্ভুল কিন্তু এটি লিখতে সময় এবং শ্রম বেশি লাগে। সাধারণত (ক) ও (গ পদ্ধতিদ্বয় অনুসরণ করা হয়। এ বইতে (গ)'র পদ্ধতিটিই অনুসৃত হবে। ১ নম্ব টেবিলের পৌনঃপুন্য বন্টনকে নিম্নে সাজানো হলো।

ক পদ্ধতি			খ পদ্ধতি			গ পদ্ধতি		
শ্রেণি ব্যবধান	মধ্যবিন্দু	পৌনঃপুন্য	শ্রেণি ব্যবধান	মধ্যবিন্দু	পৌনঃপুন্য	শ্রেণি ব্যবধান	মধ্যবিন্দু	পৌনঃপুন্য
৯০ – ৯৫	৯২	১	৮৯.৫ – ৯৪.৫	৯২	১	৯০ – ৯৪	৯২	১
৮৫ – ৯০	৮৭	২	৮৪.৫ – ৮৯.৫	৮৭	২	৮৫ – ৮৯	৮৭	২
৮০ – ৮৫	৮২	৩	৭৯.৫ – ৮৪.৫	৮২	৩	৮০ – ৮৪	৮২	৩
৭৫ – ৮০	৭৭	৪	৭৪.৫ – ৭৯.৫	৭৭	৪	৭৫ – ৭৪	৭৭	৪
৭০ – ৭৫	৭২	৪	৬৯.৫ – ৭৪.৫	৭২	৪	৭০ – ৭৪	৭২	৪
৬৫ – ৭০	৬৭	৬	৬৪.৫ – ৬৯.৫	৬৭	৬	৬৫ – ৬৯	৬৭	৬
৬০ – ৬৫	৬২	১০	৫৯.৫ – ৬৪.৫	৬২	১০	৬০ – ৬৪	৬২	১০
৫৫ – ৬০	৫৭	৭	৫৪.৫ – ৫৯.৫	৫৭	৭	৫৫ – ৫৯	৫৭	৭
৫০ – ৫৫	৫২	৫	৪৯.৫ – ৫৪.৫	৫২	৫	৫০ – ৫৪	৫২	৫
৪৫ – ৪৫	৪৭	৪	৪৪.৫ – ৪৯.৫	৪৭	৪	৪৫ – ৪৯	৪৭	৪
৪০ – ৪৫	৪২	৩	৩৯.৫ – ৪৪.৫	৪২	৩	৪০ – ৪৪	৪২	৩
৩৫ – ৪০	৩৭	১	৩৪.৫ – ৩৯.৫	৩৭	১	৩৫ – ৩৯	৩৭	১
		N = ৫০			N = ৫০			N = ৫০

পৌনঃপুন্য বণ্টনের উদ্দেশ্য

১। পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত কোন স্কোরগুচ্ছের বিভিন্ন উপাদান ও তার তাৎপর্যপূর্ণ ধারণ পরীক্ষকের সামনে পুনর্বণ্টনের আকারে তুলে ধরাই পৌনঃপুন্য বণ্টনের অন্যত প্রধান উদ্দেশ্য।

২। পৌনঃপুন্য বণ্টনের শ্রেণি ব্যবধানগুলোর কোন একটি নির্দিষ্ট স্কোর অন্যান্য কোন স্কোরের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ণয়ে সাহায্য করা।

৩। পৌনঃপুন্য বণ্টনকে লেখচিত্রে প্রকাশ করা।

৪। পৌনঃপুন্য বণ্টন হতে প্রদত্ত স্কোরগুলোর একটা সাধারণ ছবি পাওয়া যায় অধিকাংশ স্কোরগুলোকে পৌনঃপুন্য বন্টনটির মাঝামাঝি শ্রেণি ব্যবধানে আবর্তি হতে দেখা যায়। আবার অতি নিম্ন বা অতি উচ্চ স্কোরকে বণ্টনের উভয় দি প্রান্তভাগে অবস্থান করতে দেখা যায়।

অনুশীলনী-৪.৩

১। পৌনঃপুন্য বণ্টন বলতে কি বোঝেন?

২। সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ যথাক্রমে ২৩ ও ৮৪ হলে বিস্তৃতি বা রেঞ্জ কত হবে?

৩। শ্রেণি ব্যবধান সংখ্যা কিভাবে বের করা হয়?

৪। কোন এক স্কোরগুচ্ছের সর্বনিম্ন স্কোর ও শ্রেণিব্যবধান যথাক্রমে ৫৬ ও ৩, ৫ বা ১০ হয় তাহলে কোন কোন স্কোর দিয়ে শ্রেণি ব্যবধান তিনটি শুরু করবেন?

৫। মধ্যবিন্দু নির্ণয় করুন ঃ

ক. ০-৭	ঘ. ৭৩-৭৭	ছ. ১০০-১০৪
খ. ১-৫	ঙ. ৮০-৮৯	জ. ১২১-১২৬
গ. ১৫-১৭	চ. ৯০-৯৫	ঝ. ১৪০-১৪৯

৬। নিম্নে প্রদত্ত অবিচ্ছিন্ন স্কোরগুচ্ছটিকে পৌনঃপুন্য বণ্টনে সাজান। প্রথম শ্রেণি শুরু করবে (৫০-৫৪) শ্রেণিব্যবধানটি দিয়ে।

৬৭, ৯২, ৫৯, ৫৭, ৭২, ৮৩, ৭৭, ৭৮, ৬৯, ৫৯,
৮৮, ৭৮, ৭১, ৬০, ৭৩, ৫০, ৫৮, ৬৩, ৭৯, ৮৪,
৮৭, ৭০, ৬৪, ৫৭, ৬২, ৬, ৬৬, ৬১, ৫৭, ৭১.

৬৪, ৬৯, ৭৩, ৬২, ৫৭, ৭৬, ৬০, ৭৫, ৫৬, ৫৪,

৫৮, ৮৬, ৭১, ৬৬, ৫৯, ৮২, ৭৪. ৬৫, ৭৩, ৬৮।

৭। নিম্নলিখিত বিস্তৃতিগুলির পৌনঃপুন্য বণ্টন গঠন করতে শ্রেণি ব্যবধান দৈর্ঘ্য ও শ্রেণী ব্যবধানের সংখ্যা নির্ণয় করুন।

বিস্তৃতি	শ্রেণি ব্যবধান দৈর্ঘ্য	শ্রেণি ব্যবধান সংখ্যা
ক. ১৩ থেকে ৮৯		
খ. ৪২ থেকে ১৩২		
গ. ০ থেকে ৩৬		
ঘ. ১০ থেকে ৩১১		
ঙ. ৩৩ থেকে ৭৩		

৮। নিম্নে প্রদত্ত স্কোরগুচ্ছটিকে একটি পৌনঃপুন্য বণ্টনে সাজাবেন। এখানে i = ৩ এবং সর্বনিম্ন শ্রেণি ব্যবধানটি ৪২ দিয়ে শুরু করবেন।

৪৭, ৫০, ৬৩, ৪২, ৭৫, ৪৮, ৫৬, ৬৪, ৬৯, ৭৩, ৫২, ৪৬, ৫৮, ৪৭, ৬২, ৭০, ৪৩, ৫৭, ৫৯, ৫১, ৭২, ৮২, ৫৮, ৪৮, ৫১, ৬২, ৭৪, ৭০, ৭৬, ৫০,

পৌনঃপুন্য বহুভুজ ও আয়তলেখ

কোন পরীক্ষায়প্রাপ্ত স্কোরগুচ্ছকে তাদের পৌনঃপুন্য অনুযায়ী সাজিয়ে যে পৌনঃপুন্য বণ্টন গঠন করা হয় তাকে নানা উপায় লেখচিত্রের রূপান্তর করা যায়। এ ধরনের দুটি প্রচলিত পদ্ধতির নাম হলো পৌনঃপুন্য বহুভুজ (Frequency Polygon) ও আয়তলেখ (Histogram).

পৌনঃপুন্য বহুভুজ অঙ্কনের নিয়ম

পৌনঃপুন্য বহুভুজ অঙ্কন করতে হলে প্রথমেই ছক কাগজে (Graph Paper) আনুভূমিক ও উলম্ব রেখা আঁকতে হবে। এটিকে বীজগণিতের লেখচিত্রের ন্যায় X অক্ষরেখা ও Y অক্ষরেখা বলা হয়।

এখানে আনুভূমিক রেখা বা X অক্ষরেখার উপর শ্রেণি ব্যবধানগুলো পরপর বসাতে হবে এবং Y অক্ষরেখা বা উলম্ব রেখার উপর পৌনঃপুন্যগুলো বসাতে হবে। শ্রেণিব্যবধানগুলোর প্রকৃত প্রান্তবিন্দু উল্লেখ করে বসাতে হয়।

ছক কাগজে প্রত্যেকটি শ্রেণিব্যবধানের অন্তর্ভুক্ত পৌনঃপুন্যগুলো নির্দিষ্ট একক ধ
অবস্থান নির্ণয় করে রেখা আঁকাতে হবে। ১নং টেবিল এর পৌনঃপুন্য বণ্টনটি
উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করা হল। এখানে ৩৫-৩৯ (অর্থাৎ ৩৪.৫-৩৯.৫) শ্রেণিটি
পৌনঃপুন্য হল ১। এটি আঁকতে হলে প্রথমে X অক্ষরেখায় ঐ শ্রেণির মধ্যবিন্দু ৩
স্কোরে পৌছতে হবে। এরপর ঐ বিন্দুর উপর Y লম্বভাবে অক্ষরেখার সমান্তরাল কে
১ একক ঘর উপরের দিকে গুণে যে বিন্দুটি পাওয়া যায়, সেইটি হচ্ছে শ্রেণি ব্যবধানটি
পৌনঃপুন্য বণ্টনের চিত্ররূপ। অনুরূপভাবে এর পরের শ্রেণি ব্যবধানটি ৪০-৪৪ (অর্থা
৩৯.৫-৪৪.৫) এর অন্তর্ভুক্ত ৩টি স্কোর ছক কাগজে স্থাপন করতে হবে। ঐ শ্রেণি
ব্যবধানটির ঠিক উপরে Y অক্ষরেখা সমান্তরাল ৩ একক ঘর পৌনঃপুন্যসমূহের অবস্থান
বের করা হল। এভাবে সবগুলো শ্রেণিব্যবধানের পৌনঃপুন্যটির অবস্থান বের করা হল
সবগুলো শ্রেণিব্যবধানের পৌনঃপুন্যসমূহের অবস্থান ছক কাগজে বিন্দু হিসাবে স্থাপন
করে নিতে হলো। প্রত্যেকটি বিন্দু সরল রেখা দ্বারা যোগ করা হল। এখন যে চিত্ররূপ
পাওয়া গেল উহাই পৌনঃপুন্য বহুভুজ।

পৌনঃপুন্য বহুভুজ

পৌনঃপুন্য বহুভুজ

পৌনঃপুন্য বহুভুজে প্রত্যেকটি শ্রেণি ব্যবধানের মধ্যবিন্দুকেই ঐ শ্রেণির প্রতিনিধি সূচক বিন্দু বলে ধরে নিতে হবে। মধ্যবিন্দুর উপর লম্বরেখাতেই পৌনঃপুন্যের বিন্দুটিস্থাপন করতে হবে। পৌনঃপুন্য বহুভুজের ক্ষেত্রে পৌনঃপুন্য সূচক বিন্দুগুলোকে সরল রেখা দিয়ে যোগ করলে যে লেখটি (Graph) পাওয়া যাবে সেটি X অক্ষরেখা বা আনুভূমিক রেখাকে স্পর্শ করে না এবং কিছুটা উপরে অবস্থান করে। এ কারণে লেখচিত্রকে সম্পূর্ণ করার জন্য X অক্ষরেখার বাম প্রান্তে একটি শ্রেণি ব্যবধান এবং ডান প্রান্তে আর একটি শ্রেণি ব্যবধান বেশি নেয়া হয়ে থাকে। এ অতিরিক্ত দুটি শ্রেণি ব্যবধানের পৌনঃপুন্য স্বাভাবিক ভাবেই ০ (শূন্য) এবং সে কারণে এদের মধ্য বিন্দুগুলো অক্ষরেখা বা আনুভূমিক রেখা উপরে অবস্থান করবে। এ দুটি বিন্দুর সঙ্গে লেখ চিত্রটিকে সংযুক্ত করলে একটি পূর্ণাঙ্গ পৌনঃপুন্য বহুভুজ তৈরি হবে। পৌনঃপুন্য বহুভুজের দৈর্ঘ্য ও বিস্তারের অনুপাত সাধারণত বহুভুজের উচ্চতা যেন তার অধঃভূমির প্রস্থ বা দৈর্ঘ্যের ৭৫% বা এর কাছাকাছি হয়। একে ৭৫% এর নিয়ম বলা হয়।

স্তম্ভলেখ বা আয়তলেখ (Histogram) অঙ্কনের নিয়ম

পৌনঃপুন্য বণ্টনের আর এক ধরনের চিত্ররূপকে স্তম্ভ লেখ বা আয়তলেখ বলা হয়। ১নং টেবিলের পৌনঃপুন্য বণ্টনটিকে আবার আয়তলেখ আঁকা যায়। অঙ্কনের জন্য পূর্বের ন্যায় ছক কাগজের আনুভূমিক বা অক্ষরেখা এবং উলম্ব বা Y অক্ষরেখা শ্রেণি বিন্দুগুলোকে মূলবিন্দু O ধরে নিতে হয়। ছক কাগজে X অক্ষরেখার উপর শ্রেণি ব্যবধানগুলো এবং Y অক্ষরেখার উপর পৌনঃপুন্য চিহ্নিত করা হল। প্রত্যেকটি শ্রেণিব্যবধানের পৌনঃপুন্য সূচক বিন্দুটি Y অক্ষরেখায় গুণে সঠিকভাবে স্থাপন করলে এবং এই বিন্দুটিকে উচ্চ সীমা ধরে X অক্ষরেখায় ঐশ্রেণি ব্যবধানটি দৈর্ঘ্য প্রত্যেকটি আয়তক্ষেত্রের বিস্তার বা প্রস্থ আবার সবগুলো শ্রেণি ব্যবধান দৈর্ঘ্য সমান বলে ঐ আয়তক্ষেত্র গুলোর প্রস্থ বা বিস্তার সর্ব ক্ষেত্রেই সমান হবে। কিন্তু প্রত্যেকটি শ্রেণি ব্যবধানের তালিকাভুক্ত পৌনঃপুন্যের সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন বলে আয়তক্ষেত্রের উচ্চতা বিভিন্ন হবে।

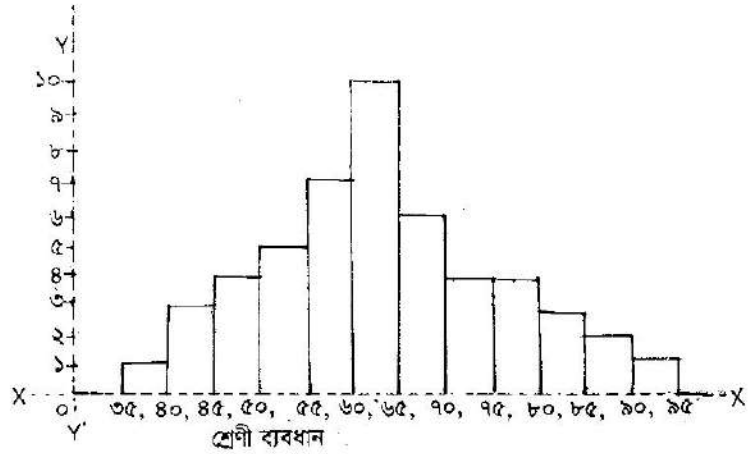

আয়তলেখ

আলোচ্য পৌনঃপুন্য বণ্টনটির প্রথম শ্রেণি ব্যবধান ৩৫-৩৯ (অর্থাৎ ৩৪.৫-৩ এর পৌনঃপুন্য-১। অতএব ঐ শ্রেণি ব্যবধানের উপর Y অক্ষরেখার এক একক নির্ণয়ে একটি আয়তক্ষেত্র টানা হলো। অনুরূপ ভাবে ৪০-৪৪ (অর্থাৎ ৩৯.৫-৪ শ্রেণিব্যবধানের পৌনঃপুন্য-৩। ছক কাগজে আনুভূমিক রেখায় ৩৫-৪০, ৪০-৪৫, ৫০ ইত্যাদি শ্রেণি ব্যবধান চিহ্নিত করা হয়েছে। এর আসল অর্থ হচ্ছে প্রকৃত ব্যবধান যথা ৩৫-৩৯, ৪০-৪৪, ৪৫-৪৯ ইত্যাদি। অতএব, ছক কাগজে এ ব্যবধানের উপর Y অক্ষরেখায় ৩ একক ঘর গুণে X অক্ষরেখার উপর আর আয়তক্ষেত্র আঁকি। এভাবে সবগুলো শ্রেণি ব্যবধানের উপর আয়তক্ষেত্র অঙ্কন ক বণ্টনটির স্তম্ভ লেখ পাওয়া যাবে।

পৌনঃপুন্য বহুভুজ ও আয়তলেখ উভয় লেখচিত্রের জন্যই প্রত্যেকটি ব্যবধানের পৌনঃপুন্য দ্বারা অধিকৃত স্থানের পরিসীমা বুঝাবার কোন ব্যবস্থা নেই পৌনঃপুন্য বহুভুজ ও আয়তলেখ এ দু'য়ের ক্ষেত্রেই লেখচিত্রের মধ্যবর্তী ক্ষেত্রটি বণ্টনের সমগ্র পৌনঃপুন্য (যার নাম N) বুঝায় কিন্তু আয়তলেখের প্রত্যেকটি আয়ত এক একটি শ্রেণি ব্যবধানের অন্তর্গত পৌনঃপুন্য দ্বারা অধিকৃত স্থানকে বুঝিয়ে এ ক্ষেত্রে পৌনঃপুন্য বহুভুজের তুলনায় আয়তলেখ সমগ্র পৌনঃপুন্যের (বা N) প্রত্যেকটি শ্রেণি ব্যবধানের পৌনঃপুন্যের অনুপাতের নিখুঁত ধারণা দেয়।

পৌনঃপুন্য বহুভুজ ও আয়তলেখের অভিস্থাপন

একই অক্ষরেখার উপর একই বা বিভিন্ন বণ্টনের দুটি পৌনঃপুন্য বহুভুজ বা দুটি আয়তলেখ অথবা একটি পৌনঃপুন্য বহুভুজ এবং একটি আয়তলেখ অঙ্কন করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে দুটি বিভিন্ন পৌনঃপুন্য বণ্টনের তুলনা করা যেতে পারে। এ ধরনের অভিস্থাপন দ্বারা দুটি বণ্টনের অত্যন্ত সঠিক একটি তুলনামূলক ধারণা পাওয়া যায়।

একই বণ্টনের পৌনঃপুন্য বহুভুজ ও আয়তলেখের অভিস্থাপন নিম্নে দেখানো হলো। ৩ নম্বর টেবিলের 'ক' বণ্টন অনুসারে উহাদের অঙ্কন করা গেল।

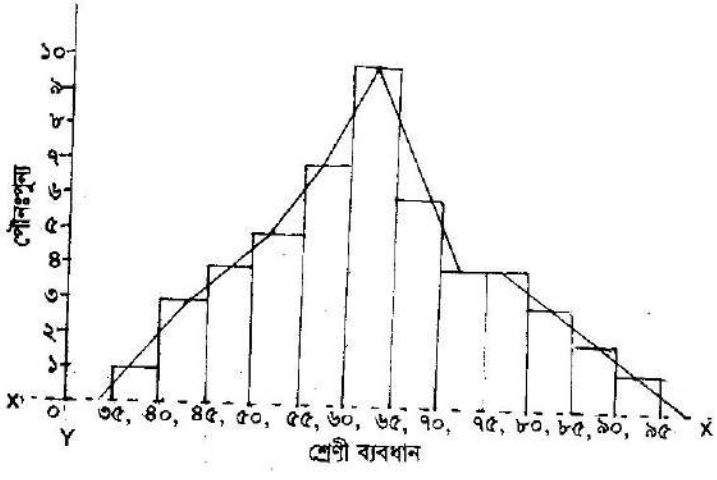

পৌনঃপুন্য বহুভুজ ও আয়তলেখের অভিস্থাপন

পৌনঃপুন্য বহুভুজ ও আয়তলেখের তুলনামূলক ব্যবহার

১। সাধারণত আয়তলেখের চেয়ে পৌনঃপুন্য বহুভুজ অনেক বেশি উপযোগী বলে মনে করা যায়। কারণ বহুভুজ বণ্টনটির আকৃতি একটি অর্থপূর্ণ ধারণা দিতে পারে।

২। একটি শ্রেণি ব্যবধান থেকে আর একটি শ্রেণি ব্যবধানে রেখচিত্রটি পৌনঃপুন্য বহুভুজের ক্ষেত্রে পরিবেশনের দিক দিয়ে অনেক নির্ভুল হয়। এক্ষেত্রে আয়তক্ষেত্র ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়।

৩। আয়তলেখের প্রতিটি শ্রেণি ব্যবধানের স্কোরের বা পৌনঃপুন্যের মোট সংখ একটা সম্পূর্ণ ধারণা পাওয়া যায়। আয়তলেখের এ ধরনের উপযোগি বৈশিষ্ট্যই একমাত্র উল্লেখযোগ্য দিক।

৪। দুটি বণ্টন একটার উপর আর একটা স্থাপন করলে পৌনঃপুন্য বহুভুজের ক্ষে বাস্তব চিত্র ফুঠে উঠে। কিন্তু আয়তলেখের ক্ষেত্রে এখানে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে

৫। বিভিন্ন N সম্বলিত একাধিক পৌনঃপুন্য বণ্টনের লেখচিত্র অঙ্কন করা যায়।

৬। লেখচিত্রের সাহায্যে শতকরা পৌনঃপুন্য গণনা করা যায়।

অনুশীলনী - ৪.৪

১। নিম্নলিখিত অবিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছকে পৌনঃপুন্য বণ্টনে সাজিয়ে এদের (ক) পৌনঃ বহুভুজ ও (খ) আয়তলেখ অঙ্কন করুন। শ্রেণি ব্যবধানের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৩, ৫ এবং ধরে সর্বনিম্ন শ্রেণি ৪৫ দিয়ে শুরু করুন।

৮১, ৯০, ৮৫, ৮৪, ৯৬, ৭২, ৮১, ৮৩, ৭২, ৫১,

৬৬, ৫১, ৪৫, ৫৩, ৬৬, ৭৯, ৫৪, ৬১, ৬৫, ৪৮,

৮৪, ৭৭, ৬৩, ৬৮, ৬৭, ৫৪, ৫৯, ৫২, ৭৫, ৮১,

৭৪, ৬৪, ৫৭, ৫২, ৭৪, ৫৫, ৫৯, ৫০, ৫৬, ৭০,

৭৬, ৭১, ৬৫, ৫৭, ৪৯, ৫৮, ৮৯, ৭৪, ৮৮, ৫৫,

৯৪, ৬৪, ৫৭, ৬৯, ৯৫, ৬৮, ৯১, ৮৪, ৭৪, ৫০,

৮৫, ৮১, ৭০, ৬৪, ৫৭, ৬৯, ৮৩, ৭৫, ৫৯, ৬৭,

৫৪, ৭৮, ৫৭, ৭৩, ৭৪, ৬৮, ৬২, ৬৭, ৬০, ৬৫,

৭৮, ৬১, ৫৫, ৭৩, ৬৪, ৬৮, ৬২, ৬৭, ৬২, ৬৭, ৬০, ৬৫,

৭৯, ৭১, ৫৯, ৬৮, ৬১, ৬৬, ৬৪, ৬০, ৬৬, ৬২।

২। নিচের অবিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছকে ৩ এবং ৫ শ্রেণি ব্যবধান দৈর্ঘ্যে দুটি পৌনঃপুন্য ব সাজিয়ে উহাদের প্রত্যেকটির জন্য (ক) পৌনঃপুন্য বহুভুজ এবং (খ) আয়তলেখ ক করুন। সর্বনিম্ন শ্রেণি ব্যবধান ৬০ দিয়ে শুরু করতে হবে।

৬৭, ৭১, ৬১, ৮৩, ৭০, ৭৬, ৭২, ৮১, ৭৪, ৬৭,

৮৪, ৬৩, ৭৬, ৬৫, ৭৭, ৬৯, ৭২, ৮২, ৮৬, ৭৫,

৬৪, ৭২, ৬৭, ৭৩, ৬৫, ৭২, ৬৮, ৭৩, ৬৯, ৭৭।

: ২ নম্বর প্রশ্নের পৌনঃপুন্য বণ্টনদ্বয়কে একই অবস্থানে পৌনঃপুন্য বহুভুজ ও আয়তলেখ [illegible]স্থাপন করুন। প্রতিটি শ্রেণি দৈর্ঘ্যের বণ্টনের জন্য পৃথক পৃথক চিত্র অঙ্কন করুন।

কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ

কোন বিদ্যালয়ের অষ্টমশ্রেণির ৪০ জন ছাত্রের বাংলা পরীক্ষার নম্বর নিম্নে [illegible]লিপিবদ্ধ করা যায়। ছাত্ররা তাদের ব্যক্তিগত পার্থক্যের জন্য অনেকেই ভিন্ন ভিন্ন স্কোর বা নম্বর পেয়েছে। তাদের প্রাপ্ত স্কোরগুলো ঃ

৪৭ ৫৮ ৩৫ ৪৮ ৪০ ৭০ ৬৫ ২০ ৫৯ ৪১

৩৭ ৪০ ৪৬ ৪৫ ৫৬ ৪৪ ৫০ ৬৩ ৫২ ৪৫

৪৭ ৪৩ ২৫ ৩৯ ৪৫ ৪৬ ৫৭ ৪৮ ৪৪ ৪৫

৪৬ ৫৮ ২৭ ৪৮ ৫৬ ৪৩ ৪৭ ৪৫ ৪০ ৪৫

উপরিউক্ত স্কোরগুলো, অবিন্যস্ত অবস্থায় আছে। প্রথমেই স্কোরগুলোকে তাদের মান অনুসারে সাজাতে হবে। এ কারণে ছোট থেকে বড় বা বড় থেকে ছোট উভয়ভাবেই সাজানো যায়। তবে ছোট থেকে বড় মান অনুযায়ী স্কোরগুলো এখানে সাজানো হলো।

২০ ২৫ ২৭ ৩৫ ৩৭ ৩৯ ৪০ ৪০ ৪০ ৪১

৪৩ ৪৩ ৪৪ ৪৪ ৪৫ ৪৫ ৪৫ ৪৫ ৪৫ ৪৫

৪৬ ৪৬ ৪৬ ৪৭ ৪৭ ৪৭ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৫০

৫২ ৫৬ ৫৬ ৫৭ ৫৮ ৫৮ ৫৮ ৬৩ ৬৫ ৭০

উপরে ছোট থেকে বড় মান অনুযায়ী সাজানো স্কোরগুচ্ছে সর্বনিম্ন স্কোর ২০ এবং সর্বোচ্চ স্কোর ৭০। বেশিরভাগ ছাত্ররা ৪৫ স্কোরটি পেয়েছে। আবার অধিকাংশ স্কোরগুলো ৪৫ এর কাছাকাছি। ইহা ছাড়া সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ স্কোরের মধ্যবর্তী স্কোর হলো ৪৫। মধ্যবর্তী স্কোর বা নম্বরের বাংলা প্রতিশব্দ কেন্দ্রীয় স্কোর বা নম্বর বলা যায়। স্কোরগুলোর সার্বিক বিস্তৃতি থেকে অতি সহজেই লক্ষ্য করা যায় যে খুব ভাল বা খারাপ ছাত্রের অর্জিত স্কোরের সংখ্যা বেশি নয়। অধিকাংশ স্কোর কেন্দ্র বিন্দুর দিকে ঘনীভূত হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। অবিন্যস্ত স্কোর গুচ্ছকে পৌনঃপুন্য বণ্টনে সাজানোর পর তাদের কেন্দ্রীয় প্রবণতা (Central tendency) বা মাঝারী ঝোক দেখা যায়। এ কেন্দ্রীয় প্রবণতা এমন একটি পরিমাপ যা সমস্ত স্কোরের প্রতিনিধিত্ব করে। কেন্দ্রীয় প্রবণতার কোন একটি পরিমাপের সাহায্যে পরীক্ষার স্কোরগুলোর সামগ্রিক ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাওয়া যায়। আবার এ কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপের সাহায্যেই দুই বা ততোধিক

দলের মধ্যে তুলনা করা সম্ভব হয়। সাধারণত পরিসংখ্যান শাস্ত্রে তিন প্রকার প্রণালী দিয়ে কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ করা যায়। প্রণালীগুলো হলো ঃ

১. গড় (Mean)

২. মধ্যক (Median)

৩. প্রচুরক বা সর্বোচ্চ শীর্ষ (Mode)

গাণিতিক গড় (Arithmetic Mean)

মনে করি কোন বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির একটি শ্রেণিকক্ষে প্রথম সারিতে পাঁচজন ছাত্র প্রতিদিন বসে। একদিন মইন, করিম, সলিল, হারুন ও মতিন বসলো। ঐ দিন গণনা করে দেখা গেল কে কত খানা পাঠ্য বই নিয়ে বিদ্যালয়ে আসলো। মইন আনলো ৬ খানা বই, করিম ৪ খানা, সলিল ৩ খানা, হারুন ৫ খানা ও মতিন ৭ খানা। তারা (৬+৪+৩+৫+৭) মোট ২৫ খানা বই শ্রেণি কক্ষে নিয়ে আসলো। এখন ঐ বইগুলো যদি ওদের পাঁচজনকে সমান সংখ্যক করে দেয়া হয়, তবে প্রত্যেককে কতখানা করে বই পাবে। এর উত্তর অতি সহজেই বের করা যায়। মোট বই এর সংখ্যা ২৫ কে মোট ছাত্র সংখ্যা ৫ দিয়ে ভাগ করলে প্রথমে ভাগফল হবে ৫। অতএব, প্রত্যেকেই পাঁচখানা করে বই পাবে। এখানে প্রথমে বইগুলোর সংখ্যা যোগ করে ছাত্রসংখ্যা দিয়ে ভাগ করা হয়েছে। গাণিতিক নিয়মে একে গাণিতিক গড় (Arithmetic Mean) বলা হয়।

$$\text{গড় (Mean)} = \frac{\text{বইগুলোর যোগফল}}{\text{মোট ছাত্র সংখ্যা}}$$

এখানে বই না বলে যে কোন বস্তু বা প্রাণী বা X বলা যায়। এভাবে ছাত্রসংখ্যা N লিখে এবং যোগফল কথাটি না লিখে তাকে Σ (সিগমা) চিহ্নটি দিয়ে প্রকাশ করা যায়। গড়কে ইংরেজি শব্দ Mean এর প্রথম অক্ষর M দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর 'Σ' এর গাণিতিক অর্থ যোগফল বা সমষ্টি। তা হলে আলোচ্য সমস্যাটি নিম্নরূপ প্রকাশ করা যায়।

$$M = \frac{\Sigma X}{N}$$

$$= \frac{২৫}{৫}$$

$$= ৫$$

এখানে,

M = গড়

ΣX = ২৫ খানা বই

N = ৫ জন ছাত্র

কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপের পদ্ধতিগুলোর মধ্যে গাণিতিক গড়ই সবচেয়ে বেশি প্রচলিত সাধারণ গড় বলতে গাণিতিক গড়কেই বুঝাতে হবে। গড় বের করার নিয়ম হল স্কোরগুচ্ছের সকল স্বতন্ত্র স্কোরগুলোকে যোগ করে তাদের যোগফলকে মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হয়। সূত্রটি হলো ঃ-

$$M = \frac{\sum X}{N}$$

এখানে,

M = গড়

N = স্কোরগুলোর মোট সংখ্যা

X = স্কোর

$\sum$ = যোগফল বা সমষ্টি

মনে করি সপ্তম শ্রেণির নয়জন ছাত্র গণিতে একটি পরীক্ষা দিল। পরীক্ষার পূর্ণমান ১০। তারা যথাক্রমে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ নম্বর বা স্কোর পেল। তারা গড়ে কত নম্বর বা স্কোর পেল? উপরের সূত্রের সাহায্যে সমস্যাটি সমাধান করা হলো।

$$\text{গড়} = \frac{\sum X}{N}$$

$$= \frac{১+২+৩+৪+৫+৬+৭+৮+৯}{৯}$$

$$= \frac{৪৫}{৯} = ৫, \quad \text{উত্তর গড়} = ৫$$

এখানে, M = গড়

X = নম্বর (স্কোর)

$\sum$ = (সিগমা) = যোগফল

$\sum X$ = নম্বরগুলোর যোগফল

N = নম্বরের মোট সংখ্যা বা ছাত্র সংখ্যা

উদাহরণ ঃ ১

বিশজন ছাত্র একটি পরীক্ষায় যথাক্রমে ৪২, ৫০, ৪৭, ৬৮, ৪৮, ৫৬, ৪৩, ৪৬, ৫৭, ৫৯, ৪৭, ৫২, ৬৩, ৫৭, ৪৮, ৫৩, ৫৫, ৪৭, ৫০, ও ৫২ নম্বর পেল তারা গড়ে কত নম্বর পেল?

$$\text{গড় (M)} = \frac{\sum X}{N} = \frac{১০৪০}{২০} = ৫২$$

উত্তর, গড় = ৫২

উদাহরণ ঃ ২

কোন পরীক্ষায় ৫০ নম্বর করে পেল ৫ জনে, ৪৫ নম্বর পেল ৭ জনে, ৪৮ ন
পেল ৬ জনে, ৪২ নম্বর পেল ৪ জনে ও ৪৩ নম্বর পেল ৩ জনে। তাদের নম্বরের
নির্ণয় করুন।

নম্বর	ছাত্রসংখ্যা পৌনঃপুন্য (f)	fx
৫০	৫	২৫০
৪৮	৬	২৮৮
৪৫	৭	৩১৫
৪৩	৩	১২৯
৪২	৪	১৬৮
	N = ২৫	∑fx = ১১৫০

$$M = \frac{\Sigma fx}{N} = ১১৫০ \div ২৫ = ৪৬$$

উত্তর, গড় = ৪৬

উদাহরণ ঃ ৩

নিম্নের পৌনঃপুন্য বণ্টনটির গড় বের করুন।

স্কোর	৪০	৩৯	৩৮	৩৭	৩৬	৩৫	৩৪	৩৩	৩২
পৌনঃপুন্য	১	৫	৮	১১	১৪	৯	৬	৪	২

উত্তর ঃ

স্কোর X	পৌনঃপুন্য f'	fx
৪০	১	৪০
৩৯	৫	১৯৫
৩৮	৮	৩০৪
৩৭	১১	৪০৭
৩৬	১৪	৫০৪
৩৫	৯	৩০৫
৩৪	৬	২০৪
৩৩	৪	১৩২
৩২	২	৬৪
$M = \frac{\Sigma fx}{N}$	N = ৬০	Σfx = ২১৬৫

$= \frac{২১৬৫}{৬০} = ৩৬.০৮৩৩৩ = ৩৬.০৮৩$

নির্ণেয় গড় = ৩৬.০৮৩

উপরে বর্ণিত সমস্যাটি স্কোর বিন্যস্ত করেও গড় নির্ণয় করা যায়। এখানে সর্বোচ্চ ৪০ এবং সর্বনিম্ন স্কোর ৩২। অতএব, বিস্তৃতি হলে ৯। অর্থাৎ এখানে ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, এবং ৪০ এ নয়টি স্কোর থাকতে পারে। এ গুলোর কোনটি একাধিক বার আবার কোনটি হয়তো একবারও না থাকতে পারে। উদাহরণটি বিন্যস্ত করে নিম্নরূপে করা যায় ঃ-

শ্রেণি ব্যবধান (i)	মধ্যবিন্দু (x)	পৌনঃপুন্য (f)	fx
৩৯ - ৪১	৪০	৬	২৪০
৩৬ - ৩৮	৩৭	৩৩	১২২১
৩৩ - ৩৫	৩৪	১৯	৬৪৬
৩০ - ৩২	৩১	২	৬২
		N = ৬০	$\sum fx$ = ২১৬৯

এখানে N = ৬০ $\sum fx$ = ২১৬৯

গড় $M = \frac{\sum fx}{N} = \frac{২১৬৯}{৬০} = ৩৬.১৫$

উদাহরণ ৩ এর অবিন্যস্ত স্কোরের গড় এবং বিন্যস্ত করে গড় নির্ণয়ের জন্য ফলের খুবই সামান্য পার্থক্য ঘটছে। এ পার্থক্য হচ্ছে ০.০৭৭।

এটি এতই সামান্য যে উভয় প্রকার ফলে মূল সংখ্যার কোনই পরিবর্তন হচ্ছে না। সুতরাং স্কোরে সংখ্যা অনেক বেশি হলে বিন্যস্ত করে পরিসংখ্যানের যে কোন কাজ করাই অনেক সুবিধাজনক।

অনুশীলনী-৪.৬

১। কেন্দ্রীয় প্রবণতা বলতে কি বুঝায়?

২। কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ শিক্ষাক্ষেত্রে কি কাজে লাগতে পারে?

৩। গড় কাকে বলে?

৪। পাঁচজন ছাত্র যথাক্রমে ৬, ১১, ২৯, ৩৪, ও ৪৫ নম্বর পেল। তাদের নম্বরের গড় কত?

৫। ৭ জন ছাত্রের প্রত্যেকে ৩৯ নম্বর করে, ৫ জনের প্রত্যেকে ৫৬, ৯ জনের প্রত্যেকে ৪৩, ৩ জনের প্রত্যেকে ৩৩, ২ জনের প্রত্যেকে ৬৩, এবং ৪ জনের ৫০ নম্বর পেল, তাদের গড় নম্বর বের করুন।

৬। নিচের পৌনঃপুন্য বন্টনটির অবিন্যস্ত ও বিন্যস্ত উভয় উপায়ের পদ্ধতি সম্মত নিয়মে গড় নির্ণয় করুন।

স্কোর (X)	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০
পৌনঃপুন্য (*f*)	১	৩	৫	৭	১৩	১৬	৯	৪	১	১

৭। নিম্নের পৌনঃপুন্য বন্টনগুলোর গড় বের করুন।

ক. নম্বর (x)	২৬	৩৫	৩৮	৪০	৪৮
ছাত্রসংখ্যা বা পৌনঃপুন্য (*f*)	২	৬	১০	৪	৩

খ. নম্বর (x)	৬	৯	১২	১৭	১৯
পৌনঃপুন্য (*f*) ২	৭	১৪	৬	১	

গ. শ্রেণি ব্যবধান	৪৫-৪৭	৪৮-৫০	৫১-৫৩	৫৪-৫৬	৫৭-৫৯	৬০-৬২	৬৩-৬৫	৬৬-৬৮
পৌনঃপুন্য (*f*)	১	৩	১১	২৭	১৮	৪	৪	২

ঘ. শ্রেণি ব্যবধান	৩০-৩৯	৪০-৪৯	৫০-৫৯	৬০-৬৯	৭০-৭৯	৭০-৭৯	৯০-৯৯
পৌনঃপুন্য (*f*)	২	৭	১২	১৭	৮	৩	১

ঙ. শ্রেণি ব্যবধান	৪০-৪৪	৪৫-৪৯	৫০-৫৪	৫৫-৫৯	৬০-৬৪	৬৫-৬৯	৭০-৭৪
পৌনঃপুন্য	২	৯	১৪	২৭	৬৩	৪৮	২২
শ্রেণি ব্যবধান	৭৫-৭৯	৮০-৮৪	৮৫-৮৯				
পৌনঃপুন্য	১৪	১১	২				

সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে অবিন্যস্ত স্কোরের গড় নির্ণয়

মনে করি পাঁচজন ছাত্র যথাক্রমে ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৪০, ৪৫ নম্বর কোন এক পরীক্ষায় পেল, এখন তাদের প্রাপ্ত নম্বরের গড় বের করতে হলে পাঁচজন ছাত্রের নম্বরগুলোর সমষ্টি বের করে ৫ দিয়ে ভাগ করলেই গড় পাওয়া যাবে।

$$\text{গড় (M)} = \frac{৩৫+৩৭+৪০+৪৫}{৫} = \frac{১৯৫}{৫} = ৩৯$$

উপরে বর্ণিত নিয়মে প্রত্যেকের সমস্ত নম্বর যোগ না করেও প্রত্যেকে গড়ে কত নম্বর পেল তা বের করা যায়। এখানে সর্বনিম্ন স্কোর ৩৫ এবং অন্যান্য স্কোরগুলো ৩৫ এর বেশি। সুতরাং এখানে গড় ৩৫ এর বেশি হবে। আবার সর্বোচ্চ স্কোর ৪৫ এবং অন্যান্য স্কোরগুলো ৪৫ এর কম। এখানে স্কোরগুলোকে ছোট থেকে বড় সাজালে দেখা যায় মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান করছে ৩৮। এখন এই ৩৮ কে অনুমিত গড় ধরে প্রত্যেক স্কোরের সাথে পার্থক্য বা দূরত্বকে বের করা যায়। ইহাকে D বলা যায়। D এর মান ভিন্ন ভিন্ন হবে। ৩৮ এর বড় স্কোরগুলোর ক্ষেত্রে D এর মান '+' হাঁ বোধক এবং এর ছোট স্কোরগুলোর ক্ষেত্রে D এর মান '-' না বোধক হবে। অনুমিত গড় (A.M)এর জন্য D এর মান O পার্থক্য হবে।

ছাত্র	প্রাপ্ত নম্বর (X)	অনুমিত গড় থেকে নম্বরের পার্থক্য	D
প্রথম ছাত্র	৩৫	৩৫-৩৮	= - ৩
দ্বিতীয় ছাত্র	৩৭	৩৭-৩৮	= - ১
তৃতীয় ছাত্র	৩৮ (অনুমিত গড়)	৩৮-৩৮	= ০
চতুর্থ ছাত্র	৪০	৪০-৩৮	= ২
পঞ্চম ছাত্র	৪৫	৪৫-৩৮	= ৭

$\sum D = ৯ - ৪$

$= ৫$

$$\text{নির্ণেয় গড় (M)} = A.M.+ \frac{\sum D}{N}$$

$$= ৩৮+ \frac{৫}{৫} = ৩৮ + ১ = ৩৯$$

এখানে অনুমিত গড় = A.M (Assumed mean), $\sum D$ = অনুমিত গড় থেকে নম্বরের পার্থক্যের সমষ্টি এবং N = মোট ছাত্র সংখ্যা

উদাহরণ ঃ ১

কোন পরীক্ষায় ১৩ জন ছাত্র যথাক্রমে ৪৫, ৭১, ৪৮, ৬২, ৫০, ৬৫, ৪৫, ৬০ ৪৭, ৬৪, ৫৮, এবং ৪৯ নম্বর পেল, সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে এদের গড় নির্ণয় করুন।

উত্তর ঃ

নম্বর বা স্কোর X	বিচ্যুতি বা পার্থক্য D
৭১	১৬
৬৫	১০
৬৪	৯
৬২	৭
৬০	৫
৫৮	৩
	+ ৫০
৫৫ (অনুমতি গড়)	০
৫৪	- ১
৫০	- ৫
৪৯	- ৬
৪৮	- ৭
৪৭	- ৮
৪৫	- ১০
	- ৩৭
	$\sum D$ = ৫০-৩৭
	= ১৩

$$(M) = A.M. + \frac{\sum D}{N}$$

$$= ৫৫ + \frac{১৩}{১৩} = ৫৫ + ১ = ৫৬$$

নির্ণেয় গড় = ৫৬

এখানে M = গড়, A.M = অনুমিত গড় = ৫৫

$\sum D$ = ১৩, N =১৩

উদাহরণ ঃ ২

কোন এক পরীক্ষায় ৪ জন ছাত্রের প্রত্যেকে ২৫, ৯জন ছাত্রের প্রত্যেকে ১৫, ১১জন ছাত্রের প্রত্যেকে ১০, ৭জন ছাত্রের প্রত্যেকে ১৮, ৮ জন ছাত্রের প্রত্যেকে ১৩ এবং একজন ছাত্র মাত্র ৫ পেয়েছে। উহাদের গড় নির্ণয় করুন।

স্কোর X	পৌনঃপুন্য (f)	বিচ্যুতি (D)	fD	
২৫	৪	১২	৪৮	
১৮	৭	৫	৩৫	
১৫	৯	২	১৮	
				+ ১০১
১৩ (A.M)	৮	০	০	
১০	১১	-৩	- ৩৩	
৫	১	-৮	- ৮	
				- ৪১
	N = ৪০		∑fD = ১০১-৪১	
			= ৬০	

নির্ণেয় (M) $= A.M. + \frac{\sum fd}{N}$

$= ১৩ + \frac{৬০}{৪০}$

$= ১৩ + \frac{৩}{২}$

$= ১৩ + ১.৫$

$= ১৪.৫$

গড় $= ১৪.৫$

এখানে, A.M. = অনুমিত গড়

N = মোট ছাত্র সংখ্যা

D = অনুমিত গড় থেকে প্রতিটি স্কোরের বিচ্যুতি বা দূরত্ব

f = স্কোরের পৌনঃপুন্য

fD = পৌনঃপুন্য ও বিচ্যুতি গুণফল।

উদাহরণ ঃ ৩

নিচের পৌনঃপুন্য বণ্টনটির গড় নির্ণয় করুন।

দীর্ঘ পদ্ধতিতে সমাধান

স্কোর (x)	পৌনঃপুন্য (f)	স্কোর (x)	পৌনঃপুন্য 'f"	fx
৬০	১	৬০	১	৬০
৫৩	৯	৫৩	৯	৪৭৭
৪৮	২৪	৪৮	২৪	১১৫২
৪৫	১১	৪৫	১১	৪৯৫
৪১	১০	৪১	১০	৪১০
৩৫	৫	৩৫	৫	১৭৫
	N = ৬০		N = ৬০	∑fx =২৭৬৯

নির্ণেয় গড় (M) = $\frac{\Sigma fx}{N} = \frac{২৭৬৯}{৬০} = ৪৬.১৫$

উত্তরঃ সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয়

স্কোর X	পৌনঃপুন্য (f)	বিচ্যুতি (D)	fD
৬০	১	+ ১২	১২
৫৩	৯	+ ৫	৪৫
			+ ৫৭
৪৮	২৪	০	০
৪৫	১১	- ৩	- ৩৩
৪১	১০	- ৭	- ৭০
৩৫	৫	- ১৩	- ৬৫
			- ১৬৮
	$N = ৬০$		$\Sigma fD = ৫৭ - ১৬৮$
			$= - ১১১$

নির্ণেয় গড় (M) = A.M.+ $\frac{\Sigma fd}{N}$

$= ৪৮ + \frac{- ১১১}{৬০}$

$= ৪৮-১.৮৫$

$= ৪৮.১৫$

উত্তর = ৪৬.১৫

এখানে A.M. = ৪৮

D = বিচ্যুতি

f = পৌনঃপুন্য

$\Sigma fD = ১১১$

$N = ৬০$

সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিন্যস্ত স্কোরের গড় নির্ণয়

গাণিতিক পদ্ধতির সাহায্যে সাধারণত বিন্যস্ত স্কোর মালার গড় বের করতে হলে প্রত্যেকটি শ্রেণি ব্যবধানের মধ্যবিন্দুকে সেই শ্রেণির পৌনঃপুন্য দিয়ে গুণ করে যে গুণফল পাওয়া যায়, তাদের সমষ্টিকে স্কোরগুচ্ছের মোট সংখ্য দিয়ে ভাগ করলেই নির্ণেয় গড় বের করা যায়। কিন্তু সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে কোন বিন্যস্ত বণ্টনের মাঝামাঝি একটি

শ্রেণি ব্যবধানের মধ্যবিন্দুকে অনুমিত গড় (Assumed mean) ধরে নিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে যে শ্রেণি ব্যবধানের পৌনঃপুন্য সবচেয়ে বেশি তার মধ্যবিন্দুতে অনুমিত গড় (A.M) ধরা যেতে পারে। অনুমিত গড় (A.M) ধরার সময় অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে করে ইহা সম্পূর্ণ বণ্টনটির প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থান করে এবং ঐ শ্রেণির পৌনঃপুন্য যেন সবচেয়ে বেশি বা তার কাছাকাছি হয়।

উদাহরণ ঃ ৪

নিচের পৌনঃপুন্য বণ্টনটির দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত উভয় পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় করুন।

শ্রেণি ব্যবধান	২৫-২৯	৩০-৩৪	৩৫-৩৯	৪০-৪৪	৪৫-৪৯	৫০-৫৪	৫৫-৫৯	৬০-৬৪
পৌনঃপুন্য	১	৪	৯	১৪	৮	৭	৫	২

উত্তর ঃ দীর্ঘ পদ্ধতিতে গড় নির্ণয়

শ্রেণি ব্যবধান (i)	মধ্যবিন্দু (x)	পৌনঃপুন্য (f)	fx
৬০-৬৪	৬২	২	১২৪
৫৫-৫৯	৫৭	৫	২৮৫
৫০-৫৪৫২	৭	৩৬৪	
৪৫-৪৯	৪৭	৮	৩৭৬
৪০-৪৪	৪২	১৪	৫৮৮
৩৫-৩৯	৩৭	৯	৩৩৩
৩০-৩৪	৩২	৪	১২৮
২৫-২৯	২৭	১	২৭
		$N = ৫০$	$= ২২২৫$

$$\text{গড় (M)} = \text{A.M.} + \frac{\sum fx}{N} = \frac{২২২৫}{৫০} = ৪৪.৫$$

উত্তর ঃ সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয়।

শ্রেণি ব্যবধান (i)	পৌনঃপুন্য (x)	বিচ্যুতি (*f*)	*fd*	
৬০-৬৪	২	৪	৮	
৫৫-৫৯	৫	৩	১৫	
৫০-৫৪	৭	২	১৪	
৪৫-৪৯	৮	১	৮	
				৪৫
৪০-৪৪	১৪	০	০	
৩৫-৩৯	৯	- ১	- ৯	
৩০-৩৪	৪	- ২	- ৮	
২৫-২৯	১	- ৩	- ৩	
				- ২০

$N = ৫০$ $\sum fd = ৪৫-২০$

$= ২৫$

গড় $(M) = M' + \frac{\sum fd}{N} \times i$ এখানে, $M =$ অনুমিত গড় $= ৪২$

$= ৪২ + \frac{২৫}{৫০} \times ৫$ $\sum fd = ২৫$

$N = ৫০$

$= ৪২ + \frac{২৫}{১০}$ $i = ৫$

$= ৪২ + ২.৫ = ৪৪.৫$।

সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় করতে হলে নিম্নের সোপানগুলো অনুসরণ করতে হবেঃ-

১। এ পদ্ধতিতে স্কোরগুচ্ছ বা পৌনঃপুন্য বণ্টনের মাঝামাঝি স্থানে আন্দাজে একটি গড় ধরে নিতে হয়। ইহাকে অনুমিত গড় বলে।

২। অনুমিত গড় নির্ভুল নয়, এজন্য, একে সংশোধন করতে হয়। ৪ নম্বর উদাহরণের সমস্যাটিতে ৪০-৪৪ শ্রেণি ব্যবধানটি বণ্টনের প্রায় মাঝামাঝি এবং ঐ শ্রেণির পৌনঃপুন্যের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এ কারণেই "৪০-৪৪" শ্রেণির মধ্যবিন্দু ৪২ কে ই অনুমিত গড় (M') ধরা হয়েছে।

৪। আলোচ্য উদাহরণের ৪০-৪৪ শ্রেণির মধ্যবিন্দু ৪২ অনুমিত গড় (Ḿ) ৪৫-৪৯ এর মধ্যবিন্দু, ৪৭ এক শ্রেণি ব্যবধান দূরে আছে। এর বিচ্যুতি (d) হলো + ১, ৫০-৫৪ এর মধ্যবিন্দু ৫২ অনুমিত গড় (Ḿ) থেকে দুই শ্রেণিব্যবধান দূরে অবস্থিত। সুতরাং ইহার বিচ্যুতি (d) +২, ৫৫-৫৯ এর মধ্যবিন্দু ৫৭ অনুমিত গড় থেকে তিন শ্রেণি ব্যবধান দূরে অবস্থিত বলে ইহার বিচ্যুতি+৩। অনুরূপভাবে ৬০-৬৪ এর মধ্যবিন্দু ৬২ এর বিচ্যুতি (d)+৪ এভাবে অনুমিত গড়ের চেয়ে এক শ্রেণি ব্যবধান ছোট হলো ৩৫-৩৯ শ্রেণিব্যবধানের মধ্যবিন্দু ৩৭ এর বিচ্যুতি হবে -১। একইভাবে ৩০-৩৪ শ্রেণি ব্যবধানের মধ্যবিন্দু ৩২ (Ḿ) থেকে দুই শ্রেণি ব্যবধান ছোট এর বিচ্যুতি (d) -২।

আবার ২৫-২৯ শ্রেণি ব্যবধানের মধ্যবিন্দু ২৭ অনুমিত গড় ৪২ থেকে তিন শ্রেণি ব্যবধান দূরত্ব কম থাকায় এর মধ্যবিন্দু বিচ্যুতি (d) হবে -- ৩। যে শ্রেণি ব্যবধানের মধ্যবিন্দু অনুমিত গড় (Ḿ) ধরা হয়, তার বিচ্যুতি সব সময়ই শূন্য (০) হবে। অত্রএব ৪০-৪৪ শ্রেণি ব্যবধানের মধ্যবিন্দুর বিচ্যুতি (d) হল শূন্য (০)

৫। বিচ্যুতি বা d স্তম্ভ পূরণ করার পর শ্রেণিব্যবধানের বিচ্যুতি বা d এর সঙ্গে সেই শ্রেণির f (পৌনঃপুন্য) গুণ করে fd স্তম্ভ পূর্ণ করতে হয়।

৬। অনুমিত গড়ের (Ḿ) উপরের ধনাত্মক fd গুলো যোগ করে পাওয়া গেল ৪৫ এবং নিচের ঋণাত্মক fd গুলো যোগ করে পাওয়া গেল -২০

সুতরাং $\sum fd = ৪৫-২০=২৫$

৭। $\sum fd$ কে শ্রেণি ব্যবধানের দূরত্ব বা i দিয়ে গুণ করে $\sum fdi$ পাওয়া যায়। বণ্টনটির স্কোরের মোট সংখ্যা বা মোট পৌনঃপুন্য বা N = ৫০ দিয়ে ভাগ করলে যা পাওয়া যায়, তা অনুমিত গড়ের সাথে যোগ বা বিয়োগ করলেই প্রকৃত গড় (M) পাওয়া যায়। আলোচ্য উদাহরণের ক্ষেত্রে $\sum fdi/N$ এর মান + ২·৫। ইহা অনুমিত গড় (Ḿ) ৪২ এর সাথে যোগ করলে গড় = ৪৪·৫ হবে।

৮। নির্ণেয় প্রকৃত গড় (M) বা সমস্যার উত্তর ঃ

$$M = \acute{M} + \frac{\sum fdi}{N}$$

$$= ৪২ + \frac{২৫ \times ৫}{৫০}$$

$$= ৪২ + ২·৫ = ৪৪·৫$$

বিঃ দ্রঃ কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণ গাণিতিক গড় বা দীর্ঘ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত উত্তর সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে প্রাপ্ত উত্তরের সাথে সামান্য কিছুটা ভগ্নাংশের অংকে অমিল হতে

পারে। তবে অধিক সংখ্যক স্কোরের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিই শ্রেয়। সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি কম সময়ে এবং কম পরিশ্রমে সমস্যার সমাধান করা যায়। আলোচ্য উদাহরণের ক্ষে উভয় পদ্ধতিতে একই ফলাফল দেখা যায়।

অনুশীলনী-৪.৫

১। নিম্নলিখিত স্কোরগুলোকে পৌনঃপুন্য বণ্টনে সাজিয়ে উহাদের গড় নির্ণয় করুন। শ্রেণি ব্যবধানের দূরত্ব হবে ১০ এবং শ্রেণি শুরু হবে ২১ থেকে।

৫৫, ৪১, ৮৭,৪৮, ৩৭, ৪২, ৫৩, ৬৪, ৭৩, ৪৫

৪২, ২৭, ৭৪, ৫৭, ২১, ৪৭, ৬৪, ৪৯, ৭৮, ৩৮

৮৩, ৭৫, ৬২, ৫৭, ৫১, ৪৪, ৩৫, ৪০, ৭৬, ৬৯

৪৮, ৪৬, ৫৩, ৬৩, ৭৬, ৪০, ৪৭, ৫৫, ৫১, ৫২

৬৬, ৪৭, ৫৮, ৬৬, ৫৫, ৬৮, ৫৩, ৬১, ৬৫, ৫২

২। সংক্ষিপ্ত পদ্ধতির সাহায্যে নিচের পৌনঃপুন্য বণ্টনগুলোর গড় নির্ণয় করুন এবং কিভাবে নির্ণয় করবেন তা বর্ণনা করুন।

(ক) শ্রেণি ব্যবধান	৪-৭	৮-১১	১২-১৫	১৬-১৯	২০-২৩	২৪-২৭	২৮-৩১	৩২-৩৫	৩৬-৩৯	৪০-৪৩
পৌনঃপুন্য	৫	১৯	২৮	৫০	৫৫	২২	১৩	৪	৩	১

(খ) শ্রেণি ব্যবধান	১৯-২৪	২৫-৩০	৩০-৩৬	৩৭-৪২	৪৩-৪৮	৪৯-৫৪
পৌনঃপুন্য	১	২	৩	০	৯	১০
শ্রেণি ব্যবধান	৫৫-৬০	৬১-৬৬	৬৭-৭২	৭৩-৭৮	৭৯-৮৪	
পৌনঃপুন্য	১২	৪	৩	৩	১	

(গ) শ্রেণি ব্যবধান	১০-১৪	১৫-১৯	২০-২৪	২৫-২৯	৩০-৩৪	৩৫-৩৯	৪০-৪৪
পৌনঃপুন্য	৩	৫	১২	১৮	২৭	৫৩	৪৯
শ্রেণি ব্যবধান	৪৫-৪৯	৫০-৫৪	৫৫-৫৯	৬০-৬৪	৬৫-৬৯		
পৌনঃপুন্য	৪৩	২৮	২১	৭	১		

মধ্যক (Median)

কোন শ্রেণী পরীক্ষায় ৫ জন ছাত্র যথাক্রমে ৫, ৩, ৭, ৪, ৬ নম্বর পেল। নম্বরগুলোর মধ্যবিন্দু বের করা যায় কি? নম্বর বা স্কোরগুলো এলোমেলোভাবে থাকলে তা থেকে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছা যাবে না। এ কারণে উপরের স্কোরগুলোকে তাদের মান অনুসারে সাজানো হল। ছোট থেকে বড় স্কোরগুলোকে মান অনুসারে সাজালে নিম্নরূপ হয়-

৩, ৪, ৫, ৬, ৭

এ সারিটির মধ্যবিন্দু ৫ অর্থাৎ সারিতে ৫ স্কোরটির উপরে আছে দুইটি স্কোর যথা ৬, ৭ এবং নিচে আছে দুইটি স্কোর যথা ৩,৪। সুতরাং এ স্কোরগুলোর মধ্য বিন্দু হলো ৫ অর্থাৎ ৫ কে এ স্কোরগুলোর মধ্যক বলা হয়। মধ্যক (Median) বলতে এমন একটি বিন্দু বা স্কোর বুঝায় যার উপরে ও নিচে সমান সংখ্যক স্কোর অবস্থান করে। অর্থাৎ মধ্যক এর উভয় দিকেই ৫০% স্কোর থাকে।

বিজোড় সংখ্যাসম্পন্ন স্কোরের সারিতে মধ্যক বের করা খুবই সহজ। জোড়সংখ্যা সম্পন্ন স্কোরের সারিতে ঠিক মধ্যে কোন স্কোর থাকে না। এ ক্ষেত্রে মধ্যক বের করতে হলে মধ্যবিন্দুটি তৈরি করে নিতে হবে।

নিচের জোড় সংখ্যক স্কোরগুচ্ছের মধ্যক কত হবে?

৭, ৪, ৫, ৮, ৬, ৯

উপরের স্কোরগুলোকে ক্রমানুসারে সাজানো হল

৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯

উপরের সারিতে মধ্যবিন্দু বা মধ্যক হবে ৬ ও ৭ এর ঠিক মাঝখানের বিন্দুটি। এ ক্ষেত্রে ৬ ও ৭ এর যোগফলকে ২ দিয়ে ভাগ করলেই মধ্যবিন্দু পাওয়া যায়।

$$\text{মধ্যবিন্দু} = \frac{৬ + ৭}{২} = \frac{১৩}{২} \text{ বা } ৬.৫$$

অতএব উপরে বর্ণিত জোড় সংখ্যক স্কোরগুচ্ছের মধ্যক হল ৬.৫

মধ্যকের (Median) সংজ্ঞা

অবিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছকে তাদের ক্রমানুসারে সাজানো হলে মধ্যবর্তী স্কোরটি বা দু'টি মধ্যবর্তী স্কোরের গড়টিকে মধ্যবিন্দু বা মধ্যক বলা হয়। মধ্যক এমন একটি বিন্দু যা ক্রমানুসারে সাজান স্কোরগুচ্ছকে সমান দু'ভাগে ভাগ করে মান অনুসারে সাজানো অবিন্যস্ত বিজোড় সংখ্যক স্কোরের ক্ষেত্রে মধ্যক নির্ণয় করার সূত্রটি হল-

মধ্যক = $\frac{N+১}{২}$ তম স্কোরটি

প্রদত্ত প্রথম উদাহরণটিতে বিজোড় সংখ্যক স্কোরের ক্ষেত্রে মধ্যক হল-

মধ্যক = $\frac{৫+১}{২}$ তম স্কোরটি অর্থাৎ ৩য় স্কোরটি। এখানে তৃতীয় স্কোরটি ৫ হল মধ্যক

উপরের বর্ণিত সূত্র অনুযায়ী জোড় সংখ্যক স্কোরের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় উদাহরণ থেকে দেখা যায়-

মধ্যক = $\frac{৬+১}{২}$ তম স্কোরটি অর্থাৎ ৩·৫তম স্কোরটি। অর্থাৎ জোড় সংখ্যক স্কোরের ক্ষেত্রে মধ্যক হবে ক্রমানুসারে সাজানো। স্কোর সারির ঠিক মাঝখানের দুইটি স্কোরের গড়। এখানে ৬ ও ৭ এর গড় মধ্যক।

অবিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছের মধ্যক নির্ণয়

উদাহরণ ঃ ১

নিচের অবিন্যাস্ত স্কোরগুচ্ছগুলোর মধ্যক নির্ণয় করুন।

ক. ৫, ১, ৭, ৪, ৩, ২, ৮, ৬, ৯

খ. ৭, ১২, ১০, ৮, ১, ১০, ৯, ১১, ৮, ১২, ১৩, ১১

গ. ৮, ৩, ১৭, ১০, ৫, ২০, ১৮, ২৩

উত্তর ঃ উদাহরণ ১ (ক)

এখানে অবিন্যস্ত স্কোরে ৯টি। সুতরাং N = ৯। স্কোরগুলোকে তাদের মানের ক্রমানুসারে সাজালে-

২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ এ সারিটি পাওয়া যায়।

মধ্যক = $\frac{N+১}{২}$ তম স্থানে অবস্থিত স্কোরটি বা মধ্যক = $\frac{৯+১}{২}$ = ৫ তম স্থানের স্কোরটি ৬। সুতরাং ৫ম স্থানের স্কোর ৬ই নির্ণেয় মধ্যক।

মধ্যক = ৬

উত্তর ঃ উদাহরণ-১ (খ)

এখানে স্কোর হচ্ছে ১২ টি। সুতরাং N = ১২ হবে। এদেরকে ক্রমানুসারে সাজালে ---

৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১, ১, ১, ১, এ সারিটি পাওয়া যায়।

এখানে মধ্যক হবে ঠিক মাঝখানের দু'টি স্কোরের গড়।

মধ্যক $= \frac{১০ + ১১}{২} = \frac{২১}{২} = ১০.৫$

অথবা, মধ্যক, $= \frac{N + ১}{২}$ তম স্থানে অবস্থিত বিন্দুটি। মধ্যক $= \frac{১২ + ১}{২}$ তম স্থানে

$= ৬.৫$ তম স্থানে অবস্থিত বিন্দু হলো ১০ ও ১১ স্কোরদ্বয়ের গড়।

সুতরাং $= \frac{১০ + ১১}{২} = \frac{২১}{২} = ১০.৫$ বিন্দুটিই নির্ণয় মধ্যক। এর উপরে ৫০% অর্থাৎ ৬টি এবং নিচে (অর্থাৎ ৬টি) স্কোর অবস্থান করছে।

উত্তর ঃ উদাহরণ- ১ (গ)

এখানে স্কোরের সংখ্যা ৮টি, সুতরাং $N = ৮$ হবে। এদেরকে ক্রমানুসারে সাজানো ৩, ৫, ৮, ১০, ১৭, ১৮, ২০, ২৩, এ সারিটি দাঁড়ায়।

সূত্র অনুযায়ী, মধ্যক, $= \frac{N + ১}{২}$ তম স্থানে অবস্থিত স্কোরটি, $= \frac{৮+১}{২}$ তম স্থানে

$\frac{৯}{২} = ৪.৫$ তম স্থানে অবস্থিত বিন্দুটি ইহা ১০ ও ১৭ স্কোরদ্বয়ের মধ্য বিন্দুটি।

অতএব, মধ্যক হবে ১০ ও ১৭ স্কোরদ্বয়ের গড়। মধ্যক $= \frac{১০ + ১৭}{২} = \frac{২৭}{২} = ১৩.৫$

বিন্দুটিই এর উপরে ৫০% (অর্থাৎ ৪টি) এবং নিচে ৫০% (অর্থাৎ ৪টি) স্কোর অবস্থান করছে।

বিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছ বা পৌনঃপুন্য বন্টনের ক্ষেত্রে মধ্যক নির্ণয় ঃ

বিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছ বা পৌনঃপুন্য বন্টনে সাজানো স্কোরগুচ্ছের মধ্যক হলো সেই বিন্দুটি যার উপরে ৫০% এবং নিচে ৫০% স্কোর আছে। এ ক্ষেত্রে বিন্দুটির উপরে থাকবে অর্ধেক পৌনঃপুন্য এবং নিচে থাকবে অর্ধেক পৌনঃপুন্য। এখানে নিচে থেকে পৌনঃপুন্য গুণে ৫০% বা N/2 বা অর্ধেক পৌনঃপুন্যতে পৌছাতে হবে এবং যে শ্রেণি ব্যবধানের পৌনঃপুন্যতে সেই বিন্দুটি পাওয়া যাবে, সে শ্রেণি ব্যবধানেই মধ্যক অবস্থান করবে।

উদাহরণ ঃ ২ নিম্নের পৌনঃপুন্য বণ্টনটির মধ্যক বের করুন।

শ্রেণি ব্যবধান (i)	পৌনঃপুন্য (f)	
৬৫-৬৯	৪	
৬০-৬৪	৫	
৫৫-৫৯	৬	
৫০-৫৪	১০	২৫
		৪৯.৫
৪৫-৪৯	৯	২৫
৪০-৪৪	৮	
৩৫-৩৯	৭	
৩০-৩৪	১	
	N = ৫০	

উপরের উদাহরণ ৫০% বা $\frac{N}{২} = \frac{৫০}{২} = ২৫$। এখন একটি বিন্দু বের করতে হবে যার উপরে থাকবে ২৫টি পৌনঃপুন্য এবং নিচে থাকবে ২৫টি পৌনঃপুন্য। নিচে থেকে গুণে ৪৫-৪৯ শ্রেণি ব্যবধান পর্যন্ত পৌনঃপুনগুলোর সমষ্টি ২৫ অর্থাৎ ১+৭+৮+৯+=২৫। সুতরাং ৪৫-৪৯ শ্রেণি ব্যবধান পর্যন্ত ৫০% স্কোর বা অর্ধেক পৌনঃপুন্য ২৫টি স্কোর রয়েছে। অতএব ৪৫-৪৯ শ্রেণি ব্যবধানের উচ্চ প্রাপ্ত বা ৫০-৫৪ শ্রেণি ব্যবধানের নিম্নপ্রাপ্ত পর্যন্ত ৫০% স্কোরের অবস্থান। অর্থাৎ ৪৫-৪৯ শ্রেণি ব্যবধানের উচ্চ প্রান্ত বা ৫০-৫৪ শ্রেণি ব্যবধানের নিম্ন প্রান্ত বা ৪৯.৫ হলো মধ্যক। অনুরূপভাবে উপর থেকে গুনে ৫০-৫৪ শ্রেণি ব্যবধান পর্যন্ত পৌনঃপুন্যগুলোর যোগফল ২৫। সুতরাং ৫০-৫৪ শ্রেণি ব্যবধানের নিম্ন প্রান্ত ৪৯.৫ পর্যন্ত ৫০% স্কোর অবস্থিত। অতএব নির্ণয় মধ্যক = ৪৯.৫। নিচ থেকে গুনলে শ্রেণি ব্যবধানের উচ্চ প্রান্ত বা উপর থেকে গুণলে শ্রেণি ব্যবধানের নিম্ন প্রান্ত বিন্দুই হবে মধ্যক। এখানে নিম্নে প্রদত্ত মধ্যক নির্ণয়ের সূত্রটি প্রয়োগের কোন প্রয়োজন নাই।

সূত্রের সাহায্যে বিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছের মধ্যক নির্ণয়

কোন বণ্টনের নিচ থেকে উপর থেকে গুনে এসে ৫০% স্কোর যদি একটি শ্রেণি ব্যবধান শেষে না পাওয়া যায় সে ক্ষেত্রে বিন্যস্ত স্কোর গুচ্ছের জন্য নিম্নোক্ত সূত্র ব্যবহার করতে হবে। বণ্টনের নিচে থেকে গুণে আসলে ব্যবহাব উপযোগী সূত্রটি হলে

$$\text{মধ্যক (Medium)} = L + \frac{N/2 - F}{fm} \times i$$

এখানে N/2= মোট পৌনঃপুন্যের স্কোরের অর্ধেক, F = যে শ্রেণি ব্যবধান মধ্যক বিন্দুটি অবস্থান করবে তার নিচের শ্রেণিব্যবধানগুলোতে যত পৌনঃপুন্য আছে সে গুলোর সমষ্টি, fm = যে শ্রেণি ব্যবধান মধ্যক অবস্থান করবে সে শ্রেণি ব্যবধানের পৌনঃপুন্য বা স্কোরের সংখ্যা, i = শ্রেণি ব্যবধানের দৈর্ঘ্য, L= যে শ্রেণি ব্যবধানে মধ্যক অবস্থান করবে সেই শ্রেণি ব্যবধানটির নিম্নপ্রান্ত।

উদাহরণ ঃ ৩ নিম্নের পৌনঃপুন্য বণ্টনটির মধ্যক বের করুন।

শ্রেণি ব্যবধান (i)	পৌনঃপুন্য (f)	
৭৫-৭৯	১	
৭০-৭৪	৪	F = ১৮
৬৫-৬৯	৬	
৬০-৬৪	৭	
৫৫-৫৯	১০	fm
৫০-৫৪	৮	
৪৫-৪৯	৫	F = ১৬
৪০-৪৪	৩	
	N. = ৪৪	

এখানে দেখা যাচ্ছে ৫৫-৫৯ শ্রেণি ব্যবধানে মধ্যকটি অবস্থান করছে। ৫০-৫৪ ব্যবধান এর পৌনঃপুন্য ১০। শ্রেণি ব্যবধানের দৈর্ঘ্য i = ৫ এবং N =৪৪। কাজেই সূত্রটি প্রয়োগ করলেই মধ্যক বের হবে।

$$\text{মধ্যক} = L + \frac{N/2 - F}{fm} \times i$$

$$= ৫৪.৫ + \frac{\frac{৪৪}{২} - ১৬}{১০} \times ৫$$

$$= ৫৪.৫ + \frac{২২ - ১৬}{১০} \times ৫$$

$$= ৫৪.৫ + \frac{৬}{২}$$

$$= ৫৪.৫ + ৩ = ৫৭.৫$$

সূত্রটি প্রয়োগ করতে নিম্নোক্ত সোপানগুলো অনুসরণ করা প্রয়োজন ঃ

১। প্রথমেই N/2 বের করতে হবে। এখানে

$$\frac{N}{২} = \frac{৪৪}{২} = ২২$$

২। বন্টনের নিচ থেকে পৌনঃপুন্য গণনা করে উপরের দিকে যেতে হবে এ কেবল মাত্র ২২ সংখ্যাক পৌনঃপুন্য পর্যন্ত গণনা করতে হবে। কেননা আলো সমস্যাটিতে মধ্যক হবে সেই বিন্দুটি যার উভয় প্রান্ত পৌনঃপুন্যর সংখ্যা হবে ২২।

৩। নিচ থেকে পৌনঃপুন্যগুলো ক্রমান্বয়ে যোগ করে দেখা যায় ৫০-৫৪ শ্রে ব্যবধান পর্যন্ত পৌনঃপুন্যের সমষ্টি ১৬। পরবর্তী শ্রেণির পৌনঃপুন্য ১০। এই ১০ থে ৬টি পৌনঃপুন্য এর সঙ্গে যোগ করলে প্রয়োজনীয় ২২টি পৌনঃপুন্য পাওয়া যা সুতরাং নিশ্চিতভাবে বলা যায় মধ্যকটি ৫৫-৫৯ শ্রেণি ব্যবধানই অবস্থান করছে। এ পৌনঃপুন্যকে fm বলা হয়। এবং ৫০-৫৪ পর্যন্ত পৌনঃপুন্যগুলোকে F = ১৬ বলা হ

৪। যেহেতু ৫৫-৫৯ ব্যবধানে মধ্যক রয়েছে। তাই এ শ্রেণির নিম্নপাশ্ব বিন্দুকে বলা যায়। অথবা যে সকল শ্রেণি ব্যবধানের মধ্যে মধ্যক নেই তাদের উচ্চ প্রাপ্ত। ইহ ৫০-৪৪ শ্রেণির উচ্চ প্রান্ত। উভয় দিক থেকেই L = ৫৪.৫।

৫। শ্রেণি ব্যবধান দৈর্ঘ্য i = ৫

৬। F, fm, L, i ও N/2 এর মান সূত্রে বসালেই মধ্যক বের করা যাবে।

মধ্যক (Median) = $L+\frac{N/2-F}{fm} \times i$

$= ৫৪\cdot৫ + \frac{২২ - ১৬}{১০} \times ৫$

$= ৫৪\cdot৫ + \frac{৬}{২}$

$= ৫৪\cdot৫ + ৩$

$= ৫৭\cdot৫$ উত্তর।

উদাহরণ ঃ ৩ এর প্রদত্ত পৌনঃপুন্য বন্টনটি হতে আবার বন্টনের উপর থে পৌনঃপুন্য গুনে এসে নিম্নোক্ত সূত্রটি প্রয়োগ করে একই মধ্যক পাওয়া যাবে।

সূত্রটি হলো-

মধ্যক (Median) = $L' - \frac{N/2-F}{fm} \times i$

উপরের সূত্রটি প্রয়োগ করতে নিম্নোক্ত সোপানগুলো অনুসরণ করতে হবে ঃ-

১। প্রথমেই $N/2 = \frac{৪৪}{২} = ২২$ বের করা হলো।

২। বন্টনের উপর থেকে পৌনঃপুন্য পর্যন্ত গণনা করে নিচের দিকে যেতে হবে এবং ২২ সংখ্যক পৌঃনপুন্য পর্যন্ত গণনা করতে হবে।

৩। উপর থেকে পৌনঃপুন্যগুলো যোগ করে দেখা যায় ৬০-৬৪ শ্রেণি ব্যবধান পর্যন্ত পৌনঃপুন্যের মোট সংখ্যা ১৮। সুতরাং নিশ্চিতভাবে বলা যায় মধ্যকটি ৫৫-৫৯ শ্রেণি ব্যবধানই অবস্থান করছে। এর পৌনঃপুন্যগুলোকে fm=১০ ধরা গেল। উপর থেকে ৬০-৬৪ শ্রেণি ব্যবধান পর্যন্ত সবগুলো পৌনঃপুন্যের মোট সংখ্যা F'=১৮

৪। যেহেতু ৫৫-৫৯ শ্রেণি ব্যবধানেই মধ্যকটি অবস্থান করছে, এ কারণেই এ শ্রেণির উচ্চ প্রান্ত বিন্দুকে L' বলা যায়। অন্যভাবে যে সকল শ্রেণি ব্যবধানের মধ্যে মধ্যক নেই তাদের নিম্নপ্রান্ত। ইহাও ৬০-৬৪ শ্রেণির নিম্নপ্রান্ত ৫৯.৫। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রে L' = ৫৯.৫।

৫। শ্রেণি ব্যবধান দৈর্ঘ্য i = ৫

৬। F', fm, L', i ও N/2 এর মান সূত্রে বসালেই নির্ণেয় মধ্যক বের হবে।

মধ্যক (Median) = $L' - \frac{N/2 - F'}{fm} \times i$

$$৫৯·৫ - \frac{২২ - ১৮}{১০} \times ৫$$

$$= ৫৯·৫ - \frac{৪}{২}$$

$$= ৫৯·২ - ২ = ৫৭·৫$$

উত্তর = ৫৭·৫

মধ্যক গণনার বিশেষ ক্ষেত্র

যখন পৌনঃপুন্য বন্টনের মধ্যে ফাঁক (gap) থাকে ঃ অনেক পৌনঃপুন্য বন্টনে ৫০% স্কোর গুণে যেখানে পৌছানো যায় তার উপরে পৌনঃপুন্যের ঘরে এক বা একাধিক শূন্য থাকতে পারে। তখন মধ্যক নির্ণয় করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এসব ক্ষেত্রে মধ্যক নির্ণয়ের দু'টি পদ্ধতি নিম্নে দেয়া হল।

উদাহরণ ঃ ৪

শ্রেণি ব্যবধান i	পৌনঃপুন্য (*f*)	
৪২-৪৪	২	
৩৯-৪১	১	
৩৬-৩৮	০	
৩৩-৩৫	০	
৩০-৩২	৭	
২৭-২৯	০	১০
২৪-২৬	০	১০
২১-২৩	৬	
১৮-২০	২	
১৫-১৭	২	
১২-১৪	১	
	N = ২০	

নির্ণেয় মধ্যক (Median) = $L + \frac{N/2 - F}{fm} \times i$

$= ২৬.৫ + \frac{১০ - ১০}{৬} \times ৩$

$= ২৬.৫ + \frac{০}{২}$

= ২৬.৫ + ০ = ২৬.৫ উত্তর।

এখানে মোট স্কোর N = ২০, N/2 = ১০ নিচে থেকে পৌনঃপুন্য গণনা করে ২৩.৫ তে পৌঁছানো হলে নিয়ম অনুসারে ২৩.৫ ই মধ্যক হওয়া উচিত। আবার উপর থেকে ১০টি স্কোর গণণা করে ২৯.৫ পর্যন্ত পৌঁছানো গেল। মধ্যক হওয়া উচিত নিয়ম মত ২৯.৫। কিন্তু মাঝখানে ২৪-২৬ এবং ২৭-২৯ দু'টি শ্রেণি ব্যবধানের পৌনঃপুন্য শূন্য থাকায় এ বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে। ইহা দূর করতে হলে ২১-২৩ শ্রেণি ব্যবধানের সাথে ২৪-২৬ যোগ করে একটি প্রলম্বিত ২১-২৬ শ্রেণি ব্যবধানে তৈরি করতে হবে অনুরূপভাবে ৩০-৩২ শ্রেণিব্যবধানের সাথে ২৭-২৯ শ্রেণি ব্যবধানটি যোগকরে '২৭-৩২' প্রলম্বিত শ্রেণি ব্যবধান তৈরি করতে হবে। এবার নিচ থেকে গুণলে ২১-২৬ শ্রেণি ব্যবধানের উচ্চ প্রান্ত বা উপর থেকে ২৭-৩২ শ্রেণি ব্যবধানের নিম্নপ্রান্ত অর্থাৎ ২৬.৫ কে মধ্যক হিসাবে ধরা হয়। এভাবে উপর থেকে অথবা নিচ থেকে গণণা করে একই ফল পাওয়া যাবে।

আবার অন্যভাবেও উপরে বর্ণিত পৌনঃপুন্য বণ্টনটির মধ্যক নির্ণয় করা যায়। নিচ থেকে পৌনঃপুন্য গণনা করে ২৪-২৬ শ্রেণিব্যবধানের উচ্চসীমা পর্যন্ত ১০টি স্কোর এবং উপর থেকে গণনা করে ৩০-২৬ শ্রেণিব্যবধানের নিম্নসীমা পর্যন্ত ১০টি স্কোর পাওয়া গেল। প্রথম গণনায় মধ্যক-২৩.৫ এবং দ্বিতীয় গণনায় মধ্যক = ২১.৫ পাওয়া গেল। এ বৈষম্যের কারণ সমাধান করতে হলে, ২৪-২৬ এবং ২৭-২৯ শ্রেণীব্যবধান দুটির পৌনঃপুন্য থাকার অবস্থা বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে ২১-২৩ শ্রেণি ব্যবধানের সাথে ২৪-২৬ শ্রেণি ব্যবধানটি যোগ করে ২১-২৬ প্রলম্বিত শ্রেণিব্যবধান এবং ৩০-৩২ শ্রেণিব্যবধানের সাথে ২৭-২৯ শ্রেণিব্যবধানটি যোগ করে ২৭-৩২ প্রলম্বিত শ্রেণি ব্যবধান তৈরি করতে হবে। এখানে মধ্যক হবে ২৩.৫ এবং ২৯.৫ এর মধ্যবিন্দু।

নির্ণেয় মধ্যক = $\frac{২৩.৫ + ২৯.৫}{২} = \frac{৫৩.০০}{২}$ = ২৬.৫ উত্তর।

প্রচুরক (Mode) বা সর্বোচ্চ শীর্ষ

যে কোন স্কোরগুচ্ছের দুই প্রকারের প্রচুরক (Mode) বা সর্বোচ্চ শীর্ষ বের করা যায়।

১। অভিজ্ঞতা নির্ভর প্রচুরক বা সর্বোচ্চ শীর্ষ (Empirical Mode) বা স্থূল প্রচুরক (Crude Mode)

২। বিজ্ঞানসম্মত প্রচুরক বা প্রকৃত প্রচুরক (True mode)। ইংরেজি শব্দ Mode এর অর্থ রীতি বা প্রথা বা ফ্যাশন। সমাজে অধিকাংশ লোকের সাধারণ কার্যাবলীকে রীতি বা প্রথা বা প্রচুরক বলা যায়। এভাবে কোন স্কোরগুচ্ছের যে স্কোরটি অনেকেই পায় সেটিই উহার প্রচুরক।

অবিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছের ক্ষেত্রে স্থূল প্রচুরক (Mode) নির্ণয়

অবিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছের ক্ষেত্রে যে স্কোরটি বেশি বার আসে বা পরীক্ষার্থীরা অর্জন করে সেটিই হলো স্থূল প্রচুরক (Crude Mode) বা স্থূল সর্বোচ্চ শীর্ষ। মনে করি কোন শ্রেণি পরীক্ষায় বার জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে নিম্নোক্ত নম্বর বা স্কোর পেল।

১১, ১১, ১০, ১১, ১১, ১০, ১২, ১২, ১৩, ১৪, ৮, ৯।

উপরের স্কোরগুলিকে ক্রমানুসারে সাজান হলো -

৮, ৯, ১০, ১০, ১১, ১১, ১১, ১১, ১২, ১২, ১৩, ১৪।

উপরের সারিতে সবচেয়ে বেশি ছাত্র যে স্কোরটি পেয়েছে, সেটি হলো ১১। চারজন ছাত্র ১১ নম্বর পেয়েছে। অন্য কোন নম্বরই দু'জন ছাত্রের বেশি পায় নি। সুতরাং এক্ষেত্রে স্থূল (Mode) প্রচুরক হলো ১১।

বিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছের বা পৌনঃপুন্য বণ্টনের স্থুল প্রচুরক হলো যে শ্রেণি ব্যবধানের মধ্যবিন্দু হবে নির্ণেয় স্থুল প্রচুরক। নিচে একটি উদহারণ দেয়া হলো।

উদাহরণ ঃ ৫

নিচের পৌনঃপুন্য বণ্টনটির স্থুল প্রচুরক নির্ণয় করুন।

শ্রেণি ব্যবধান	৪০-৪৪	৪৫-৪৯	৫০-৫৪	৫৫-৫৯	৬০-৬৪	৬৫-৬৯
পৌনঃপুন্য	২	৩	৮	৩	২	১

উপরের উদাহরণটিতে ৫০-৫৪ শ্রেণিব্যবধানের পৌনঃপুন্যর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। সুতরাং ৫০-৫৪ শ্রেণি ব্যবধানের মধ্যবিন্দু ৫২ হলো বণ্টনের স্থুল প্রচুরক।

উদাহরণ ঃ ৬

নিম্নের অবিন্যস্ত স্কোর গুচ্ছের স্থুল প্রচুরক বের করুন।

২, ৩, ৩, ৪, ৪, ৪, ৫, ৫, ৫, ৬, ৬, ৭

উপরের সারিতে দেখা যায় ৪ স্কোরটি ৩ বার আবার ৫ স্কোরটিও ৩ বার এসেছে অন্য কোন স্কোর ২ বারের বেশি অবস্থান করছে না। এ ক্ষেত্রে স্থুল প্রচুরক হলো ৪, ৫ এদের কে দ্বি-মোডাল বলে। সাধারণত এক মোডাল ও দ্বি-মোডাল স্কোরগুচ্ছ দেখা যায়।

প্রকৃত প্রচুরক নির্ণয়

প্রকৃত প্রচুরক (True Mode) নির্ণয়ের সূত্র হলো-

প্রকৃত প্রচুরক = ৩ মধ্যক - ২ গড়।

অর্থাৎ কোন স্কোরগুচ্ছের প্রকৃত প্রচুরক নির্ণয় করতে হলে উহার মধ্যক বের করে ৩ দিয়ে গুণ করতে হবে। এরপর উহার গড় বের করে আবার ২ দিয়ে গুণ করতে হবে প্রথম গুণফল থেকে দ্বিতীয় গুণফল বিয়োগ করলেই প্রকৃত প্রচুরক পাওয়া যাবে।

অবিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছ থেকে প্রকৃত প্রচুরক নির্ণয়

উদহারণ ঃ ৭, নিম্নের স্কোরগুচ্ছের স্থুল প্রচুরক ও প্রকৃত প্রচুরক নির্ণয় করুন।

৪, ৫, ৬, ৬, ৭, ৭, ৮, ৮, ৯

উপরে বর্ণিত স্কোর গুচ্ছের সমষ্টি $\sum x = ৬৬$, $N = ১০$।

গড় $(M) = \frac{\sum x}{N} = \frac{৬৬}{১০} = ৬.৬$

মধ্যক = $\frac{৬+৭}{২} = \frac{১৩}{২} = ৬.৫$

স্থুল প্রচুরক (Crude Mode) = ৬

প্রকৃত প্রচুরক (True Mode)

= ৩ মধ্যক-২ গড়

= ৬.৫ x ৩ - ৬.৬ x ২

= ১৯.৫-১৩.২

= ৬.৩ উত্তর

বিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছের প্রচুরক নির্ণয়

উদাহরণ ঃ ৮ নিম্নের পৌনঃপুন বণ্টনটির প্রকৃত প্রচুরক বের করুন।

শ্রেণিব্যবধান	২৬-৩০	৩১-৩৫	৩৬-৪০	৪১-৪৫	৪৬-৫০	৫১-৫৫	৫৬-৬০
পৌনঃপুন্য	১	৪	৫	৯	৭	২	২

উত্তর ঃ

শ্রেণি ব্যবধান (i)	পৌনঃপুন (f)	বিচ্যুতি (d)	fd
৫৬-৬০	২	৩	৬
৫১-৫৫	২	২	৪
৪৬-৫০	৭	১	৭
৪৬-৫০	৭	১	৭
			১৭
৪১-৪৫	৯	- ০	- ৫
৩৬-৪০	৫	-১	- ৫
৩১-৩৫	৪	= ১০-২	- ৮
২৬-৩০	১	- ৩	- ৩
			- ১৬
	N = ৩০		$\sum fd$ = ১৭-১৬=১

গড় (M) = $\acute{M} + \frac{\sum fd}{N} \times i$

= ৪৩ + $\frac{১}{৩০}$ x ৫

= ৪৩ + $\frac{১}{৬}$ x

= ৪৩ + ০.১৬

=৪৩.১৬

এখানে $\acute{M}$ = ৪৩

$\sum fd$ = ১

i = ৫

N = ৩০

$$\text{মধ্যক} = L + \frac{N/2 - F}{fm} \times i$$

$$= ৪০\cdot৫ + \frac{১৫ - ৩}{৯} \times ৫$$

$$= ৪০\cdot৫ + \frac{২৫}{৯}$$

$$= ৪০\cdot৫ + ২\cdot৭৭$$

$$= ৪৩\cdot২৭$$

এখানে $N/2 = ১৫$

$i = ৫$

$fm = ৯$

$L = ৪০\cdot৫$

$F = ১৩$

প্রকৃত প্রচুরক = ৩ মধ্যক -২ গড়

= ৪৩·২৭ x ৩-৪৩·১৬ x ২

= ১২৯·৮৯ - ৮৬·৩২

= ৪৩·৪৯।

স্থূল প্রচুরক = ৪৩।

গড়, মধ্যক ও প্রচুরকের ব্যবহারের নিয়মাবলী

কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ তিনটি হলো গড়, মধ্যক ও প্রচুরক। এ তিনটি পরিমাপ সর্বক্ষেত্রে সবসময়ে সমানভাবে ব্যবহৃত হয়না। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ পরিমাপটি ব্যবহার করা হয়। কেন্দ্রীয় প্রবণতার তিনটি পরিমাপের মধ্যে গড়ই নির্ভরযোগ্য পরিমাপ। গড়ের পরেই মধ্যক। প্রচুরক খুব একটা নির্ভরযোগ্য পরিমাপ নয়।

গড়ের বৈশিষ্ট্যাবলী

১। গড় কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য। জনসংখ্যার বিভিন্ন ধরনের নমুনা দলের (Samples) মধ্যক ও প্রচুরকের তুলনায় গড়গুলোর মধ্যে বৈষম্য সবচেয়ে কম থাকে।

২। পরিসংখ্যানের পরবর্তী পরিমাপসমূহে (যেমন আদর্শ বিচ্যুতি, সহ-সম্পর্কের মান ইত্যাদি) গড় অতি সহজেই ব্যবহৃত হচ্ছে। ইহা বন্টনের কেন্দ্রীয় মান থেকে প্রতিটি স্কোরের বিচ্যুতি নির্ধারণ করতে সহায়তা করে যা, পরিসংখ্যানের অনেক গুরত্বপূর্ণ গণনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

৩। গড় থেকে বিচ্যুতি গণনা করা এবং উহার বর্গকরা পদ্ধতিসমূহ যে কোন বণ্টনের সবগুলো স্কোরের উপর সমান গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে মধ্যক ও প্রচুরকের তুলনায় গড় মোটামুটিভাবে সুসামঞ্জস্য প্রকৃতির প্রয়োগমূলক পদ্ধতি।

৪। বণ্টনটি অসামঞ্জস্য প্রকৃতির হলে গড় থেকে বণ্টনের ভুল ধারণা পাওয়া যাবে। এ ধরনের ক্ষেত্রে মধ্যক, প্রচুরক ব্যবহার করা উচিত।

৫। বিভিন্ন স্কোরের গড় থেকে বিচ্যুতির মানটি পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরত্বপূর্ণ। গড় থেকে নেয়া বিচ্যুতিগুলোর যোগফল সবসময়ই শূন্য (০) হবে। গড়ের এ বৈশিষ্ট্যটি বিশেষ গুরত্বপূর্ণ। মধ্যক ও প্রচুরকেরও এ ধরনের বৈশিষ্ট্য নেই।

মধ্যকের বৈশিষ্ট্যাবলী

১। অল্প সংখ্যক নমুনার ক্ষেত্রে যদি প্রান্তবর্তী চরম প্রকৃতির স্কোর থাকে, সে ক্ষেত্রে গড়ের চেয়ে মধ্যক সঠিক পরিমাপ দেয়।

২। কোন বণ্টনের প্রান্তবর্তী স্কোরগুলো অনির্দিষ্ট বা অনিশ্চিত প্রকৃতির থাকে, সে ক্ষেত্রে একমাত্র মধ্যকই নির্ভরযোগ্য কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ। এরূপ ক্ষেত্রে প্রচুরকও মোটামুটি সঠিক পরিমাপ দেয়।

গড়, মধ্যক ও প্রচুরকের তুলনামূলক ব্যবহার

গড় কখন ব্যবহার করতে হয়

১। সবচেয়ে নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য একটি কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপের জন্য গড় ব্যবহার করা হয়।

২। একটি স্বাভাবিক পৌনঃপুন্য বণ্টনের ক্ষেত্রে গড় ব্যবহৃত হয়।

৩। পরিসংখ্যানের অন্যান্য পরিমাপ-যেমন আদর্শ বিচ্যুতি, গড় বিচ্যুতি, সহ-সম্পর্কের মান ইত্যাদি নির্ণয়ের জন্য গড় ব্যবহৃত হয়।

৪। যখন প্রত্যেকটি স্কোরের ওজন বা গুরত্ব একই বলে নিতে হয়, তখন সমস্ত স্কোরগুলোর সমষ্টিকে মোট স্কোর সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে গড় বের করা হয়, এ ক্ষেত্রে প্রতিটি স্কোরের ওজন বা গুরুত্ব সমভাবে প্রতিফলিত হয়।

মধ্যক কখন ব্যবহার করতে হয়

১। দীর্ঘহিসাব বা গণনা করার সময়ের অভাব থাকলে সহজেই ও তাড়াতাড়ি মধ্যক বের করা যায়।

২। বণ্টনের উপরের অর্ধে ও নিচের অর্ধে স্কোরগুলো ছড়িয়ে থাকলে তাদের সঠিক তথ্য জানতে হবে বা কেন্দ্রীয় বিন্দু হতে স্কোরগুলো কতদূরে ছড়িয়ে আছে তা জানার প্রয়োজন হলে মধ্যক ব্যবহৃত হয়।

৩। যখন কোন বণ্টনের ঠিক মধ্যবিন্দুটি জানার প্রয়োজন হয় তখন মধ্যক ব্যবহ করা হয়।

৪। যখন কোন অসম্পূর্ণ বণ্টন সম্পর্কে পরিমাপ করতে হয় অথবা বণ্টনটির প্রা অনির্দিষ্ট স্কোর থাকে এবং গড় বের করা সম্ভব নয় তখন মধ্যক ব্যবহৃত হয়।

৫। যখন কোন বণ্টনের প্রান্তসীমার খুব উচ্চমানের বা নিম্নমানের অধিক সংখ্যক স্কে থাকে যার ফলে গড় অস্বাভাবিক খুব বড় বা ছোট হতে পারে এ সবক্ষেত্রে একম মধ্যক সঠিক পরিমাপ দেয়। কারণ মধ্যক এ জাতীয় অস্বাভাবিক স্কোর দ্বা প্রভাবিত হয় না।

প্রচুরক কখন ব্যবহার করতে হয়

১। খুব তাড়াতাড়ি একটি কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ করতে হলে প্রচুরক ব্যবহার ক হয়।

২। কেন্দ্রীয় প্রবণতার মোটামুটি একটি পরিমাপ হলে যদি চলে, তখন প্রচুরক ব্যবহ হয়।

৩। যখন কোন স্কোর বণ্টনের মধ্যে অধিক অবস্থান করছে যদি তা জানার প্রয়োজ হয়, তখন প্রচুরক ব্যবহার করতে হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ গড়, মধ্যক ও প্রচুরক কোন স্কোর নয়, এরা কেন্দ্রীয় প্রবণত পরিমাপক বা নির্ণয়ক একটি বিন্দু মাত্র বা স্কোর।

অনুশীলনী ৪.৭

১। গড়, মধ্যক ও প্রচুরক বলতে কি বুঝেন? উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা দিন।

২। কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপগুলো কি কি ঠিক উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।

৩। গড়, মধ্যক, প্রচুরকের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি? কোনটি কখন ব্যবহৃত হয়?

৪। নিম্নলিখিত স্কোরগুলোর স্থূল প্রচুরক বের করুন।

ক) ১৪, ৬ , ৭, ১৫, ৮, ১৯, ১০, ৯, ১১, ১৩, ১০, ১১

খ) ৪, ৫, ৯, ৬, ৪, ৬, ৩, ৮, ৬, ৭, ৬, ২, ৬, ৫

গ) ১৭, ৬, ১০, ১৫, ১৪, ২১, ১৫

ঘ) ১৮, ২১, ৪, ২৯, ১৮, ৩, ২৬, ১২, ২৪, ২৫

ঙ) ২৩, ৬, ৩৯, ১৭, ১৯, ১৭, ৩৬, ২৮

৫ নিচের স্কোরগুলোকে পৌনঃপুন বণ্টনে সাজিয়ে উহাদের গড়, মধ্যক ও প্রচুরক নির্ণয় করুন। সর্বনিম্ন শ্রেণিব্যবধান ৩০-৩৪ দিয়ে শুরু করুন।

৪০, ৪৮, ৬২, ৫৭, ৭৩, ৪২, ৩৭, ৪৫, ৬২, ৭৫

৪৮, ৩১, ৪৭, ৫০, ৭০, ৭৩, ৬০, ৬৯, ৮০, ৮৩

৪৪, ৩৮, ৫, ৬৪, ৭৩, ৪২, ৫৭, ৪৬, ৬৪, ৮৭

৪৮, ৫৪, ৫৭, ৭৯, ৬২, ৫৫, ৪৪, ৬৩, ৫৮, ৪৯

৫৭, ৪২, ৫৪, ৫৯, ৫২, ৪৬, ৫১, ৫৮, ৪৮, ৫৩

৬। নিম্নলিখিত পৌনঃপুন্য বণ্টনগুলোর গড়, মধ্যক ও প্রচুরক নির্ণয় করুন

(ক)

শ্রেণি ব্যবধান	পৌনঃপুন্য
৯১-১০০	৪
৮১-৯০	১২
৭১-৮০	২৬
৬১-৭০	৪৩
৫১-৬০	৩৫
৪১-৫০	১৯
৩১-৪০	৭
২১-৩০	২

(খ)

শ্রেণি ব্যবধান	পৌনঃপুন্য
৮৬-৯০	১
৮১-৮৫	৫
৭৬-৮০	০
৭১-৭৫	৮
৬৬-৭০	০
৬১-৬৫	০
৫৬-৬০	৫
৫১-৫৫	৪
৪৬-৫০	৩
৪১-৪৫	২

৭। নিচের পৌনঃপুন্য বণ্টনগুলোর সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় ও মধ্যক বের করুন : ব্যবহৃত পদ্ধতি ও সূত্রের বর্ণনা দিন।

(ক)

শ্রেণি ব্যবধান	পৌনঃপুন্য
৭৮-৮০	১
৭৫-৭৭	৪
৭২-৭৪	৫
৬৯-৭১	৭
৬৬-৬৮	৮
৬৩-৬৫	৯

(খ)

শ্রেণি ব্যবধান	পৌনঃপুন্য
৮০-৮৫	১
৭৪-৭৯	৩
৬৮-৭৩	৩
৬২-৬৭	৭
৫৬-৬১	৯
৫০-৫৫	১২

৬০-৬২	১১
৫৭-৫৯	১৪
৫৪-৫৬	১৭
৫১-৫৩	১৩
৪৮-৫০	৮
৪৫-৪৭	৬
৪২-৪৪	৪
৩৯-৪১	২
৩৬-৩৮	১
৩৩-৩৫	২
৩০-৩২	১

৪৪-৪৯	১৪
৩৮-৪৩	১১
৩২-৩৭	৮
২৬-৩১	৩
২০-২৫	১

(গ)

শ্রেণি ব্যবধান	পৌনঃপুন্য
৬০-৬৩	৩
৫৬-৫৯	৪
৫২-৫৫	৬
৪৮-৫৩	১১
৪৪-৪৭	১৪
৪০-৪৩	২৩
৩৬-৩৯	২৮
৩২-৩৫	২১
২৮-৩১	১৭
২৪-২৭	১২
২০-২৩	৭
১৬-১৯	৩
১২-১৫	১

(ঘ)

শ্রেণিব্যবধান	পৌনঃপুন্য
৮৫-৮৯	২
৮০-৮৪	৪
৭৫-৭৯	০
৭০-৭৪	৬
৬৫-৬৯	১৩
৬০-৬৪	১
৫৫-৫৯	০
৫০-৫৪	৪
৪৫-৪৯	৩
৪০-৪৪	১

বিষমতার পরিমাপ

কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ জানাসত্ত্বেও বিষমতার পরিমাপ জানতে হয় কেন?

কেন্দ্রীয় প্রবণতা একটি স্কোরগুচ্ছের প্রতিনিধি স্বরূপ। কিন্তু কেন্দ্রীয় প্রবণত পরিমাপগুলো জানলেই স্কোরগুচ্ছটির সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্য জানা যায় না। উদাহরণস্বরূপ ন শ্রেণির ৭ জন ছাত্র ও ৭ জন ছাত্রীর গণিত বিষয়ে ১০০ নম্বরের একটি পরীক্ষা হলো। এ দু'য়ের মধ্যে ছাত্রদের স্কোরগুলো যথাক্রমে-

৫৭, ৬০, ৪০, ৫২, ৫০, ৪৩, ৪৮

এবং ছাত্রীদের স্কোরগুলো যথাক্রমে-

৫৬, ৬৭, ৮০, ৫০, ৪৪, ২০, ৩৩

উভয় স্কোরগুলোকে মানের ক্রমানুসারে সাজান হলো-

ছাত্রদের স্কোর ঃ ৪০, ৪৩, ৪৮, ৫০, ৫২, ৫৭, ৬০

ছাত্রীদের ঃ ২০, ৩৩, ৪৪, ৫০, ৫৬, ৬৭, ৮০

উভয় দলের গড় = ৫০, মধ্যক = ৫০ এবং প্রচুরক = ৫০। কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপগুলো দিয়ে স্কোরগুচ্ছ দুটির মধ্যে কোন পার্থক্য পাওয়া গেল না। ফলে, এ সিদ্ধান্ত কি সঠিক হবে যে উভয়দলের পারদর্শিতা বা ফলাফল একই রকম? কিন্তু তা হতে পারে না। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপগুলো উভয়দলের ফলাফল সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা দিতে পারছে না। এ জন্য উভয়দলের স্কোরগুলোর আরো বিশ্লেষণ প্রয়োজন। ছাত্রদের স্কোর ৪০ থেকে শুরু করে ৬০ পর্যন্ত। কিন্তু ছাত্রীদের স্কোর ২০ থেকে ৮০ পর্যন্ত। যদিও উহাদের গড়, মধ্যক ও প্রচুরকের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু উহাদের বিস্তৃতির ক্ষেত্রে বেশ পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। দু'দলের স্কোরের বিস্তৃতি-

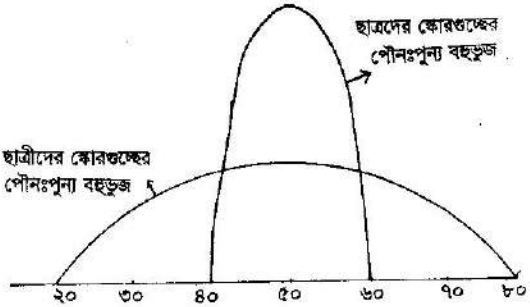

ছাত্রদের স্কোরের বিস্তৃতি = ৬০-৪০=২০

ছাত্রীদের স্কোরের বিস্তৃতি = ৮০-২০=৬০

নিম্নে দু'দলের স্কোরগুচ্ছ দিয়ে পৌনঃপুন্য বহুভুজ অঙ্কন করা হলো। ছাত্রদের স্কোরগুলো ছাত্রীদের স্কোরের তুলনায় কম জায়গা জুড়ে আছে। ছাত্রীদের স্কোরগুলো ছাত্রদের স্কোরের চেয়ে পরিসংখ্যানের ভাষায় বেশি বৈষম্যপূর্ণ। এ কারণেই স্কোরগুচ্ছের প্রকৃত স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য জানতে হলে কেবল তাদের কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপগুলো জানলেই চলে না, তাদের এ বিষমতার স্বরূপটিও জানার প্রয়োজন হয়। কোন স্কোরগুচ্ছের বৈশিষ্ট্য জানতে হলে সে স্কোরগুলোর কেন্দ্রীয় প্রবণতার চারপাশে বিস্তৃত বা ছড়িয়ে পড়া বৈষম্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলোর বিষমতার পরিমাপ জানা প্রয়োজন হয়। যেমন

উল্লিখিত স্কোরগুচ্ছদ্বয়ের মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপগুলো পরস্পর সমান হ
ছাত্রীদের স্কোরগুলোর বিষমতা ছাত্রদের স্কোরগুলোর বিষমতার তিনগুণ। সাধারণ
সমজাতীয় ব্যক্তি বা বস্তু দিয়ে গঠিত দলের বিষমতার পরিমাপ কম হয়। আর দ
অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তি বা বস্তুর স্কোরের পার্থক্য যত বেশি থাকবে তাদের বিষমত
পরিমাপ ততবেশি হবে। শ্রেণিকক্ষে সমজাতীয় শিক্ষার্থী থাকলে বিস্তার বা বিষমত
পরিমাপ কম হবে। তাদেরকে পাঠদান করা সহজ এবং শিক্ষকের পাঠদান ফলপ্র
সার্থক ও কার্যকরি হয়। শ্রেণিতে বিভিন্ন মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থী থাকলে তাদেরকে সমভা
আগ্রহী করে পাঠদান করা অত্যন্ত জটিল কাজ হয়ে দাঁড়ায়।

কোন শ্রেণিতে কোন বিষয়ে কেহ হয়ত খুব ভাল আর কেহ হয়ত খুবই দূর্বল।
ধরনের পরিস্থিতিতে ঐ শ্রেণিতে ফলপ্রসূ বা সন্তোষজনক পাঠদান করা মোটেই সহ
নয়। আবার শ্রেণিতে অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি আরও সমস্যাকে বাড়ি
দেয়। এ রকম অসম অবস্থায় শিক্ষক কোন শিক্ষার্থীকেই ব্যক্তিগতভাবে নজর দিতে
পাঠগ্রহণে আগ্রহী বা উপযোগী করতে সক্ষম হবেন না। এ কারণেই শিক্ষার্থীরা লে
পড়ায় পিছিয়ে পড়ে। শ্রেণিকক্ষে সমজাতীয় মেধা বা সমমানসিক বুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্র/ছা
আছে কিনা তা নিরূপণ করতে হয়।

ছাত্র/ছাত্রীদের সঠিক অবস্থানের তথ্য জেনে মোটামোটিভাবে একই মেধা সম্প
শিক্ষার্থীদেরকে এক একদলভুক্ত করে পাঠদানে অগ্রসর হলে অবশ্যই পাঠদান সু
সার্থক ও কার্যকরি হবে। আর শিক্ষার্থীদের সঠিক তথ্য জানার জন্য বিষমতার পরিম
একান্ত প্রয়োজন।

বিষমতার পরিমাপ নির্ণয়

চার প্রকার প্রণালীর মাধ্যমে বিষমতার পরিমাপ নির্ণয় করা হয়। যথা

১। বিস্তৃতি (Range)

২। গড় বিচ্যুতি (Mean Deviation or M.D.)

৩। আদর্শ বিচ্যুতি (Standard Deviation or S.D.) ঃ

৪। চতুর্থাংশ বিচ্যুতি (Quartile Deviation or Q.)

বিস্তৃতি (Range)

বিস্তৃতি বলতে সহজেই বুঝা যায় কোন স্কোরগুচ্ছের স্কোরগুলো কতদূর প
ছড়িয়ে রয়েছে তার একটি পরিমাপ। স্কোরগুচ্ছের বৃহত্তম স্কোরটি থেকে নিম্নতম স্কো
বিয়োগ করলে বিস্তৃতি পাওয়া যায়। উপরের উদাহরণে ছাত্রদের স্কোরগুচ্ছের বিস্তৃ

হচ্ছে = ৬০-৪০=২০ এবং ছাত্রীদের স্কোরগুচ্ছের বিস্তৃতি = ৮০ - ২০ = ৬০। বিস্তৃতির সাহায্যে দু'টি দলের স্কোর কিভাবে ছড়িয়ে রয়েছে তার একটা মোটামোটি তুলনা করা যায়। তবে, বিস্তৃতির ক্ষেত্রে কেবলমাত্র দু'টি প্রান্তের স্কোর দু'টিকে হিসাবে ধরা হয়।

বিস্তৃতির অসম্পূর্ণতা (Defects of Range)

অনেকক্ষেত্রে বিষমতার পরিমাপ হিসাবে বিস্তৃতি মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ, বিস্তৃতি গণনায় কেবলমাত্র সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন এ দু'টি স্কোরকে গুরুত্ব দিয়ে স্কোরগুচ্ছের অন্যান্য স্কোরগুলিকে উপেক্ষা করা হয়। তাদের অবস্থান, প্রকৃতি বা স্বরূপ পরিমাপের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় না। দু'টি দলের স্কোর গুচ্ছকে উদাহরণ হিসাবে লক্ষ্য করা যায়। প্রথমেই নবম শ্রেণির দশ জন ছাত্রের বাংলা বিষয়ের নম্বর লিখি। ইহারা যথাক্রমে ১০. ৪০, ৪২, ৪৪, ৪৫, ৪৭, ৪৮, ৫০, ৫২, ও ৮০ এবং একই শ্রেণীর একই বিষয়ের দশজন ছাত্রীর নম্বর হলো ৩৫, ৩৭, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪২, ৪৩, ৪৪ ও ৪৫। ছাত্রদের সর্বনিম্ন স্কোর ১০ এবং সর্বোচ্চ ৮০ এবং ছাত্রীদের সর্বোচ্চ স্কোর ৪৫ এবং সর্বনিম্ন স্কোর ৩৫। ছাত্রদের স্কোরের মধ্য সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ স্কোর দু'টির চরম প্রকৃতির। অন্যান্য স্কোরগুলি কাছাকাছি এবং একই প্রকৃতির বা ছাত্রীদের কাছাকাছি এবং একই প্রকৃতির। ছাত্রদের স্কোরের বিস্তৃতি = ৮০-১০ = ৭০ এবং ছাত্রীদের স্কোরের বিস্তৃতি = ৪৫-৩৫ = ১০। এখানে দেখা যাচ্ছে ছাত্রদের বন্টনের বিস্তৃতি ৭০ এবং ছাত্রীদের বন্টনের বিস্তৃতি ২০ অর্থাৎ ছাত্রদের বিস্তৃতি ছাত্রীদের বিস্তৃতির সাতগুণ। ছাত্রদের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ স্কোর বাদ দিলে উভয় দলই মোটামুটি একই রকম। বিস্তৃতির পরিমাপের জন্য শুধু এ দু'টি নম্বরই নেয়া হয়। এ কারণ ছাত্রদের স্কোর এর ক্ষেত্রে বিস্তৃতিটি স্কোরগুচ্ছের বিষমতার যথার্থ পরিমাপ দিতে পারছে না। অপরদিকে ছাত্রীদের স্কোরের ক্ষেত্রে কোন চরম প্রকৃতির স্কোর না থাকায়, বিষমতার পরিমাপ রূপে বিস্তৃতিকে গণ্য করা যায়। বস্তুতঃ দু'টি বন্টনের বিস্তৃতির মধ্যে তুলনা করে বন্টন দু'টির বিষমতার পরিমাপের ক্ষেত্রে একটি ধারণা পাওয়া যায়। যদি ঐ বন্টনদ্বয়ের স্কোরগুলোর মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য না থাকে বা কোন চরম প্রকৃতির স্কোর না থাকে। আবার দু'টি বন্টনের পরিমাপের একক সমান না হলে বিস্তৃতি দু'টি দলের বিষমতার সঠিক পরিমাপ দিতে পারে না।

বিস্তৃতি কখন ব্যবহার করতে হয়?

বিষমতার পরিমাপের চার প্রকার প্রণালীর মধ্যে বিস্তৃতির এ ধরনের সীমাদ্ধতা সত্ত্বেও নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে ইহার ব্যবহার উল্লেখযোগ্য ঃ

১. যখন স্কোরগুলো সংখ্যায় খুব কম এবং ছড়ানো থাকে তখন অন্যকোন বিষমতার পরিমাপ নির্ণয় করার কোন প্রয়োজন হয় না।

২. যখন বণ্টনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন স্কোরগুলোর মোটামোটি তথ্য জানার প্রয়োজ হয়, তখন উন্নত ধরনের কোন বিষমতার পরিমাপ নির্ণয়ের দরকার পড়ে ন কেবলমাত্র বিস্তৃতি জানলেই চলে।

৩. যখন স্কোরগুলো কতদূর পর্যন্ত ছড়ানো আছে, শুধু তা জানার প্রয়োজন পড়ে, তখ বিস্তৃতির ব্যবহার করতে হয়।

৪. যখন দ্রুততম বিষমতার পরিমাপ জানার দরকার হয় তখন কেবল বিস্তৃতি ব্যবহার করতে হয়।

গড় বিচ্যুতি (Mean Deviation)

গড় বিচ্যুতি (Mean Deviation) সংজ্ঞা ঃ কোন স্কোরগুচ্ছের কেন্দ্রীয় প্রবণ (সাধারণত গড়) থেকে তার প্রত্যেকটি স্কোরের যে বিচ্যুতি (Deviation) সেই বিচ্যুতি গড়কে গড় বিচ্যুতি (Mean Deviation or M.D.) বলে। গড় বিচ্যুতি নির্ণয় কর হলে বিচ্যুতিগুলোর যোগ (Plus) বা বিয়োগ (Minus) চিহ্ন অগ্রাহ্য করে প্রত্যেক বিচ্যুতিকেই যোগ চিহ্ন ধরে তাদের গড় বের করতে হয়। গড়ের সঙ্গে প্রতিটি স্কো যে, পার্থক্য পাওয়া যায় সে পার্থক্যকে বিচ্যুতি (Deviation) বলে। যে স্কোরটি গ সমান তার বিচ্যুতি শূন্য (০)। বিচ্যুতির সূত্র হলো-

$d = X - M$, এখানে, X = মূল স্কোর

M = গড়

d = স্কোরটির গড় থেকে বিচ্যুতি।

উদাহরণ ঃ ১

২, ৪, ৬, ৮, ১০ স্কোরগুলোর গড় বিচ্যুতি নির্ণয় করুন।

স্কোর (X)	গড় (M)	বিচ্যুতি (X-M=d)
১০	৬	১০-৬= ৪
৮	৬	৮-৬= ২
৬	৬	৬-৬= ০
৪	৬	৪-৬= -২
২	৬	২-৬= -৪
$\sum X = ৩০$		$\sum/d/ = ১২$

প্রদত্ত উদাহরণের স্কোরগুলোর সমষ্টি $\sum X = ৩০$, $N = ৫$

গড় (M) = $\frac{\sum x}{N} = \frac{৩০}{৫} = ৬$।

এ গড় থেকে প্রতিটি স্কোরের বিচ্যুতি (X-M=d) হবে (নিচ থেকে) -৪, -২, ০, ২, ৪ এদের যোগফল $\Sigma d = (-৪) + (-২) - ০ - ২ - ৪ = ০$। ইহাকে সংখ্যা N = ৫ দিয়ে ভাগ করলে $\frac{০}{৫} = ০$ হয়। অতএব বিচ্যুতিগুলোর সাধারণ সমষ্টি থেকে গড় বিচ্যুতি পাওয়া যাবে না আবার বন্টনটির মধ্যে প্রত্যেক পরীক্ষার্থী একই স্কোর পায়নি, এ কারণে গড় বিচ্যুতি শূন্য হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে গাণিতিক পরম মান (Absolute Value) হিসাবে ঋণমূলক (Negative) বিচ্যুতিগুলোকে ধনমূলক (Positive) ধরে বিচ্যুতিগুলোর সমষ্টি বের করে গড় বিচ্যুতি নির্ণয় করতে হবে। তাহলে উপরের বিয়োগ (Minus) চিহ্নযুক্ত বিচ্যুতিগুলিকে তাদের বিয়োগচিহ্ন উপেক্ষা করে সবগুলো বিচ্যুতির সমষ্টি $\Sigma|d| = ৪+২+০+২+৪=১২$। সুতরাং উপরের উদাহরণের গড় বিচ্যুতি (M.D.) = ১২ ÷ ৫ = ২.৪। অবিন্যস্ত স্কোরের ক্ষেত্রে গড় বিচ্যুতি নির্ণয়ের সূত্র হলো-

গড় বিচ্যুতি (Mean Deviation) = $\frac{\Sigma|d|}{N}$

এখানে, Σ = সমষ্টি

d = গড় থেকে নেয়া প্রতিটি স্কোরের বিচ্যুতি

N = স্কোরের মোট সংখ্যা

|| = এ বার চিহ্ন দু'টি দিয়ে চিহ্ন নিরপেক্ষতা বা পরিমাণ (Absolute Value) বুঝাচ্ছে।

উদাহরণ ঃ ২

ক. আটজন ছাত্র একটি শ্রেণি পরীক্ষায় যথাক্রমে ১১, ১৪, ১৩, ১৬, ১২, ৯, ১১ পেল। স্কোরগুলোর গড় বিচ্যুতি বের করুন।

খ. নবমমানের দশ জন ছাত্র বাংলা পরীক্ষায় যথাক্রমে ৪৭, ৫৬, ৩৮, ৩৭, ৪৩, ৪১, ৩৩, ২৪, ৩৯, ৪২ স্কোর পেল। স্কোরগুলোর গড় বিচ্যুতি বের করুন।

(ক) উত্তর

স্কোর (X)	গড় থেকে প্রতিটি স্কোরের বিচ্যুতি (d)
১৬	১৬-১২= ৪
১৪	১৪-১২= ২
১৩	১৩-১২= ১
১২	১২-১২= ০
১১	১১-১২= -১
১১	১১-১২= -১
১০	১০-১২= -২
৯	৯-১২= -৩
$\Sigma X = ৯৬$	$\Sigma\|d\| = ১৪$

গড় $M = \frac{\Sigma x}{N} = \frac{৯৬}{৮} = ১২$

গড় বিচ্যুতি $(M.D.) = \frac{\Sigma/d/}{N} = \frac{১৪}{১২} = ১.১৬$

খ) উত্তর ঃ

স্কোর (X)	বিচ্যুতি (d)
৫৬	১৬
৪৭	৭
৪৩	৩
৪২	২
৪১	১
৩৯	-১
৩৮	-২
৩৭	-৩
৩৩	-৭
২৪	-১৬
$\Sigma X = ৪০০$	$\Sigma/d/ = ৫৮$

গড় $(M) = \frac{\Sigma X}{N} = \frac{৪০০}{১০} = ৪০$

গড় বিচ্যুতি $= \frac{\Sigma/d/}{N} = \frac{৫৮}{১০} = ৫.৮$

নির্ণেয় গড় বিচ্যুতি = ৫.৮

বিন্যস্ত স্কোরের ক্ষেত্রে গড় বিচ্যুতি নির্ণয় ঃ

অবিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছের গড় বিচ্যুতি (M.D) বের করার ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি স্কোরের গড় থেকে নেয়া বিচ্যুতিগুলোর সমষ্টিকে মোট স্কোর সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হয়। কিন্তু বিন্যস্ত স্কোরের গড় বিচ্যুতি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পৌনঃপুন্য বন্টনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি স্কোরের বিচ্যুতি আলাদাভাবে বের করা হয় না।

এখানে গড় থেকে প্রত্যেকটি শ্রেণিব্যবধানের মধ্যবিন্দুর বিচ্যুতিকে সে শ্রেণির পৌনঃপুন্য দিয়ে গুণ করতে হয়। এ ছাড়া বিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছের গড় বিচ্যুতি নির্ণয়ের অন্যান্য পদক্ষেপগুলো অবিন্যস্ত স্কোরের মতই। সুতরাং বিন্যস্ত স্কোরের ক্ষেত্রে গড় বিচ্যুতি নির্ণয়ের সূত্র হলো-

গড় বিচ্যুতি $(M.D.) = \frac{\Sigma/fd/}{N}$

এখানে, Σ = সমষ্টি,

d = গড় থেকে প্রতিটি শ্রেণি ব্যবধানে মধ্যবিন্দুর বিচ্যুতি

f = পৌনঃপুন্য

N = মোট স্কোর সংখ্যা বা পৌনঃপুন্যের সংখ্যা

|| = এবার চিহ্ন দুটো দ্বারা বিচ্যুতিগুলোর চিহ্ন নিরপেক্ষতা বা ধনমূলক (Absolute Value) বুঝাবে।

$\therefore \Sigma|fd|$ = গড় থেকে প্রত্যেক শ্রেণির মধ্য বিন্দুর বিচ্যুতিকে সে শ্রেণির পৌনঃপুন্য দিয়ে গুণ করে চিহ্ন নিরপেক্ষভাবে তাদের মোট যোগফল বা সমষ্টি।

উদাহরণ ঃ ৩

নিচের পৌনঃপুন্য বন্টনগুলোর গড় বিচ্যুতি নির্ণয় করুন।

(ক)

স্কোর	পৌনঃপুন্য
৩৪	২
৩০	৪
২৬	৫
২৫	৬
২৪	৩

(খ)

শ্রেণি ব্যবধান	পৌনঃপুন্য
৮০-৮৪	১
৭৫-৭৯	২
৭০-৭৪	৬
৬৫-৬৯	৮
৬০-৬৪	১৫
৫৫-৫৯	৭
৫০-৫৪	৬
৪৫-৪৯	৩
৪০-৪৪	২

উদাহরণ ঃ ৩

উত্তর ঃ ৩ (ক)

স্কোর (X)	পৌনঃপুন্য (f)	অনুমিত গড় থেকে বিচ্যুতি (D)	fD	গড় থেকে বিচ্যুতি d=X-M	fd
৩৪	২	৮	১৬	+ ৭	১৪
৩০	৪	৪	১৬	+ ৩	১২
২৬ (অনুমিত গড়)	৫	০	০	+ ১	- ৫

২৫	৬	১	- ৬	- ২	- ১২
২৪	৩	২	- ৬	- ৩	- ৯

N = ২০ ΣfD = ৩২- ১২ $\Sigma /fD/$ = ৫২

= ২০

গড়, (M) = A.M.+ $\frac{\Sigma fD}{N}$ = ২৬ + $\frac{২০}{২০}$ = ২৬ + ১ = ২৭

গড় বিচ্যুতি = M.D. = $\frac{\Sigma /fd/}{N}$ = $\frac{৫২}{২০}$ = $\frac{৫·২}{২}$ = ২·৬।

উত্তর ঃ ৩ (খ)

শ্রেণি ব্যবধান (i)	শ্রেণি মধ্যমান (x)	পৌনঃপুন্য (f)	অনুমিত গড় থেকে বিচ্যুতি (d´)	fd	গড় (M)	গড় থেকে বিচ্যুতি d=X̄-M	fd
৮০-৮৪	৮২	১	৪	৪		২০.৬	২০.৬
৭৫-৭৯	৭৭	২	৩	৬		১৫.৬	৩১.২
৭০-৭৪	৭২	৬	২	১২		১০.৬	৬৩.৬
৬৫-৬৯	৬৭	৮	১	৮		৫.৬	৪৪.৮
৬০-৬৪	৬২	১৫	০	০	৬১.৪	০.৬	৯.০
৫৫-৫৯	৫৭	৭	-১	-৭		-৪.৪	-৩০.৮
৫০-৫৪	৫২	৬	-২	-১২		-৯.৪	-৫৬.৪
৪৫-৪৯	৪৭	৩	-৩	-৯		-১৪.৪	-৪৩.২
৪০-৪৪	৪২	২	-৪	-৮		-১৯.৪	-৩৮.৮

N = ৫০, $\Sigma fd'$ = ৩০-৩৬ $\Sigma /fd/$ = ৩৩৮.

= - ৬

গড় (M) = M´+ $\frac{\Sigma fd'}{N}$ x i

= ৬২ + $\frac{- ৬}{৫০}$ x ৫

= ৬২- ০·৬

= ৬১·৪

এখানে, M´ = অনুমিত গড় = ৬২

$\Sigma fd'$ = - ৬

i = ৫

N = ৫০

∴ নির্ণেয় গড় বিচ্যুতি (M.D.) = $\frac{\Sigma /fd/}{N}$ = $\frac{৩৩৮৪}{৫০}$ = $\frac{৩৩·৮৪}{৫}$ = ৬·৭৬।

গড় বিচ্যুতি (M.D.) নির্ণয়ের প্রয়োজনীয় ধাপ সমূহ

১। গড় বিচ্যুতি (M.D) নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রথম স্তর হল প্রদত্ত বন্টনটির গড় বের করা। উপরের উদাহরণ গড় (M) = ৬১·৪

২। প্রত্যেকটি শ্রেণিব্যবধানের মধ্যবিন্দু থেকে বন্টনের গড়ের বিচ্যুতি (d = X – M) বের করতে হবে। উপরের ছকে বিচ্যুতি (d) দিয়ে চিহ্নিত সারি বা স্তম্ভের গড় থেকে প্রতিটি শ্রেণিব্যবধানের মধ্যবিন্দুর দূরত্ব বের করা হয়েছে।

৩। গড় থেকে প্রতিটি শ্রেণিব্যবধানের মধ্যবিন্দু দূরত্ব বা বিচ্যুতি (d) কে সে শ্রেণির পৌনঃপুন্য (f) দিয়ে গুণ করতে হয়। উদাহরণে fd সারি দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখানে ৪০-৪৪ শ্রেণিব্যবধানে মধ্যবিন্দু ৪২ এবং বন্টনটির গড় ৬১.৪। সুতরাং fd হবে d = X-M = ৪২-৬১.৪ = -১৯.৪ এর সাথে ঐ শ্রেণির f = ২ এর গুণফল (fd) = -৩৮.৮। অনুরূপভাবে ৪৫-৪৯ শ্রেণির d = - ১৪.৪ এর সাথে উহার f = ৩ এর গুণফল বা fd = -৪৩·২। এভাবে উপরের সবগুলোর শ্রেণিব্যবধান fd যথাক্রমে -৫৬.৪, -৩০.৮, ৯.০, ৪৪.৮, ৬৩.৬, ৩১.২, ২০.৬, বের করা হলো।

৪। এর পরে প্রত্যেক fd এর যোগ বিয়োগ চিহ্ন অগ্রাহ্য করে প্রত্যেকটিকে যোগবোধক (Positive) মনে করে $\sum fd$ এর সমষ্টি বা $\sum|fd|$ = ৩৩৮·৪ বের করা হলো।

৫। এখন নির্ণেয় গড় বিচ্যুতি (M.D.) হবে $\sum|fd|$ = ৩৩৮.৪ কে মোট পৌনঃপুন্যের সংখ্যা N = ৫০ দিয়ে ভাগ করলে M.D. = ৬.৭৬।

গড় বিচ্যুতি কখন ব্যবহার করতে হয়?

১। খুব পরিশ্রম না করে মোটামুটি নির্ভরযোগ্য একটি বিচ্যুতি জানার প্রয়োজনে গড় বিচ্যুতি ব্যবহার করতে হয়।

২। গড় থেকে প্রাপ্ত প্রতিটি স্কোরের বিচ্যুতিকেই তাদের পরিমাপ অনুযায়ী গুরুত্ব দিতে হলে গড় বিচ্যুতি ব্যবহৃত হয়।

৩। যখন কোন বন্টনে চরম বিচ্যুতিসম্পন্ন স্কোর থাকে যা বিচ্যুতির গড়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তখন অবশ্যই গড় বিচ্যুতি ব্যবহার করতে হয়।

অনুশীলনী - ৪.৮

১। বিষমতা বলতে কি বুঝেন? বিষমতার পরিমাপ নির্ণয়ের পন্থাগুলো কি কি?

২। কেন্দ্রীয় প্রবণতা জানা সত্ত্বেও বিষমতার পরিমাপ জানতে হয় কেন?

৩। বিস্তৃতি বলতে কি বুঝেন? উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা দিন।

৪। নিম্নে প্রদত্ত ছক থেকে বিস্তৃতি নির্ণয় করুন।

সর্বনিম্ন স্কোর	২০	১০৭	০	৫১	২১	৪৩	৪৫	২৩	৩৩	১৯
সর্বোচ্চ স্কোর	৫০	১১৯	৭	৫২	৩৯	৭৯	৮৫	৬৯	৮১	৩৯

৫। নিচের অবিন্যস্ত স্কোরগুলোর বিস্তৃতি ও গড়বিচ্যুতি নির্ণয় করুন।

ক) ৭, ৩, ৯, ১১, ৩, ৫, ৮, ১২, ৯, ৮

খ) ২৫, ১০, ৩৮, ২১, ২৫, ২৭, ২৮, ২২, ৮

গ) ৪১, ৪৫, ৩৯, ৫৬, ৬২, ৪৮, ৭১, ৫৮, ৪৯, ৫২

ঘ) ১৩, ২৭, ৩৩, ১৪, ২৬, ১৭, ৩৬, ২৪, ২১, ২৯

ঙ) ৫, ৯, ৩, ৮, ৬, ৭, ৪, ৬, ৭, ৫

চ) গড় বিচ্যুতি কাকে বলে? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা দিন।

৭। নিচের পৌনঃপুন্য বন্টনগুলোর গড় বিচ্যুতি নির্ণয় করুন ঃ

(ক)

স্কোর (χ)	পৌনঃপুন্য (f)
৫৫	১
৫০	৭
৪৭	১১
৩৯	১০
৩৪	৮
২৭	৩

শ্রেণি ব্যবধান (i)	পৌনঃপুন্য (f)
৮১-৮৫	১
৭৬-৮০	৪
৭১-৭৫	৪
৬৬-৭০	৪
৬১-৬৫	১০
৫৬-৬০	১৭
৫১-৫৫	২৩
৪৬-৫০	১৪
৪৮-৪৫	৬
৩৬-৪০	৫
৩১-৩৫	৩
২৬-৩০	১

(গ)

শ্রেণি ব্যবধান (i)	পৌনঃপুন্য (f)
৯০-৯৯	২
৮০-৮৯	৪
৭০-৭৯	১৬

৬০-৬৯	২১
৫০-৫৯	৩৭
৪০-৪৯	২৮
৩০-৩৯	১২
২২-২৯	৭
১০-১৯	৩

আদর্শ বিচ্যুতি (Standard Deviation)

আদর্শ বিচ্যুতি (Standard Deviation) বিষমতার নিখুঁততম ও সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পরিমাপ। এ অধ্যায় গড় বিচ্যুতি (Mean Deviation) নির্ণয়ের জন্য গাণিতিক ঋণাত্মক (Negative) ধারণাকে উপেক্ষা করে সকল বিচ্যুতিকেই ধনাত্মক (Positive) সংখ্যা হিসাবে ধরে নিতে হয়েছে। এর ফলে প্রতিষ্ঠিত গাণিতিক নিয়ম ভঙ্গ করা হয় বলে গড় বিচ্যুতি পরিমাপটির নির্ণয়ের পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বৈধ গাণিতিক চিহ্নের ব্যবহারিক অসুবিধা দূর করে যে কোন স্কোরগুচ্ছের আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয়ের পদ্ধতিসমূহ উদ্ভাবিত হয়েছে। স্কোরগুচ্ছের গড় থেকে প্রতিটি স্কোরের বিচ্যুতির উপর ভিত্তি করে আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ গাণিতিক প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়। গড় বিচ্যুতি (M.D) নির্ণয়ের মতই আদর্শ বিচ্যুতি (S.D) নির্ণয়ের সময় স্কোরগুচ্ছের গড় থেকে প্রতিটি স্কোরের বিচ্যুতি (d) বের করতে হয়। গড়ে গাণিতিক চিহ্নের অসুবিধা দূর করার জন্য বিচ্যুতিকে (d) বর্গ করে নিতে হয়। এর ফলে ঋণাত্মক বিচ্যুতিগুলো (d) বর্গসংখ্যা হয়ে গিয়ে সবগুলো বিচ্যুতি d^2 ধনাত্মক হয়ে যায়। পরে d^2 এর সমষ্টি বের করে মোট স্কোর সংখ্যা (N) দিয়ে ভাগ করে সে ভাগফলের বর্গমূল (Square Root) বের করতে হয়। এ বর্গমূল সংখ্যাটিকে আদর্শ বিচ্যুতি (S.D) বলে। আদর্শ বিচ্যুতি সাধারণত গ্রীক চিহ্ন সিগমা দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

আদর্শ বিচ্যুতির (S.D) সংজ্ঞা

আদর্শ বিচ্যুতি বলতে কোন স্কোরগুচ্ছের গড় থেকে নেয়া প্রতিটি স্কোরের বিচ্যুতিগুলোর বর্গীকৃত (Squared) রূপের গড়ের বর্গমূলকেই বলা হয়। অবিন্যস্ত স্কোরের ক্ষেত্রে আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয়ের সূত্র ঃ

$$\text{আদর্শ বিচ্যুতি (Standard Deviation)} = \sqrt{\frac{\sum d^2}{N}}$$

এখানে, d = স্কোরগুচ্ছের গড় থেকে প্রতি স্কোরের দূরত্ব বা বিচ্যুতি

d^2 = প্রতিটি বিচ্যুতির বর্গ

$\sum$ = সমষ্টি

N = মোট স্কোর সংখ্যা

$\sqrt{}$ = বর্গমূল চিহ্ন (Square Root Sign)

উদাহরণ ঃ ১

(ক) ৫, ৭, ৯, ১, ১৩ স্কোরগুলোর আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় করুন।

(খ) ১২, ১৭, ২৩, ২৬, ৩২, ৩৫, ৩৭ স্কোরগুলোর আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় করুন

উত্তর উদাহরণ-১ (ক)

স্কোর (χ)	গড় থেকে প্রতিটি স্কোরের বিচ্যুতি (d=x-m)	d^2
১৩	১৩-৯ = ৪	১৬
১১	১১-৯ = ২	৪
৯	৯-৯ = ০	০
৭	৭-৯ = - ২	৪
৫	৫-৯ = - ৪	১৬

$\sum x = ৪৫$ $\sum d^2 = ৪০$

N = ৫

M (গড়) = $\frac{\sum x}{N} = \frac{৪৫}{৫} = ৯$

আদর্শ বিচ্যুতি (S.D.) = $\sqrt{\frac{\sum d^2}{N}} = \sqrt{\frac{৪০}{৫}} = \sqrt{৮}$

$= \sqrt{৮} = ২\cdot৮৮৮৩ = ২\cdot৮৩$

আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয়ের ধাপ গুলো

১। প্রথমে স্কোরগুলোর গড় নির্ণয় করতে হয়।

২। প্রতিটি স্কোর থেকে গড়ের দূরত্ব বা বিচ্যুতি (x - m = d) বের করতে হয়।

৩। এর পর d কে বর্গ করতে হবে বা d^2 ।

৪। এ বর্গগুলোর সমষ্টি বা $\sum d^2$ বের করতে হবে।

৫। এ সমষ্টিকে স্কোরের মোট সংখ্যা (N) দিয়ে ভাগ করতে হয় অর্থাৎ $\sum d^2 \div N$ ব
$\sum d^2/N$।

৬। সর্বশেষ এ ভাগফলের বর্গমূল নির্ণয় করলেই আদর্শ বিচ্যুতি পাওয়া যাবে।

আদর্শ বিচ্যুতি (S.D.) = $\sqrt{\frac{\sum d^2}{N}}$

উত্তর ঃ উদাহরণ - ১ (গ)

স্কোর (X)	গড় থেকে প্রতিটি স্কোরের বিচ্যুতি (d=x-m)	d^2
৩৭	৩৭-১৬= ১১	১২১
৩৫	৩৫-২৬= ৯	৮১
৩২	৩২-২৬= ৬	৩৬
২৬	২৬-২৬= ০	০
২৩	২৩-২৬= - ৩	৯
১৭	১৭-২৬= - ৯	৮১
১২	২৬-১২= - ১৪	১৯৬
		$\sum d^2 = ৫২৪$

$\sum X=১৮২$, $N = ৭$

গড় (M) = $\frac{\sum x}{N} = \frac{১৮২}{৭} = ২৬$

নির্ণেয় আদর্শ বিচ্যুতি (S.D.) $= \sqrt{\frac{\sum d^2}{N}}$

$= \sqrt{\frac{৫২৪}{৭}} = \sqrt{৭৪.৮৬} = ৮.৬৫$

মূল স্কোর থেকে আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয়

কমসংখ্যক স্কোরের ক্ষেত্রে গড় থেকে বিচ্যুতি বের না করে সরাসরি মূল স্কোর থেকে আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় করা যায়। এক্ষেত্রে ব্যবহৃত সূত্রটি হলো।

আদর্শ বিচ্যুতি (σ) = $\frac{1}{N}\sqrt{N\sum x^2 - (\sum x)^2}$

এখানে, N = স্কোরের মোট সংখ্যা

X = স্কোর বা নম্বর

$\sum x$ = স্কোরগুলোর সমষ্টি

$\sum x^2$ = স্কোর গুলির বর্গের যোগফল

উদাহরণ ঃ ২

একটি পরীক্ষায় দশ জন ছাত্র যথাক্রমে ২৯, ৩২, ২৫, ১৮, ২১, ১৭, ১২, ১৯, ২২, ২০ নম্বর পেল। এদের আদর্শ বিচ্যুতি কত?

উত্তর উদাহরণ ঃ ২

স্কোর (X)	X^2
২৯	৮৪১
৩২	১০২৪
২৫	৬২৫
১৮	৩২৪
২১	৪৪১
১৭	২৮৯
১২	১৪৪
১৯	৩৮১
২২	৪৮৪
২০	৪০০
$\sum X = ২১৫$	$\sum X^2 = ৪৯৫৩$

নির্ণেয় আদর্শ বিচ্যুতি $(\sigma) = \frac{1}{N} \sqrt{N\sum x^2 - (\sum x)^2}$

$= \frac{১}{১০} \sqrt{১০ \times ৪৯৫৩ - (২১৫)^2}$

$= \frac{১}{১০} \sqrt{৪৯৫৩০ - ৪৬২২৫}$

$= \frac{১}{১০} \sqrt{৩৩০৫}$

$= \frac{১}{১০} \times ৫৭.৪ = ৫.৭৪$

উপরের উদাহরণ ২ এর আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয়ের ক্ষেত্র ব্যবহৃত ধাপগুলো নিম্নরূপঃ

(১) প্রথমে প্রত্যেকটি স্কোরের (X) বর্গ বের করে সেগুলোর সমষ্টি বের করতে হবে। এখানে $\sum x^2 = ৪৯৫৩$ ।

(২) $\sum x^2$ স্কোরের মোট সংখ্যা $N = ১০$ দিয়ে গুন করতে হবে এখানে $N\sum x^2 = ৪৯৫৩০$।

(৩) স্কোরগুলোর সমষ্টি $\sum X$ বের করতে হবে এখানে $\sum X = ২১৫$।

$\sum x$ এর বর্গ $(\sum x)^2 = ৪৬২২৫$।

(৪) $N\sum x^2$ থেকে $(\sum x)^2$ বিয়োগ করে সংখ্যাটি পাওয়া যায় তাকে বর্গমূল করতে হবে। অর্থাৎ $\sqrt{N\sum x^2 - (\sum x)^2}$

$= \sqrt{৪৯৫৩০-৪৬২২৫} = \sqrt{৩৩০৫} = ৫৭.৪$।

(৫) এভাবে প্রাপ্ত সংখ্যাটিকে স্কোর সমষ্টি বা N দিয়ে ভাগ করলে আদর্শ বিচ্যুতি (σ) পাওয়া যাবে।

নির্ণেয় আদর্শ বিচ্যুতি $(\sigma) = \frac{1}{N}\sqrt{N\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2}$

$= \frac{১}{১০}\sqrt{৩৩০৫} = \frac{১}{১০} \times ৫৭.৪$

$= ৫.৭৪$।

আদর্শ বিচ্যুতি, ভেরিয়ান্স (Variance) ও বর্গ সমষ্টি (Sum of squares) ঃ ভেরিয়ান্স (Variance) ও বর্গ সমষ্টি (Sum of Squares) এ দুটি পরিমাপ আদর্শ বিচ্যুতির পরিমাপের সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। প্রকৃতপক্ষে, এ দু'টি পরিমাপ থেকে আদর্শ বিচ্যুতির গণনা করা হয়ে থাকে। বর্গ সমষ্টি (Sum of square) বলতে বুঝায় গড় থেকে নেয়া স্কোরের বিচ্যুতির (d) বর্গের (d^2) সমষ্টি বা যোগফল (Σd^2)।

উদাহরণ ঃ ৩

নিচের স্কোরগুচ্ছের বর্গসমষ্টি ও ভেরিয়ান্স এবং পরে আদর্শ বিচ্যুতি বের করুন।

শিক্ষার্থী	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ
স্কোর	১৮	১৬	১০	১৩	১২	১০	৮

উত্তর ঃ উদাহরণ ৩

শিক্ষার্থী	স্কোর (X)	বিচ্যুতি (d)	বিচ্যুতি বর্গ (d^2)
ক	১৮	৫	১৫
খ	১৬	৩	৯
গ	১৪	১	১
ঘ	১৩	০	০
ঙ	১২	- ১	১
চ	১০	- ৩	৯
ছ	৮	- ৫	২৫
	$\Sigma x = ৯১$	$\Sigma d = 0$	$\Sigma d^2 = ৭০$

M (গড়) $= \frac{\Sigma x}{N} = \frac{৯১}{৭} = ১৩$, $\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma d^2}{N}} = \sqrt{\frac{৭০}{৭}} = ১০$

আদর্শ বিচ্যুতি $(\sigma) = \sqrt{\frac{\Sigma d^2}{N}} = \sqrt{১০} = ৩.১৬$

উপরের উদাহরণ থেকে দেখা যায় বর্গ সমষ্টি $(\Sigma d)^2$ মোট স্কোর সংখ্যা (N) দিয়ে ভাগ করলে ভেরিয়ান্স (Variance) নির্ণয় করা হয়। অর্থাৎ বর্গ সমষ্টির গড়কেই ভেরিয়ান্স বলা যায়।

$\therefore V = \frac{\sum d^2}{N}$ এখানে $V = \frac{৭০}{৭} = ১০$

সুতরাং ভেরিয়ান্স কে বিচ্যুতি বর্গ সমষ্টির গড় (Mean square Deviation) ও আদর্শ বিচ্যুতি (σ) কে সেই বিচ্যুতি বর্গ সমষ্টির গড়ের বর্গমূল (Root mean square Deviation) বলা হয়।

উপরে আলোচিত উদাহরণ থেকে নিচের সূত্রগুলো গঠন করা যায়।

আদর্শ বিচ্যুতি $(\sigma) = \sqrt{\frac{\sum d^2}{N}} = \sqrt{V}$

ভেরিয়ান্স $(V) = \frac{\sum d^2}{N} = \sigma^2$

$\therefore \sum d^2 = NV = N\sigma^2$

বিন্যস্ত স্কোরের ক্ষেত্রে আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয়

বিন্যস্ত স্কোরের ক্ষেত্রে আদর্শ বিচ্যুতি (S.D.) নির্ণয়ের সময় স্কোরগুলো পৌনঃপুন্য বন্টনে সাজানো না থাকলে যথারীতি মূল স্কোরগুচ্ছকে পৌনঃপুন্য বন্টনে সাজিয়ে নিতে হয়। স্কোরগুচ্ছের সংখ্যা কম থাকলে প্রতিটি স্কোরের পৌনঃপুন্য বের করা যায়। কিন্তু স্কোরের সংখ্যা বেশি হলে অবশ্যই এদেরকে শ্রেণিবদ্ধভাবে পৌনঃপুন্য বন্টনে সাজিয়ে নিতে হলে বিন্যস্ত স্কোরের ক্ষেত্রে আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় করা হয়। ইহারা যথাক্রমে-

(ক) দীর্ঘ পদ্ধতি।

(খ) সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি।

(ক) দীর্ঘ পদ্ধতিতে আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয়

দীর্ঘ পদ্ধতিতে আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় করতে হলে প্রথমেই স্কোরগুলোর গ (Mean) নির্ণয় করতে হয়। এরপর থেকে প্রতিটি স্কোরের বিচ্যুতি নির্ণয় করতে হ স্কোরগুলো পৌনঃপুন্য বন্টনে সাজানো থাকলে প্রত্যেক শ্রেণি ব্যবধানের মধ্যবিন্দু থে গড়ের দূরত্ব বা বিচ্যুতি (d) বের করে নিতে হবে। বিন্যস্ত স্কোরের ক্ষেত্রে আদর্শ বিচ্যু নির্ণয়ের সূত্র হলো ঃ

আদর্শ বিচ্যুতি S.D. $= \sqrt{\frac{\sum fd^2}{N}}$

এখানে f = পৌনঃপুন্য

d = গড় থেকে প্রতিটি স্কোরের বিচ্যুতি

N = মোট স্কোর বা পৌনঃপুন্যের সংখ্যা।

উদাহরণ ঃ ৪

নিম্নলিখিত পৌনঃপুন্য বন্টনগুলোর আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় করুন।

(ক) স্কোর	৩৪	৩০	২৬	২৫	২৪
পৌনঃপুন্য	২	৪	৫	৬	৩

(খ) শ্রেণি ব্যবধান	৪০-৪৪	৪৫-৪৯	৫০-৫৪	৫৫-৫৯	৬০-৬৪	৬৫-৬৯	৭০-৭৪	৭৫-৭৯	৮০-৮৪
পৌনঃপুন্য	২	৩	৬	৭	১৫	৮	৬	২	১

উত্তর ঃ ৪ (ক)

স্কোর	পৌনঃপুন্য	অনুমিত গড় থেকে বিচ্যুতি		গড় থেকে বিচ্যুতি		
(x)	(f)	(d)	fd	x-n=d	fd	fd^2
৩৪	২	৮	১৬	৭	১৭	৯৮
৩০	৪	৪	১৬	৩	১২	৩৬
২৬ (অনুমিত গড়)	৫	০	- ০	- ১	- ৫	৫
২৫	৬	- ১	- ৬	- ২	- ১২	২৪
২৪	৩	- ২	- ৬	- ৩	- ৯	২৭
	N = ২০		$\sum fd$ = ৩২-১২ = ২০			$\sum fd^2$ = ১৯০

গড় (M) = A.M. + $\frac{\sum fD}{N}$

= ২৬ + $\frac{২০}{২০}$ = ২৬ + ১ = ২৭

আদর্শ বিচ্যুতি (δ) = $\sqrt{\frac{\sum fd^2}{N}}$ = $\sqrt{\frac{১৯০}{২০}}$ = $\sqrt{৯.৫০}$ = ৩.০৮

উপরের স্কোরগুচ্ছের আদর্শ বিচ্যুতি বের করার জন্য নিচের ধাপগুলো স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

(১) প্রথমে স্কোরগুলো (x) সাজিয়ে নিয়ে তাদের পৌনঃপুন্য (f) বের করতে হয় এর স্কোরগুলোর গড় নির্ণয় করতে হবে। উপরের উদাহরণে অনুমিত গড় ধরে প্রকৃত গড় নির্ণয় করা হয়েছে। এখানে গড় M = ২৭।

(২) সাজানো স্কোর থেকে গড়ের দূরত্ব (x - m = d) বা বিচ্যুতি বের করতে হয়। এখানে d চিহ্নিত সারিতে বিচ্যুতিগুলো বের করা হয়েছে।

(৩) এমন প্রতিটি স্কোরের d কে সে স্কোরের f দিয়ে গুণ করে fd বের করতে হয়। fd সারিতে সবগুলো স্কোরের fd বের করা হয়েছে। আবার fd কে d দিয়ে গুণ করে fd^2 বের করতে হয়। এখানে সারিতে সবগুলো স্কোরের জন্য fd^2 বের করে সারিবদ্ধ করা হয়েছে। উদাহরণে স্কোর ৩৪ এর d হল ৭, fd হলো ৭x২ = ১৪ এবং fd^2 হলো ১৪x৭ = ৯৮। অনুরূপভাবে সবগুলো স্কোরের fd^2 যথাক্রমে- ৩৬, ৫, ২৪ ও ২৭ বের করা হয়েছে এবং $\sum fd^2 = ১৯০$।

(৪) $\sum fd^2$ কে N দিয়ে ভাগ করতে হয়। এখানে = N = ২০।

(৫) $\sqrt{\sum fd^2 \div N} = \sqrt{১৯০ \div ২০} = \sqrt{৯.৫০} = ৩.০৮$ এভাবে আদর্শ বিচ্যুতি S.D. = ৩.০৮ পাওয়া গেল।

বিন্যস্ত স্কোরের ক্ষেত্রে দীর্ঘ পদ্ধতিতে আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় পদ্ধতি

দীর্ঘ পদ্ধতিতে বিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছের আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় করার জন্য নিম্নোক্ত প্রক্রিয়াগুলো অনুসরণ করতে হবে ঃ

১। প্রথমত গড় (M) নির্ণয় করতে হয়। ইহা সংক্ষিপ্ত বা দীর্ঘ যে কোন এক পদ্ধতিতেই নির্ণয় করতে হবে।

২। প্রত্যেকটি শ্রেণির মধ্যমান (x) নির্ণয় করতে হয়।

৩। গড় (M) থেকে প্রত্যেকটি শ্রেণির মধ্যমানের বিচ্যুতি (x-m = d) নির্ণয় করতে হয়।

৪। প্রত্যেকটি d কে সেই শ্রেণির f দিয়ে গুণ করে fd বের করতে হবে।

৫। প্রত্যেক শ্রেণীর fd কে সে শ্রেণীর d দিয়ে গুণ করে fd^2 নির্ণয় করতে হবে

৬। এরপর fd^2 এর সমষ্টি ($\sum fd^2$) নির্ণয় করতে হবে।

৭। সর্বশেষে সূত্রানুযায়ী আদর্শ বিচ্যুতি (S.D.) = $\sqrt{\frac{\sum fd^2}{N}}$ নির্ণয় করতে হবে

এখানে, = আদর্শবিচ্যুতি

$\sum fd^2$ = fd^2 এর সমষ্টি,

N = মোট পৌনঃপুন্যের সংখ্যা।

উত্তর ঃ উদাহরণ (খ)

শ্রেণিব্যবধান	শ্রেণি মধ্যমান	পৌনঃপুন্য	অনুমিত গড় থেকে বিচ্যুতি		গড়	d =X-M গড় থেকে শ্রেণির মধ্য স্থানের বিচ্যুতি		
(i)	(X)		(d)	(fd)	(M)	d	fd	fd^2
৮০-৮৪	৮২	১	৪	৪		২০.৬	২০.৬	৪২৪.৩৬
৭৫-৭৯	৭৭	২	৩	৬		১৫.৬	৩১.২	৪৮৬.৭২
৭০-৭৪	৭২	৬	২	১২		১০.৬	৬৩.৬	৬৭৪.১৬
৬৫-৬৯	৬৭	৮	১	৮		৫.৬	৪৪.৮	২৫০.৮৮
৬০-৬৪	৬২	১৫	০	০	৬১.৪	০.৬	১০.০	৫.৪০
৫৫-৫৯	৫৭	৭	-১	-৭		-৪.৪	-৩০.৮	১৩৫.৫২
৫০-৫৪	৫২	৬	-২	-১২		৯.৪	-৫৬.৪	৫৩০.১৬
৪৫-৪৯	৪৭	৩	-৩	-৯		-৪.৪	-৪৩.২	৬২২.০৮
৪০-৪৪	৪২	২	-৪	-৮		-১৯.৪	৩৮.৮	৭৫২.৭২

$N = ৫০$, $\sum fd^2$ $\sum fd = ৩৩৮\cdot৪$ $\sum fd^2 = ৩৮৭২$

$= ৩০-৩৬$

$= -৬$

গড় $(M) = ৬২ + \frac{-৬}{৫০} \times ৫$

$= ৬২-০.৬$

$= ৬১.৪$

∴ নির্ণেয় গড় বিচ্যুতি $(M.D) = \frac{৩৩৮\cdot৪}{৫০} = \frac{৩৩\cdot৮৪}{৫} = ৬\cdot৭৬$

আদর্শ বিচ্যুতি $(S.D.) = \sqrt{\frac{৩৮\cdot৭২}{৫০}} = \sqrt{৭৭\cdot৪৫}$

উপরের নির্ণেয় আদর্শ বিচ্যুতি বের করার সূত্রের প্রয়োগ পদ্ধতি নিম্নে দেয়া হলোঃ

১। সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে প্রদত্ত বন্টনটির গড় $(M) = ৬১.৪$ বের করা হয়েছে। দীর্ঘ পদ্ধতিতে গড় বের করা যেত।

২। প্রত্যেক শ্রেণির মধ্যমান (X) যথাক্রমে ৪২, ৪৭, ৫২, ৫৭, ৬২, ৬৭, ৭২, ৭৭, ৮২ বের করা হলো।

৩। গড় (M) থেকে প্রতিটি শ্রেণির মধ্যমান x থেকে বিচ্যুতি (Deviation) যথাক্রমে -১৯.৪, -১৪.৪, -৯.৪, -৪.৪, ০.৬, ১০.৬, ১৫.৬, ২০.৬ পাওয়া গেল।

৪। প্রত্যেক শ্রেণির d কে সেই শ্রেণির f দ্বারা গুণ করে fd বের করা হলো যেমন- ৩৮.৮, ৪৩.২-৩০.৮, ৯.০, ৪৪.৮, ৬৩.৬, ৩১.২, ২০.৬।

৫। এখন প্রত্যেক fd কে d দ্বারা গুণ করে সবগুলো শ্রেণির fd^2 পাওয়া গেল যথাক্রমে ৭৫২.৭২, ৬২২.০৮, ৫৩০.১৬, ১৩৫.৫২, ২৫০.৮৮, ৬৭৪.১৬, ৪৮৬.৭২ এবং ৪২৪.৩৬।

৬। fd^2 এর সমষ্টি $\sum fd^2 = ৩৮৭২$

৭। নির্ণেয় আদর্শ বিচ্যুতি $= \sqrt{\frac{\sum fd^2}{N}} = \sqrt{\frac{৩৮৭২}{৫০}} = \sqrt{৭৭.৪৫} = ৮.৮$

(খ) কল্পিত গড় বা সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয়

বিন্যস্ত স্কোরের ক্ষেত্রে আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয়ের জন্য পূর্বে আলোচিত দীর্ঘ পদ্ধতি খুবই পরিশ্রম সাধ্য। এ কারণে বিকল্প হিসাবে কল্পিত গড় বা অনুমিত গড় পদ্ধতিতে আদর্শ বিচ্যুতি (S.D) বের করা যায়। ইহা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে কল্পিত বা অনুমিত গড়ের ভিত্তিতে কোন পৌনঃপুন্য বন্টনের শ্রেণিগত বিচ্যুতি ও বিচ্যুতি বর্গের সমষ্টি বের করা হয়। সর্বশেষে প্রকৃত বিচ্যুতির বর্গ নির্ণয় করার জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধনের মাধ্যমে অতি সহজেই আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় করা যায়। সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে আদর্শ বিচ্যুতি (δ) নির্ণয়ের সূত্র ঃ

আদর্শ বিচ্যুতি $(\delta) = \sqrt{\frac{\sum fd^2}{N} - \left(\frac{\sum fd}{N}\right)^2} \times i$

এখানে, f = শ্রেণীর পৌনঃপুন্য সংখ্যা

d = অনুমিত গড় থেকে প্রত্যেকটি শ্রেণির বিচ্যুতি,

N = মোট পৌনঃপুন্য সংখ্যা এবং

i = শ্রেণির দৈর্ঘ্য।

কর্ম পদ্ধতি

উপরে বর্ণিত সূত্রানুযায়ী আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয়ের জন্য নিম্নোক্ত প্রক্রিয়াগুলো পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করতে হবে ঃ

১। কোন পৌনঃপুন্য বন্টনের যে কোন শ্রেণির মধ্যবিন্দুকে অনুমিত গড় ধ
প্রত্যেক শ্রেণির বিচ্যুতি (d) বের করতে হয়।

২। প্রত্যেক শ্রেণির পৌনঃপুন্য সংখ্যা (f) দ্বারা সেই শ্রেণীর বিচ্যুতিকে (d) গুণ করে fd বের করতে হয়।

৩। সব শ্রেণির fd গুলির সমষ্টি $\sum fd$ বের করতে হয়। এ পর্যন্ত সকল কার্যাবলি সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয়ের সাথে হুবহু মিলে যাবে।

৪। এরপর প্রত্যেকটি fd কে সেই শ্রেণির d দ্বারা গুণ করে fd^2 তৈরী করতে হবে।

৫। সব fd^2 গুলির সমষ্টি $\sum fd^2$ নির্ণয় করতে হবে।

৬। সর্বশেষে $(\sigma) = \sqrt{\frac{\sum fd^2}{N} - \left(\frac{\sum fd}{N}\right)^2} \times i$ অনুসরণ করতে হবে।

আলোচ্য সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয়ের জন্য দীর্ঘ পদ্ধতিতে ইতিপূর্বে ব্যবহৃত উদাহরণটিই গ্রহণ করা হলো। এর ফলে উভয় পদ্ধতিতে ব্যবহৃত প্রয়োগ কৌশল ও নির্ণয় ফলাফলের একটা সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে।

উত্তর ঃ উদাহরণ-৪ (খ)

শ্রেণিব্যবধান (i)	পৌনঃপুন্য (f)	অনুমিত গড় বিচ্যুতি (d)	fd	fd^2
৮০-৮৪	১	৪	৪	১৬
৭৫-৭৯	২	৩	৬	১৮
৭০-৭৪	৬	২	১২	২৪
৬৫-৬৯	৮	১	৮	৮
৬০-৬৪	১৫	০	০	০
৫৫-৫৯	৭	-১	-৭	৭
৫০-৫৪	১	-২	-১২	২৪
৪৫-৪৯	৩	-৩	-৯	২৭
৪০-৪৪	২	-৪	-৮	৩২
	$N = ৫০$	$\sum fd$	$= ৩০-৩৬$	$\sum fd^2 = ১৫৬$
			$=-৬$	

নির্ণেয় আদর্শ বিচ্যুতি $= \sqrt{\frac{\sum fd^2}{N} - \left(\frac{\sum fd}{N}\right)^2} \times i$

$= \sqrt{\frac{১৫৬}{৫০} - \left(\frac{৬}{৫০}\right)^2} \times ৫$

$= \sqrt{\frac{১৫৬}{৫০} - \frac{৬\times৬}{৫০\times৫০}} \times ৫ = \sqrt{\frac{৭৮০০ - ৩৬}{৫০\times৫০}} \times ৫$

$= \sqrt{\frac{৭৭৬৪}{৫০}} \times ৫ = \frac{৮৮.১}{১০} = ৮.৮১$ নির্ণেয় $(\sigma) = ৮.৮$

এখানে, N = ৫০

i = ৫

$\sum fd = -৬$

এবং $\sum fd^2 = ১৫৬$

কিভাবে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে আদর্শ বিচ্যুতি বের করা হলো তার কার্য বিবরণী নিম্নে দেয়া হল ঃ-

১। প্রদত্ত পৌনঃপুন্য বন্টনটির ৬০-৬৪ শ্রেণিব্যবধানের মধ্যমান ৬২ কে অনুমিত গড় ধরা হল। ফলে ৬০-৬৪ শ্রেণির উপরের বিচ্যুতি (d) ১, ২, ৩, ৪ এবং নিচের শ্রেণিগুলোর বিচ্যুতি -১, -২, -৩, -৪ পাওয়া গেল।

২। প্রত্যেক শ্রেণির f এবং d এর গুণফল fd বের করা হল। নিচ থেকে হচ্ছে যথাক্রমে -৮, -৯, -১২, -৭, ০, ১২, ৬, ৪। $\sum fd$ =৩০-৩৬=-৬।

৩। প্রত্যেক শ্রেণির fd কে d দ্বারা গুণ করলে fd^2 পাওয়া যায়। এখানে নি থেকে fd^2 হচ্ছে যথাক্রমে ৩২, ২৭, ২৪, ৭, ০, ৮, ২৪, ১৮, ১৬।

সুতরাং $\sum fd^2$ =১৫৬।

৪। $\sigma = \sqrt{\frac{\sum fd^2}{N} - \left(\frac{\sum fd}{N}\right)^2} \times i$ এ সূত্রে উল্লেখিত মানগুলো বসাইলে

σ = ৮.৮ পাওয়া যাবে।

আদর্শ বিচ্যুতি সংব্যাখ্যান (Interpretation)

কোন বন্টনের আদর্শ বিচ্যুতি ও গড় জানা থাকলে উহার কি কি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যাবে তা নিম্নে আলোচনা করা গেল। কোন বন্টনের গড় (M) ও আদর্শ বিচ্যুতি (S.D.) জানা থাকলে, ঐ স্কোরগুচ্ছের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি সম্পর্কে একটা সঠিক ধারণা পাওয়া যায়। বন্টনের গড়ের এক সিগমা (১ সিগমা) এবং গড়ের নিচে এক সিগমা (1σ) পর্যন্ত মোট ক্ষেত্রের দুই-তৃতীয়াংশ অবস্থিত। অর্থাৎ গড়ের উপরে এক সিগমা দ্বারা মোট স্কোরের এক তৃতীয়াংশ এবং গড়ের নিচে এক সিগমা দ্বারা মোট স্কোরের এক তৃতীয়াংশের অবস্থিতি প্রকাশ পায়। এখানে আদর্শ বিচ্যুতির তাৎপর্য আলোচনার ক্ষেত্রে একটি স্বাভাবিক বন্টনের (Normal Distributions) বৈশিষ্ট্যের কথাই চিন্তা করা হচ্ছে কেবল মাত্র স্বাভাবিক ক্ষেত্রে গড়ের নিচে এক সিগমা এবং গড়ের উপরে এক সিগমা দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এ দুই বিন্দুর মধ্যে অর্থাৎ -এক সিগমা থেকে + এক সিগমা পর্যন্ত মোট স্কোরের শতকরা ৬৮ ভাগ অবস্থান করবে। অনুরূপভাবে -২ সিগমা থেকে + ২ সিগমা পর্যন্ত শতকরা ৯৫ ভাগ এবং - ৩ সিগমা থেকে + ৩ সিগমা পর্যন্ত শতকরা ৯৯ ভাগ স্কোর থাকে। সূত্রের সাহায্যে নিম্নরূপ প্রকাশ করা যায়।

১। M ± ১σ এর মধ্যে ৬৮% ভাগ স্কোর,

২। M ± ২σ এর মধ্যে ৯৫% ভাগ স্কোর, এবং

৩। M ± ৩·σ এর মধ্যে ৯৯% ভাগ স্কোর।

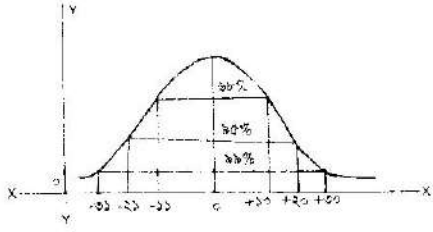

উপরের চিত্রের সাহায্যে আদর্শ বিচ্যুতির সংব্যাখ্যান দেয়া হল। একটি উদাহরণের সাহায্যে গড় ও আদর্শ বিচ্যুতির সম্পর্ক নিম্নে আলোচনা হল।

উদাহরণ ঃ নবম শ্রেণির ৫০ জন ছাত্রের সাধারণ পণিতের একটি পরীক্ষার নম্বরের গড় (M) = ৬৩, আদর্শ বিচ্যুতি (σ) = ৭। ঐ শ্রেণির ৬৮% ছাত্রের অর্থাৎ ৩৪ জন ছাত্রের নম্বর = ৬৩ ± ৭ বা ৫৬ থেকে ৭০ এর মধ্যে। আবার ৯৫% ছাত্রের নম্বর = ৬৩ ± ২x৭= ৬৩ - ১৪ বা ৪৯ থেকে ৭৭ এর মধ্যে এবং ৯৯% ছাত্রের নম্বর = ৬৩-৩x৭ = ৬৩ ± ২১ বা ৪২ থেকে ৮৪ এর মধ্যে। গড় (M) ও আদর্শ বিচ্যুতি (σ) নির্ণয়ের মাধ্যমে এভাবে শিক্ষামূল যে কোন ধরনের অভীক্ষার সাধারণ মান (Norm) বা স্বাভাবিক পারদর্শিতার সীমা (Average Achievement limit) হিসাবে স্কোর বিস্তৃতিকেই বিবেচনা করা হয়।

উদাহরণ ঃ ৫

নিম্নের পৌনঃপুন্য বন্টনটির গড় ও আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় করুন এবং ফলাফলের ব্যাখ্যা দিন।

শ্রেণি ব্যবধান	৩০-৩৪	৩৫-৩৯	৪০-৪৪	৪৫-৪৯	৫০-৫৪	৫৫-৫৯	৬০-৬৪	৬৫-৬৯
পৌনঃপুন্য	২	৪	৭	১৩	১২	৮	৩	২

উত্তর ঃ উদাহরণ-৫

শ্রেণি ব্যবধান (i)	পৌনঃপুন্য (f)	বিচ্যুতি (d)	fd	fd^2
৬৫-৬৯	২	৪	৮	৩২
৬০-৬৪	৩	৩	৯	২৭
৫৫-৫৯	৮	২	১৬	৩২
৫০-৫৪	১১	১	১১	১১
			৪৪	

৪৫-৪৯	১৩	০	০		০
৪০-৪৪	৭	-১	-৭		৭
৩৫-৩৯	৪	-২	-৮		১৬
৩০-৩৪	২	-৩	-৬	-২১	১৮

$N = ৫০$ $\sum fd = ৪৪-২১ = ২৩$ $\sum fd^2 = ১৪৩$

গড় $(M) = \acute{M} + \frac{\sum fd}{N} Xi$

$= ৪৭ + \frac{২৩}{৫০} \times ৫ = ৪৭ + \frac{২৩}{১০} = ৪৭ + ২.৩$

$= ৪৯.৩$, নির্ণেয় গড় $(M) = ৪৯.৩$

এখানে, $\acute{M}$ = অনুমিত গড় = ৪৭

$i = ৫$

$\sum fd = ২৩$

$N = ৫০$

আদর্শ বিচ্যুতি $(\delta) = \sqrt{\frac{\sum fd^2}{N} - \left(\frac{\sum fd}{N}\right)^2} \times i$

$= \sqrt{\frac{\sum fd^2}{N} - \left(\frac{\sum fd}{N}\right)^2} \times i$

$= \sqrt{\frac{১৪৩}{৫০} - \left(\frac{২৩}{৫০}\right)^2} \times ৫$

$= \sqrt{\frac{১৪৩}{৫০} - \frac{২৩ \times ২৩}{৫০ \times ৫০}} \times ৫ = \sqrt{\frac{১৪৩ \times ৫০ - ৫২৯}{৫০ \times ৫০}} \times ৫$

$= \sqrt{\frac{৭১৫০ - ৫২৯}{৫০}} \times ৫ = \frac{৬৬২১}{১০} = ৮.১১$

নির্ণেয় আদর্শ বিচ্যুতি $\sigma = ৮.১$

গড় $M = ৪৯.৩$

এখানে, $\sum fd^2 = ১৪৩$

$\sum fd = ২৩$

$i = ৫$

$N = ৫০$

ফলাফলের ব্যাখ্যা ঃ

১। M - ১δ এর মধ্যে ৬৮% ভাগ স্কোর

২। M - ২δ এর মধ্যে ৯৫% ভাগ স্কোর

৩। M - ৩ δ এর মধ্যে ৯৯% ভাগ স্কোর।

১। (৫৯'৩-৮'১) থেকে ৪৯'৩+৮'১ এর মধ্যে আলোচ্য পৌনঃপুন্য বন্টনের ৬৮% ভাগ স্কোর অবস্থিত।

বা ৪১'২ থেকে ৫৭'৪ এর মধ্যে অবস্থান করছে সমগ্র স্কোরগুচ্ছের ৬৮% ভাগ স্কোর।

২। (৪৯'৩-২x ৮'১) থেকে (৪৯'৩+২x ৮'১) এর মধ্যে আলোচ্য পৌনঃপুন্য বন্টনের ৯৫% ভাগ স্কোর অবস্থান করছে।

বা, ৩৩.১ থেকে ৬৫.৫ এর মধ্যে অবস্থান করছে সমগ্র স্কোরগুচ্ছের ৯৫% স্কোর।

৩। (৪৯'৩ - ৩) - ৩ x ৮.১ থেকে (৪৯'৩ + ৩ x ৮.১) এর মধ্যে আলোচ্য পৌনঃপুন্য বন্টনের ৯৯% ভাগ স্কোর রয়েছে।

বা ২৫.০ থেকে ৭৩.৬ এর মধ্যে অবস্থান করছে সমগ্র স্কোরগুচ্ছের ৯৯% ভাগ স্কোর।

আদর্শ বিচ্যুতি (δ) ব্যবহার

১। বিষমতার নিখুঁততম পরিমাপ জানার প্রয়োজন হলে আদর্শ বিচ্যুতি ব্যবহার করতে হয়।

২। আদর্শ বিচ্যুতির উপর নির্ভরশীল সব ধরনের পরিসংখ্যানের জন্য ইহা ব্যবহার করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় অনুবন্ধ সহগ নির্ণয়ের সময়ে আদর্শ বিচ্যুতি বের করতে হয়।

৩। কোন স্কোরগুচ্ছের সমস্ত বিচ্যুতিগুলোই যথাযথভাবে বিষমতার পরিমাপের উপর প্রভাব বিস্তারের জন্য আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় করতে হয়।

৪। স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্রের সংশ্লিষ্ট নানান ধরনের পরিসংখ্যানের প্রয়োজন হয়। তখন বিষমতার চারটি পরিমাপের মধ্যে নির্ভরযোগ্যতার দিক দিয়ে আদর্শ বিচ্যুতি প্রথম, এর পর নির্ভরযোগ্যতার দিক দিয়ে যথাক্রমে গড় বিচ্যুতি, চতুর্থাংশ বিচ্যুতি ও বিস্তৃতি। গণনার দ্রুততা ও স্বল্পায়াসের দিক হিসাবে বিস্তৃতি বিষমতার পরিমাপগুলোর মধ্যে প্রথমস্থান অধিকার করবে। এরপর চতুর্থাংশ বিচ্যুতি ও গড় বিচ্যুতি এবং সর্বশেষ আদর্শ বিচ্যুতি।

আদর্শ বিচ্যুতির ধর্ম (Properties)

১। আদর্শ বিচ্যুতি কোন স্কোরগুচ্ছের প্রতিটি স্কোরের মানের উপর নির্ভরশীল স্কোরগুচ্ছের যে কোন একটির পরিবর্তন ঘটলে তার বিচ্যুতির ও (X - M = d) পরিবর্ত ঘটবে। ইহা গড়ের মতই স্কোরগুচ্ছের প্রতিটি স্কোরেরমানের প্রতিনিধিত্বমূলক এবং ইহা প্রকৃত মানের উপর নির্ভরশীল।

২। অস্বাভাবিক স্কোরের উপস্থিতির জন্য সমগ্র স্কোরগুচ্ছের আদর্শ বিচ্যুতি বিষমতার সঠিক পরিমাপ দিতে পারে না।

৩। কোন স্কোরমালার প্রত্যেকটি স্কোরের সাথে নির্দিষ্ট কোন মান যোগ বা বিয়োগ করলে আদর্শ বিচ্যুতির কোন পরিবর্তন হবে না।

৪। কোন গুচ্ছের প্রত্যেকটি স্কোরকে নির্দিষ্ট মান দিয়ে গুণ বা ভাগ করলে আদর্শ বিচ্যুতির মান অনুরূপভাবে প্রভাবিত হবে।

চতুর্থাংশ বিচ্যুতি (Quartile)

বিষমতার আর একটি পরিমাপ হলো চতুর্থাংশ বিচ্যুতি। একটি পৌনঃপুন্য বণ্টনে চতুর্থাংশ বিচ্যুতি (Quartile বা সংক্ষেপে Q) বলতে বুঝায় বণ্টনটির ৭৫ তম শতাংশ (75th Percentile) এবং ২৫তম শতাংশের (25th Percentile) অন্তর্বর্তী দূরত্বের ঠিক মধ্য বিন্দু। এখানে বণ্টনের প্রথম চতুর্থাংশের বলা হয় ২৫তম শতাংশ (বা Q_1) এ বিন্দুর নিচে ২৫% স্কোরের অবস্থান। দ্বিতীয় চতুর্থাংশকে ৫০তম শতাংশ (বা Q_2) মধ্যক। তিন চতুর্থাংশ বা ৭৫ তম শতাংশ (বা Q_3) যার নিচে ৭৫% স্কোর থাকবে।

একটি বণ্টনকে সমান চারভাগে ভাগ করলে চারটি চতুর্থাংশ (Quartile) পাওয়া যাবে। বণ্টনের নিচ থেকে উপরের দিকে মোট ক্ষেত্রের সর্বনিম্ন প্রথম চতুর্থাংশ যে বিন্দুতে পাওয়া যাবে তাকেই প্রথম চতুর্থাংশ (First Quartile বা Q_1) বলা হয় আবার নিচ থেকে যে বিন্দুতে সর্বোচ্চ বা তৃতীয় চতুর্থাংশ (Third Quartile) পাওয়া যাবে তাকে বলা হয়। বণ্টনের দ্বিতীয় চতুর্থাংশ (Second Quartile) হল বণ্টনের অর্ধেক বা মধ্যক বা Q_2, Q_3 এর মান থেকে Q_1 এর মান বিয়োগ করলে Q_1 ও Q_3 এর মধ্যকার দূরত্ব পাওয়া যাবে। এ দূরত্বকে অন্ত চতুর্থাংশ বিন্দুর বিস্তার (Inter Quartile Range) বলে। এ বিস্তারকে অর্ধেক করলেই অর্ধ অন্ত-চতুর্থাংশ বিন্দু বিস্তার (Semi Inter or Quartile Range) বা চতুর্থাংশ বিস্তৃতি বা Q পাওয়া যায়। চিত্রে চতুর্থাংশ বিন্দুর অবস্থিতি দেখানো হলো ঃ

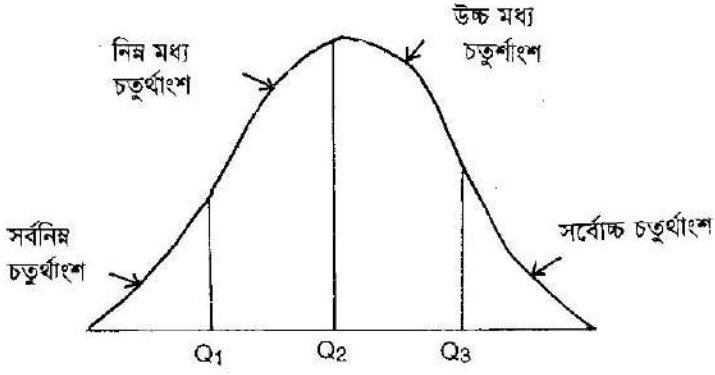

চতুর্থাংশ বিচ্যুতি বা Q নির্ণয়ের সূত্র ঃ

$$Q = \frac{Q_3 - Q_1}{২}$$

এখানে, Q_3 = ৭৫তম শতাংশ বিন্দু

Q_1 = ২৫তম শতাংশ বিন্দু

নির্ণয় করতে হলে প্রথমেই Q_1 এবং Q_3 নির্ণয় করতে হবে।

Q_1 নির্ণেয় সূত্র ঃ

$$Q_1 = L_1 + \frac{\frac{N}{4} - F}{fm_1} \times i$$

এখানে, L_1 = যে শ্রেণিব্যবধানে ২৫তম শতাংশ বিন্দু (Q_1) পড়ে তার নিম্ন প্রান্ত।

$N/_4$ = মোট স্কোরের এক চতুর্থাংশ

F_1 = যে শ্রেণি ব্যবধানে Q_1 পড়ে তার নিচের পৌনঃপুন্যগুলোর সমষ্টি।

fm_1= যে শ্রেণি ব্যবধানে Q_1 পড়ে সে শ্রেণি ব্যবধানের পৌনঃপুন্য বা স্কোরের সংখ্যা।

এবং L = শ্রেণি ব্যবধানের দৈর্ঘ্য।

Q_3 নির্ণয়ের সূত্র ঃ $Q_3 = L_3 + \left(\frac{3N/_4 - F_3}{fm_3} \right) \times i$

L_3 = যে শ্রেণি ব্যবধানে ৭৫তম শতাংশ বিন্দু (Q_3) পড়ে তার নিম্নপ্রান্ত, $\frac{3N}{4}$ = মোট স্কোরের তিন চতুর্থাংশ।

F_3 = যে শ্রেণি ব্যবধানে Q_3 পড়ে তার নিচের পৌনঃপুন্যগুলোর সংখ্যা এবং শ্রেণি ব্যবধানের দৈর্ঘ্য।

উদাহরণ ঃ ৪ (খ) এর চতুর্থাংশ বিচ্যুতি নির্ণয়

শ্রেণি ব্যবধান (i)	পৌনঃপুন্য (f)		
৮০-৮৪	১		
৭৫-৭৯	২		
৭০-৭৪	৬		
৬৫-৬৯	৮	$fm_3 = ৮$	
৬০-৬৪	১৫		
৫৫-৫৯	৭	$fm_1 = ৭$	$F_3 = ৩৩$
৫০-৫৪	৬	$F_1 = ১১$	
৪৫-৪৯	৩		
৪০-৪৪	২		

$N = ৫০$

নির্ণেয় $Q_1 = L_1 + \frac{N/4 - F_1}{fm_1} \times i$

$= ৫৪·৫ + \frac{১২·৫ - ১১}{৭} \times ৫$

$= ৫৪·৫ + \frac{১·৫ \times ৫}{৭}$

$= ৫৪·৫ + \frac{৭·৫}{৭}$

$= ৫৪·৫ + ১·০৭$

$= ৫৫·৫৭$

এখানে, $\frac{N}{4} = \frac{৫০}{৪} = ১২·৫$

$F_1 = ১১$

$fm_1 = ৭$

$L_1 = ৫৪·৫$

নির্ণেয় $Q_3 = L_3 + \frac{^{3N}/_4 - F_3}{fm_3} \times i = ৬৪\cdot৫ + \frac{৩৭\cdot৫ - ৩৩}{৮} \times ৫$

$= ৬৪\cdot৫ + \frac{৪\cdot৫ \times ৫}{৮}$

$= ৬৪\cdot৫ + \frac{২২\cdot৫}{৮}$

$= ৬৪\cdot৫ + ২\cdot৮১$

$= ৬৭\cdot৩২$

এখানে,

$\frac{3N}{4} = \frac{৩ \times ৫০}{৪} = ৩৭\cdot৫$

$F_3 = ৩৩$

$fm = ৮$

নির্ণেয় $Q = \frac{Q_3 - Q_1}{২}$

$= \frac{৬৭\cdot৩১ - ৫৫\cdot৫৭}{২}$

$= \frac{১১\cdot৭৪}{২}$

$= ৫\cdot৮৭$

এখানে, $Q_1 = ৫৫\cdot৫৭$

$Q_3 = ৬৭\cdot৩১$

চতুর্থাংশ বিচ্যুতির ব্যবহার

১। বন্টনের প্রান্তে চরম প্রকৃতির স্কোর অবস্থান করলে চতুর্থাংশ বিচ্যুতি ব্যবহার করতে হয়। কারণ চতুর্থাংশ বিচ্যুতি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রান্তবর্তী চরম প্রকৃতির স্কোরগুলোর উপর কোন প্রভাব পড়ে না। অথবা এ পরিমাপে কেবল মধ্যবর্তী অংশে কি ধরনের স্কোর কেন্দ্রীভূত হয় তা পরিমাপ করা হয়।

২। যেখানে কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ হিসাবে মধ্যক ব্যবহৃত হয়, সেখানেই চতুর্থাংশ বিচ্যুতি ব্যবহার করতে হবে।

৩। কোন বন্টনের মাত্র ৫০% এর পরিমাপ জানার প্রয়োজন হলে চতুর্থাংশ বিচ্যুতি ব্যবহার করতে হয়।

৪। কোন বণ্টনের নিচের বা উপরের দিকটা অজ্ঞাত বা অসমাপ্ত থাকলে চতুর্থাংশ বিচ্যুতি ব্যবহৃত হয়।

বিষমতার পরিমাপগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক

স্বাভাবিক বণ্টনের (Normal Distribution) ক্ষেত্রে বিষমতার পরিমাপগুলোর মধ্যে একটা পারস্পরিক সমন্বয় খুঁজে পাওয়া যায়। সেগুলোর সূত্র হলো ঃ

Q = ০.৮৪৫	M.D. = ০.৬৭৪σ
M.D. = ১.১৮৩	Q = ০.৭৯৮σ
σ = ১.৪৮৩	Q =১.২৫৩ M.D.

নির্ভুলতার দিক দিয়ে আদর্শ বিচ্যুতি গড় বিচ্যুতির চেয়ে উন্নত পরিমাপ হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে গড় বিচ্যুতিকেই অধিকতর কাজে লাগানো হয়। গড় থেকে বিচ্যুতির বর্গ নিয়ে আদর্শ বিচ্যুতি গণনা করা হয় বলে কিছুসংখ্যক বিচ্যুতি চরম প্রকৃতির থাকার কারণে এ ধরনের আদর্শ বিচ্যুতির ফলাফল সঠিক হয় না। এ ধরনের ক্ষেত্রে গড় বিচ্যুতি বা চতুর্থাংশ বিচ্যুতি অনেকটা সঠিক পরিমাপ দিবে।

ইতিপূর্বে সমাধানকৃত উদাহরণ ৩ (খ) বা ৪ (খ) থেকে দেখা যায় যে একই পৌনঃপুন্য বণ্টনের ক্ষেত্রে গড় বিচ্যুতি (M.D.) আদর্শ বিচ্যুতি (S.D.) এবং চতুর্থাংশ বিচ্যুতি (Q) এর ফলাফল এক নয়। উল্লিখিত বণ্টনটির ফলাফল নিম্নরূপ ঃ

গড় বিচ্যুতি (M.D.) = ৬.৭৬

আদর্শ বিচ্যুতি (S.D.) = ৮.৮

চতুর্থাংশ বিচ্যুতি (Q) = ৫.৮৭

উপরের তথ্য থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে আদর্শ বিচ্যুতি বিষমতার সবচেয়ে সূক্ষ্ম পরিমাপ। এরপর গড় বিচ্যুতি এবং চতুর্থাংশ বিচ্যুতি। নির্ভুলতার দিক দিয়ে আদর্শ বিচ্যুতি গড় বিচ্যুতির চেয়ে উন্নত। তারপর পর্যাক্রমে গড় বিচ্যুতি, চতুর্থাংশ বিচ্যুতি ও বিস্তৃতি। কিন্তু বিস্তৃতি কেবল গণনার দ্রুততার ও স্বল্পায়াসের দিক দিয়ে বিচার করলে প্রথম স্থান অধিকার করবে। এক্ষেত্রে চতুর্থাংশ বিচ্যুতি, গড়বিচ্যুতি এবং সর্বশেষ আদর্শ বিচ্যুতি।

মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার উন্নতিকল্পে কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ বিষমতার পরিমাপের ব্যবহার

কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ ও বিষমতার পরিমাপের ব্যবহারিক জ্ঞান বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উন্নতির জন্য কিভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে তা আলোচনা করা যেতে

পারে। প্রত্যেক বিদ্যালয়েই পরীক্ষা নেয়ার পরে সকল পরীক্ষার নম্বর বা স্কোরগুলোকে রেকর্ড করা হয়। মনে করি কোন বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির দশজন ছাত্রের বিভিন্ন বিষয়ে তাদের প্রাপ্ত নম্বরগুলো শ্রেণি শিক্ষক খাতায় রেকর্ড করেন। প্রত্যেক পরীক্ষার পর প্রোগ্রেস রিপোর্ট কার্ড তৈরি করে অভিভাবকদের কাছে পাঠান। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, উক্ত নম্বর তালিকার নিচে মাত্র আরও দু'টি হিসাব অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এ দু'টি হিসাবের মধ্যে একটি হল গড় এবং অন্যটি হলো গড়বিচ্যুতি বা আদর্শ বিচ্যুতি। ছাত্র সংখ্যা কম থাকলে গড় বিচ্যুতি নেয়াই শ্রেয়। কিভাবে গড় ও বিচ্যুতি, আদর্শ বিচ্যুতি লিখতে হয় তা নম্বরের রেকর্ডের একটি নমুনা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

	বাংলা				সাধারণ গণিত		
ক্র. নং	ছাত্রের নাম	প্রথম সাময়িক পরীক্ষা পূর্ণমান	দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা পূর্ণমান	বার্ষিক পরীক্ষা পূর্ণমান	প্রথম সাময়িক পরীক্ষা পূর্ণমান	দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা পূর্ণমান	বার্ষিক পরীক্ষা পূর্ণমান
		১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
১।	মইন	৩৩	৩৬	৫২	৫৮	৫২	৬৫
২।	তানজীম	৩৮	৩২	৩৯	৬০	৬৬	৭২
৩।	দাউদ	৪৮	৫৪	৭০	৭৮	৭০	৭৮
৪।	রায়হান	৪৫	৪৪	৫৬	৮০	৭২	৮০
৫।	ইমরান	৫০	৫২	৬৯	৭২	৭৭	৮৬
৬।	চিত্ত	৩৩	৩৯	৩৭	৬০	৬০	৬৪
৭।	রফিক	৪৪	৪৬	৫১	৫৮	৫৬	৬৩
৮।	মতিন	৫৩	৫৪	৬৪	৭০	৭২	৭৫
৯।	পলাশ	৩৮	৩৪	৩৩	৬৪	৬০	৭১
১০।	রায়হান	৩৮	৩	২৯	৬০	৫৫	৬৩
	নম্বরের গড় (M)	৫২	৪৪	৫১	৬৭	৬৩	৭১
	গড় বিচ্যুতি (M.D.)	৬	৬	১২.২	৪.৪	৭.৪	১৪.৪

পরীক্ষার নম্বরের রেকর্ড যে কোন ভাবে রাখা যায়। এখানে চার্ট দেখানোর উদ্দেশ্য হল নম্বরের শেষে প্রত্যেক বিষয়ের গড় ও গড় বিচ্যুতি রেকর্ড করা। এক পরীক্ষা থেকে অন্য পরীক্ষার গড় নম্বর বেশি হলে বুঝতে হবে এ শ্রেণিতে ছাত্রদের মোট কৃতিত্ব বেড়ে গেছে। কিন্তু আদর্শ বিচ্যুতি বা গড় বিচ্যুতি বেশি হলে বুঝতে হবে এ শ্রেণিতে কিছু ছাত্র

খুব ভাল এবং কিছু ছাত্র খারাপ। প্রত্যেক বিষয়ের নম্বরের শেষে গড় ও গড় বিচ্যুতি রেকর্ড থাকলে শিক্ষক অনায়াসেই বুঝতে পারেন কোন পরীক্ষায় ছাত্রদের কৃতিত্ব বাড়ছে না কমছে। শ্রেণি শিক্ষকের উদ্দেশ্য হবে বিষয়-ভিত্তিক গড় বাড়ানো এবং আদর্শ বিচ্যুতি বা গড় বিচ্যুতি কমানো। উপরের উদাহরণে দেখা যায় বাংলা পরীক্ষায় প্রথম সাময়িক ও দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার ফলাফল প্রায় একই রকম। কিন্তু বার্ষিক পরীক্ষায় ভিন্ন রূপের। এর কারণ হলো কিছু ভাল ছাত্র যারা বার্ষিক পরীক্ষায় আরো বেশি ভাল করেছে। পিছনে পড়া ছাত্ররা ওদের মত একই রকম ভাল করতে পারে নাই। এখানে ভাল ও খারাপ ছাত্রদের মেধা ভিত্তিক সীমাবদ্ধতা ধরা পড়ছে। আবার গণিত বিষয়ে প্রথম সাময়িক পরীক্ষার তুলনায় দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার গড় ও গড় বিচ্যুতি উভয়ই কিছুটা সামান্য কমেছে। এখানে শ্রেণি শিক্ষণে প্রথমে সাময়িক পরীক্ষার পরে শিক্ষক পশ্চাৎগামী শিক্ষার্থীদের প্রতি একটু বেশি নজর রেখেছেন, যার ফলে গড় বিচ্যুতি কিছুটা কমে এসেছে। কিন্তু মেধাবী ছাত্ররা বার্ষিক পরীক্ষায় তাদের আশানুরূপ ফলাফল করতে সক্ষম হওয়ায় এখানে দেখা যায় গণিত বিষয়ের গড় ও গড় বিচ্যুতি উভয়ই বেড়েছে। এর কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে যে ভাল ছাত্ররা যে হারে গণিত বিষয়ে পাঠ উন্নতি সাধনে সক্ষম হয়েছে। খারাপ ছাত্ররা সেই হারে তাদের সাথে পেরে উঠে নি। যারফলে গড় ও গড় বিচ্যুতি উভয়ই বেড়েছে। সুতরাং ভাল ছেলেদের বলা যায় এ ধরনের পরীক্ষার ফলাফলের হিসাব রেকর্ড করলে সকল ছাত্র/ছাত্রীদেরকেই শিক্ষা জীবনে উন্নতি করার তুলনামূলক চিত্র শ্রেণি শিক্ষক সময়মত তার পেশাগত দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারেন। এভাবেই ধীরে ধীরে শিক্ষাক্ষেত্রে একটা সুস্থ, সাবলীল ও প্রগতিমুখী পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়।

অনুশীলনী - ৪.৯

১। বিষমতার পরিমাণ কি? উদাহরণসহ বিষমতার পরিমাপগুলোর সংজ্ঞা ও ব্যবহার লিখুন।

২। আদর্শ বিচ্যুতি বলতে কি বুঝেন? সুষ্ঠুভাবে শিক্ষাদানের জন্য আদর্শ বিচ্যুতির প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করুন।

৩। বিষমতার পরিমাপগুলোর প্রয়োগ বিধি বর্ণনা করুন।

৪। বিষমতার পরিমাপ হিসাবে গড় বিচ্যুতির চেয়ে আদর্শ বিচ্যুতি বেশি গ্রহণযোগ্য কেন?

৫। বিষমতার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পরিমাপ কোনটি এবং কেন? ইহার ব্যবহার লিখুন।

৬। চতুর্থাংশ বিচ্যুতি বলতে কি বোঝেন?

৭। নিম্নলিখিত স্কোরগুলোর আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় করুন ঃ

(ক) ৬, ১০, ৫, ১১, ৭, ৯, ৮, ৭, ৯, ৮।

(খ) ২২, ২৫, ২৩, ১৬, ৩২, ১৯, ২৯, ২০, ২৮, ২৬, ২৭, ২১

(গ) ৪, ৫, ৯, ৩, ১২, ৭, ১৫, ৭, ৯।

৮। নিচের পৌনঃপুন্য নমুনাগুলোর দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত উভয় পদ্ধতিতেই আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় করুন।

(ক) শ্রেণি ব্যবধান	পৌনঃপুন্য	(খ) শ্রেণি ব্যবধান	পৌনঃপুন্য
৯১-১০০	১	৩০-৩২	২
৮১-৯০	৭	২৭-২৯	৩
৭১-৮০	৯	২৪-২৬	৪
৬১-৭০	১৪	২১-২৩	৬
৫১-৬০	১৯	১৮-২০	৯
৪১-৫০	১২	১৫-১৭	৭
৩১-৪০	৫	১২-১৪	৫
২১-৩০	২	৯-১১	৪
১১-২০	১		

(গ) শ্রেণি ব্যবধান	পৌনঃপুন্য	(ঘ)শ্রেণি ব্যবধান	পৌনঃপুন্য
৮৩-৮৬	২	৮০-৮৯	৩
৭৯-৮২	৪	৭০-৭৯	১৪
৭৫-৭৮	৭	৬০-৬৯	৩৪
৭১-৭৪	৯	৫০-৫৯	৩৬
৬৭-৭০	১২	৪০-৪৯	২৮
৬৩-৬৬	১৫	৩০-৩৯	২১
৫৯-৬২	১০	২০-২৯	৯
৫৫-৫৮	৮	১০-১৯	৫
৫১-৫৪	৬		
৪৭-৫০	৪		
৪৩-৪৬	৩		
৩৯-৪২	২		
৩৫-৩৮	২		

১০। নিম্নলিখিত পৌনঃপুন্য বণ্টনগুলোর গড় বিচ্যুতি, আদর্শ ও চতুর্থাংশ বিচ্যুতি বের করুন। ব্যবহৃত পদ্ধতি ও সূত্রের বর্ণনাসহ উল্লিখিত বিষমতার পরিমাপগুলোর নির্ণয়ে ফলাফলগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করুন।

(গ) শ্রেণি ব্যবধান	পৌনঃপুন্য	(ঘ)শ্রেণি ব্যবধান	পৌনঃপুন্য
৭১-৭৫	৩	১৬৫-১৬৯	১
৬৬-৭০	৬	১৬০-১৬৪	৪
৬১-৬৫	৭	১৫৫-১৫৯	৬
৫৬-৬০	৮	১৫০-১৫৪	৯
৫১-৫৫	১২	১৪৫-১৪৯	১৩
৪৬-৫০	২২	১৪০-১৪৪	১২
৪১-৪৫	১৮	১৩৫-১৩৯	৭
৩৬-৪০	১১	১৩০-১৩৪	৫
৩১-৩৫	৯	১২৫-১২৯	২
২৬-৩০	৩	১২০-১২৪	১
২১-২৫	১		

৯। নিম্নলিখিত পৌনঃপুন্য বণ্টনটির চতুর্থাংশ বিচ্যুতি নির্ণয় করুন।

শ্রেণি ব্যবধান	৪০-৪৪	৪৫-৪৯	৫০-৫৪	৫৫-৫৯	৬০-৬৪	৬৫-৬৯	৭০-৭৪
পৌনঃপুন্য	৪	১১	২১	২৪	১৮	৫	৩

১১। নিম্নের পৌনঃপুন্য বণ্টনগুলোর গড় ও আদর্শ বিচ্যুতি বের করে ফলাফলের ব্যাখ্যা দিন

(ক) শ্রেণি ব্যবধান	পৌনঃপুন্য
৮০-৮৪	২
৭৫-৭৯	৭
৭০-৭৪	৭
৬৫-৬৯	৯
৬০-৬৪	১১
৫৫-৫৯	৮
৫০-৫৪	৬
৪৫-৪৯	৪
৪০-৪৪	১

(খ)শ্রেণি ব্যবধান	পৌনঃপুন্য
৭৯-৮২	১
৭৫-৭৮	৩
৭১-৭৪	৩
৬৭-৭০	৫
৬৩-৬৬	৭
৫৯-৬২	১৩
৫০-৫৮	৮
৫১-৫৪	৬
৪৭-৫০	৫
৩৩-৪৪	৪
৩৯-৪২	১

(গ) শ্রেণি ব্যবধান	পৌনঃপুন্য
৭০-৭৬	২
৬৩-৬৯	৫
৫৬-৬২	৯
৪৯-৫৫	১২
৪২-৪৭	৮
৩৫-৪১	৬
২৮-৩৪	৫
২১-২৬	২

স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্র (Normal Probability Curve)

লেখচিত্র এক ধরনের তথ্য পরিবেশনের কৌশল। যে কোন তথ্য পরিবেশন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের লেখচিত্র ব্যবহৃত হয়। শিক্ষামূলক ও মনোবৈজ্ঞানিক তথ্য পরিবেশন করা ও তাৎপর্য নির্ণয়ের জন্য নানাবিধ লেখচিত্রের সাহায্য নেয়া হয়। শিক্ষামূলক বা মনোবৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ থেকে প্রাপ্ত যে কোন স্কোরগুচ্ছকে বন্টনে সাজিয়ে যদি তার একটি বহুভুজ অংকন করা হয়, তবে সে চিত্রটি অনেকটা ঘন্টার আকৃতির মত এক ধরনের চিত্রে পরিণত হয়। ইহা গর্সিয়ান (Gaussian) চিত্র নামে পরিচিত। শিক্ষাবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, আবহাওয়া বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের পরীক্ষণ সংক্রান্ত উপাত্ত থেকেই একই ধরনের ঘন্টার আকারের মত চিত্র পাওয়া যায়। ইহাই স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্র (Normal Probability Curve) নামে পরিচিত। বৈজ্ঞানিক বা

কারিগরি গবেষণার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের মডেল (Model) বা অতিরূপ বা প্রতিকল্প বহুল প্রচলিত। আজকের দিনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সাংকেতিক (Symbolic) প্রতিকল্প (Model) বা গাণিতিক (Mathematical) প্রতিকল্পগুলোও এক ধরনের স্বাভাবিক বন্টনের লেখচিত্র। আধুনিক মূল্যায়ন ও পরিমাপ বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও স্বাভাবিক বন্টনের মৌলিক নীতিকে ভিত্তি করেই বাস্তবায়িত হচ্ছে।

স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্র ঃ অভিন্ন বয়স, শিক্ষা, পারিবারিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে বসবাসরত একদল বালক বা বালিকার উপর প্রয়োগকৃত একটি বুদ্ধির অভীক্ষার স্কোরগুচ্ছের পৌনঃপুন্য বহুভুজটি কেন্দ্রীয় প্রবণতার বৈশিষ্ট্যসমূহের মৌলিক ধারণা দেয়। যদি এ লেখচিত্রটির সর্বোচ্চ শীর্ষবিন্দু থেকে তার অধঃরেখায় একটি লম্ব টানা যায়, তবে চিত্রটি একই ধরনের দুই অংশে বিভক্ত হবে। চিত্রদুটো আকারে প্রতিসম (Symetrical) শীর্ষ বিন্দুর দুধার থেকে চিত্রের রেখাটি ধীরে ধীরে সরু হয়ে দু'পাশেই নেমে আসবে। সর্বনিম্ন স্কোরগুলো দিয়ে বাম প্রান্ত শুরু হবে। খুব কম সংখ্যক স্কোর প্রান্ত ভাগে থাকবে। ক্রমশ স্কোরের সংখ্যা বেড়ে যেতে শুরু করবে। মধ্যভাগে স্কোরগুলোর সংখ্যা ও আয়তন অত্যধিক বেড়ে যাবে। আবার ডান দিকের শেষ প্রান্তে অল্প সংখ্যক সর্বোচ্চ স্কোরগুলো অবস্থান করবে। ইহাদের সংখ্যা অনেকটা সর্বনিম্ন স্কোরগুলোর মতই। চিত্রটির মাঝখানটি উচু ও প্রান্ত খোলা থাকবে এবং ইহাকে একটা ঘন্টার আকৃতির সাথে তুলনা করা যাবে। এ ধরনের আকৃতি বিশিষ্ট বন্টনের একটা আদর্শ চিত্ররূপ পাওয়া যাবে। সব ধরনের অভীক্ষালব্ধ চিত্রের আকৃতিগত মিল সব সময়ই বজায় থাকে। এ জাতীয় বিভিন্ন অভীক্ষালব্ধ চিত্রকেই স্বাভাবিক বন্টনের চিত্র বা স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্র বলে। স্বাভাবিক সম্ভাবনার একটি চিত্র এখানে দেয়া হলোঃ

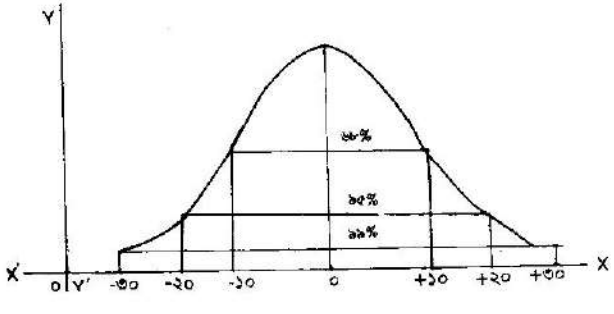

BANBEIS Library
Accession No.

ছক কাগজের X_0X^1 অক্ষরেখা চিত্রটির অধঃরেখা। চিত্রটির ঠিক মধ্য বিন্দুটিই গড়। ঐ বিন্দুতে একটি লম্ব টানলে বন্টনটি সমান দুই ভাগে বিভক্ত হবে। এ ক্ষেত্রে গড় মধ্যক ও প্রচুরক তিনটিই এক বিন্দুতে অবস্থান করবে এবং সে চিত্রতে কেন্দ্রীয় প্রবণতার তিনটি অভিন্ন পরিমাপ থাকবে। এরূপ চিত্রকে স্বাভাবিক বন্টনের চিত্র বা স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্র বলা হয়। স্বাভাবিক বন্টন ছাড়া অন্যান্য চিত্রে গড়, মধ্যক ও প্রচুরক ভিন্ন ভিন্ন হবে। গণিতবিদ্‌গণ স্বাভাবিক চিত্রের একটি সমীকরণ, গঠন করেছেন। সমীকরণটি নিম্নরূপ ঃ

$$Y = \frac{N}{\sigma\sqrt{2\pi}} \; e^{\frac{-x^2}{2\pi^2}}$$

এখানে, Y= পৌনঃপুন্য (f), X অক্ষরের উপর বন্টনের দৈর্ঘ্য।

x =X অক্ষরেখার স্কোর (গড় থেকে বিচ্যুতি)

N = মোট স্কোর সংখ্যা।

σ = আদর্শ বিচ্যুতি

π = ৩·১৪১৬

e = ২·৭১৮৩

N এবং σ জানা থাকলে ঐ সূত্রের সাহায্যে X এর পৌনঃপুন্য বা Y জানা যায়। একটি স্কোর কতজন ছাত্র পেয়েছে বা দুটি স্কোরের মধ্যে পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা কত তা সঠিকভাবে জানা যায়।

সম্ভাবনার মৌলিক নীতি

স্বাভাবিক বন্টনের সঙ্গে সম্ভাবনা (Laws of Chance) এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এ সম্বন্ধকে গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। কোন একটা ঘটনার সম্ভাবনা বলতে বুঝা যাবে একই ধরনের ঘটনার মধ্যে একটি বিশেষ ঘটনা যতবার ঘটবার আশা বা প্রত্যাশা থাকে।

সম্ভাবনা অনুপাত (Probability Ratio)

ঐ অনুপাত ০ (শূন্য) থেকে +১ (এক) পর্যন্ত দুটি সীমার মধ্যেই আবদ্ধ। সম্ভাবনা '১' (এক) মানে ইহা সত্য বলে প্রমাণিত হওয়ায় মত ঘটনা আবার সম্ভাবনা ০ (শূন্য) মানে ইহা একবারও ঘটবার সম্ভাবনা নেই। ফলে যে কোন সম্ভাবনার মান হতে পারে বা ঘটতে পারে। সব কিছু, নির্ভর করছে ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনার উপর। উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আকাশে চাঁদ দেখা যায়। দিনের বেলা চাঁদ দেখা যাওয়ার সম্ভাবনার ০ (শূন্য), তেমনি রাত্রে সূর্য পশ্চিম দিকে উদয় হয়, এরও সম্ভাবনা

০ (শূন্য)। আবার দিনের বেলা সূর্য দেখার সম্ভাবনা ১ (এক) তেমনি রাত্রে চাঁদ দেখার সম্ভাবনাও ১ (এক)। আকাশে মেঘ থাকলে বৃষ্টি হয়। এর সম্ভাবনা বৎসরের বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন হচ্ছে। যেমন বর্ষাকালে এর সম্ভাবনা ১। বিভিন্ন ঋতুতে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ভিন্ন হবে। মাস হিসেবে ধরা গেলে বছরের কোন মাসে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা যেমন (শূন্য) ০ হয়। তেমন সম্ভাবনা ১ (এক) হবে। আবার ০ হতে ১ এর মাঝের যে কোন মানের সম্ভাবনা ঘটতে পারে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বা সময় কাল না ধরে কেবল মাত্র বৃষ্টিপাত হল কিনা। এমনি অনেক ধরনের উদাহরণের সাহায্যে দেখা যাবে যে ঘটনা ঘটবার সম্ভাব্যতা বিভিন্ন মানের হচ্ছে।

সম্ভাবনার সূত্র ঃ- 'ক' এবং 'খ' বাংলাদেশী দুইটি আধুলি। ইহাদেরকে টস (Toss) করলে নিম্নরূপ সূত্র পাওয়া যায়।

$$(\text{শ}+\text{প})^{২} = \text{শ}^{২} + ২\text{শপ} + \text{প}^{২}$$

এখানে শ = আধুলির যে পৃষ্ঠে শাপলা ফুল আছে সে দিকটা। প = উহার অপর পৃষ্ঠে যেখানে কয়েকটা প্রোটিনযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য যথা মাছ, মাংস, ফলমুলের ছবি। একটি মুদ্রা উপরে নিক্ষেপ করে মাটিতে পড়তে দিলে উহার শ উঠার সম্ভাবনা ৫০% এবং প উঠার সম্ভাবনা ৫০%। এ কারণে উভয় ক্ষেত্র সম্ভাবনা $\frac{১}{২}$।

দুইটি মুদ্রা এক সঙ্গে নিক্ষেপ করলে শ এবং প উঠার সম্ভাবনাকে নিম্নরূপ চার ভাগে দেখানো যেতে পারে।

১	২	৩	৪
কখ	কখ	কখ	কখ
শ+শ	শ+শ	শ+শ	শ+শ
$\frac{১}{৪}$	$\frac{১}{৪}$	$\frac{১}{৪}$	$\frac{১}{৪}$

উপরের সূত্রটিকে অন্যভাবে সমীকরণে প্রকাশ করা যায়। যদি ঘটনার মোট সংখ্যাকে N এবং উহা দুই ভাগে ভাগে করে। যেমন ঃ কৃতকার্য ঘটনা = S এবং অকৃতকার্য ঘটনা = F ধরলে, সমীকরণটি নিম্নরূপ দাঁড়াবে ঃ-

(১) $P = \frac{S}{N}$ (২) $Q = \frac{F}{N} = Q$

এখানে P = কৃতকার্য হওয়ার সম্ভাবনা

Q = অকৃতকার্য হওয়ার সম্ভাবনা।

সুতরাং $S + F = N$

বা $\frac{S}{N} = \frac{F}{N} = ১$

এখন সূত্রটিকে আরো স্পষ্ট করে লিখা যায়

$(P+Q)^2 = P^2 + 2PQ + Q^2$

স্বাভাবিক সম্ভাবনার চিত্র অঙ্কন

(ক) মুদ্রার উৎক্ষেপন ও স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্র অঙ্কন ঃ

ছয়টি বাংলাদেশী আধুলিকে একটি ছোট টিনের কার্টুনে রেখে উহার খোলমুখ হাত দিয়ে বন্ধ করে একটু ভালমত নেড়ে উপর দিকে ছুড়ে দিলে মুদ্রা ছয়টি সাত রকম রূপ নিতে পারে। যেমন ঃ ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬। মনে করি, একবার শাপলা ফুল উঠলোনা, মাত্র একবার শাপলা ফুল উঠলো। মাত্র দুইবার, মাত্র তিনবার, এভাবে ছয়টি ছয়বার পর্যন্ত উঠতে পারে। যদি উক্ত ৬টি মুদ্রা ৪০ বার উপরে ছুড়া হয়, তবে নিম্নোক্ত পৌনঃপুন্য পাওয়া যেতে পারে।

শাপলা ফুল	০	১	২	৩	৪	৫	৬
পৌনঃপুন্য	১	৪	৮	১৪	৮	৪	১

উপরে বর্ণনা অনুযায়ী একটি বাস্তব পরীক্ষা করা হল, এখানে ছয়টি আধুলি ৫০ বার উৎক্ষেপণ করা হলো।

শাপলা ফুল	০	১	২	৩	৪	৫	৬
প্রাপ্ত পৌনঃপুন্য	১	৭	১১	১৪	৯	৬	২
প্রত্যাশিত পৌনঃপুন্য	১	৬	১০	১৬	১০	৬	১

উপরের দুই ধরনের উপাত্ত দিয়ে নিম্নের চিত্রটি অংকন করা হলো। প্রত্যাশিত পৌনঃপুন্য ভিত্তি করে আয়তলেখ এবং প্রাপ্ত পৌনঃপুন্যকে ভিত্তি করে স্বাভাবিক বণ্টনের পৌনঃপুন্য বহুভুজ আয়তলেখের অভিস্থাপন করা হলো। পৌনঃপুন্য বহুভুজটি মসৃণীকৃত করলে ঘন্টার আকৃতি গ্রহণ করবে। এরূপ সংশোধন ও সংস্কার করার পর উহা স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্র হবে।

$$Y = \frac{N}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-x^2}{2\pi^2}}$$

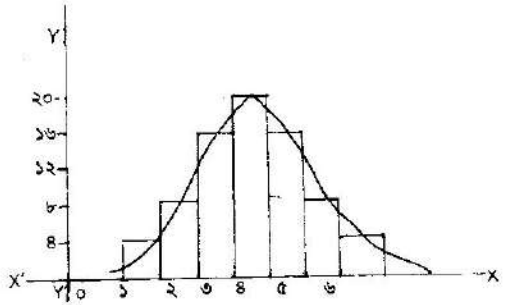

এ সমীকরণের সাহায্যে গণিতবিদগণ গর্সিয়ান চিত্র বা স্বাভাবিক সম্ভাবনার চিত্র অঙ্কন করেন। $Y = \frac{N}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-x^2}{2\pi^2}}$

খ) শোভনতম স্বাভাবিক বন্টনের চিত্র অঙ্কন।

উপরে বর্ণিত সমীকরণের সাহায্যে যে কোন বন্টনের শোভনতম স্বাভাবিক বন্টনের চিত্ররূপটি অঙ্কন করা যায়।

শ্রেণিব্যবধান	১৫-৯	২০-২৪	২৫-২৯	৩০-৩৪	৩৫-৩৯	৪০-৪৪	৪৫-৪৯	
পৌনঃপুন্য	১	২	২	১০	১৫	২৭	৩৭	
শ্রেণিব্যবধান	৫০-৫৪	৫০-৫৫	৬০-৬৪	৬৫-৬৯	৭০-৭৪	৭৫-৭৯	৮০-৮৪	৮৫-৮৯
পৌনঃপুন্য	৩০	৩৪	১৮	১৩	১০	৪	২	১

উপরের বন্টনের N = ২০৬

আদর্শ বিচ্যুতি (σ) = ১২.১৪

গড় (M) = ৫১·৯৫ এবং মধ্যক = ৭১·০০

স্বাভাবিক বন্টনের সূত্রের সাহায্যে প্রদত্ত বন্টনটির সবচেয়ে মানানসই একটি স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্র অঙ্কন করা যায়।

১) প্রথমত স্বাভাবিক বন্টনের ঠিক মধ্যবর্তী পৌনঃপুন্য বন্টনের বা সর্বোচ্চ কোটিটি (Ordinate) বা Y অক্ষরেখাটি নির্ণয় করতে হয়। মনে করি সর্বোচ্চ কোটি Y। ইহা নির্ণয় করার সময় X= 0 ধরে উপরের সূত্রে প্রয়োগ করতে হয়। স্বাভাবিক বন্টনের ঠিক মধ্যবর্তী পৌনঃপুন্যটির X বা গড় বিচ্যুতির (শূন্য) এ কারণে

$e^{\frac{-x^2}{2x^2}}$ হলে, প্রদত্ত সূত্রটি দাঁড়াচ্ছে- $Y = \frac{N}{\sigma\sqrt{2\pi}}$

$= e^0 = 1$

উপরের উদাহরণটিতে $Y_0 = \frac{২০৬}{২·৪৩ \times ২·৫১} = ৩৩·৮$

এখানে $\sqrt{২\pi}$= ২·৫১ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে বন্টনের দৈর্ঘ্য (i) ৫ দিয়ে আদর্শ বিচ্যুতি σ = ১২·১৪ কে ভাগ করলে σ = ২·৪৩ হবে। কারণ আদর্শ বিচ্যুতিকে শ্রেণি ব্যবধানের এককের হিসাবে নেয়ার জন্য শ্রেণি ব্যবধান দৈর্ঘ্য দিয়ে ভাগ করতে হচ্ছে।

Y (0) নির্ধারণ করার পর গড় থেকে বিভিন্ন দুরত্বে অবস্থিত কোটিগুলির (ordinate) উচ্চতা নির্ণয় করা হলো।

$Y(0) = \frac{২০৬}{২·৪৩ \times ২·৫১} = ৩৩·৮$

$\pm 1\sigma = 0.0606 \times 33.8 = 20.5$

$\pm 2\sigma + 01.534 \times 33.8 = 8.6$

$\pm 3\sigma = 0.1111 \times 33.0 = 04$

স্বাভাবিক সম্ভাবনার চিত্রে গড় থেকে বিভিন্ন σ দূরত্বে অবস্থিত কোটিগুলোর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে। বন্টনের ঠিক মধ্যবর্তী কোটির দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ এবং ইহাকে ১-০০ ধরে নিয়ে অন্য কোটিগুলোকে তার ভগ্নাংশে প্রকাশ করা যায়। যেমন গড় থেকে $\pm 1\sigma$ তে কোটির উচ্চতা পাওয়া যাবে, $\frac{x}{\sigma} = 1.0$ এর বিপরীতে লিখিত রাশিটি অর্থাৎ ০.৬০৬৫৩, গড় থেকে $\pm 2\sigma$ তে কোটির উচ্চ পাওয়া যাবে = $\frac{x}{\sigma} = 2.0$ এর বিপরীতে রাশিটি ০.১৩৫৩৪ তেমনটি গড় থেকে $\pm 3\sigma$ দূরত্বে কোটির উচ্চ পাওয়া যাবে $x = 30$ এর বিপরীতে লিখিত রাশিটি অর্থাৎ ০.০১১১১।

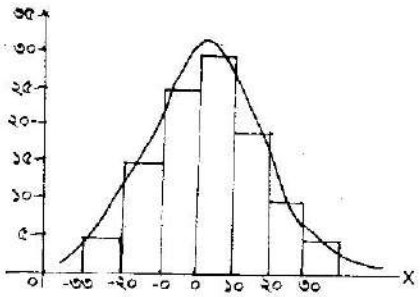

এবার প্রদত্ত বন্টনটির গড় থেকে $\pm 1\sigma$ দূরত্বে কোটির উচ্চতা হবে .০৬০৫৩ x ৩৩.৮ বা ২০.৫। তেমনই গড় থেকে $\pm 2\sigma$ দূরত্বে কোটির উচ্চতা হবে ০.১৩৫৩৪ x ৩৩.৮ কিংবা ৪.৬ এবং গড় থেকে $\pm 3\sigma$ দূরত্বে কোটির উচ্চতা হবে .০১১১১ x ৩৩.৮ বা ০.৪।

অতএব গড়ের বাদিকে $-\sigma$, -2σ, -3σ এবং ডানদিকে $+1\sigma$, $+2\sigma$ এবং 3σ এ ছ'টি বিন্দুতে কোটির উচ্চতা জানা গেল, গড়ের কোটির উচ্চতাও জানা গেল। অতএব, এ সাতটি বিন্দুর কোটি অঙ্কন করেই প্রদত্ত বন্দনটির সবচেয়ে মানানসই স্বাভাবিক বন্টনের চিত্রটি আঁকতে হবে। মূল বন্টনটির আয়তলেখ প্রথমে অঙ্কন করে তার উপর শোভনতম স্বাভাবিক বন্টনের চিত্রটি অভিস্থাপিত করা হয়েছে।

আরো নিখুঁতভাবে স্বাভাবিক বন্টনের চিত্রটি আঁকতে হলে স্বাভাবিক বন্টনের মধ্যবর্তী আরো অনেকগুলো কোটির উচ্চতা নির্ণয় করা যেতে পারে। যেমন + 0.5σ+1.5σ+2.5σ বিন্দুগুলোতে কোটির উচ্চতা জানতে পারলে স্বাভাবিক চিত্র আঁকার জন্য আরো ছ'টি বিন্দু পাওয়া যাবে, যথা-

± ০০.৫০তে কোটির উচ্চতা হলো ০.৮৮২৫০ x ৩৩.৮ = ২৯.৮

± ১.৫০তে কোটির উচ্চতা হলো ০.৩২৪৬৫ x ৩৩.৮ = ১১.০

± ২.৫০তে কোটির উচ্চতা হলো ০.০৪৩২৪ x ৩৩.৮ = ১.৫

স্বাভাবিক বন্টনের ক্ষেত্রফল

স্বাভাবিক বন্টনের ক্ষেত্রে গাণিতিক গড়কেই X - অক্ষরেখা তথা বন্টনের কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করা যায়। এ কেন্দ্র থেকে শুরু করে X - অক্ষরেখাটিকে কয়েকটি সমান ভাগে ভাগ ডানদিকে ও বামদিকের স্কোরগুলোর জন্য + বা - চিহ্ন ব্যবহার করতে হয়। সাধারণত গড় থেকে ডানদিকে তিনটি ও বামদিকে তিনটি মোট ছয়টি সমান ভাগে অক্ষরেখাটি বিভক্ত করা হয় এবং ভাগগুলোকে σ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এই হিসাবে সমস্ত বন্টনটি M ± ৩σ এর মধ্যে অবস্থান করবে। কিন্তু স্কোরের সংখ্যা সব জায়গায় ভিন্ন থাকায় বন্টনের ক্ষেত্রফল সব জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন কোথাও এক নয়। বন্টনটির ক্ষেত্রফল নিম্নে দেয়া হলো।

+ ১σ এর মধ্যে ৩৪.১৩% স্কোর

- ১σ এর মধ্যে = ৩৪.১৩% স্কোর

∴ ১σ এর মধ্যে = ৬৮.২৬% স্কোর

+ ২σ এর মধ্যে = ৪৭.৭২ স্কোর

- ২σ এর মধ্যে = ৪৭.৭২% স্কোর

∴ ± ২σ এর মধ্যে = ৯৫.৪৪%

+ ৩σ এর মধ্যে ৪৯.৮৭% স্কোর এবং

- ৩σ এর মধ্যে = ৪৯.৮৭ স্কোর

∴ ± ৩σ এর মধ্যে = ৯৯.৭৪%।

এখন দেখা যাচ্ছে যে, সমস্ত স্কোরই -৩σ থেকে + ৩σ এর সীমার মধ্যে ছড়িয়ে থাকছে। এর বাইরে স্কোরের সংখ্যা খুবই কম।

অস্বাভাবিক বা বিচ্যুতি লেখচিত্র

শিক্ষামূলক পরিমাপের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত তথ্যের বন্টন ও আদর্শ স্বাভাবিক বন্টনের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকছে নমুনা দল নির্মাণের নীতি থেকে প্রাপ্ত বন্টন স্বাভাবিক বন্টনের প্রকৃতি থেকে কিছুটা অস্বাভাবিক। প্রথমত প্রাপ্ত বন্টনের সম (Symmetry) বজায় থাকে

না। দ্বিতীয় প্রাপ্ত বন্টন স্বাভাবিক বন্টনের আনুপাতিক উচ্চতা বজায় রাখতে পারে না। এ ধরনের অস্বাভাবিক লেখচিত্র দুই প্রকারের।

ক তির্যকতা (Skewness)

খ কার্টোসিস (Kurtosis)

ক) তির্যকতা (Skewness)

সাধারণত স্বাভাবিক বন্টনটির চিত্রকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে এক অংশ অন্য অংশের উপর স্থাপন করলে অংশ দুইটি সম্পূর্ণ ভাবে মিলে যাবে। কারণ হলো স্বাভাবিক বন্টনের লেখচিত্রের দুইটি অংশ বাম এবং ডান মূল মধ্য অক্ষরেখা বরাবরই সমদ্বিখন্ডিত হয়। ফলে, স্বাভাবিক বন্টনের গড়, মধ্যক, প্রচুরক চিত্রে একই বিন্দুতে অবস্থান করে এবং তাদের মান পরস্পর সমান থাকে। কিন্তু যদি কোন প্রাপ্ত বন্টনের গড়, মধ্যক, ও প্রচুরক ভিন্ন ভিন্ন মানের হয় তবে উহারা চিত্রেও ভিন্ন ভিন্ন বিন্দুতে অবস্থান করবে, কখনও একই বিন্দুতে মিলিত হবে না। এ ক্ষেত্রে লেখচিত্রটির কিছুটা বিকৃতি ঘটে। যখন কোন বন্টনের চিত্ররূপ স্বাভাবিক বন্টনের আদর্শ চিত্রের অনুরূপ হয় না তখন সে বন্টনটিকে অসমাঞ্জস্য (Asymmetrical) বলা হয়। আবার এ অসামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে যে বিচ্যুতি ঘটে তাকেই বলা হয় তির্যকতা (Skewness)। লেখচিত্রের তির্যকতা (Skewness) দুই ধরনের হতে পারে। ইহারা হ্যাঁ সূচক তির্যকতা (Positive Skewness) ও না সূচক তির্যকতা (Negative Skewness)। কোন বন্টনের ঢালুদিক লেখচিত্রের ডানদিকে নেমে যায়, তাকে ধনাত্মক তির্যকতা বিশিষ্ট বন্টন বলে। আর বন্টনের বাঁদিকে স্কোরগুলো সমবেত হয়। কিন্তু যদি বন্টনের ঢালু দিক লেখচিত্রের বামদিকে নেমে যায়। তাহলে সে বন্টনটিকে ধনাত্মক তির্যকতা বিশিষ্ট বন্টন বলা হবে। এ জাতীয় বন্টনের ডানদিকে স্কোরগুলো সমবেত থাকবে। ঋণাত্মক তির্যকতার ক্ষেত্রে প্রথমে গড়, তারপর মধ্যক, ধনাত্মক তির্যকতার ক্ষেত্রে প্রথমে মধ্যক, পরে গড় লেখচিত্রে অবস্থান করবে।

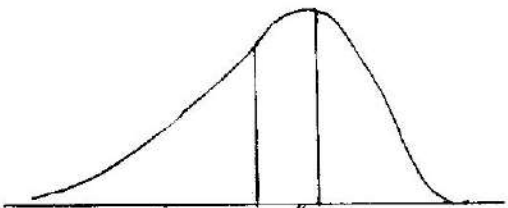

ধনাত্মক তির্যকতা

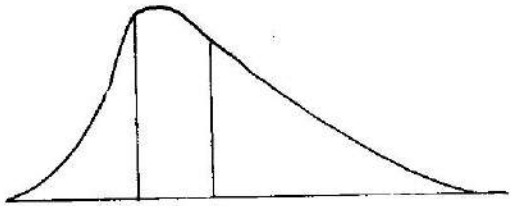

ধনাত্মক তির্যকতা

কোন বন্টনের অসামঞ্জস্য বা বিচ্যুতি নির্ণয়ের জন্য একটি সূচক ব্যবহার করা হয়। ইহাই তির্যকতা পরিমাপের সূত্র ঃ

$$\text{তির্যকতা (SK)} = \frac{৩ (\text{গড়} - \text{মধ্যক})}{\sigma}$$

এখানে, σ = আদর্শ বিচ্যুতি

শতাংশের সাহায্যেও তির্যকতা নির্ণয় করা যায়। এ ক্ষেত্রে সূত্র হলো

$$\text{তির্যকতা (SK)} = \frac{P_{৯০}+P_{১০}}{২} - P_{৫০}$$

খ) কার্টোসিস (Kurtosis)

কোন একটি বন্টনের শীর্ষদেশ স্বাভাবিক বন্টনের তুলনায় কতটা চ্যাপটা বা উঁচু তার একটি পরিমাপ হলো কার্টোসিস। যদি কোন বন্টনের চিত্র স্বাভাবিক বন্টনের তুলনায় বেশি উঁচু হয় তবে সেই বন্টন লেপ্টোকার্টিক (Leptokurtic) বলা হয়। চিত্রে ক চিহ্নিত রেখাটি স্বাভাবিক বন্টনের, ছবির চেয়ে উচ্চশীর্ষ সম্পন্ন। ইহা লেপ্টোকার্টিক, চিহ্নিত রেখাচিত্রটি স্বাভাবিক বন্টনের চেয়ে নিম্নশীর্ষ সম্পন্ন চিত্রটি বা চ্যাপ্ট। ইহাকে প্ল্যার্টিকার্টিক (Platikutic) বলে। স্বাভাবিক বন্টনের চিত্রটি এই দুইটি চিত্রের মাঝামাঝি কার্টোসিসসম্পন্ন, এজন্য ইহাকে মেসোকার্টিক (Mesokurtic) বলা হয়।

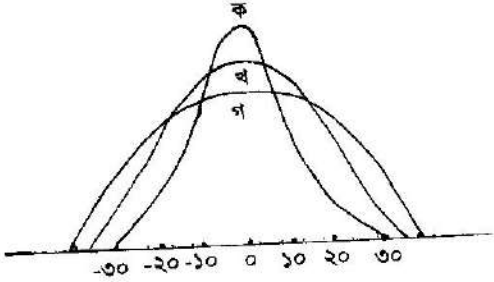

কার্টোসিস নির্ণয়ের সূত্র ঃ

$$K\mu = \frac{Q}{P_{৯০} - P_{১০}}$$

প্রাপ্ত বন্টনের স্বাভাবিক থেকে বিচ্যুতির কারণ

শিক্ষামূলক পরিমাপের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত স্কোরগুলো অনেক সময় স্বাভাবিক নীতি মেনে চলে না। ইহা স্বাভাবিকতা থেকে বিচ্যুতি হতে পারে। যে কোন পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত বন্টনের বিচ্যুতি ঘটার কারণগুলো নিম্নরূপ ঃ

এক. নমুনা দল (Sample) নির্বাচনে ভুল ঃ নমুনা দল নির্বাচন করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। কারণ এ দলের সংখ্যা যদি খুব কম হয় এবং নিম্ন শক্তি সম্পন্ন বা উচ্চ শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি বর্গ নিয়ে গঠিত হয়, তবে এদের প্রাপ্ত স্কোর কখনই স্বাভাবিক বন্টনের রূপ নিবে না। স্বাভাবিক দৃষ্টান্তের হার অনুসরণ করে নমুনা দলের যাচাই নির্ভুল করতে হবে।

দুই. অভীক্ষার প্রয়োগ ও স্কোরিংজনিত ভুল ঃ অভীক্ষার প্রয়োগ ও স্কোরিং পদ্ধতি, উপাদান, পরিবেশ ইত্যাদি আদর্শায়িত করা না হলে বন্টনের তির্যকতা ও কার্টেসিস দেখা দিতে পারে। আদর্শায়িত অভীক্ষার প্রয়োগ ও স্কোরিং নিয়ম মেনে চলবে যে কোন অভীক্ষার প্রয়োগজনিত ভুল কমে যায়। তবে একেবারে দূর করা যায় না।

তিন. অভীক্ষার গঠন ঘঠিত ভুল ঃ অভীক্ষাটি গঠন করার সময় শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার প্রতি নিখুঁত সমভাবাপন্ন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে ইহা তৈরি করতে হবে। তা না হলে অভীক্ষাটি শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার তুলনায় অতি সহজ বা অতি কঠিন হলে প্রাপ্ত স্কোরের বন্টন স্বাভাবিক হবে না। অভীক্ষার সহজ বা কঠিন সমস্যাগুলোর সংখ্যা সংযোজন এমন ভাবে করতে হবে যাতে করে প্রাপ্ত স্কোর মালা স্বাভাবিক বন্টনে পরিণত হয়।

স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্রের বৈশিষ্ট্য

গাণিতিক মডেলের চিত্রগত রূপই স্বাভাবিক বন্টনের লেখচিত্র। চিত্রের আকৃতিগত আয়তনের পার্থক্য থাকলেও চিত্রগুলোর কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

ক) স্বাভাবিক বন্টনের লেখচিত্রটির আকৃতি একটি উপুড় করা ঘন্টার মত।

খ) স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্রের একটি চরম উচ্চতা থাকে ইহার X- অক্ষরেখার মান বাড়ার সাথে সাথে Y- অক্ষরেখার মানও বাড়তে থাকে। একটি চরম অবস্থায় আসার পর আবার কমতে থাকে।

গ) স্বাভাবিক বণ্টনের লেখচিত্রটির মধ্যে অক্ষ (Middle axis) সরাসরি সমপাতিত হয়। বণ্টনের গড় ও মধ্য অক্ষের পাদ বিন্দু পরস্পর মিলে যায়।

ঘ) স্বাভাবিক বণ্টনের গড় Mean) মধ্যক, (Median) ও প্রচুরকের (Mode) মান পরস্পর সমান হয়। লেখচিত্রের মধ্য অক্ষের পাদবিন্দুতে তাদের অবস্থান থাকে।

ঙ) স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্রটি অসীম। এ চিত্রটি মূল অক্ষের ছেদ বিন্দু থেকে ধীরে ধীরে X- অক্ষের দিকে নেমে আসে বটে, কিন্তু ইহা কখনও X- অক্ষ রেখাকে স্পর্শ করে না।

চ) স্বাভাবিক বণ্টনের লেখাচিত্রটি অসীম হলেও প্রায় ৯৯.৭% স্কোর (M+3σ) এর মধ্যে অবস্থান করে। একারণেই গাণিতিক তুলনা করা সহজ ও সঙ্গতিপূর্ণ পদক্ষেপ বলে বিবেচিত।

ছ) স্বাভাবিক বণ্টনের লেখচিত্রের একটি সাধারণ ও তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো X- - অক্ষের দুই বিন্দুর অন্তর্গত ক্ষেত্রফল সব সময় স্থির থাকে।

জ) স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো উহার বিস্তার ও উচ্চতার মধ্যে একটি আনুপাতিক সম্পর্ক সব সময় বজায় থাকে।

স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্রের ব্যবহার

আধুনিক পরিমাপ ও মূল্যায়নের বিভিন্নক্ষেত্রে স্বাভাবিক বণ্টনের লেখচিত্রের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। ইহার সাহায্যে শিক্ষামূলক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এবং বিভিন্ন দিক থেকে শিক্ষামূলক তথ্যের তাৎপর্য নির্ণয় করা যায়। নিম্নে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ ও উপযোগিতার বর্ণনা দেয়া হলো ঃ

১। অল্পসংখ্যক নমুনা দলের সীমাবদ্ধ পরিমাপ থেকে অনেক বেশি সংখ্যক জন সমষ্টির পরিমাপ সম্বন্ধে দেয়া স্বাভাবিক বণ্টনের লেখচিত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বিস্ময়কর প্রয়োগ।

২। স্বাভাবিক বণ্টনের নিয়মাবলী মানুষের বিভিন্ন দৈহিক, মানসিক ও শিক্ষাগত বৈশিষ্ট্যের পরিমাপসমূহ সঠিকভাবে নির্ণয় করতে সাহায্য করে।

৩। শিক্ষাগত পরিমাপের বা পরীক্ষার প্রশ্ন পত্রের কাঠিন্য মূল্য (Difficulty value) স্বাভাবিক বণ্টনের লেখচিত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা হয়।

১ মূল্যায়ন ও পরিমাপের বিবিধ উপায়সমূহের মধ্যে কোন কোন বিশেষ পরিমাপ প্রণালী কতটা নির্ভরযোগ্য তা নির্ণয় করার জন্য স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্র ব্যবহার করতে হয়।

২ শিক্ষামূলক বা মনোবিজ্ঞানিক অভীক্ষা স্বাভাবিক বণ্টনের লেখচিত্রের সাহায্যে আদর্শায়িত করা হয়। ইহা যে কোন অভীক্ষার অন্তর্ভুক্ত প্রশ্নগুলোর আভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য (Internal Consistency) ঠিক করে দেয়।

৩ বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক পরিমাপের ক্ষেত্রেও স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্র একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। প্রাচীনকাল হতেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে দিগন্তের আলোর প্রতিসরণে চিত্রসহ ধ্রুব নক্ষত্র মহাকাশে অন্যান্য তারকার অবস্থান নির্ণয়ের জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়।

৪ যে সকল সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বন্টন স্বাভাবিক বন্টনের লেখচিত্রের আকৃতিকে অনুসরণ করে সেগুলি নিম্নরূপ ঃ

ক) জীবতত্ত্বমূলক পরিমাপ ঃ দেশ ও কাল ভেদে নারী পুরুষের জন্মের হার, বিভিন্ন শ্রেণির প্রাণী ও গাছপালার অনুপাত।

খ) মানবতত্ত্বমূলক পরিমাপ তথ্যাদি ঃ উচ্চতা, ওজন, সমবয়সী ব্যক্তিদের মস্তিষ্কের আয়তনের অনুপাত।

গ) অর্থনৈতিক ও সামাজিক তথ্যাদি ঃ অপরিবর্তনীয় পারিপার্শ্বিক বা পরিবেশিক অবস্থায় জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহের হার। অথবা একই পেশায় নিয়োজিত কর্মীদের বেতন ও তাদের উৎপাদনের অনুপাত।

ঘ) মনোবৈজ্ঞানিক পরিমাপ ঃ বুদ্ধির মাত্রা, আগ্রহ, মনোভাব ও উপলব্ধি বিস্তার অনুষঙ্গ গঠনের দ্রুততার হার বানান, গণিত, গঠন অভিনয় ইত্যাদি শিক্ষামূলক বিষয়ে অভীক্ষার স্কোর।

ঙ) পর্যবেক্ষণের ভুল (Errors of observations) ঃ পরিমাপে ভুল সংঘটিত হওয়া খুবই সাধারণ ব্যাপার। যেমন একটি ব্ল্যাক বোর্ডের ক্ষেত্রফল বের করার জন্য যদি উহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ ১০০ বার মাপা হয়। তবে দেখা যাবে যে, নিছক মাপার ত্রুটির জন্য কিছু কিছু মাপে বেশ পার্থক্য রয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রকৃত দৈর্ঘ্য থেকে প্রত্যেকটি মাপের বিয়োগফলই হবে পরিমাপের ভুল। প্রাপ্ত ভুল গুলোতে বন্টনের আকারে সাজালে সেটি স্বাভাবিক বন্টনের চিত্ররূপ হবে। এ তথ্যটি আধুনিক মূল্যায়ন ও পরিমাপের উপায় সমূহের অধিকতর নির্ভরযোগ্য করতে সাহায্য করছে।

অনুশীলনী ৪.১০

১। স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্র বলতে কি বুঝেন? চিত্রের সাহায্যে বুঝিয়ে দিন।

২। স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?

৩। সম্ভাবনার মৌলিক নীতি কি? সম্ভাবনার অনুপাত বলতে কি বুঝেন? সম্ভাবনার সূত্রটি বর্ণনা করুন।

৪। মুদ্রার উৎক্ষেপনের পরীক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে স্বাভাবিক সম্ভাবনার চিত্র অঙ্কন করুন।

৫। একটি শোভনতম স্বাভাবিক বন্টনের চিত্র অঙ্কন করুন।

শ্রেণি ব্যবধান (i)	১৬-২০	২১-২৫	২৬-৩০	৩১-৩৫	৩৬-৪০	৪১-৪৫	৪৬-৫০
পৌনঃপুন্য (f)	৪	১১	১৭	২২	১৬	১৩	৩

৬। স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্রের প্রয়োগ ক্ষেত্রগুলোর বর্ণনা দিন।

৭। স্বাভাবিক বন্টন থেকে প্রাপ্ত বন্টনের বিচ্যুতির কারণগুলো কি কি?

সহ-সম্পর্ক (Correlation)

এক বা একাধিক ব্যক্তিগত বা দলগত পরিমাপের পৃথক তাৎপর্য কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ বা বিষমতার পরিমাপের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। তা সত্ত্বেও শিক্ষামূলক বা মনোবৈজ্ঞানিক পরিমাপের ক্ষেত্রে আর একটি দিক থেকে তথ্যগুলোকে বিচার না করলে ব্যক্তির অনেক পরস্পর সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্যাবলী জানা যায় না। এভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে কোন বিশেষ বিষয়ের পারদর্শিতা অন্য বিষয়ের পারদর্শিতার সঙ্গে কি ধরনের সম্পর্কযুক্ত হতে পারে তা শিক্ষামূল্যায়ন ও পরিমাপের আধুনিক কর্মকাণ্ডে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। এক কথায় ব্যক্তির সার্বিক কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ঘটানোর জন্য যে কোন শিক্ষককেই এ রকম দ্বিমুখী পরস্পর সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্যাবলীর প্রকৃত স্বরূপটি বের করে নেয়া দরকার হয় প্রকৃতপক্ষে যে কোন ব্যক্তির দুটি গুণের মধ্যে এমন একটা সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রয়োজন যা এক বিষয়ের পারদর্শিতা থেকে অন্য বিষয়ের কতটা থাকতে পারে সে সম্পর্কে ভবিষ্যৎ ধারনা দেয়া সম্ভব হবে। দুটি বিভিন্নধর্মী বস্তু ঘটনা বা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যে সম্পর্ক এর কারণে একটির পরিবর্তনের জন্য অন্যটিরও পরিবর্তন ঘটে, এ জাতীয় ঘটনাকে সহ-সম্পর্ক বলা হয়। তিন প্রকারের সহ-সম্পর্ক (Correlation) হতে পারে। যথা ঃ-

১। সমমুখী বা ধনাত্মক (Positive) ২) বিপরীত বা ঋণাত্মক (Negative) এবং ৩) প্রভাব শূণ্য (Indifferent)।

১। সমমুখী বা ধনাত্মক সহ-সম্পর্ক ঃ সমমুখী বা ধনাত্মক সহ-সম্পর্ক নানাবিধ উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন মানুষের দেহের উত্তাপ বাড়তে থাকলে একইভাবে থার্মোমিটারের পারদের উচ্চতা বাড়তে থাকবে। এখানে মানুষের দেহ ও পারদের সাথে সম্পর্ক দেহের উত্তাপ বাড়লে পারদের উচ্চতা বাড়ে, আবার দেহের উত্তাপ কমলে, পারদের উচ্চতা কমে। তাপ মাত্রা উভয়ের মধ্যে সমমুখী বা ধনাত্মক সম্পর্ক বজায় রাখতে। ইহা ধনাত্মক সহ-সম্পর্ক।

২। বিপরীত বা ঋণাত্মক সহ-সম্পর্ক এখানে পদার্থ নিয়ে উদাহরণ দেখা যায়। চাপ বাড়লে উহার আয়তন কমে, আর চাপ কমলে আয়তন বাড়ে। এ ক্ষেত্রে একটি বাড়লে অপরটি কমে। ইহা ঋণাত্মক সহসম্পর্ক।

৩। প্রভাব শূন্য (Indifferent) সহ-সম্পর্ক ঃ দেশে অতি বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু ছাত্ররা রীতিমত বিদ্যালয়ে যাচ্ছে বা পড়াশুনা করছে। অতি বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির প্রভাব ছাত্রদের পড়াশুনার উপর সরাসরি পড়ছে না। এহচ্ছে প্রভাব শূন্যতার সম্পর্ক। ইহাকে প্রভাব শূন্য সহ-সম্পর্ক বলা হয়।

সহ-সম্পর্কের মান (Co-efficient of Correlation) ঃ পরিসংখ্যান শাস্ত্রে একটির মধ্যে কোন এক প্রকার পরিবর্তন দেখা দিলে অপরটির মধ্যেও সঙ্গে সঙ্গে যে পরিবর্তন ঘটে, এ সহ-সম্পর্কের মানকে সহগাঙ্ক বা অনুবন্ধ সহগ (Co-efficeient of Correlation) বলে। সংক্ষেপে ইহাকে r অক্ষর দিয়ে প্রকাশ করা হয়। সহগাঙ্ক বা অনুবন্ধ সহগ হলো সম্পর্কের পরিবর্তনের একটি অনুপাত। যতটা সম্পর্ক থাকে ঠিক ততটা সম্পর্কের পরিমাণই সহগাঙ্ক বা অনুবন্ধ সহগ হবে। এ পরিবর্তনের পরিমান বিভিন্ন মানের হতে পারে। একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য যতবার কমান বা বাড়ান হলো, ঠিক ততবারই বৃত্তের পরিধি কমবে বা বাড়বে। বৃত্তের পরিধি ব্যাসের দৈর্ঘ্যের সব সময়ই তিনগুণের কিছু বেশি হয়ে থাকে। এ অনুপাত (২২ঃ৭) কখনও বদলাবে না। অতপর, একটি বৃত্তের ব্যাস এবং পরিধির মধ্যে সহপরিবর্তনকে নিখুঁত বা সম্পূর্ণ (Perfect) সহ-সম্পর্ক। সব ধরনেরক্ষেত্রে সহ-সম্পর্ক মান r= ১.০০ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যখন এ অনুপাতটি অসমান হয়। তখন সহ-সম্পর্ক বলা হয় অসম্পূর্ণ (Imperfect) আবার যেখানে দুইটি ঘটনার মধ্যে কোন পরিবর্তনগত সম্বন্ধ নেই, অর্থাৎ একটির মধ্যে পরিবর্তন হলে অপরটির ক্ষেত্রে কোন ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না। সে রকম সহ-সম্পর্কের মান বা r = 0 (শূন্য)। আর উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করা যায়। কোন শ্রেণিতে একজন ছাত্র সব পরীক্ষাগুলোতেই বাংলাতে প্রথম স্থান অধিকার করে। কিন্তু গণিতে তার নম্বরের অবস্থান হলো সর্বশেষ তা, হলে এ ক্ষেত্র হচ্ছে পরিপূর্ণ ঋণাত্মক বা r = - ১.০০। সহ-সম্পর্কের মান + ১.০০০ থেকে -১.০০ এ দুই চরম প্রান্তের মধ্যে যে কোন একটি স্থানে থাকতে পারে। এর পরিমাণ ও প্রকৃতি বিভিন্ন হতে পারে। নিম্নে প্রদত্ত তালিকা থেকে কি জাতীয় (কম, বেশি না মাঝারী) সহগাঙ্ক হবে তা যাচাই করা যাবে।

বিভিন্নমানের অনুবন্ধ সহগ

r এর স্বরূপ	r এর মানের নিম্ন প্রান্ত বা সীমা	r এর মানের উচ্চ প্রান্ত বা সীমা	r এর মান সম্পর্কে মন্তব্য
১।	+ ০০ - (শূন্য)	+ ০.২০ -	উদাসীন (Indiffinent)
২।	± ০.২০	± ০.৪০	খুব কম (Slight)
৩।	± ০.৪০	± ০.৭০	উল্লেখযোগ্য (Remarkable)
৪।	± ০.৭০	± ০.৯০	উচ্চ (High)
৫।	± ০.৯০	± ১.০০	অত্যন্ত উচ্চ বা সর্বোচ্চ (Highest)

সহ-সম্পর্কের মান বা r নির্ণয়

সহ-সম্পর্কের মান বা r সাধারণত নিম্নোক্ত দুটি পদ্ধতির সাহায্যে নির্ণয় করা হয়।

১। পিয়ারসনের প্রোডাক্ট মোমেন্ট পদ্ধতি (Pearson Product Moment Method)

২। সারি পার্থক্যের পদ্ধতি ঃ- (Rank Difference Method)

১। প্রোডাক্ট মোমেন্ট পদ্ধতি (Product Moment Method) সহ-সম্পর্কের মান বা r নির্ণয় করার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও প্রচলিত পদ্ধতিটি হলো Product Moment পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে r বলতে দুটি স্কোরগুচ্ছের মধ্যে এমন একটি পারস্পরিক সম্বন্ধ বুঝায় যেখানে একটির পরিবর্তন হলে অপরটিরও পরিবর্তন হবে। এ সকল পরিবর্তনকে একটি সরল রেখার সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। যে সরল রেখার সংখ্যা হচ্ছে - ১·০০ থেকে শুরু করে ০·০০ হয়ে + ১·০০ পর্যন্ত।

প্রোডাক্ট মোমেন্ট পদ্ধতিতে r নির্ণয়ের সূত্রটি হলো ঃ

$$r = \frac{\Sigma xy}{N\sigma x\sigma y}$$

এখানে, r = x এবং y এর মধ্যে সহ-সম্পর্ক,

χ = x অভীক্ষার গড় থেকে যে কোন

x স্কোরের বিচ্যুতি বা $x - M = \chi$ ।

y =y অভীক্ষার গড় থেকে যে কোন y স্কোরের বিচ্যুতি বা $y - m = y$

Σxy = সকল গড় থেকে বিচ্যুতিদ্বয়ের গুণফলের (xy) মোট সমষ্টি।

$\sigma\chi$ = x স্কোরের আদর্শবিচ্যুতি,

σy = y স্কোরের আদর্শ বিচ্যুতি

এবং N = স্কোরের মোট সংখ্যা।

প্রোডাক্ট মোমেন্ট পদ্ধতিতে সহ-সম্পর্কের মান নির্ণয়ের কয়েকটি স্তর এখানে বর্ণনা করা হলো।

১। X এবং Y স্কোরগুচ্ছদ্বয়ের পাশপাশি দুটি স্তম্ভ সাজাতে হবে। প্রত্যেক অভীক্ষার্থীর X স্কোরের বরাবরে ঠিক তার Y স্কোর বসাতে হবে এবং উহাদের গড় বের করতে হবে।

২। এরপর প্রতিটি X স্কোরের এবং প্রতিটি Y স্কোরের গড় থেকে বিচ্যুতি বের করতে হবে। অর্থাৎ $\chi = X - M$ এবং $y = Y - M$ বের করতে হবে, এ দুটি স্তরের যোগফল Σx ও Σy সব সময়েই 0 (শূন্য) হবে।

৩। প্রতিটি স্কোরের গড় থেকে প্রাপ্ত বিচ্যুতির বর্গ করতে হবে দুটি স্তম্ভে χ^2 এবং y^2 পাশাপাশি লিখতে হবে।

৪। বিচ্যুতিগুলোর বর্গগুলো যোগ করে নিতে অর্থাৎ Σx^2 এবং Σy^2 বের করতে হবে।

৫। σx এবং σy নির্ণয় করতে হবে। $\sigma x = \sqrt{\frac{\Sigma x^2}{N}}$ এবং $\sigma y = \sqrt{\frac{\Sigma y^2}{N}}$

৬। X এবং Y গুণ করে প্রত্যেক অভীক্ষার্থীর xy বের করতে হবে। এগুলোর সমষ্টি Σxy নির্ণয় করতে হবে।

৭। এরপর উপরে বর্ণিত সূত্রে Σxy, N, σx এবং σy মান বসিয়ে নির্ণয় করতে হবে।

উদাহরণ ঃ ১

৭ জন ছাত্রের বাংলা ও গণিতে নম্বর নিম্নে দেয়া আছে। এদুটি স্কোরগুচ্ছের প্রোডাক্ট মোমেন্ট পদ্ধতিতে সহসম্পর্কের মান নির্ণয় করুন।

ছাত্র	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ
বাংলা	৪২	৫৯	৩৬	৪০	৩৮	৩৩	৫২
গণিত	৬০	৫৫	৪০	৭০	৭৫	৪২	৭৮

ছাত্র	বাংলা বিষয়ের x স্কোর	গণিত বিষয়ের y স্কোর	গড় বিচ্যুতি χ	গড় থেকে বিচ্যুতি y	χ^2	y^2	χy
ক	৪২	৬০	২	০	৪	০	০
খ	৩৯	৫৫	-১	-৫	১	২৫	৫
গ	৩৬	৪০	-৪	-২০	১৬	৪০০	৮০
ঘ	৪০	৭০	০	১০	০	১০০	০
ঙ	৩৮	৭৫	-২	-১৫	৪	২২৫	-৩৭
চ	৩৩	৪২	-৭	-১৮	৪৯	৩২৪	২১৬
ছ	৫২	৭৮	১২	১৮	১৪৪	৩২৪	২১৬
N = ৭,	Σx = ২৮০	Σy = ৪২০	$\Sigma x=0$	$\Sigma y=0$	$\Sigma\chi^2$ = ২১৮	Σy^2 = ১৩৯৮	$\Sigma\chi y$ = ৩৯৭

$$M\chi = \frac{\Sigma\chi}{N} = \frac{২৮০}{৭} = ৪০$$

$$My = \frac{\Sigma y}{N} = \frac{৪২০}{৭} = ৬০$$

$$\sigma\chi = \sqrt{\frac{\Sigma\chi^2}{N}} = \sqrt{\frac{২১৮}{৭}} = \sqrt{৩১\cdot১৪} = ৫\cdot৬$$

$$\sigma y = \sqrt{\frac{\Sigma y^2}{N}} = \sqrt{\frac{১৩৯৮}{৭}} = \sqrt{১৯৯\cdot৭১} = ১৪\cdot১$$

নির্ণেয় সহ-সম্পর্কের মান

$$r = \frac{\Sigma\chi y}{N\sigma\chi\sigma y} = \frac{৩৯৭}{৭\times৫\cdot৬\times১৪\cdot১} = \frac{৩৯৭\times১০\times১০}{৭\times৫৬\times১৪১} = ০\cdot৭১$$

উদাহরণ ঃ ২

দশজন পরীক্ষার্থীর বাংলা ও বিজ্ঞানের দুটি স্কোরগুচ্ছ নিম্নে বর্ণিত ছকে দেয়া আছে, এদের প্রোডাক্ট মোমেন্ট পদ্ধতিতে সহসম্পর্ক নির্ণয় করুন।

পরীক্ষার্থী	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
বাংলা	৪৩	৪২	৪০	৪০	৩৮	৩৬	৩৬	৩৫	৩৩	৩২
বিজ্ঞান	৫১	৫৪	৫১	৪৭	৪৯	৫১	৪৩	৪৭	৪৬	৪১

উত্তর ঃ

শিক্ষার্থী	বাংলা বিষয়ের স্কোর x	বিজ্ঞান বিষয়ের স্কোর y	স্কোরের গড় থেকে বিচ্যুতি χ	স্কোরের গড় থেকে বিচ্যুতি y	χ^2	y^2	χy
ক	৪৩	৫১	৫.৫	৩	৩০.২৫	৯	১৬.৫
খ	৪২	৫৪	৪.৫	৬	৬.২৫	৩৬	২৭.০
গ	৪০	৫১	২.৫	৩	৬.২৫	৯	৭.৫
ঘ	৪০	৪৭	২.৫	-১	৬.২৫	১	- ২.৫
ঙ	৩৮	৪৯	০.৫	+১	০.২৫	১	০.৫
চ	৩৬	৫১	- ১.৫	- ৩	২.২৫	১	- ৪.৫
ছ	৩৬	৪৩	- ১.৫	- ৫	২.২৫	৯	৭.৫
জ	৩৫	৪৭	২.৫	- ১.৫	- ৬.২৫	১	২.৫
ঝ	৩৩	৪৬	- ৪.৫	- ২	২০.২৫	৪	৯০
ঞ	৩২	৪১	- ৫.৫	- ৭	৩০.২৫	৪৯	৩৯৫
N = ১০	Σx	Σy	$\Sigma \chi$	Σy	$\Sigma \chi^2$	$\Sigma y2$	$\Sigma \chi y$
	= ৩৭৫,	= ৪৮০,	= ০·০,	= ০·০	= ১২৪·৫০	= ১৪৪	= ১০২·০

$$M\chi = \frac{\Sigma \chi}{N} = \frac{৩৭৫}{১০} = ৩৭·৫$$

$$My = \frac{\Sigma y}{N} = \frac{৪৮০}{১০} = ৪৮·০$$

$$\sigma\chi = \sqrt{\frac{\Sigma \chi^2}{N}} = \sqrt{\frac{১২৪·৫০}{১০}} = \sqrt{১২·৪৫০} = ৩·৫৩$$

$$\sigma y = \sqrt{\frac{\Sigma y^2}{N}} = \sqrt{\frac{১৪৪}{১০}} = \sqrt{১৪.৪} = ৩·৭৯$$

$$\text{নির্ণেয় } r = \frac{\Sigma \chi y}{N \sigma\chi \sigma y} = \sqrt{\frac{১০২০}{১০ \times ৩.৫৩ \times ৩.৭৯}} = \frac{১০২·০}{১৩৩·৯০} = ০·৭৬$$

একটি বিকল্প সূত্র ঃ (An Alternative Formula) ।

$\sigma\chi$ এবং σy নির্ণয় না করে সরাসরি χy এবং χ^2 ও y^2 নির্ণেয় করে r = নির্ণয় করা যায়। সূত্রটি হলোঃ $r = \frac{\Sigma \chi y}{\sqrt{(\Sigma \chi^2)(\Sigma y^2)}}$

$$r = \frac{\Sigma \chi y}{\sqrt{(\Sigma \chi^2)(\Sigma y^2)}} = \frac{৩৯৭}{\sqrt{২১৮ \times ১৩৯৮}} = \frac{৩৯৭}{৫৫২.৬} = \frac{৩৯৭০}{৫৫২৬} = ০·৭১$$

উদাহরণ - ২ এর সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা হলো,

$$r = \frac{\Sigma xy}{\sqrt{(\Sigma x^2)(\Sigma y^2)}} = \frac{১০২.০}{\sqrt{১২৪.৫০ \times ১৪৪}} = \frac{১০২.০}{\sqrt{১৭৯২৮.০}}$$

$$= \frac{১০২.৩}{\sqrt{১৭৯২৮.০}} = \frac{১০২}{\sqrt{১৭৯২৮}} = \frac{১০২}{১৩৩.৯}$$

$$= \frac{১০৩০}{১৩৩৯} = ০.৭৬$$

উপরের সমাধানকৃত দুটি উদাহরণ এর মাধ্যমে দেখানো হল যে, বিকল্প সূত্র অনুযায়ী r এর নির্ণেয় ফলাফল প্রোডাক্ট মোমেন্ট পদ্ধতি থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের মধ্যে কোন তফাৎ নেই।

২। সারি পার্থক্যের পদ্ধতিঃ (Rank Difference Method)

শিক্ষাক্ষেত্রে বা মনোবিজ্ঞানে কতকগুলো মান থাকে যেগুলোকে সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। ব্যক্তিত্ব, বিচারকরণ ক্ষমতা, স্মৃতিশক্তি ইত্যাদি মানুসিক গুণাবলিকে পদ বা Rank অনুযায়ী সাজানো যায়। এসব ক্ষেত্রে প্রোডাক্ট মোমেন্ট পদ্ধতি মোটেই ব্যবহার করা চলে না। আবার নমুনা স্কোরের সংখ্যা ৩০ বা তার কম থাকলে একটি সহজতর পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। এটিকে সারি পার্থক্যের পদ্ধতি (Rank Difference Method) বলে। স্পিয়ারম্যান (Spearman) এ সহ-সম্পর্ক পদ্ধতিটির আবিষ্কারক। এ পদ্ধতিটির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল যে এটিতে প্রোডাক্ট মোমেন্টের মত জটিল গাণিতিক গণনা করার প্রয়োজন হয় না। অতি সহজ পন্থায়ই সহ-সম্পর্কের মান নির্ণয় করা যায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে স্কোরের পরিবর্তন বা সারিতে নমুনাগুলো বা দৃষ্টান্তগুলো সাজানো থাকে সেখানে এ পদ্ধতির প্রয়োগ আরো সহজ হয় কারণ এ পদ্ধতিতে সহ-সম্পর্ক নির্ণয় করার সময় নমুনা বা দৃষ্টান্ত লিখে আগেই Rank বা সারিতে সাজিয়ে নিতে হয়। একেই সারিবিন্যাস বা Ranking বলে। এর ব্যাখ্যা হল যে, সব চেয়ে বেশি স্কোর অর্জন করেছে তার সারি হবে ১, তার পরের আয়তন বিশিষ্ট স্কোর যে পাবে তার সারি হবে ২, তৃতীয় আয়তন বিশিষ্ট স্কোর যে পেয়েছে তার সারি হবে ৩ ইত্যাদি। এভাবে দুটি বিভিন্ন স্কোরগুচ্ছের ক্ষেত্রেই পরীক্ষার্থীর r নির্ণয় করা হয়। এ ক্ষেত্রে প্রথম সারিকে R। এবং দ্বিতীয় সারিকে R_2 দিয়ে প্রকাশ করা হয়। প্রথম সারি দুটির পার্থক্য ($R_1 - R_2$) কে d দিয়ে নির্ণয় করা হয়। প্রথম সারির স্কোর যদি দ্বিতীয় সারির স্কোরের চেয়ে বড় হয় ($R_1 > R_2$) তবে d হবে ধনাত্মক। এ অবস্থার বিপরীত ক্ষেত্রে অর্থাৎ ($R_1 < R_2$) d হবে ঋণাত্মক। d সারিতে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক মানগুলোর সমষ্টি শূন্য (০) হবে। এরপর প্রত্যেক d কে বর্গ করে (d^2) নিতে হবে। d^2 এর সমষ্টি

$\sum d^2$ বের করতে হবে। সারি পার্থক্যের পদ্ধতির মাধ্যমে সহ-সম্পর্কের মানকে গ্রীক অক্ষর ρ (রো) দিয়ে প্রকাশ করা হয়। ρ (রো) নির্ণয়ের সূত্রটি হলো,

$$\rho = ১ - \frac{৬ \times \sum d^2}{N(N^2-১)}$$

এখানে ρ ঃ সারি পার্থক্যমূলকসহ পরিবর্তন

d = প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর দুটি স্কোরকে সারিতে রূপান্তরিত করে তাদের পার্থক্য,

N = মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা।

উদাহরণ ঃ ১ কে সারি পার্থক্যের পদ্ধতিতে আবার সহ-সম্পর্কের মান নির্ণয় করা হলো।

ছাত্র	বাংলা বিষয়ের স্কোর X	গণিত বিষয়ের স্কোর Y	R_1	R_2	$R_1 - R_2 = d$	d^2
ক	৪২	৬০	২	৪	- ২	৪
খ	৩৯	৫৫	৪	৫	- ১	১
গ	৩৬	৪০	৬	৭	- ১	১
ঘ	৪০	৭০	৩	৩	- ০	০
ঙ	৩৮	৭৫	৫	২	৩	৯
চ	৩৩	৪২	৫	৬	১	১
ছ	৩২	৭৮	১	১	০	০
	৭				$\sum d = 0$,	$\sum d^2 = ১৬$

নির্ণেয় $\rho = ১ - \frac{৬ \times \sum d^2}{N(N^2-১)}$ এখানে

$= ১ - \frac{৬ \times ১৬}{৭(৭^২ - ১)}$ $N = ৭$

$= ১ - \frac{৬ \times ১৬}{৭(৪৯ - ১)}$ $\sum d^2 = ১৬$

$= ১ - \frac{৬ \times ১৬}{৭ \times ৪৮}$

$= ১ - \frac{৬ \times ১}{৭ \times ৩} = ১ - \frac{৬২ \times ১}{৭ \times ৩} = \frac{৭ - ২}{২} = \frac{৫}{৭} = ০\cdot৭১$

উদাহরণ ঃ ৩

ক) নিম্নের ছক দুটি নির্ণয় করুন।

পরীক্ষার্থী	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
বাংলা	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯
গণিত	৬০	৫৫	৬৩	৫৬	৫৮	৬৪	৬১	৬২	৫৭	৫৯

(খ)

পরীক্ষার্থী	রকিব	মতিন	জোসেপ	মিজান	মানিক	হামিদ	তৌহিদ
বাংলা	৪৬	৫০	৪৮	৪৪	৪৪	৪৪	৪৩
বিজ্ঞান	৬২	৫৪	৫৮	৫৬	৬০	৬০	৬২

উত্তর ঃ ৩ (ক)

পরীক্ষার্থী	বাংলা বিষয়ের স্কোর	গণিত বিষয়ের স্কোর	প্রথম	দ্বিতীয়	সারি পার্থক্য	
	x	y	R_1	R_2	$d = R_1 - R_2$	d^2
ক	৪০	৬০	১০	৫	৫	২৫
খ	৪১	৫৫	৯	১	- ১	১
গ	৪২	৬৩	৮	২	৬	৩৬
ঘ	৪৩	৫৬	৭	৯	- ২	৪
ঙ	৪৪	৫৮	৬	৭	- ১	১
চ	৪৫	৬৪	৫	১	৪	১৬
ছ	৪৬	৬১	৪	৪	০	০
জ	৪৭	৬২	৩	৩	০	০
ঝ	৪৮	৫৭	২	৮	- ৬	৩৬
ঞ	৪৯	৫৯	১	৬	- ৫	২৫

$N = ১০$ $\sum d = 0$ $\sum d^2 = ১৪৪$

নির্ণেয় $\sigma = ১ - \frac{৬ \times \sum d^2}{N(N^2-১)}$ এখানে

$= ১ - \frac{৬ \times ১৪৪}{১০(১০^২ - ১)}$ $N = ১০$

$= ১ - \frac{৬ \times ১৪৪}{১০ \times ৯৯}$ $\sum d^2 = ১৪৪$

$= ১ - \frac{৮৬৪}{৯৯০}$

$= \frac{৯৯০ - ৮৬৪}{৯৯০} = \frac{১২৬}{৯৯০} = ০·১৩$

উত্তর ঃ ৩ (খ)

শিক্ষার্থী	বাংলা বিষয়ের স্কোর x	বিজ্ঞানের স্কোর y	সারি R_1	সারি R_2	পার্থক্য d	d^2
রকিব	৪৬	৬২	৩	১.৫	১.৫	২.২৫
মতিন	৫০	৫৪	১	৭	- ৬	৩৬.০০
যোসেফ	৪৮	৫৮	২	৫	- ৩	৯.০০
মিজান	৪৪	৫৬	৫	৬	- ১	১.০০
মানিক	৪৪	৬৭	৫	৩.৫	১.৫	২.২৫
হামিদ	৪৪	৬০	৫	৩.৫	১.৫	২.২৫
তৌহিদ	৪৩	৬২	৭	১.৫	৫.৫	৩০.২৫

$N = ৭$ $\sum d=0$ $\sum d^2=৮৩$

নির্ণেয় $\sigma = ১ - \frac{৬ \times \sum d^2}{N(N^2-১)}$ এখানে

$= ১ - \frac{৬ \times ৮৩}{৭(৭^২ - ১)}$ $N = ৭$

$= ১ - \frac{৬ \times ৮৩}{৭ \times ৪৮} = ১ - \frac{৮৩}{৫৬}$ $\sum d^2 = ৮৩$

$= - \frac{৫৬ - ৮৩}{৫৬} = \frac{-২৭}{৫৬} = - ০·৪৮$

সহ-সম্পর্কের মানের সংব্যাখ্যান
(Interpretation of the Co-efficinat of Correlation)

দু'টি বিষয়ের অভীক্ষা থেকে প্রাপ্ত স্কোরের ভিত্তিতে প্রাপ্ত সহ-সম্পর্কের বিভি মানকে যথাক্রমে উদাসীন বা উপেক্ষণীয়, খুব কম বা নিম্নস্তর, উল্লেখযোগ্য বা গুরুত্বপূর্ণ উচ্চ ও অতিউচ্চ বা সর্বোচ্চ ইত্যাদি শ্রেণি বিভাগে সাজানো যায়। কিন্তু প্রকৃত অর্থ ব গুরুত্ব নির্ণয় করতে কি ধরনের সহ-সম্পর্কের মানের ব্যাখ্যা দেয়া যায়। এ সম্পর্কে নি আলোচনা করা হল।

১। দু'টি পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্য বা ঘটনার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন পরিবর্তন ঘ কি না তা যাচাই করার জন্য সহ-সম্পর্কের মান বের করার প্রয়োজন। এরূপক্ষে একটির পরিবর্তনের জন্য অন্যটির কি ধরনের পরিবর্তন ঘটে তা নির্ণয় করতে হয়।

২। দু'টি বৈশিষ্ট্য বা ঘটনার মধ্যে একটি জানা সম্পর্ক আছে বটে, কিন্তু সম্পর্কটির মাত্রা কত? তা অবশ্যই নির্ণয় করা প্রয়োজন।

প্রাপ্ত r গ্রহণযোগ্য কিনা

এর কতটা গ্রহণযোগ্য তা নির্ণয়ের তিনটি উপায় ঃ

১। সহ-সম্পর্কের মান বা এর মান আদর্শ ভুল (Standard error) বের করে নি বিবেচনা করতে হবে যে আদর্শ ভুল যতবেশি হবে, তত কম গ্রহণযোগ্য হবে।

r এর আদর্শভুল নির্ণয়ের সূত্র হলো, আদর্শভুল = $\frac{(১ - r^2)}{\sqrt{N}}$

২। মনোবিজ্ঞানী Fisher প্রদত্ত উপায়ে r এর মানকে z এর মানে রূপান্তর ক তার গুরুত্ব বিচার করা।

৩। তৃতীয় উপায়টি হল অনুমিত সিদ্ধান্ত (Null Hypothesis) ধরে নিয়ে প্রাপ্ত এর মান বিচার করা। এখানে প্রাপ্ত r এর মান সত্যিই গাণিতিক পদ্ধতিতে বের ক যাচাই করা হয়, যে উহা প্রকৃতপক্ষে গ্রহণযোগ্য কিনা। প্রাপ্ত r এর মান অধিতকর হ নাস্তি প্রকল্পটি মনে করা হয়, অন্যথায় এর মান গ্রহণ করা হয়।

বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্য ও বুদ্ধির অন্তত r = ০·৭ বা তার বেশী পাওয়া গেলে তাকে গুরুত্বপূর্ণ ধরা ঠিক হবে না। বাংলা ইতিহাসের পরীক্ষার স সম্পর্কের মান ০·৪ থেকে ০·৬ পর্যন্ত থাকলে মোটামোটি নির্ভরযোগ্য হিসাবে যাবে। পিতা মাতার শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যের সহ-সম্পর্কের ০·৩৫ থেকে ০·৫৫ এর মধ্যে পাওয়া যায়। আবার কোন অভীক্ষার নির্ভরশীলতার ০·৬ এর বেশী না হলে তাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা যাবে না। অভীক্ষা পুনরভীক্ষে ক্ষেত্রে সহসম্পর্কের মান ০·৮৫ থেকে ০·৯৫ হওয়া উচিৎ।

সহ-সম্পর্কের ব্যবহার

আধুনিক পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের বিকাশে সহ-সম্পর্ক নির্ণয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে শিক্ষা মূল্যায়ন ও পরিমাপের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহ-সম্পর্ক নির্ণয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহ-সম্পর্কের মান ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

১। দুটি পরিবর্তনশীল বস্তু বা ঘটনার মধ্যে কোনরূপ সম্পর্ক আছে কিনা তা যাচাই করার জন্য সহসম্পর্কের মান নির্ণয় করতে হয়।

২। ভবিষ্যৎ গণনা করার ক্ষেত্রে সহসম্পর্কের মান বের করতে হয়।

৩। আধুনিক অভীক্ষার আদর্শায়নের ক্ষেত্রে সহসম্পর্কের মান নির্ণয় করতে হয়। আদর্শায়িত অভীক্ষার নির্ভরশীলতার মান নির্ণয় করে নিতে হয়।

৪। অভীক্ষার যথার্থায়নের ক্ষেত্রেও সহসম্পর্কের মান বের করতে হয়। অভীক্ষার প্রত্যেকটি পদের বিভেদী করণের মান (Discriminative Value) নির্ণয় করতে সহসম্পর্কের মান বের করতে হয়।

৫। আজকাল প্রতিষ্ঠানের ভর্তি পরীক্ষায় বা চাকুরীতে নিয়োগদানের পরীক্ষায় সহ-সম্পর্ক প্রক্রিয়ার বহুল ব্যবহার প্রচলিত।

অনুশীলনী ৪.১১

১। সহসম্পর্কের মান বলতে কি বুঝেন? ইহা কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

২। সহসম্পর্কের মানের শ্রেণি বিভাগ বর্ণনা করুন।

৩। সহসম্পর্কের মান নির্ণয়ের জন্য কি কি পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়? পদ্ধতিগুলোর সীমাবদ্ধতা আলোচনা করুন।

৪। সহসম্পর্কের মানের ব্যবহারগুলো কি কি? আজকাল ইহা কোন কোন ক্ষেত্রে বহুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৫। সহসম্পর্কের মানের সংব্যাখ্যান বর্ণনা করুন।

৬। শিক্ষাক্ষেত্রে সহসম্পর্কের মানের ব্যবহার উপযোগিতা বর্ণনা করুন।

৭। নিম্নে প্রদত্ত ছকগুলোর প্রোডাক্ট মোমেন্ট পদ্ধতিতে ও ইহার বিকল্প সূত্র ব্যবহার করে সহসম্পর্কের মান নির্ণয় করুন।

(ক) শিক্ষার্থী	ইংরেজী	বাংলা
ক	২৯	৪৯
খ	৫০	৫৫
গ	৬১	৪৮
ঘ	৭৬	৪৩
ঙ	১৭	৪৪
চ	৮০	৩৮
ছ	৬১	৪২
জ	৩২	৫৬
ঝ	৩২	৪৪
ঞ	৫৬	৬৭

(খ) শিক্ষার্থী	গণিত	বিজ্ঞান
করিম	৮৫	৭৭
হাবিব	৮২	৭৭
আসিক	৯১	৮২
নাজিম	৮০	৭৪
আজিম	৭৫	৭০
হারা ধন	৯৫	৮৭
যোসেফ	৮৩	৭৭
অঞ্জন	৮৫	৭৭
নিতাই	৮৮	৮২
আকরাম	৭১	৭১

৮। নিম্ন লিখিত স্কগুলোর সারি পার্থক্য পদ্ধতিতে সহসম্পর্কের মান নির্ণয় করণঃ

(ক) ছাত্র	বাংলা	গণিত
ক	৪২	৭০
খ	৬০	৬৪
গ	৬৫	৭১
ঘ	৫৪	৬৬
ঙ	৫১	৬২
চ	৪২	৬৯
ছ	৭৮	৭৭
জ	৫৬	৬৬
ঝ	৫৪	৬৪
ঞ	৬৩	৮৫

(খ) ছাত্র	গণিত	বিজ্ঞান
ক	৭৫	৭০
খ	৭৮	৭২
গ	৮২	৮০
ঘ	৭৭	৭৫
ঙ	৭৯	৭৩
চ	৮০	৭৬
ছ	৭৬	৭১
জ	৮১	৭১

(গ) ছাত্র	বাংলা	ইতিহাস
ক	৪০	৪২
খ	৪৪	৪৫
গ	৪৬	৫৪
ঘ	৪৯	৪৮
ঙ	৫০	৪৬
চ	৫২	৫০

(ঘ) ছাত্র	গণিত	ভূগোল
ক	৭৬	৫৫
খ	৬২	৫৮
গ	৬০	৩৫
ঘ	৭২	৫৮
ঙ	৫৮	৩৮
চ	৪৪	৪৭

ছ	৫১	৫২	ছ	৪৮	৫০
জ	৫৫	৫০	জ	৪০	৬৮
ঝ	৫৭	৪৮	ঝ	৬৪	৫০
ঞ	৬১	৫৪	ঞ	৮১	৪৮
ট	৬১	৫৪			
ঠ	৬৪	৬০			

(ঙ) ছাত্র	বুদ্ধির স্কোর	স্মৃতির স্কোর	(চ) ছাত্র	বাংলা	সমাজ বিজ্ঞান
ক	১১	৫	ক	২১	৪১
খ	১০	১০	খ	১৬	৪১
গ	১৩	৬	গ	২০	৪৬
ঘ	১২	১৩	ঘ	১৯	৪৩
ঙ	১৫	১৪	ঙ	১৭	৪৫
চ	১৪	৮	চ	২২	৫০
ছ	১৮	৭	ছ	১৮	৪২
জ	১৯	৯	জ	১৫	৪০

অভীক্ষার স্কেলিং পদ্ধতি
(Scaling Procedure of Tests)

আমাদের দেশের প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থা নানারকম ত্রুটি পূর্ণ। এর উন্নতির জন্য বিভিন্ন ধরনের গাণিতিক পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। কোন পরীক্ষণ থেকে সরাসরি প্রাপ্ত কাঁচা নম্বরগুলোর (Raw Score) তুলনামূলক বিচার করা যায় না। সাধারণত বিভিন্ন বিষয়ের স্কোরের বা প্রাপ্ত নম্বরের তাৎপর্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বণ্টনের নীতির উপর ভিত্তি করে এদেরকে স্কেলের আকারে সাজানো প্রয়োজন হয়। শিক্ষামূলক ও মনোবৈজ্ঞানিক পরিমাপের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত স্কোরকে তাদের পরিমাপক একক (Unit of measurement) পরিবর্তন করে সুবিধামত একক ধরে পরিসংখ্যান রীতি সম্মত নতুন মানে পরিবেশন করা হয়। এ কারণেই মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পরিমাপের ক্ষেত্রে সাধারণত চার ধরনের পরিবর্তিত স্কেল ব্যবহার করে থাকেন। স্কেলগুলো হলো ঃ

১। Z স্কোর স্কেল (Z- Score Scale)
২। আদর্শ স্কোর স্কেল (Standard Score Scale)
৩। T স্কেল (T - Scale)
৪। শতাংশ স্কেল (Percentile Scale)

BARDOC

(এক) Z - স্কোর (Z - Score) ঃ

কোন প্রাপ্ত স্কোরকে যখন কোন একটি নির্দিষ্ট গড় (Mean) ও আদর্শ বিচ্যুতি (σ) সম্পন্ন বণ্টনে পরিবর্তন করা হয়, তখন তাকে পরিবর্তিত স্কোর (Derived Score) বলে। Z - স্কোর খুব সহজ ও সরলতম পরিবর্তিত স্কোর। কোন প্রাপ্ত বণ্টনে একটি স্কোর গড়ে কত আদর্শ বিচ্যুতি উপরে বা নিচে অবস্থান করছে তা বুঝানোর জন্যই Z - স্কোর ব্যবহৃত হয়। যেকোন প্রাপ্ত বণ্টনের স্কোর গুলোকে Z স্কোরে পরিবর্তিত করলে Z স্কোরের যে নতুন বণ্টন পাওয়া যায়, তার একটি নির্দিষ্ট গড় (M) এবং আদর্শ বিচ্যুতি σ থাকবে। Z - স্কোরের ক্ষেত্রে গড় ধরা হয় ০ (শূন্য) এবং আদর্শ বিচ্যুতি ধরা হয় ১ (এক)। নিম্নলিখিত সূত্রের সাহায্যে Z - স্কোর বের করা হয়।

$$Z\text{ - স্কোর} = \frac{X-M}{\sigma} = \frac{\text{প্রাপ্ত নম্বর - গড়}}{\text{আদর্শ বিচ্যুতি}} = \frac{\chi}{\sigma}$$

এখানে M = বণ্টনের গড়, X = প্রাপ্ত নম্বর

σ = বণ্টনের আদর্শ বিচ্যুতি,

এবং χ = গড় থেকে প্রতিটি স্কোরের বিচ্যুতি।

Z - স্কোর নির্ণয় করতে হলে গড় থেকে প্রতিটি প্রাপ্ত স্কোরের বিচ্যুতি প্রথমে বের করে নিতে হবে। পরে ঐ বিচ্যুতিকে বণ্টনের আদর্শ বিচ্যুতি (σ) দিয়ে ভাগ করতে হবে। এ ভাগফলই হলো নির্ণেয় Z - স্কোর।

উদাহরণ ঃ ১

নিম্নে প্রদত্ত সারণীটির তথ্যাবলি থেকে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর Z - স্কোর বের করুন।

Z - স্কোরের প্রায়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

ছাত্র	আকবর	বকর	চিত্ত	ইমরান	রফিক	দাউদ	হরি	ইকবাল	আলম	জন
বাংলা	৪০	২২	২০	২২	৪৮	৩৭	৩৬	৩৪	৩০	৩১
গণিত	৮৬	৭৬	৫৭	৬৭	৭৮	৯৪	৮০	৯৮	৬৮	৪৬
বিজ্ঞান	৭২	৬০	৩৩	৩৪	৮৭	৮৫	৭৫	৮১	৩৯	৩৪

উত্তর ঃ উদাহরণ-১

ছাত্র	বাংলা			গণিত			বিজ্ঞান		
	স্কোর	বিচ্যুতি		স্কোর	বিচ্যুতি		স্কোর	বিচ্যুতি	
	x	d	d^2	x	d	d^2	x	d	d^2
আকবর	৪০	৮	৬৪	৮৬	১১	১২১	৭২	১২	১৪৪
বকর	২২	১০	১০০	৭৬	১	১	৬০	১২	০
নবির	২০	১২	১৪৪	৫৭	১৮	৩২৪	৩৩	২৭	৭২৯
চিত্ত	২২	- ১০	১০০	৬৭	৮	৬৪	৩৪	২৬	৬৭৬
ইমরান	৪৮	১৬	২৩৬	৭৮	৩	৯	৮৭	২৭	৭২৯
রফিক	৩৭	৫	২৫	৯৪	১৯	৩৬১	৮৫	২৫	৬২৫
দাউদ	৩৬	৪	১৬	৮০	৫	২৫	৭৫	১৫	২২৫
হরি	৩৪	২	৪৮	৯৮	২২৯	৮২৯	৮১	১১১	৪৪১
ইকবাল	৩০	২	৪	৬৮	- ৭	৪৯	৩৯	২১	৪৪১
জন	৩১	- ১	১	৪৬	২৯৬	৬৪	৩৪	২৬	৬৭৬
N = ১০		Σx= ৩২০	Σd^2 = ৭১৪	Σx = ৭৫০	Σd^2 = ২৩২৪		Σx = ৬০০	Σd^2 = ৪৬৮৬	

$M = \frac{৩২০}{১০} = ৩২,$ $M = \frac{৭৫০}{১০} = ৭৫,$ $M = \frac{৬০০}{১০} = ৬০$

$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma d^2}{N}} = \sqrt{\frac{৭১৪}{১০}}$ $\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma d^2}{N}} = \sqrt{\frac{৩২৪}{১০}}$ $\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma d^2}{N}}$

$= \sqrt{৭১·৪০} = ৮·৪$ $= \sqrt{৩২·৪০} = ১৫·২$ $= \sqrt{\frac{৪৬৮৬}{১০}}$

$= \sqrt{৪৬৮·৬০}$

$= ২১·৫৫$

ছাত্র	ছাত্রের প্রাপ্ত নম্বর					ছাত্রের Z - স্কোর = $\frac{X - M}{\sigma}$				
	বাংলা	গণিত	বিজ্ঞান	মোট	শ্রেণিতে আপেক্ষিক অবস্থান	বাংলা	গণিত	বিজ্ঞান	মোট	অবস্থান শ্রেণীতে
আকবর	৪০	৮৬	৭২	১৯৮	৩য়	০.৯৫	০.৭২	০.৫৬	২.২৩	৪র্থ
ইমরান	৪৮	৭৮	৮৭	২১৩	২য়	১.৯০	০.২০	১.২৫	৩.৩৫	২য়
রফিক	৩৭	৯৪	৮৫	২১৬	১ম	০.৬০	১.২৫	১.১৬	৩.০১	৩য়
দাউদ	৩৬	৮০	৭৫	১৯১	৪র্থ	০.৪৭	০.৩২	০.৭০	১.৪৯	৫ম
হরি	৩৪	৯৮	৮১	২১৩	২য়	০.২৪	২.৭৪	০.৯৮	৩.৯৬	১ম

প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ফলাফল Z – স্কোরের ভিত্তিতে ফলাফল

ছাত্র

	তিন বিষয়ের নম্বর	শ্রেণিতে আপেক্ষিক স্থান	তিন বিষয়ের স্কোরের সমষ্টি	স্থান
আকবর	১৯৮	তৃতীয়	২.২৩	চতুর্থ
ইমরান	২১৩	দ্বিতীয়	৩.৩৫	দ্বিতীয়
রফিক	২১৬	প্রথম	৩.০১	তৃতীয়
দাউদ	১৯১	চতুর্থ	১.৪৯	পঞ্চম
হরি	২১৩	দ্বিতীয়	৩.৯৬	প্রথম

উপরে বর্ণিত ছক থেকে দেখা যায় প্রাপ্ত স্কোরগুলোকে Z - স্কোরে পরিবর্তন করলে আপেক্ষিক পারদর্শিতার সারি (Rank) পরিবর্তন হচ্ছে। প্রাপ্ত স্কোরের ক্ষেত্রে রফিক সর্বমোট নম্বর বেশি পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে বটে কিন্তু Z - স্কোরের সমষ্টিতে দেখা যাচ্ছে রফিক তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। প্রাপ্ত স্কোরের হিসাবে হরি ও ইমরান দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। Z স্কোরের সমষ্টি অনুযায়ী হরি প্রথম স্থান ও ইমরান তার পূর্ব দ্বিতীয় স্থান বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।

Z - স্কোরের বৈশিষ্ট্যাবলী

১। গড় থেকে প্রতিটি স্কোরের প্রকৃত বিচ্যুতি নির্ণয় করা যায় বলে যে কো বন্টনের স্কোরগুলোর পরিবর্তিত মান স্কোরের ধনাত্মক ও ঋণাত্মক উভয় প্রকারের হবে

২। কোন বণ্টনের Z - স্কোরগুলোর সমষ্টি ০ (শূন্য) হবে। এবং এ একই কারণে Z - স্কোরের গড় (M) হবে ০ (শূন্য)।

৩। প্রকৃত স্কোর গড় বিয়োগ দিয়ে বিচ্যুতিকে আদর্শ বিচ্যুতি দিয়ে ভাগ করা হয় বলে Z - স্কোরের মান খুবই কম।

৪। প্রাপ্ত বণ্টনে স্কোরগুলোকে Z - স্কোরে পতিবর্তিত করলে প্রাপ্ত স্কোরগুলোর পরিমাপক একক σ।

৫। কোন প্রাপ্ত বণ্টনের স্কোরগুলোকে Z - স্কোরে পরিবর্তিত করলে বণ্টনের প্রকৃতির কোন পরিবর্তন হয় না।

Z - স্কোরের সুবিধা

শিক্ষামূলক তাৎপর্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে Z - স্কোর ব্যবহার করলে বিশেষ যে সুবিধাগুলো পাওয়া যায় সেগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১। Z - স্কোর ব্যবহারের ফলে প্রাপ্ত স্কোরগুলোকে একটি নির্দ্দিষ্ট এককে পরিবর্তন করা যায়।

২। Z - স্কোরের একক আদর্শ বিচ্যুতি (σ) হওয়ার Z - স্কোরগুলোকে পরস্পরের মধ্যে তুলনা করা যায়।

৩। প্রাপ্ত স্কোরকে Z - স্কোরে পরিবর্তন করলে, তার ব্যাপক তাৎপর্য নির্ণয় করা সহজ। কারণ প্রত্যেকটি স্কোর থেকে স্বাভাবিক বণ্টনের লেখচিত্রের অন্তর্ভুক্ত ক্ষেত্র নির্ণয় করা যায়।

৪। শিক্ষামূলক অভীক্ষা প্রস্তুত করার সময় বিভিন্ন প্রশ্নের (Test item) কাঠিন্য Z স্কোর দ্বারা নির্ণয় করা সহজ হয়।

আদর্শ স্কোর (Standard Score)

Z - স্কোরের প্রথম দুটি অসুবিধা হলো এর সংখ্যামানের ক্ষুদ্রতা এবং ধনাত্মক ও ঋণাত্মক চিহ্ন সম্বলিত মান। এ অসুবিধা দুর করার জন্য আর এক ধরনের পরিবর্তিত স্কোর (Derived Score) ব্যবহার করা হয়। এ ক্ষেত্রে প্রথমত Z - স্কোরের মান বৃদ্ধি করা হয় এবং দ্বিতীয়তঃ সকল Z - স্কোরের মান গুলোকে ধনাত্মক (Positive) করা হয় এ কারণে প্রাপ্ত Z - স্কোরের বণ্টনকে অপর একটি সুবিধাজনক বণ্টনের Z - স্কোরে পরিবর্তিত করা যায়। নতুন পরিবর্তিত স্কোরের মান যাতে করে ধনাত্মক ও পূর্ণ সংখ্যা হয়। সে জন্য প্রাপ্ত বণ্টনটির Z - স্কোরের গড় (M) ও আদর্শ বিচ্যুতি (σ) প্রয়োজনমত

নির্বাচন করে দিতে হয়। অতএব কোন বন্টনের স্কোরকে যখন অন্য কোন সুবিধাজনক কল্পিত বন্টনের স্কোরে পরিবর্তন করা হয়। তখন তাকে আদর্শ স্কোর বলে।

যে কোন আদর্শ স্কোরের একটি নির্দিষ্ট গড় ও একটি নির্দিষ্ট আদর্শ বিচ্যুতি ঠিক করে নিতে হয়। আজকাল যে কোন অভীক্ষা তৈরি করার জন্য এ ধরনের আদর্শ স্কোর ধরে নিতে হয়।

আদর্শ স্কোরের বৈশিষ্ট্য

আদর্শ স্কোরের একটি নির্দিষ্ট গড় ও একটি আদর্শ বিচ্যুতি থেকে Z - স্কোরের ক্ষেত্রে গড় ০ (শূন্য) ও আদর্শ বিচ্যুতি - ১। কিন্তু আদর্শ স্কোরের এ মানগুলো নির্বাচিত।

২। আদর্শ স্কোরের গড় ও আদর্শ বিচ্যুতির মান এমনভাবে নির্বাচন করা হয় যাতে স্কোরগুলোর মান সব সময়ে ধনাত্মক থাকবে।

৩। আদর্শ স্কোর নির্ণয় করার সময় প্রয়োজনমত গড় ও আদর্শ বিচ্যুতি নির্বাচন করে আদর্শ স্কোরের মান বাড়ানো যায়।

৪। কোন প্রাপ্ত বন্টনের স্কোরগুলোকে অন্যকোন বন্টনের আদর্শ স্কোরে পরিবর্তন করলে কল্পিত বন্টনের আদর্শ বিচ্যুতি পরিমাপক একক।

৫। কোন প্রাপ্ত বন্টনের স্কোরকে আদর্শ স্কোরে পরিবর্তিত করলে প্রাপ্ত বন্টনের অসামঞ্জস্য দূর হয় না। প্রাপ্ত বন্টনের প্রকৃতি ও স্বরূপ মোটেই বদলাবে না। অর্থাৎ প্রাপ্ত বন্টনটির তির্যকতা থাকলে পরিবর্তিত আদর্শ স্কোরে বন্টনটির তির্যকতাসম্পন্ন হবে।

আদর্শ স্কোর নির্ণয়ের পদ্ধতি

পরিমাণগত সমতুল্যের নীতি অনুসরণ করে কোন প্রাপ্ত স্কোরকে যে কোন নির্বাচিত বন্টনের স্কোরে পরিবর্তিত করে আদর্শ স্কোর নির্ণয় করতে হয়। সাধারণত দু'টি স্কোর সমান আদর্শ বিচ্যুতি দূরত্বে অবস্থান করলে স্কোরদ্বয়কে পরিমাণগত দিক থেকে সমতুল্য বলা হয়। সমতুল্যের নীতি (Principle of equivalence) অনুযায়ী একটি বন্টনের স্কেল যদি $\frac{x}{\sigma}$ এককে এবং অপরটি যদি $\frac{x'}{\sigma}$ এককে থাকে,

তবে $\frac{x}{\sigma} = \frac{x'}{\sigma}$

বা $\frac{x-m}{\sigma} = \frac{x' - m'}{\sigma}$

বা $x - m = \frac{\sigma}{\sigma_1}, (x' - m')$

বা $x = \frac{\sigma}{\sigma_1}, (x' - m') + m$

এখানে M ও M` বন্টন দু'টির গড়,

σ এবং σ` উহাদের আদর্শ বিচ্যুতি।

উপরের এ সূত্র প্রয়োগ করে কোন প্রাপ্ত স্কোরকে যেকোন আদর্শ স্কোরে পরিবর্তিত করা যায়।

$\therefore$ আদর্শ স্কোর $(X) = \frac{\sigma}{\sigma'} (X' - M') + M$

এখানে, X = আদর্শ স্কোর।

M = যে বন্টনে স্কোরটিকে পরিবর্তন করা হচ্ছে তার গড় σ = যে বন্টনের স্কোরটিকে পরিবর্তন করা হচ্ছে তার আদর্শ বিচ্যুতি, X' = প্রাপ্ত স্কোর বা যে স্কোরকে আদর্শ স্কোরে পরিবর্তন করা হচ্ছে M' = প্রাপ্ত বন্টনটির গড়, এবং σ' = প্রাপ্ত বন্টনটির আদর্শ বিচ্যুতি।

উদাহরণ ঃ

নিম্নে বর্ণিত সারণীতে মইন ও নিজামের বার্ষিক পরীক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের নম্বর তালিকা দেয়া হল। পরিবেশিত তথ্য থেকে সুবিধামত একটি আদর্শ বন্টনের স্কোরে পরিবর্তন করে এদের দু'জনের পারদর্শিতার মানের তুলনা করুন।

ছাত্র	বাংলা	গণিত	ইংরেজি	বিজ্ঞান	সমাজবিজ্ঞান	মোট প্রাপ্তনম্বর
মইন	৫৪	৭২	৪৮	৬৩	৫৬	২৯৩
নিজাম	৬৩	৭৮	৪৫	৫৭	৪৮	২৯১
শ্রেণির গড়	৫১	৬৬	৪২	৫৪	৪৮	
শ্রেণির আদর্শ বিচ্যুতি	৩	২	৬	৫	৮	

সমাধানঃ উপরের সারণী থেকে মইন ও নিজামের বিভিন্ন বিষয়ের নম্বর তুলনা করতে হলে প্রত্যেক বিষয়ের নম্বরগুলোকে নির্দিষ্ট বন্টনের আদর্শ স্কোরে পরিবর্তিত করতে হবে। মনে করি সে বন্টনের গড় (M) = ২০০ এবং আদর্শ বিচ্যুতি (σ) = ১০ এখন মইনের বিভিন্ন বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বরগুলোকে আদর্শ স্কোরে পরিবর্তন করলে-

বাংলার আদর্শ স্কোর = $\frac{১০}{৩}$ - (৫৪-৫১) + ২০০ = ২১০

গণিতের আদর্শ স্কোর = $\frac{১০}{২}$ (৭২-৬৬) + ২০০ = ২৩০

ইংরেজির আদর্শ স্কোর = $\frac{১০}{৬}$ (৪৮-৪২) + ২০০ = ২১০

বিজ্ঞানের আদর্শ স্কোর = $\frac{১০}{৫}$ (৬৩-৫৪) + ২০০ = ২১৮

সমাজবিজ্ঞানের আদর্শ স্কোর = $\frac{১০}{৮}$ (৫৬-৪৮) + ২০০ = ২১০

∴ মইনের মোট আদর্শ স্কোর = ১০৭৮

নিজামের বিভিন্ন বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বরগুলোকে আদর্শ স্কোরে পরিবর্তন করলে-

বাংলার আদর্শ স্কোর = $\frac{১০}{৩}$(৬৩-৫১) + ২০০ = ২৪০

গণিতের আদর্শ স্কোর = $\frac{১০}{২}$ (৭৮-৬৬) + ২০০ = ২৬০

ইংরেজির আদর্শ স্কোর = $\frac{১০}{৬}$(৪৫-৪২) + ২০০ = ২০৫

বিজ্ঞানের আদর্শ স্কোর = $\frac{১০}{৫}$(৫৭-৫৪) + ২০০ = ২০৬

সমাজবিজ্ঞানের আদর্শ স্কোর = $\frac{১০}{৮}$(৪৮-৪৮) + ২০০ = ২০০

নিজামের মোট আদর্শ স্কোর = ১১১১

সুতরাং আদর্শ স্কোরের বিচারে নিজামের পারদর্শিতা মইনের পারদর্শিতা থেকে কিছুটা ভাল।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়, প্রাপ্ত স্কোরের ভিত্তিতে মইনের পারদর্শিতা ছিল নিজামের চেয়ে কিছু ভাল। কিন্তু এ ধরনের তুলনা করার রীতি গাণিতিক দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ। কারণ বিভিন্ন বিষয়ে পরিমাপক একক ভিন্ন। এ কারণে সব বিষয়ের নম্বরগুলোকে একই গড় (M) ও আদর্শ বিচ্যুতি σ সম্পন্ন বণ্টনে আদর্শ স্কোরে পরিবর্তন করা হল। এখানে ঐ ছাত্র দু'জনের আদর্শ স্কোরের হিসাবে দেখা গেল অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। নিজামের পারদর্শিতা মইনের পারদর্শিতা থেকে অপেক্ষাকৃত অনেক ভাল। গাণিতিক নির্ভুলতার দিক দিয়ে বিচার করলে এটাই সঠিক সিদ্ধান্ত।

সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি ঃ

আদর্শ স্কোর বের করার জন্য নিম্নোক্ত ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে-

১। যে বণ্টনের আদর্শ স্কোর - নির্ণয় করতে হবে সে বণ্টনে গড় (M) ও আদর্শ বিচ্যুতি (σ) নির্বাচন করতে হবে।

২। প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি বিষয়ের প্রাপ্ত স্কোরের আদর্শ স্কোর পরিবর্তন করতে হবে নিম্নোক্ত সূত্র অনুযায়ী, আদর্শ স্কোর (x) = $\frac{\sigma}{\sigma'}(x' - m') + m$.

৩। প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি বিষয়ে আদর্শ স্কোরের সমষ্টি বের করতে হবে।

৪। পরিশেষে, মোট আদর্শ স্কোরের ভিত্তিতে প্রত্যেক ছাত্রকে পারদর্শিতার তুলনা করা যাবে। যে বেশি আদর্শ স্কোর পাবে, তার পারদর্শিতাই ভাল বলে গ্রহণযোগ্য হবে।

আদর্শ স্কোরের সুবিধা

শিক্ষামূলক তথ্যের তাৎপর্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আদর্শ স্কোর ব্যবহৃত হলে, যে সকল সুবিধা পাওয়া যায় তা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

১। আদর্শ স্কোর ব্যবহার করলে প্রাপ্ত যে কোন স্কোরকে যে কোন সুবিধামত এবং প্রয়োজনীয় এককে পরিণত করা যায়।

২। আদর্শ স্কোরে সকল মানগুলো ধনাত্মক থাকে। স্কোরগুলোর উপর বিভিন্ন প্রক্রিয়া অতি সহজেই সম্পাদন করা যায়।

৩। শিক্ষামূলক পরিমাপের ক্ষেত্রে প্রচলিত ত্রুটিপূর্ণ ধারনা ও প্রক্রিয়াকে আদর্শ স্কোরের নির্বাচিত গড় ও আদর্শ বিচ্যুতি সংশোধন করতে সক্ষম।

৪। শিক্ষামূলক পরিমাপের ক্ষেত্রে সমতুল্য স্কোরে পরিবর্তন করে অতি সহজেই তুলনা করা যায়।

৫। শিক্ষামূলক ও মনোবিজ্ঞানিক অভীক্ষার তুল্যাঙ্ক মান (Norm) একমাত্র আদর্শ স্কোরের সাহায্যেই নির্ধারণ করা যায়।

T- স্কোর (T-Score)

সাধারণত কোন আদর্শ স্কোর (Standard score) বণ্টনের প্রকৃতি পরিবর্তন করতে পারে না। প্রাপ্ত বণ্টনের মধ্যে যদি কোন অসামঞ্জস্যতা থাকে, তা পরিবর্তিত আদর্শ স্কোরেও থেকে যায়। ফলে আদর্শ স্কোরকে সার্বজনীনভাবে ব্যবহার করা যায় না। স্কোরের স্বাভাবিক বণ্টনের নিয়মানুযায়ী তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা যায় না। এসব অসুবিধা দূর করার জন্য প্রাপ্ত বণ্টনটিকে স্বাভাবিক বণ্টনে লেখচিত্রের অর্ন্তভুক্ত ক্ষেত্র অনুযায়ী স্বাভাবিক বণ্টনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হয়। তখন তাকে (T-Scale) বলা হয়। অতএব টি স্কোর বলতে স্বাভাবিকীকৃত আদর্শ স্কোর (Normalised Standard Score) বুঝায়। আর টি-স্কেল বলতে বুঝায় এ ধরনের স্বাভাবিকতা আদর্শ স্কোরের স্কেল। ম্যাককল (MachCall) এ স্কেলটির উদ্ভাবক। থর্ণডাইক ও টারম্যানের নামের প্রথম অক্ষর স্মরণ করে স্কেলটির নাম T স্কেল রাখা হয়েছে।

স্কোরের বৈশিষ্ট্য

১। T স্কোর এক ধরনের আদর্শ স্কোর (Standard Score) যার গড় (M) = ৫০ এবং σ = ১০।

২। T - স্কেলে - ৫σ বিন্দু থেকে শুরু করে + ৫σ বিন্দুতে শেষ বিন্দুর T - স্কোর ১০০।

৩। T - স্কোর এর মানগুলো হয় ধনাত্মক (Positive)

৪। যে কোন প্রাপ্ত স্কোরের T - স্কোর স্বাভাবিক বণ্টনের সমতূল্য শতাংশ বিন্দুর দ্বারা নির্ধারিত হয়।

T - স্কোর নির্ণয়ের পদ্ধতি

T - স্কোর হলো স্বাভাবিক আদর্শ স্কোর। সুতরাং আদর্শ স্কোর নির্ণয় পদ্ধতি অনুসরণ করে T স্কোর নির্ণয় করা হয়। প্রাপ্ত স্কোরকে আদর্শ স্কোরে পরিবর্তন করার সময়ের স্বাভাবিক বণ্টনের রীতিনীতি পুরাপুরি মেনে চলতে হয়। এ কারণে প্রথমেই আদর্শ স্কোর নির্ণয়ের সূত্র বিশ্লেষণ করা যায়।

আদর্শ স্কোর (X) = $\frac{\sigma}{\sigma'}$, $(X' - M') + M$

এখানে X', M' ও σ' প্রাপ্ত স্কোর প্রাপ্ত বণ্টনের গড় ও আদর্শ বিচ্যুতি।

এবং M ও σ যথাক্রমে আদর্শ স্কোরের গড় ও আদর্শ বিচ্যুতি।

$\therefore X = \sigma\chi \frac{X' - M'}{\sigma'} + M = \sigma Z' + M \left[\therefore \frac{X' - M'}{\sigma'} = \frac{X'}{\sigma'} = Z'\right]$

$= \sigma Z' + M$

এখন, Z বা $\frac{X'}{\sigma'}$ প্রাপ্ত বণ্টনের Z স্কোরকে স্বাভাবিক বণ্টনের $\frac{X}{\sigma}$ বা Zএ পরিবর্তন করা হলে প্রাপ্ত বণ্টনের স্কোরটিও স্বাভাবিক বণ্টনের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তন হবে।

অর্থাৎ আদর্শ স্কোর (X)= σZ + M,

এখন T- স্কোরের গড় (M)= ৫০, আদর্শ বিচ্যুতি σ = ১০ সূত্রে বসালে স্কোরের মান পাওয়া যায়।

কোনো প্রাপ্ত স্কোরকে T স্কোরে পরিবর্তন করতে হলে স্বাভাবিক বণ্টনে ঐ স্কোরে Z বা $\frac{X'}{\sigma'}$ এর মান কত হবে, তা নির্ণয় করা যাবে।

১। প্রথমে প্রাপ্ত স্কোরের মধ্যবিন্দুর নিচ পর্যন্ত শতকরা কত ভাগ স্কোর আছে তা বের করতে হবে।

২। পরে ঐ শতকরা হার স্বাভাবিক বন্টনে কত $\frac{X}{\sigma}$ বা Z বিন্দুর মধ্যে আছে, তা স্বাভাবিক বন্টনের তালিকা থেকে বের করতে হবে।

৩। Z এর মান সূত্রে বসালেই T এর মান বের হবে। T স্কোর এক ধরনের পরিবর্তিত স্কোর এবং আদর্শ স্কোর যার গড় (M)= ৫০ এবং আদর্শ বিচ্যুতি σ = ১০। এ আদর্শ স্কোরের বন্টনটি গাণিতিক প্রক্রিয়ার দ্বারা স্বাভাবিককৃত। পরিসংখ্যানে T স্কোরের মান বের করার জন্য একটি আদর্শ তালিকা ব্যবহৃত হয়। Z এর মান ছাড়া বাকি সংখ্যাগুলো ধ্রুবক (Constant)। সুতরাং বিভিন্ন প্রাপ্ত স্কোরের মধ্যবিন্দু নিচ পর্যন্ত শতকরা স্কোর স্বাভাবিক বন্টনের কত Z মানের সমান হবে তা যেমন স্থির তেমনি স্বাভাবিক বন্টনে Z এর মানের প্রেক্ষিতে T স্কোরের মানও স্থির। তাই এ তালিকায় নির্দিষ্ট স্কোরের অর্ধ্যাংশের নিচ পর্যন্ত শতকরা যতগুলো স্কোর আছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে T স্কোর কত হবে তা বের করা যায়। স্বাভাবিক বন্টনের ± ৫σ এ দৈর্ঘ্যের মধ্যে সাধারণত বন্টনের ৯৯.৭৩% ভাগ স্কোর থাকে। এ বিস্তারকে বন্টনের সামগ্রিক অন্তর্ভুক্তির স্তর ধরা হয়। Z স্কোর বন্টনে গড় (M) = 0 এবং আদর্শ বিচ্যুতি σ =১। আর এ বন্টনের গড় (M) = ৫ ধরা হয় তা হলে এক ধরনের আদর্শ স্কোর পাওয়া যাবে যার গড় (M) = ০ হবে এবং আদর্শ বিচ্যুতি σ = -৫, এ স্কেলে সর্বোচ্চ বিন্দু হবে ১০। এ আদর্শ স্কোরের গড় = (M) = ৫০ এবং আদর্শ বিচ্যুতি σ = ১০ ধরা হলে, যে পরিমাপক স্কেল পাওয়া যাবে তা শূন্য (০) থেকে ১০০ পর্যন্ত বিস্তৃত। নিম্নের চিত্রে তা দেখানো হলো।

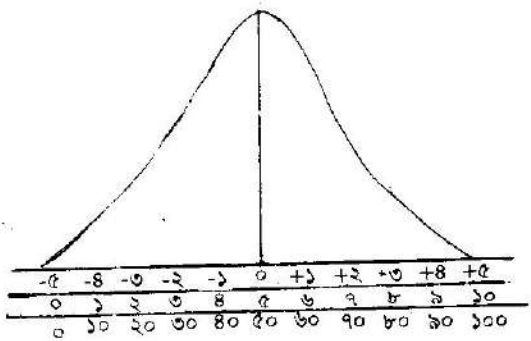

T স্কেলের মূল বিন্দুর পরিবর্তন

T স্কেলে মুল বিন্দুর পরিবর্তন

প্রাপ্ত বণ্টনটি সম্পূর্ণভাবে স্বাভাবিক (Normal) হলে T স্কোরের ধারনার কোনো পার্থক্য থাকেনা। প্রাপ্ত বণ্টনটি দ্বারা অস্বাভাবিক বণ্টনটিকে পরিবর্তন করে স্বাভাবিক করে নিতে হয়।

উদাহরণ -৩

নিচের সারণিতে ৫০ জন ছাত্রের একটি পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের বণ্টন দেয়া হলো। প্রাপ্তনম্বরগুলোর T-স্কোর নির্ণয় করুন।

প্রাপ্ত স্কোর	(X)	২০	৩৪	৩৮	৪৭	৫০	৫৭	৬০	৬৪	৬৫	৭২
ছাত্র সংখ্যা	(*f*)	২	৩	৭	৯	১০	৬	৫	৪	২	২

সমাধান ঃ

স্কোর X	*f*	C*f*	যে স্কোরের নিচ পর্যন্ত C*f*+ স্কোরের পৌনঃপুন্যের অর্ধেক	পূর্ববর্তী স্তরের মানের শতকরা হার	T স্কোর
৭২	২	৫০	৪৮+২/২=৪৯	৯৮%	৭১
৬৫	২	৪৮	৪৬+২/২=৪৭	৯৪%	৬৬
৬৪	৪	৪৬	৪২+৪/২=৪৪	৮৮%	৬২
৬০	৫	৪২	৩৭+৫/২=৩৯.৫	৭৯%	৫৮
৫৭	৬	৩৭	৩১+৬/২=৩৪	৬৮%	৫৫
৫০	১০	৩১	২১+১০/২=২৬	৫২%	৫১
৪৭	৯	২১	৯+৭/২=১৬.৫	৩৩%	৪৬
৩৮	৭	১২	৫+৭/২=৮.৫	১৭%	৪১
৩৪	৩	৫	২+৫/২=৪.৫	৯%	৩৭
২০	২	২	০+২/২=১	২%	৩০

N= ৫০

যে কোনো বণ্টন থেকে T - স্কোরের মান বের করতে হলে নিম্নরূপ প্রক্রিয়াগুলো পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করতে হবে।

১। স্কোর (X) ও পৌনঃপুন্য (*f*) পৃথক দু'টি স্তম্ভে উপরের ছকের মতই পাশাপাশি সাজাতে হবে।

২। বণ্টনের নিচের দিক থেকে প্রত্যেকটি স্কোরের কিউমুলেটিভ (Cumulative) পৌনঃপুন্য (C*f*) বের করে পার্শ্ববর্তী স্তম্ভে সাজাতে হবে।

৩। এর পর প্রত্যেকটি স্কোরের কিউমুলেটিভ পৌনঃপুন্য - cf ও ঐ স্কোরের মোট পৌনঃপুন্যের অর্ধেক যোগ করে পরবর্তী স্তম্ভে লিখতে হবে। অর্থাৎ ২০ স্কোরের নিচে cf=০। সুতরাং ঐ স্কোরের মধ্যবিন্দুর নিচ পর্যন্ত পৌনঃপুন্য হবে ০+২/২=০+১=১। আবার স্কোর ৩৪ এর নিচ পর্যন্ত Cf = 2। সুতরাং ঐ স্কোরের মধ্যবিন্দুর নিচ পর্যন্ত মোট পৌনঃপুন্য হবে ২+৫/২=২+২.৫=৪.৫। অনুরূপভাবে ৩৮ স্কোরের নিচ পর্যন্ত Cf =৫ এবং স্কোরের মধ্যে বিন্দুর নিচ পর্যন্ত মোট পৌনঃপুন্য হবে ৫+৭/২=৮.৫ ইত্যাদি।

৪। এখন পূর্বের মানগুলির শতকরা মান নির্ণয় করতে হবে। এ জন্য প্রত্যেকটি মানকে $\frac{১০০}{N} = \frac{১০০}{৫০} = ২$

৫। এরপর T স্কেলের তালিকা থেকে শতকরা হিসাবের ভিত্তিতে T- স্কোর নির্ণয় করতে হবে। T - স্কোর নির্ণয় করার সময় শতকরা হিসাবের কাছাকাছি মানকে ধরা হয়েছে। যেমন ২% এর জন্য তালিকা ১'৭৯ থেকে ২'২৮ এর জন্য মান হচ্ছে ৩০। সুতরাং ঐ ৩০ই স্কোরের মান ধরা হয়েছে।

এভাবে T- স্কোর বের করা খুবই সহজ। শিক্ষামূলক তথ্যগুলোকে তালিকার সাহায্যে T- স্কোরে পরিবর্তন করে তুলনা করা যায়।

T- স্কোরের সুবিধা

T- স্কোর এক ধরনের আদর্শ স্কোর। ফলে আদর্শ স্কোরের যে সকল সুবিধা আছে T- স্কোরের ঐ ধরনের সুবিধা থাকবে। T- স্কোরের বিশেষ সুবিধাগুলো নিম্নে দেয়া হলঃ-

১। T- স্কোরের মাধ্যমে প্রাপ্ত স্কোরগুলোকে একই এককে পরিবর্তন করা যায়। এর ফলে বিভিন্ন বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন এককের নম্বরগুলোকে সহজেই তুলনা করা যায়।

২। O প্রাপ্ত স্কোরগুচ্ছকে T- স্কোরে পরিবর্তনের মাধ্যমে স্বাভাবিক বণ্টনের সকল ধরনের তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য অর্জিত হয় এবং সম্পর্ক বজায় থাকে।

৩। T- স্কোর ও প্রাপ্ত স্কোরের মধ্যে সরল রৈখিক (Linear) সম্পর্ক বজায় থাকে। প্রাপ্ত স্কোর ও T- স্কোর দিয়ে লেখচিত্র অঙ্কন করলে তা সে সরল রেখার মাধ্যমে সহজেই নমুনাদলের বহির্ভূত স্কোরদেরকেও T- স্কোরে পরিবর্তন করতে কোনো অসুবিধা হয় না।

৪। T- স্কোরের মান ১০০ এককের স্কেলের মধ্যে থাকে বলে এটি অতি সহজেই সাধারণের বুঝতে সুবিধা হয়।

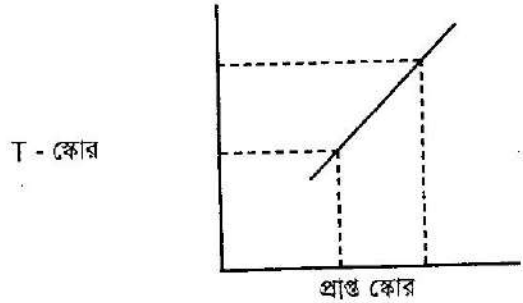

T- স্কোরের তালিকা

নির্দিষ্ট স্কোরের মধ্যে বিন্দুর নিচ পর্যন্ত স্কোর সংখ্যার (N) শতকরা হার	T- স্কোর	নির্দিষ্ট স্কোরের মধ্য-বিন্দুর নিচ পর্যন্ত স্কোর সংখ্যার (N) শতকরা হার	T- স্কোর
০.০০৩২	১০	৫৩.৯৮	৫১
০.০০৪৮	১১	৫৭.৯৩	৫২
০.০০৭	১২	৬৫.৫৪	৫৩
০.০১১	১৩	৬৫.৫৪	৫৪
০.০১৬	১৪	৬৯.১৫	৫৫
০.০২৩	১৫	৭৫.৫৭	৫৬
০.০৩৪	১৬	৭৫.৮০	৫৭
০.০৪৮	১৭	৭৮.৮১	৫৮
০.০৬৯	১৮	৮১.৫৯	৫৯
০.০১৭	১৯	৮৪.১৩	৬০
০.১৩	২০	৮৬.৪৩	৬১
০.১৯	২১	৮৮.৪৯	৬২
০.২৬	২২	৯০.৪৯	৬৩
০.৩৫	২৩	৯১.৩২	৬৪
০.৪৭	২৪	৯৩.৩২	৬৫
০.৬২	২৫	৯৪.৫২	৬৬
০.৮২	২৬	৯৫.৫৪	৬৭
১.০৭	২৭	৯৬.৪১	৬৮

১.৩৯	২৮	৯৭.১৩	৬৯
১.৭৯	২৯	৯৭.৭২	৭০
২.২৮	৩০	৯৮.২১	৭১
২.৮৭	৩১	৯৮.৬১	৭২
৩.৫৯	৩২	৯৮.৯৩	৭৩
৪.৪৬	৩৩	৯৯.১৮	৭৪
০.৪৮	৩৪	৯৯.৩০	৭৫
৬.৬৮	৩৫	৯৯.৫৩	৭৬
৮.০৮	৩৬	৯৯.৬৫	৭৭
৯.৬৮	৩৭	৯৯.৭৪	৭৮
১১.৫১	৩৮	৯৯.৭১	৭৯
১৩.৫৭	৩৯	৯৯.৮৬৫	৮০
১৫.৮৭	৪০	৯৯.৯০৩	৮১
১৮.৪১	৪১	৯৯.৯৩১	৮২
২১.১৯	৪২	৯৯.৯৫২	৮৩
২৪.২০	৪৩	৯৯.৯৬৬	৮৪
২৭.৪৩	৪৪	৯৯.৯৭৭	৮৫
৩০.৮৫	৪৫	৯৯.৯৮৪	৮৬
৩৪.৪৬	৪৬	৯৯.৯৮৯	৮৭
৩৮.২১	৪৭	৯৯.৯৯৩	৮৮
৪২.০৭	৪৮	৯৯.৯৯৫	৮৯
৪৬.০২	৪৯	৯৯.৯৯৭	৯০
৫০.০০	৫০		

অনুশীলনী ৪.১২

১। নিম্নে প্রদত্ত সারণিটি থেকে প্রত্যেক ছাত্রের T - স্কোর বের করুন।

ছাত্র	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
গণিত	৯০	৬৫	৫৮	৬৯	৭৫	৪০	৭৬	৭৩	৪৩	৬৬
ভূগোল	৪৭	৪৫	৬১	৩৩	৫৬	৪৮	৩৮	৪৩	২৮	৪৮
বিজ্ঞান	৭২	৪৮	৫২	৪৭	৭৫	৪৩	৪৭	৪৪	৫১	৫৩

২। নিম্নলিখিত ছক হতে হাসেম ও আরিফের আদর্শ স্কোর বের করে তাদের পারদর্শিতার মান তুলনা করুন।

ছাত্র	বাংলা	গণিত	সমাজ বিজ্ঞান	বিজ্ঞান	অঙ্কন	মোট নম্বর	
হাসেম	৫৮	৮৪	৫২		৬৮	৫৭	৩১৯
আরিফ	৬২	৭৬	৪১		৬১	৬৯	৩০৯
শ্রেণি গড় (M)		৫৬	৬৪	৫৪	৫৪	৫১	
শ্রেণির আদর্শ বিচ্যুতি		২	৮		১০	৩	

৩। নিম্নলিখিত বণ্টনটির T - স্কোর বের করুন।

স্কোর	২৩	২৮	৩৬	৪৩	৪৮	৫৪	৫৯	৬১	৬৪
পৌনঃপুন্য	১	৩	৭	১০	১৩	৮৩	৫৮	১	১

৪। নিম্নলিখিত সারণি হতে প্রত্যেক ছাত্রের T - স্কোর বের করে তাদের প্রাপ্ত নম্বরের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

ছাত্র	গণিত	বিজ্ঞান	সমাজ	বাংলা	ইংরেজি
ক	৩৫	৩৪	৪৬	৩৪	৪৩
খ	৬২	৪৩	৫৩	৪৬	৩৪
গ	৪৩	৪৭	৪৬	৩৮	২৮
গড়(M)	৪৪	৩৮	৪১	৪২	৩৩
আদর্শ বিচ্যুতি	৫	৭	৬	৪	৮

৫। পরিবর্তিত স্কোর বলতে কি বুঝেন? কোন পরীক্ষণ থেকে সরাসরি প্রাপ্ত স্কোরগুলোকে বিভিন্ন পরিমাপক স্কেলে পরিবর্তন করা হয় কেন? ব্যাখ্যা করুন।

৬। Z - স্কোর কি? Z - স্কোরের বৈশিষ্ট্যাবলী ও সুবিধা আলোচনা করুন।

৭। আদর্শ স্কোর বলতে কি বুঝেন? আদর্শ স্কোর নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা কেন? ব্যাখ্যা করুন। এর বৈশিষ্ট্য ও সুবিধাগুলো কি কি?

৮। T - স্কেল কি? T - স্কোর নির্ণয়ের পদ্ধতি বর্ণনা করুন। এর বৈশিষ্ট্যাবলী উল্লেখসহ পরিমাপের ক্ষেত্রে এ স্কেলের সুবিধাগুলো বর্ণনা করুন।

১০। টীকা লিখ ঃ-

(ক) Z - স্কোর, (খ) আদর্শ স্কোর, (গ) T - স্কোর, (ঘ) স্কেলিং পদ্ধতি।

ক্রমসমষ্টিমূলক বণ্টন ও অন্যান্য চিত্রমূলক পদ্ধতি
(Cumulative Distribution and other Graphical Methods)

স্কোর বিন্যাস অধ্যায়ে পৌনঃপুন্য বণ্টনের বহুল প্রচলিত চিত্ররূপ পৌনঃপুন্য বহুভূজ (frequency polygon) ও আয়ত লেখ (histogram) আলোচিত হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে আরো দুটি চিত্রমূলক পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা হবে।

পদ্ধতি দু'টি-

(১) ক্রমসমষ্টিমূলক পৌনঃপুন্য চিত্র (cumulative frequency graph)

(২) ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা চিত্র (cumulative percentage curve) বা ওজাইভ (ogive)

ক্রমসমষ্টিমূলক পৌনঃপুন্য চিত্র (Cumulative Frequency Graph) ঃ

ক্রমসমষ্টিমূলক পৌনঃপুন্য চিত্র কোনো পৌনঃপুন্য বণ্টনকে চিত্ররূপে প্রদান করার একটি পদ্ধতি। এ ধরনের চিত্রে পৌনঃপুন্যগুলোকে নিচ থেকে উপর দিকে পরপর যোগ করে যেতে হয়। এ জন্যই এ চিত্রের নাম ক্রমসমষ্টিমূলক পৌনঃপুন্য চিত্র বলে। একটি বণ্টনের ক্রমসমষ্টিমূলক পৌনঃপুন্য নিম্নরূপঃ

ছক - ১

শ্রেণি ব্যবধান (i)	পৌনঃপুন্য (f)	ক্রম সমষ্টিমূলক পৌনঃপুন্য (Cum.f)
৯৫ - ৯৯	১	৫৩
৯০ - ৯৪	২	৪৯
৮৫ - ৮৯	৩	৪৭
৮০ - ৮৪	৬	৪৪
৭৫ - ৭৯	৮	৩৮
৭০ - ৭৪	১০	৩০
৬৫ - ৬৯	৬	২০
৬০ - ৬৪	৫	১৪
৫৫ - ৫৯	৩	৯
৫০ - ৫৪	৩	৬
৪৫ - ৪৯	৩	৩

N = ৫০

উপরের বণ্টনের পৌনঃপুন্যগুলোকে নিচে থেকে উপর দিকে পর পর যোগ করে সবগুলো শ্রেণি ব্যবধানের সমষ্টিই বের করা হয়েছে। এখন, প্রথম শ্রেণি ব্যবধানের ক্রম সমষ্টিমূলক পৌনঃপূন্য হল ১, দ্বিতীয় শ্রেণি ব্যবধানের ১+৩ = ৪, তৃতীয়টির ৪+২ = ৬, চতুর্থটির ৬+৪ = ১০, এভাবে সর্বোচ্চ শ্রেণি ব্যবধানের ক্রমসমষ্টিমূলক পৌনঃপুন্য হচ্ছে ৫০। এরপর সমষ্টিমূলক পৌনঃপুন্য অনুযায়ী প্রদত্ত বণ্টনটিকে চিত্রের আকারে অঙ্কন করলে নিম্নের রেখাচিত্রটি পাওয়া যাবে।

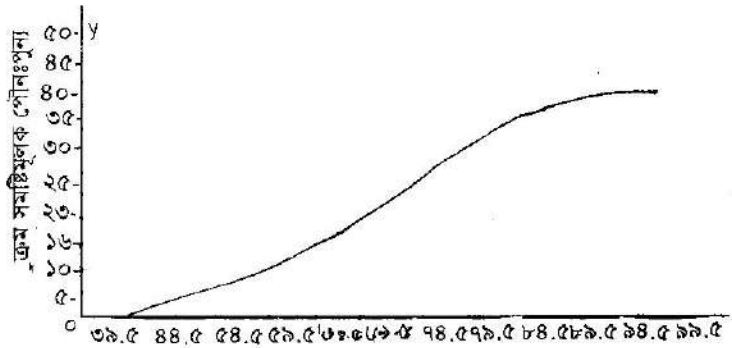

এ চিত্রে বণ্টনটির শ্রেণি ব্যবধানগুলো X - অক্ষে এবং ক্রমসমষ্টিমূলক পৌনঃপুন্যগুলো Y অক্ষে বসান হয়েছে। এখানে শ্রেণিব্যবধানের সংখ্যা ১২। এখানে সর্বোচ্চ ক্রম সমষ্টিমূলক পৌনঃপুন্য ৫০। অঙ্কনের সুবিধার জন্য Y অক্ষের এককের দৈর্ঘ্য ৫ স্কোর এবং মোট এককের সংখ্যা ১০ নেয়া হয়েছে।

পৌনঃপুন্য বহুভুজ অঙ্কনে প্রত্যেকটি শ্রেণি ব্যবধানের মধ্যবিন্দু ধরা হলেও এখানে প্রত্যেকটি ক্রমসমষ্টিমূলক পৌনঃপুন্য ঐ শ্রেণি ব্যবধানের সীমায় বসাতে হয়। ক্রম সমষ্টিমূলক পৌনঃপুন্য বণ্টনের নিচে থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি শ্রেণি ব্যবধানের শেষ সীমা পর্যন্ত সব স্কোরগুলোকে যোগ করে ঐ ব্যবধানের পৌনঃপুন্য নির্ণয় করা হয়।

উদাহরণ-১ ঃ নিম্নের বণ্টনটির ক্রমসমষ্টিমূলক পৌনঃপুন্য চিত্র অঙ্কন করা হল

ছক -২

শ্রেণি ব্যবধান (i)	পৌনঃপুন্য (f)	ক্রমসমষ্টিমূলক পৌনঃপুন্য (Cum.f)
৬০ - ৬৪	১	৫০
৫৫ - ৫৯	১	৪৯
৫০ - ৫৪	২	৪৮
৪৫ - ৪৯	২	৪৬
৪০ - ৪৪	৪	৪৪
৩৫ - ৩৯	৬	৪০
৩০ - ৩৪	৭	৩৪
২৫ - ২৯	১১	২৭
২০ - ২৪	৬	১৬
১৫ - ১৯	৮	১০
১০ - ১৪	২	২

N = ৫০

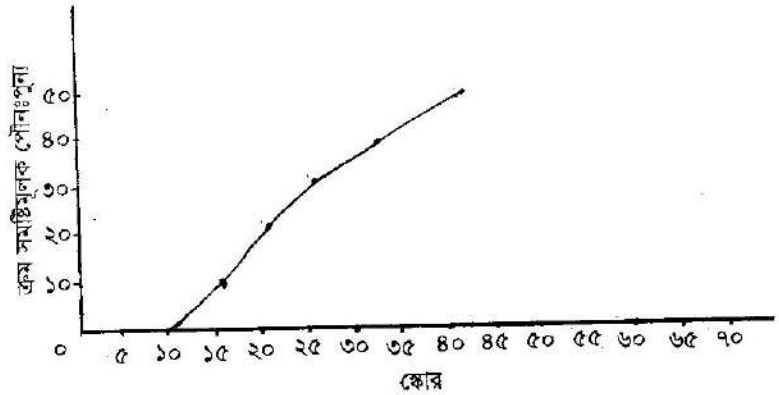

প্রথম উদাহরণের মতই X অক্ষ রেখায় শ্রেণিব্যবধান এবং Y অক্ষ রেখায় ক্রম সমষ্টিমূলক পৌনঃপুন্য বসান হল। প্রত্যেকটি শ্রেণি ব্যবধানের ক্রমসমষ্টিমূলক পৌনঃপুন্যের একটি করে বিন্দু বসিয়ে নিন, বিন্দুগুলো যোগ করেই ক্রমসমষ্টিমূলক পৌনঃপুন্য চিত্রটি অঙ্কিত হলো।

ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা রেখা চিত্র বা ওজাইভ
(Cumulative Percentage Curve or Qgive) ঃ

সাধারণ ক্রমসমষ্টিমূলক পৌনঃপুন্য বণ্টনের মতো ক্রমসমষ্টিমূলক শতক রেখাচিত্রে পৌনঃপুন্যগুলোকে পরপর যোগ করে প্রত্যেকটি পৌনঃপুন্যকে বণ্টনের মো সংখ্যা বা N-এর শতকরারূপে প্রদান করা হয়।

নিম্নের ছকে একটি পৌনঃপুন্য বণ্টনের ক্রম সমষ্টিমূলক পৌনঃপুন্য (Cumulat Frequencies) এবং ক্রম সমষ্টিমূলক শতকরা পৌনঃপুন্যের তালিকা দেয়া হলো

ছক - ৩

ক্রম সমষ্টিমূলক শতকরা পৌনঃপুন্যের তালিকা ঃ

(১) শ্রেণি ব্যবধান (i)	(২) পৌনঃপুন্য (f)	(৩) ক্রম সমষ্টিমূলক (Cum.f)	(৪) ক্রম সমষ্টিমূলক শতক পৌনঃপুন্য (Cum.% f)
৭৫ - ৭৯	১	১২৫	১০০.০
৭০ - ৭৪	২	১২৪	৯৯.২
৬৫ - ৬৯	৪	১২২	৯৭.৬
৬০ - ৬৪	৯	১১৮	৯৪.৪
৫৫ - ৫৯	১৪	১০৯	৮৭.২
৫০ - ৫৪	২০	৯৫	৭৬.০
৪৫ - ৪৯	৩২	৭৫	৬০.০
৪০ - ৪৪	২০	৪৩	৩৪.৪
৩৫ - ৩৯	১৩	২৩	১৮.৪
৩০ - ৩৪	৬	১০	৮.০
২৫ - ২৯	৩	৪	৩.২
২০ - ২৪	১	১	০.৮
	= ১২৫		

উপরের বণ্টনে শতকরা বলতে মোট সংখ্যা N-এর শতকরা রূপ। এ শতকরা করতে প্রথমে 1/N বের করে নিতে হয়। 1/N কে হার (Rate) বলা হয়। এ প্রত্যেকটি ক্রমসমষ্টিমূলক পৌনঃপুন্যকে ঐ হার দিয়ে গুণ করে এবং গুণফলকে দিয়ে গুণ করলেই ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা পাওয়া যাবে।

উপরের বণ্টনে হার 1/N = ১ ÷ ১২৫ = ০.০০৮। এরপর ২০ -২৪ ব্যবধানটির ক্রমসমষ্টিমূলক পৌনঃপুন্য ১। অতএব, এ শ্রেণিব্যবধানটির

সমষ্টিমূলক শতকরা = ১ x .০০৮ x ১০০ = ০.৮। অনুরূপভাবে ২৫ - ২৯ শ্রেণি-ব্যবধানের ক্রম সমষ্টিমূলক শতকরা = ৪ x .০০৮ x ১০০ = ৩.২, ৩০ - ৩৪ শ্রেণি-ব্যবধানের ক্রম সমষ্টিমূলক শতকরা = ১০ x .০০৮ x ১০০ = ৮ ইত্যাদি।

শতাংশ বিন্দু (Percentile Points)

কোনো পৌনঃপুন্য বণ্টনে মধ্যক (Median) হল এমন একটি বিন্দু যার উপরে ৫০% এবং নিচে ৫০% স্কোর অবস্থান করে। অনুরূপভাবে Q_1 হল সে বিন্দু যার নিচে ২৫% স্কোর এবং Q_3 সে বিন্দু যার নিচে ৭৫% স্কোর রয়েছে। এভাবে ১০%, ৪৭%, ৬৩%, ৯০% কিংবা যে কোনো বিন্দুর শতকরা স্কোর কল্পনা করা যায়। এ ধরনের বিন্দুগুলোই সাধারণভাবে শতাংশ বিন্দু নামে পরিচিত। এ বিন্দুটিকে P_{10}, P_{47}, P_{63} P_{94} ইত্যাদি প্রতীক দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এ ক্ষেত্রে মধ্যক হল P_{50}, Q হলো P_{25}, Q_3 হলো P_{75} ।

শতাংশ বিন্দু (Percentile) বের করার সূত্র

এখানে P = বণ্টনের যে বিন্দুর শতকরা বের করতে হবে $P_p = L + \left(\frac{P_N - F}{f_p}\right) x i$

L = যে শ্রেণি ব্যবধানে Pp পড়ে তার ঠিক নিম্ন সীমা।

P_N = P তে পৌছতে N এর যে অংশটুকু নিচে থেকে গুণে নিতে হবে। F = L এর নিচে কতগুলো শ্রেণি সমষ্টি থাকবে তাদের সবগুলোর পৌনঃপুন্য সমষ্টি i = শ্রেণি-ব্যবধানের দৈর্ঘ্য।

শতাংশ সারি (Percentile Rank)

শতকরা সারি বলতে কোনো একটি বণ্টনে কোনো বিশেষ ব্যক্তির অবস্থিতি বুঝায়। ব্যক্তির নিজস্ব স্কোর অনুযায়ী বণ্টনের মধ্যে তার একটি নির্দিষ্ট স্থান থাকে, ঐ স্থানটিকে ব্যক্তির সারি বা Rank বলে। এ সারিটিকে শতকরা হিসাবে বা ১০০ এর অংশ রূপে প্রকাশ করলে ঐটিকে শতাংশ সারি নাম দেয়া যায়। আবার শতাংশ সারির সঙ্গে শতাংশ বিন্দুর (Percentile) পার্থক্য বুঝতে হবে। কোনো বণ্টনের মোট স্কোরের একটি বিশেষ শতকরা নিয়ে বণ্টন নিচ থেকে উপর দিকে গণনা করে কোনো বিন্দুতে গিয়ে পৌছলে ঐ বিশেষ শতকরাটি পাওয়া যাবে এবং গণনার ফলে যে বিন্দুটি চিহ্নিত হবে সেটিকেই শতাংশ বিন্দু নাম দেয়া যায়। যেমন ৩০% মানে ঐ নির্দিষ্ট বিন্দু যার নিচে ৩০ শতাংশ স্কোর আর তার উপরে ৭০ শতাংশ স্কোর থাকবে। শতাংশ হিসাবে মধ্যক এমন একটি বিন্দু যার উপরে ও নিচে ৫০% স্কোর অবস্থান করে। শতাংশ সারি (PR) বের করতে হলে যে ব্যক্তির শতাংশ সারি বের করা হবে তার স্কোরটি নিতে হবে। এরপর মোট

স্কোরের শতকরা কতভাগ সেই স্কোরটির নিচে আছে। সে শতকরাটিই ঐ ব্যক্তির শতাংশ সারি।

শতাংশ বিন্দু নির্ণয় করার সময় মোট স্কোরের একটি বিশেষ শতকরা নিয়ে শুরু করতে হয়, যেমন ৩০% বা ৪৫%, তখন বন্টনটির নিচে থেকে উপর দিকে গণনা করে ঐ বিশেষ বিন্দুটিতে গিয়ে পৌছলে যে শতকরাটি পাওয়া যাবে, সেটিই শতাংশ বিন্দু। যেমন- $P_{১০}$, $P_{৩০}$। কিন্তু শতাংশ সারি বের করার সময় বিপরীত উপায় অনুসরণ করতে হয়, এখানে ব্যক্তির স্কোর থেকে শুরু করে এবং বন্টনের মধ্যে ঐ স্কোরের নিচে শতকরা কত স্কোর আছে তা বের করতে হয়।

উদাহরণ ঃ-

শ্রেণি ব্যবধান(i)	৪০-৪৪	৪৫-৪৯	৫০-৫৪	৫৫-৫৯	৬০-৬৪	৬৫-৬৯	৭০-৭৪
পৌনঃপুন্য (f)	৩	৮	১০	১৬	৬	৫	২

উপরে বর্ণিত ছক থেকে-

(ক) $P_{১০}$, $P_{২০}$, $P_{৪০}$, $P_{৫০}$, $P_{৭০}$, $P_{৮০}$ শতাংশ বিন্দুগলো P_p নির্ণয় করুন।

(খ) ৪৭, ৫২, ৫৭, ৬২, এর শতাংশ সারি বের করুন।

সমাধান ঃ (ক)

নির্ণেয় শতাংশ বিন্দু বের করার সূত্র হলো - $P_p = L + \left(\frac{P_N - F}{f_p}\right) \times i$

$P_{১০}$ বের করতে হলে, ৫০ এর ১০% = ৫ নির্ণয় করে প্রদত্ত বন্টনের $P_{১০}$ এর হিসাবে সেই বিন্দুটি যার নিচে ঠিক ৫টি স্কোরের অবস্থান, তা হলো-

$$P_{১০} = ৪৪·৫ + \frac{৫ - ৩}{৮} \times ৫ = ৪৪·৫ + \frac{২ \times ৫}{৮} = ৪৪·৫ + ১·২৫ = ৪৫·৭৫$$

অনুরূপভাবে -

$$P_{২০} = ৪৪·৫ + \frac{১০ - ৩}{৮} \times ৫ = ৪৮·৮৭ \text{ (৫০ এর ২০\% = ১০)}$$

$$P_{৪০} = ৪৯·৫ + \frac{২০ - ১১}{১০} \times ৫ = ৫৪·০ \text{ (৫০ এর ৪০\% = ২০)}$$

$$P_{৫০} = ৫৪·৫ + \frac{২৫ - ২১}{১৬} \times ৫ = ৫৫·৭৫ \text{ (৫০ এর ৫০\% = ২৫)}$$

$$P_{৭০} = ৫৪\cdot৫ + \frac{৩৫ - ২১}{১৬} \times ৫ = ৫৮\cdot৮৭ \text{ (৫০ এর ৭০\% = ৩৫)}$$

$$P_{৮০} = ৫৯\cdot৫ + \frac{৪০ - ৩৭}{৬} \times ৫ = ৬২\cdot০ \text{ (৫০ এর ৮০\% = ৪০)}$$

সমাধান ঃ (খ)

প্রদত্ত পৌনঃপুন্য বণ্টন হতে ৪৭ স্কোরটির শতাংশ সারি বা PR বের করতে হবে। বণ্টন থেকে দেখা যাচ্ছে ৪৭ স্কোরটি ৪৫ - ৪৯ শ্রেণি ব্যবধানে অবস্থান করছে। ঐ শ্রেণি ব্যবধানের নিম্নপ্রান্ত ৪৪·৫ পর্যন্ত স্কোর আছে ৩টি। ঐ শ্রেণি ব্যবধানের মধ্যে ছড়িয়ে আছে ৮টি স্কোর। শ্রেণি ব্যবধানের দৈর্ঘ্য ৫ দ্বারা ঐ ৮টি স্কোরকে ভাগ করলে ভাগফল ১·৬ স্কোর। ৪৭ স্কোরটি শ্রেণি ব্যবধানের নিম্নপ্রান্ত থেকে (৪৭-৪৪·৫) = ২.৫ স্কোর। ৪৭ স্কোরটি শ্রেণি ব্যবধানের নিম্নপ্রান্ত থেকে (৪৭-৪৪·৫) = ২·৫ স্কোর একক দূরে অবস্থিত। এখন ২·৫ কে ১·৬ দ্বারা গুণ করলে গুণফল হবে ৪। ঐ শ্রেণি ব্যবধানের নিচের ৩টি স্কোরের মধ্যে ৪ যোগ করলে যোগফল হবে ৭। অতএব, ৭ হল মোট স্কোর বা N এর সেই অংশ যা ৪৭ স্কোরটির নিচে অবস্থিত। এখন, ৭কে মোট স্কোরের শতকরায় নিলেই ৪৭ স্কোরটির শতাংশ সারি পাওয়া যাবে।

৭, মোট স্কোর N এর শতকরা ১৪। অতএব ৪৭ এর শতাংশ সারি হলো ১৪%।

অনুরূপভাবে-

৫২ স্কোরটির শতাংশ সারি (PR) = ৩২%

৫৭ " " " (") = ৫৮%

৬২ " " " (") = ৮০%

৭২ " " " (") = ৯৮%

ওজাইভ থেকে শতাংশ বিন্দু ও শতাংশ সারি গণনা ঃ ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা রেখাচিত্র বা ওজাইভ এর চিত্র থেকে সরাসরি শতাংশ বিন্দু এবং শতাংশ সারি গণনা করা যায়। ছক - ৩ এর ৪নং স্তম্ভে ৮তম শতাংশ বিন্দু হচ্ছে ৩৪·৫ এর কাছাকাছি। ৩৫তম শতাংশ বিন্দু হচ্ছে ৪৫·৫ এর কাছাকাছি। আবার ৭৬তম শতাংশ বিন্দু ৫৫ এর ৯৮তম শতাংশ বিন্দু ৭৫·৫ এর কাছাকাছি ইত্যাদি।

এভাবে শতাংশ সারি (PR) ছক-৩ এর বণ্টনটি থেকে সরাসরি বের করা যায়। যেমন স্কোর ৩২ এর শতাংশ সারি ৮%, ৪৭ এর শতাংশ সারি ৫%, ৫৬ এর শতাংশ ৮২% এবং ৭৩ এর শতাংশ ৯৯% ইত্যাদি।

ওজাইভ চিত্র থেকে শতাংশ বিন্দু ও শতাংশ সারি নির্ণয় ঃ ছক-৩ বন্টনটির শতকরা পৌনঃপুন্য চিত্র বা ওজাইভ অঙ্কন করা হলো, ওজাইভ চিত্র থেকে সরাসরি যে কোন স্কোরের শতাংশ বিন্দু ও শতাংশ সারি বের করা যায়।

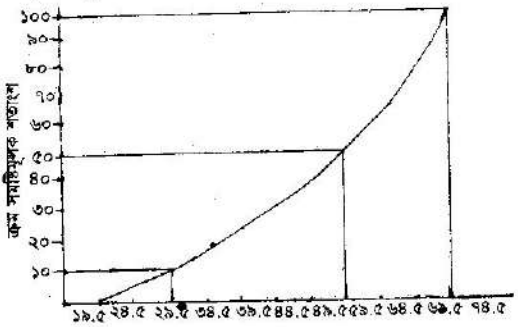

ওজাইভের ব্যবহার ঃ ওজাইভের বহুবিধ ব্যবহার প্রচলিত, সাধারণত তিন ধরনের ব্যবহার-

(১) শতাংশ বিন্দু ও শতাংশ সারি নির্ণয় করা

(২) দুটি দলের পারদর্শিতা বা অর্জিত জ্ঞানের তুলনা করা। এবং

(৩) শতাংশ মান (Percentile Norm) বের করা।

ছক - ৪

শ্রেণি ব্যবধান (i)	ছেলে পৌনঃপুন্য f	ক্রম সমষ্টি মূলক পৌনঃপুন্য (Cum.f)	ক্রম সমষ্টি মূলক শতকরা পৌনঃপুন্য (Cum.%f)	মেয়ে পৌনঃপুন্য f	ক্রম সমষ্টি মূলক পৌনঃপুন্য (Cum.f)	ক্রম সমষ্টিমূল শতকরা পৌনঃপুন্য (Cum.% f
৭০-৭৪	১	৮০	১০০.০০	০	৮০	১০০.০০
৬৫-৬৯	১	৭৯	৯৮.৭৫	১	৮০	১০০.০০
৬০-৬৪	২	৭৮	৯৭.৫০	০	৭৯	৯৮.৭৫
৫৫-৫৯	১০	৭৬	৯৫.০০	২	৭৯	৯৮.৭৫
৫০-৫৪	২৪	৬৬	৮২.৫০	৫	৭৭	৯৬.২৫
৪৬-৪৯	২১	৪২	৫২.৫০	৭	৭২	৯০.০০
৪০-৪৪	১১	২১	২৬.২৫	২১	৬৫	৮১.২৫
৩৬-৩৯	৮	১০	১২.৫০	২৩	৪৪	৫৫.০০
৩০-৩৪	২	২	২.৫০	১০	২১	২৬.২৫
২৫-২৯	০	০	০	৮	১১	১৩.৭৫
২০-২৪	০	০	০	৩	৩	৩.৭৫
	N = ৮০			N = ৮০		

দুটি দলের তুলনামূলক ওজাইভ চিত্র ঃ

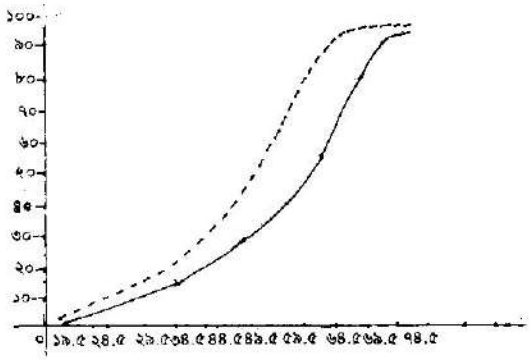

স্কোর

উপরের চিত্র থেকে দুটি দলের তুলনামূলক ওজাইভ দেখা যায়, এ চিত্র থেকে আমরা সরাসরি উভয়দলের পারদর্শিতা বা অভিজ্ঞ জ্ঞান তুলনা করতে পারি।

অন্যান্য চিত্রমূলক পদ্ধতি ঃ বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, শিক্ষা সংক্রান্ত প্রভৃতি বিষয় সমূহের পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ থেকে তথ্য চিত্রাকারে প্রকাশ করলে শিখন (Learning) ও শিক্ষণ (Teaching) প্রক্রিয়ায় বহুলাংশে সহজ ও নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। এ কারণে নানান ধরণের চিত্র ব্যবহৃত হয়। এ চিত্রগুলো-

(১) রেখা চিত্র (Line Graph)
(২) বার চিত্র (Bar Graph)
(৩) পাই চিত্র (Pie Diagram)
(৪) পৌনঃপুন্য বহুভূজ (Frequency Polygon)
(৫) আয়তলেখ বা স্তম্ভ চিত্র (Histogram)

(১) রেখা চিত্র (Line Graph)

নিচের রেখাচিত্রটিকে একটু মনযোগের সাথে লক্ষ্য করলেই সাধারণভাবে মনে রাখার পরিমাপটি জানা যায়। বিভিন্ন শ্রেণির বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে কতো সময়ের ব্যবধানে শিক্ষার্থীরা কতটা মনে রাখতে পারে, তা ধারনা করা যাবে।

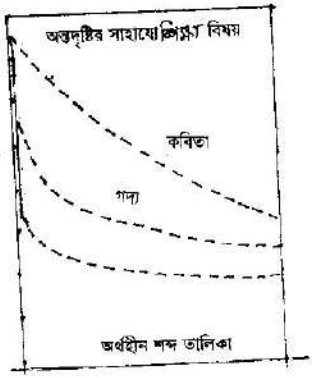

শেখার পর অতিবাহিত সময় চিত্রে (১) অর্থহীন শব্দ তালিকা, (২) পদ্য (৩) কবিতা এবং (৪) আদর্শদৃষ্টির সাহায্যে শেখা বিষয়ের শিখন ফল পরীক্ষণ করা হয়েছে। চিত্রের সাহায্যে শিখন প্রক্রিয়ার মনে রাখার সময়ের ব্যবধান প্রদর্শন করা হয়েছে। ৫ দিন পরে অর্থহীন শব্দ তালিকার চিত্রে ৩০%, পদ্যের ক্ষেত্রে ৪২%, কবিতার ক্ষেত্রে ৮২% এবং আদর্শদৃষ্টির সাহায্যে শেখা বিষয় বস্তুর ক্ষেত্রে ১০০% মনে থাকার পরিমাপটি অঙ্কন করা হয়েছে। এভাবে ১০, ১৫, ২০, ৩০ দিন পরেও বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মনে রাখার পরিমাপটি চিত্রের সাহায্যে খুব সহজেই পরিবেশন করা যায়।

২। বার চিত্র (Bar Graph)

একাধিক বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য নিয়ে ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে তুলনা করতে যার লেখচিত্র বা বার গ্রাফ ব্যবহার করা হয়। বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, শিক্ষাসহ বিভিন্ন বিষয়ে বারচিত্র সহজেই অঙ্কন করা যায়। বাংলাদেশের ছয়টি বিভাগীয় শহরের লোকসংখ্যা পেশা ভিত্তিক বারচিত্র উদাহরণ স্বরূপ অঙ্কন করা হলো।

ছক - ৫

শহরের নাম	চাকুরিজীবী (শতকরা)	শ্রমিক (শতকরা)	ব্যবসায়ী শতকরা)	অন্যান্য পেশাজীবী (শতকরা)	বেকার/কর্মহীন (শতকরা)
ঢাকা	১২	২৮	২৬	২৩	১১
চট্টগ্রাম	০৮	৩১	৩৫	১৯	০৭
রাজশাহী	১৪	২৭	২৫	২১	১৩
খুলনা	১০	৩৮	৩৪	১৫	০৩
বরিশাল	১৭	২৩	২১	৩১	০৮
সিলেট	১১	২১	২৩	৩৯	০৬

বাংলাদেশের ছয়টি বিভাগীয় শহরের লোকসংখ্যা পেশাজীবি বারচিত্র নিম্নরূপঃ-

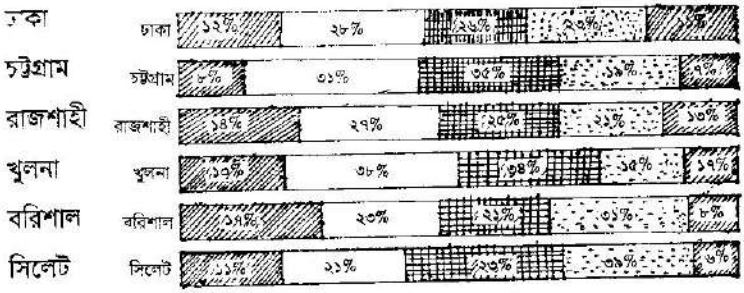

৩। পাইচিত্র (Pie Diagram)

যেকোন তথ্য বা পরিমাপকে বৃত্তের আকারে প্রকাশ করা যায়। এটি পাই চিত্র নামে পরিচিত। একটি বৃত্তের অন্তর্গত ক্ষেত্রটিতে ৩৬০° কোণে ভাগ করা যায়। এস,এস,সি পরীক্ষায় একটি বিদ্যালয়ের ফলাফল নিম্নে দেয়া হলো। একে পাই চিত্রে প্রকাশ করা হবে।

১৯৯৫ সনের এস,এস,সি পরীক্ষার ফলাফল (শতকরা হিসাবে)

বিদ্যালয়ের নাম	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ	অকৃত কার্য
বাবুগঞ্জ বিদ্যালয়	৩২%	৫৩%	১২%	৩%

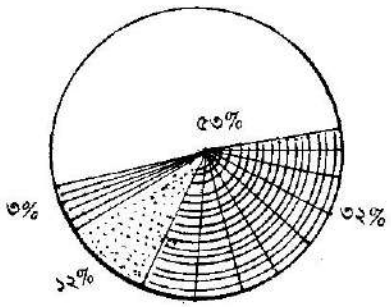

৪। পৌনঃপুন্য বহুভূজ ও আয়তলেখ

চিত্র দুটি স্কোর বিন্যাস অধ্যায়ে ইতিপূর্বেই ব্যাপকভাবে আলোচিত ও চিত্র গঠন করা হয়েছে।

নির্ভরণ (Regression)

পরিসংখ্যান প্রক্রিয়া সহ-সম্পর্ক (Correlation) বিশ্লেষণের মাধ্যমে দুটি চলকের মধ্যে পারস্পারিক সহগমন বা সম্পর্ক যাচাই করা হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে একটির গতিশীলতা অপরটির উপর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে তা নির্ণয় করা যায় না। একটি চলকের গতিশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে অপরটিতে যে ধরনের পরিবর্তন ঘটে তা পরিমাপ করার জন্য নির্ভরণ বিশ্লেষণের সাহায্য নিতে হয়। প্রখ্যাত জীবতত্ত্ববিদ স্যার ফ্রেন্সিস গেলটন এটা প্রণয়ন করেন। বংশগতির বৈশিষ্ট্য গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি নির্ভরণ প্রক্রিয়ার ব্যবহার করেন, কোন জাতির উত্তর পুরুষদের দৈহিক উচ্চতা সে জাতির গড় উচ্চতার দিকে প্রত্যাবর্তিত হওয়ার প্রবণতাই তিনি প্রমাণ করেন। আজকাল নির্ভরন প্রক্রিয়া ব্যাপকতর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেকোনো চলকের একটির পরিপ্রেক্ষিতে অপরটির অনুমিত গড় গতিশীলতা পরিমাপ করতে নির্ভরণ প্রক্রিয়াই ব্যবহার করতে হয়। এ ক্ষেত্রে একটি চলকের পরিপ্রেক্ষিতে অপর চলকটিতে যে গড় পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় তা নির্ভরণ বিশ্লেষণে পরিমাপ করা যায়। ফলে একটি চলকের প্রয়োজক (Subject) অপরটিকে সাপেক্ষ (Relative) ধরা হয়। এখন একটি চলকের পরিবর্তনের অপরটি কি মাত্রায় প্রভাবিত হয়েছে তা বের করা যায়। একটি চলককে পরিপ্রেক্ষিতে অপর চলকের গতিশীলতা পরিমাপের ক্ষেত্রে নির্ভর রেখা অঙ্কন করতে হয়। একটি চলকের গড় মানগুলোর বিপরীতে অন্য একটি চলকের যথার্থ গড় মানগুলোকে নির্ভর রেখা প্রদর্শন করে। x ও y যথাক্রমে দুটি চলক দ্বারা সূচিত করা যায় এবং নিম্নোক্ত দু'টি নির্ভর রেখা পাওয়া যায়। নির্ভররেখা দু'টির দু'টি নির্ভর সমীকরণ হলোঃ

১। $y = a_1 + b_1 \chi$, χ এর উপর এর নির্ভর সমীকরণ, এবং

২। $x = a_2 + b_2 y$, y এর উপর এর নির্ভর সমীকরণ।

এখানে a_1, a_2 এবং b_1, b_2 ধ্রুবক b_1, x চলকের উপর y চলকের নির্ভর রেখার x অক্ষরে ঢাল (Step) নির্দেশ করে x এর উপর y এর নির্ভরাঙ্ক। অতএব, x এর উপর y চলকের নির্ভরাঙ্ক হলো x চলকের প্রতি একক পরিবর্তনের বিপরীতে y চলকের পরিবর্তনের পরিমাপ এবং a_1 হল মূল বিন্দু এবং যে বিন্দুতে x চলকের উপর y নির্ভর রেখা y অক্ষকে স্পর্শ করে তাদের মধ্যবর্তী y অক্ষের অনুচ্ছেদ অনুরূপভাবে b_2, y চলকের উপর x চলকের নির্ভর রেখার x অক্ষতে ঢাল এবং y চলকের প্রতি একক পরিবর্তনের বিপরীতে x চলকের পরিবর্তন পরিমাপ করে ও b_2 কে y এর উপর x এর নির্ভারক বলা হলো a_2 হলো x অক্ষতে মূলবিন্দু এবং x অক্ষের যে বিন্দুতে y এর উপর নির্ভরণ রেখা ছেদ করে উহার দূরুত্ব। নিম্নের চিত্রে দেখানো হয়েছে।

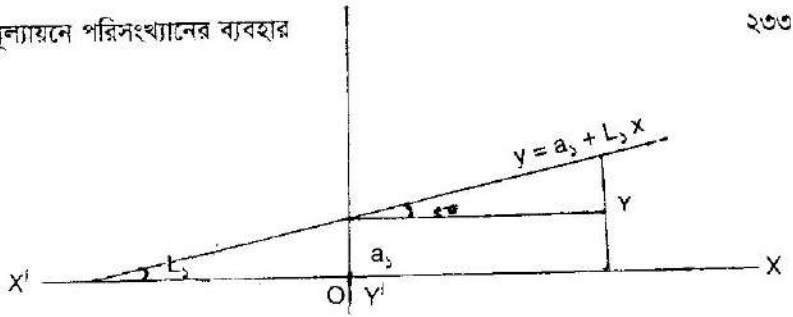

নির্ভরণ সমীকরণে a_1 এবং b_1 ধ্রুবক, a_1 এবং b_1 এর ঢাল নির্ণয় করতে হবে। a_1 এবং b_1 এর মান জানলে x মানের বিপরীতে y এর মান নির্ণয় করা যায়। অনুরূপভাবে a_2, b_2 এর মান অনুসারে y মানের বিপরীতে x এর আনুমানিক মান নির্ণয় করা যায় নুন্যতম বর্গ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ধ্রুবক দ্বয়ের মান বের করা যায়। ফরাসী গণিতজ্ঞ এলড্রিন লেপনড্রি নুন্যতম বর্গ প্রক্রিয়া ব্যবহার করেন, সংখ্যাত্মক তথ্যের ক্ষেত্রে সরল রেখা অংকনের জন্য এ প্রক্রিয়ার সার্বজনিন গ্রহণ যোগ্যতা রয়েছে। এখানে অঙ্কিত রেখা হতে প্রতিটি বিন্দুর বিচ্যুতির বর্গের যোগফল হবে সবচেয়ে নুন্যতম, ইহাই বর্গ প্রক্রিয়ার মূল প্রকল্প। এভাবে প্রথম সমীকরণীকে $a_1 = Y - b_1 x$ অথবা $Y = a_1 + b_1 x$

এখানে x = প্রথম চলকের মান, x = x চলকের গড়

y = দ্বিতীয় চলকের মান Y = y চলকের গড় এবং X = স্বাধীন চলক, y = অধীন চলক। যখন তথ্য সারির মানগুলো খুব বড় হয় তখন আনুমানিক গড় বিয়োগ করে পরিমাপকে সহজ করা হয়। সে ক্ষেত্রে সূত্রটি ঃ

$$b_1 = \frac{\sum dxdy - \frac{\sum dx \sum dy}{n}}{\sum dx^2 - \frac{(\sum dx)^2}{n}}$$

এখানে,

$dx = x - Ax$

$dy = y - Ay$

x = স্বাধীন চলকের মান

y = অধীন চলকের মান

Ax = x তথ্যসারির আনুমানিক গড়।

Ay = y তথ্যসারির আনুমানিক গড়।

দ্বিতীয় সমীকরণ হতে x = অধীন চলক এবং y = স্বাধীন চলক ধরে a_2 এবং b_2 এর সূত্র পাওয়া যায়।

$$a_2 = X - b_2Y$$

$$b_2 = \frac{\Sigma dxdy - \frac{\Sigma dx \Sigma dy}{n}}{\Sigma dy^2 - \frac{(\Sigma dy)^2}{n}}$$

এখানে,

$dx = x - Ax$ $\quad$ Ax = x সারির আনুপাতিক গড়

$dy = y - Ay$ $\quad$ Ay = y সারির আনুপাতিক গড়

নির্ভরাঙ্ক ঃ নির্ভর রেখার ব্যবহৃত প্রতীক চিহ্ন b_1 এবং $= b_2$ মানদ্বয়ের নির্ভরাঙ্ক বলা হয়। b_1 কে x এর উপর y এর নির্ভরক এবং b_2 কে y এর উপর x এর নির্ভরাঙ্ক বলা হয়।

নির্ভরাঙ্ক স্বাধীন চলকে একক পরিবর্তনের জন্য অধীন চলকে অনুরূপ গড় পরিবর্তনের জন্য নির্দেশ করে নির্ভরাঙ্ক দু'টি সূত্র হলো ঃ

$$b_1 = \frac{\Sigma(x-X)(y-Y)}{\Sigma(x-X)^2}$$ $\quad$ x এর উপর y এর নির্ভরক

$$b_2 = \frac{\Sigma(x-X)(y-Y)}{\Sigma(y-y)^2}$$ $\quad$ y এর উপর x নির্ভরক

সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে b_1 এবং b_2 নির্ণয়ের সূত্র দু'টি

$$b_1 = \frac{\Sigma dxdy - \frac{\Sigma dx \Sigma dy}{n}}{\Sigma dx^2 - \frac{(\Sigma dx)^2}{n}} \qquad b_2 = \frac{\Sigma dxdy - \frac{\Sigma dx \Sigma dy}{n}}{\Sigma dy^2 - \frac{\Sigma dy^2}{n}}$$

এখানে,

$dx = x - Ax$

$dy = y - Ay$

Ax = x তথ্যসারির আনুমানিক গড়

Ay = y তথ্যসারির আনুমানিক গড়

নির্ভরাঙ্কের সাহায্যে সহ পরিবর্তন নির্ণয় ঃ

$r = \sqrt{b_1 b_2}$

r এবং σ ব্যবহার করে নির্ভরাঙ্ক বির্ণয়

r = সহ-সম্পর্ক, σx = x চলকের আদর্শ বিচ্যুতি এবং σy = y চলকের আদর্শ বিচ্যুতি

এখানে, $b_1 = \frac{r\sigma y}{\sigma x}$ এবং $b_1 = \frac{r\sigma x}{\sigma y}$

উদাহরণ ঃ- ১

নিম্নোক্ত উপাত্ত হতে নির্ভরাঙ্কদ্বয় এবং সহ পরিবর্তন নির্ণয়

ব্যক্তি	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ
উচ্চতা (ইঞ্চিতে)	৫১	৫৪	৫৮	৬১	৬২	৬৫	৬৯	৭০
ওজন (পাউন্ডে)	৮৪	৯২	৯৭	১০৮	১১২	১৩৪	১৪২	১৩৭

সমাধান ঃ

b_1, b_2 এবং r পরিমাপের জন্য ছক

x	y	x- ৬১ = dχ	y-১১২ = dy	dxdy	dx^2	dy^2
৫১	৮৪	-১০	-২৮	২৮০	১০০	৭৪৮
৫৪	৯২	-৭	-২০	১৪০	৪৯	৪০০
৫৮	৯৭	-৩	-১৫	৪৫	৯	২২৫
৬১	১০৮	০	-৪	০	০	১৬
৬২	১১২	১	০	০	১	০
৬৫	১৩৪	৪	২২	৮৮	১৬	৪৮৪
৬৯	১৪২	৮	৩০	২৪০	৬৪	৯০০
৭০	১৩৭	৯	২৫	২২৫	৮১	৬২৫
		২	১০	১০১৮	৩২০	৩৪৩৪

$$b_1 = \frac{\sum dxdy - \frac{\sum dx \sum dy}{n}}{\sum dy^2 - \frac{(\sum d\chi)^2}{n}} = \frac{১০১৮ - \frac{২ \times ১০}{৮}}{৩২০ - \frac{২^২}{৮}} = \frac{১০১৮ - ২.৫}{৩২০ - ৫} = \frac{১০১৫.৫}{৩১৯.৫} = ৩.১৮$$

$$b_2 = \frac{\sum dxdy - \frac{\sum dx \sum dy}{n}}{\sum dy^2 - \frac{(\sum dy)^2}{n}} = \frac{১০১৫.৫}{৩৪৩৪ - \frac{(১০)^২}{৮}} = \frac{১০১৫.৫}{৩৪৩৪-১২.৫} = \frac{১০১৫.৫}{৩৪২১.৫} = ০.৩$$

$r = \sqrt{b_1 b_2} = \sqrt{৩.১৮} \times ০.৩ = \sqrt{০.৯৫৪} = ০.৯৮$

উদাহরণ ঃ- ২ $\sigma x = ১.৪$ $\sigma y = ৯৮$ এবং $r = ০.৭$ দেয়া আছে।

b_1 এবং b_2 বের করতে হবে।

$$b_1 = r \frac{\sigma y}{\sigma x} = ০.৭ \times \frac{৯.৮}{১.৪} = ০.৭ \times ৭ = ৪.৯$$

$$b_2 = r \frac{\sigma y}{\sigma x} = ০.৭ \times \frac{১৪}{৯.৮} = \frac{০.৭}{৭} = ০.১।$$

তাৎপর্য নির্ণয়ের অভীক্ষা
(Test Of Significance)

মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাগবেষণার ক্ষেত্রে প্রকল্প (Hypothesis) বা অনুমিত সিদ্ধান্ত দু'ধরনের পরিসাংখ্যিক অভীক্ষা (Statistical Test) দ্বারা যাচাই করা হয়। এগুলোকে পরামাত্রিক অভীক্ষা (Parametric Test) ও অপরামাত্রিক (Non-Parametric Test) অভীক্ষা বলা হয়। পরামাত্রিক অভীক্ষায় যে তথ্যবিশ্ব বা সমগ্রক থেকে নমুনা চয়ন করা হয় তার মাত্রা (Parameter) সম্পর্কে কিছু সুনির্দিষ্ট শর্ত অনুসরণ করতে হয়। আর অপরামাত্রিক অভীক্ষায় এ ধরনের মাত্রা (Parameter) সম্পর্কে কোন শর্ত থাকে না। পরিসংখ্যানবিদদের মতে পরামাত্রিক অভীক্ষা বেশি শক্তিশালী। Z-অভীক্ষা, t- অভীক্ষা ও F অভীক্ষা এ তিনটি পরামাত্রিক অভীক্ষা। আর X^2 (কাইবর্গ) অভীক্ষা, ম্যান হুইটনে অভীক্ষা (Mann-Whiteney Test) T (টাউ) অভীক্ষা, কেন্ডাল (Kendal) এর অভীক্ষা ইত্যাদি অপরামাত্রিক অভীক্ষা।

পরামাত্রিক অভীক্ষার ক্ষেত্রে কতগুলো প্রত্যয় (Concept) সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন। এ প্রত্যয়গুলো স্বাধীনতা মাত্রা (degrees of freedom) নাস্তি প্রকল্প (null hypothesis), অর্থবহতার মাত্রা (level of significance) ইত্যাদি পরিসাংখ্যিক অভীক্ষার তাৎপর্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রান্ত বৈশিষ্ট্যগুলো কতটা যুক্তিযুক্ত সে সিদ্ধান্ত নিতে প্রয়োজন হয়।

স্বাধীনতা মাত্রা (Degrees of freedom বা df) কে পরিবর্তিত হওয়ার স্বাধীনতা বুঝায়। পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা মাত্রা হলো পর্যবেক্ষণের সে সংখ্যা যা পরস্পরের অনুপেক্ষ (independent) বা পরস্পর থেকে স্বাধীন এবং এদের এক থেকে অপরকে প্রতিপাদন (deduced) করা যায় না। মনেকরি ৫টি স্কোরের গড় ৭। এক্ষেত্রে গড় ৭ হওয়ার জন্য মোট স্কোরের ৪টি স্বাধীনভাবে নির্বাচন করা যাবে কিন্তু ৫ম স্কোরটি অবশ্যই বাকি ৪টি স্কোরের সাথে মিলিয়ে নির্বাচন করতে হবে। মনেকরি ৪টি স্কোর হলো ৩, ৮, ৯, ১০। এ চারটি স্কোরসহ ৫টি স্কোরের গড় ৭ হলে পঞ্চম স্কোরটি অবশ্যই ৫ হবে। এখানে বন্টনের চারটি স্কোর অনপেক্ষ বা স্বাধীন। অর্থাৎ এ চারটি স্কোর যে কোনো মানের হতে পারে। এদেরকে পরস্পর থেকে প্রতিপাদন করা যায় না। পঞ্চম স্কোরটি প্রতিক্ষেত্রেই স্থির বা সুনির্দিষ্ট থাকবে। কারণ সবক্ষেত্রেই গড় ৭। সুতরাং

আলোচ্য উদাহরণটিতে স্বাধীনতা মাত্রা হলো ৪। অন্যভাবে লিখা যায় df = N - ১ = ৫ - ১ = ৪। এখানে মোট স্কোরের সংখ্যা N হচ্ছে ৫। স্বাধীনতা মাত্রার ধারণাটি আবার অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়। মনেকরি কোনো বন্টনে ৫০টি স্কোর রয়েছে, এ অবস্থায় স্বাধীনতা মাত্রা ৫০। কারণ স্কোরের সংখ্যা ৫০। কিন্তু ঐ ৫০টি স্কোরের গড় বের করলে স্বাধীনতা মাত্রা হবে ৪৯। কারণ গড় বের করার ফলে ৫০তম স্কোরটি সুনির্দিষ্ট (fixed) হয়ে যায়। গড় মান পরিবর্তন হবে না। এ কারণে ১টি স্বাধীনতা মাত্রা হারিয়েছে।

df = N- ১ = ৫০ - ১ = ৪৯ স্বাধীনতা মাত্রা, নাস্তি প্রকল্পের (Null hyputhesis) বর্ণনা বা বিবৃতি দিয়েই যে কোনো পরিসংখ্যিক টেস্ট বা যাচাইয়ের কাজ শুরু হয়। H_0 দ্বারা নাস্তি প্রকল্প বুঝানো হয়।

অপার্থক্যের প্রকল্পই নাস্তি প্রকল্প। এটি অন্যভাবে প্রকাশকরা হয়। "যে সব নমুনা নিয়ে কাজ করা হচ্ছে তাদের মধ্যে অর্থবহ পার্থক্য নেই" এ বিবৃতি বা বর্ণনাই নাস্তি প্রকল্প। নমুনাগুলোর মধ্যে প্রাপ্ত পার্থক্য আসলে কি কোনো প্রকৃত পার্থক্যের কারণে না কোনো দৈব ভ্রান্তি (error) বা ত্রুটির কারণে। এটি যেখানে পরীক্ষণদল ও নিয়মিত দলের স্কোরের গড় সমান সেখানে গৃহীত হয়। এটি বাতিল হলে বিকল্প প্রকল্প (H_1) গ্রহণ করতে হয়। গবেষকের গবেষণা প্রকল্পের (Research Hypothesis) অপারেশনাল বিবৃতিকে বিকল্প প্রকল্প হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আবার নাস্তি প্রকল্পের যাচাইকেই অর্থবহতা যাচাই (tests of significance) বা অর্থবহতার স্তর হিসেবে বর্ণনা করা হয়। অর্থবহতার মাত্রাকে যথার্থতার মাত্রাও বলা হয়। নাস্তি প্রকল্প গৃহীত বা বাতিল হবে কিনা তা অর্থবহতার মাত্রা অনুসারেই নির্ধারণ করা হয়। শিক্ষা গবেষণায় সাধারণত দুটি অর্থবহতার মাত্রা ব্যবহৃত হয়। এ দু'টো হচ্ছে ০.০৫ বা ৫% মাত্রা এবং ০.০১ বা ১% অর্থবহতার মাত্রা। ৫% মাত্রায় নাস্তি প্রকল্পটি বাতিল হলে তা পরীক্ষণের ১০০টি পুনরুৎপাদনে ৫ বার নাস্তি প্রকল্পটি সত্যি এবং ৯৫ বার নাস্তি প্রকল্পটি মিথ্যা। একে আরো সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে শতকরা ৯৫ ভাগ ক্ষেত্রে প্রাপ্ত ফলাফল পরীক্ষণ পরিচালনার কারণে ঘটেছে। এটিই ৫% মাত্রায় নাস্তি প্রকল্প বাতিল হওয়ার কারণ। অনুরূপভাবে ০.০১ অর্থবহতা মাত্রায় নাস্তি প্রকল্পটি ১ বার সত্য এবং শতকরা ৯৯ ভাগ মিথ্যা হবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে সাধারণত একই তথ্যবিশ্ব হতে সংগ্রহীত দুটি পৃথক নমুনার দু'টি গড়ের মধ্যে অর্থবহ পার্থক্য যাচাইয়ের ক্ষেত্রে Z- টেস্ট বা t- টেস্ট ব্যবহৃত হয়। নমুনার আকার ৪০ এর কম হলে t টেস্ট এবং নমুনার আকার ৪০ এর চেয়ে বড় হলে Z- টেস্ট ব্যবহার করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, Z- টেস্ট ও t- টেস্টের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই।

নমুনাদলের গড়ের পার্থক্য নির্ণয়ে Z- টেস্টের সূত্র ঃ

$$Z = \frac{(M_1 - M_2) - o}{\sigma ED}$$

এখানে,

M_1 = ১ম নমুনাদলের গড়

M_2 = ২য় নমুনাদলের গড়

σED = দু'টি নমুনা গড়ের

পার্থক্যের প্রমাণ ত্রুটি (Standard error)

σED নির্ণের সূত্র ঃ

$$\sigma ED = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

এখানে, σ_1^2 = ১ম নমুনাদলের আদর্শবিচ্যুতি

σ_2^2 = ২য় নমুনাদলের আদর্শ বিচ্যুতি

n_1 = ১ম নমুনাদলের আকার

n_2 = ২য় নমুনাদলের আকার

Z-এর সূত্রে লিখিত শূন্যের (০) প্রকৃতপক্ষে কোনো ভূমিকা নেই। একই তথ্যবিশ্বের দুটি নমুনাদলের গড়ের পার্থক্য শূন্য (০)। সুতরাং, শূন্য বাদ দিয়ে সূত্রটি হবে,

$$Z = \frac{(M_1 - M_2)}{\sigma ED} = \sqrt{\frac{(M_1 - M_2)}{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

তিন ধরনের ভিন্ন প্রকৃতির দলের জন্য Z- টেস্ট বা t-টেস্ট ব্যবহৃত হয়। এ ভিন্ন রকম দলগুলো হলো

১. অনুপেক্ষ দল (Independent Group)

২. সহ-সম্পর্কযুক্ত দল (Correlated Group)

৩. সমকক্ষ দল (Matched Group)

t- বের করার সূত্রগুলো ঃ

$$t = \frac{(M_1 - M_2)}{\sigma ED}$$

এখানে, M_1 = ১ম দলের গড়

M_2 = ২য় দলের গড়

σED = দু'টি নমুনা গড়ের (M_1 ও M_2) পার্থক্যের প্রমাণ ত্রুটি (Standard error) ভিন্ন ভিন্ন দলের জন্য σED পৃথকভাবে নির্ণয় করার সূত্র ঃ

দল	σED এর সূত্রে
অপেক্ষক	$\sigma ED = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$
সহ-সম্পর্কযুক্ত	$\sigma ED = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2} + 2r}$
সমকক্ষ	$\sigma ED = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2} + [১-r^2]}$

এখানে, σ_1 = ১ম দলের আদর্শ বিচ্যুতি

σ_2 = ২য় দলের আদর্শ বিচ্যুতি,

r = দু'টিদলের স্কোরের সহ-সম্পর্কের সহগঙ্ক।

উদাহণ - ১ ঃ

১০০ জন বালক ও ১০০ জন বালিকার দু'টি পৃথক দলের ভাষা শিক্ষার একটি পরীক্ষায় নিম্নোক্ত তথ্য পাওয়া গেল। তাদের ভাষা শিক্ষার পারদর্শিতার প্রাপ্ত নম্বরের গড়ের মধ্যে কোনো অর্থবহ পার্থক্য আছে কিনা তা যাচাই করতে হবে।

বালক বালিকা	পারদর্শিতার গড়	আদর্শ বিচ্যুতি
বালক	৫৬.৮	৫.৩
বালিকা ৪৮.২	৬.৬	

Z- অভীক্ষা ব্যবহার করে অর্থবহ পার্থক্য যাচাই করতে হবে।

এখন, $Z = \frac{(M_1 - M_2)}{\sigma ED} = \sqrt{\frac{(M_1 - M_2)}{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$

এখানে, M_1 = ৫৬.৮

n_1 = ১০০

σ_1 = ৫৩

M_2 = ৪৮.২

n_2 = ১০০

σ_2 = ৬.৬

$\therefore M_1 - M_2$ = ৫৬.৮ - ৪৮.২ = ৮.৬

$\sigma_1^2 = (৫.৩)^২ = ২৮.০৯$

$\sigma_2^2 = (৬.৬)^২ = ৪৩.৫৬$

সুতরাং $Z = \frac{৮.৬}{\sqrt{\frac{২৮.৩৯}{১০০} + \frac{৪৩.৫৬}{১০০}}} = \frac{৮.৬}{\sqrt{.২৮০৯ + .৪৩৫৬}} = \frac{৮.৬}{\sqrt{.৭১৬৫}}$

$= \frac{৮.৬}{.৮৪৬৪} = \frac{৮.৬}{.৮৫} = ১০.১$

আদর্শ সারণি থেকে প্রাপ্ত Z এর ক্রান্তিমান ৯৯%

বিশ্বস্ততা সীমায় বা ১% মাত্রায় = ৬.৬

Z এর নির্ণীত মান = ১০.১

Z নির্ণীত মান > Z ক্রান্তিমান

অতএব, ০.০১ মাত্রায় দু'টি দলের পারদর্শিতার গড়ের মধ্যে পার্থক্য অর্থবহ। প্রদত্ত নমুনা অনুসারে বালকেরা বালিকাদের চেয়ে ভাষাজ্ঞানে শ্রেয়।

উদাহরণ - ২ ঃ একটি বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণির 'ক' শাখার শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৫ এবং 'খ' শাখার শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩০, গাণিতিক যুক্তি বিষয়ে পরীক্ষা নিয়ে নিম্নোক্ত তথ্য পাওয়া গেল। এ দু'টি দলের গড় সাফল্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কিনা তা বের করতে হবে।

এখানে T - টেস্ট ব্যবহার করতে হবে।

ক - শাখা	খ - শাখা
শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরের গড় ৮০·২৫	শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরের গড় = ৭১·৫৫
প্রাপ্ত নম্বরের আদর্শ বিচ্যুতি ৭·৩৭	প্রাপ্তি নম্বরের বিচ্যুতি = ৯·৪২

নাস্তি প্রকল্প ঃ গাণিতিক যুক্তি পরীক্ষায় 'ক' শাখা ও 'খ' শাখার শিক্ষার্থীদের গড় সাফল্যের মধ্যে কোনো অর্থবহ পার্থক্য নেই।

এখন $t = \frac{(M_1 - M_2)}{\sigma ED}$, $\sigma ED = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$

প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী,

$M_1 = ৮০.২৫$ $M_2 = ৭১.৫৫$

$\sigma_1 = ৭.৩৭$ $\sigma_2 = ৯.৪২$

$n_1 = ২৫$ $n_2 = ৩০$

$M_1 - M_2 = ৮০.২৫ - ৭১.৫৫ = ৮.৭$

$\sigma_1^2 = (৭.৩৭)^২ = ৫৪.৩১$

$\sigma_2^2 = (৯.৪২)^২ = ৮৮.৭৪$

সুতরাং $\delta ED = \sqrt{\frac{৫৪.৩১}{২৫} + \frac{৮৮.৭৪}{৩০}} = \sqrt{২.১৭+২.৯৬} = \sqrt{৫.১৩} = ২.২৬$

$\therefore t = \frac{(M_1 - M_2)}{\sigma ED} = \frac{৮.৭}{২.২৬} = ৩.৮৫$

স্বাধীনতার মাত্রা বা $df = (n_1 - 1) + (n_1 - ১) = ২৪ + ২৯ = ৫৩$। স্বাধীনতা মাত্রা ৫৩ এর জন্য ০.০৫ মাত্রায় t ক্রান্তিমান (আদর্শ সারণি থেকে প্রাপ্ত) ২.০১। t এর নির্ণীতমান = ৩.৮৫।

অতএব, t নির্ণীতমান > t ক্রান্তিমান দু'টি দলের গড় সাফল্যের মধ্যে প্রকৃতপক্ষেই পার্থক্য রয়েছে।

F- টেস্ট

T- টেস্ট বা Z- টেস্ট ব্যবহার করে তিন বা ততোধিক দলের মধ্যে তুলনা করা যায় না। এক্ষেত্রে ভেদাঙ্ক বিশ্লেষক (analysis of variance) পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এ ভেদাঙ্ক বিশ্লেষণের মূল ভিত্তি F-test বা F-অভীক্ষা। দু'টি ভেদাঙ্কের অনুপাতকে F- অনুপাত বা (F-Ratio) বলা হয়।

$$F = \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$$

এখানে নমুনাজ ভেদাঙ্ক σ_1^2 এবং σ_2^2 এর অনুপাত F = ১ প্রত্যাশিত মান। নমুনাজনিত ত্রুটির কারণে F- অনুপাত ১ এর চেয়ে বড় বা ছোট হতে পারে। নমুনাজনিত ত্রুটি মানে নমুনাটি তথ্যবিশ্বের প্রতিনিধিত্ব করছে না।

উদাহরণ - ১ ঃ

তিন দল শিক্ষার্থীর বিজ্ঞান বিষয়ের কোনো পরীক্ষার স্কোর সমূহের ছক নিম্নে দেয়া হল। দলগুলোর সাফল্যাঙ্কের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কিনা তা বের করতে হবে।

দল	বিজ্ঞান পরীক্ষার প্রাপ্ত স্কোর
১ম দল	৩, ৫, ৬, ৮, ৩
২য় দল	৮, ১২, ৯, ৬, ১০
৩য় দল	১৩, ১২, ১৪, ১৫, ১৬

নাস্তি প্রকল্প ঃ দলগুলোর গড় সাফল্যাঙ্কের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

আমরা জানি,

$$F\text{- অভীক্ষা} = \frac{\text{বহিঃদলীয় ভেদাঙ্ক}}{\text{অন্তঃ দলীয় ভেদাঙ্ক}}$$

মনে করি দলগুলো যথাক্রমে G_1, G_2, G_3, মোটদলের সংখ্যা $K = ৩$ এবং $N_1 = N_2 = N_2 = ৫$ = শিক্ষার্থীর সংখ্যা,

$X_1 = ৩+৫+৬+৮+৩=২৫$

$X_2 = ৮+১২+৯+৬+১০=৪৫$

$X_3 = ১৩+১২+১৪+১৫+১৬+=৭০$

$\sum X = X_1+X_2+X_3=১৪০$

$N = N_1 + N_2 + N_3 =১৫$, $K = ৩$, $\sum X^২$ = স্কোরগুলোর সমষ্টি = ১৫৫৮, $(\sum x)^2$ = স্কোরগুলোর সমষ্টির বর্গ = ১৯.৬০০ বহিঃদলীয় বর্গসমষ্টি Between Sum of Squares বা BSS

$$= \frac{X_১^2}{X_১} + \frac{X_২^2}{X_২} + \frac{X_৩^2}{X_৩} - \frac{(\sum x)^2}{N} = \frac{(২৫)^২}{৫} + \frac{(৪৫)^২}{৫} + \frac{(৭০)^২}{৫} - \frac{(১৪০)^২}{১৫}$$

$$= \left(\frac{৬২৫}{৫} + \frac{২০২৫}{৫} + \frac{৪৯০০}{৫}\right) - \frac{১৯৬০০}{১৫} = \frac{৭৫৫০}{৫} - \frac{১৯৬০০}{৫}$$

$$= \frac{২২৬৫০ - ১৯৬০০}{১৫} = \frac{৩০৫০}{১৫} = ২০৩.৩৩$$

বহিঃদলীয় স্বাধীনতা মাত্রা $df = K - ১ = ৩ - ১ = ২$

বহিঃ দলীয় ভেজাঙ্ক $= \frac{BSS}{df} = \frac{২০৩.৩৩}{২} = ১০১.৬৭$

অন্তঃদলীয় বর্গসমষ্টি (Within group sum of squares) বা WSS

= মোট বর্গসমষ্টি (Total Sum of Squral) বা TSS - বহিঃদলীয় বর্গসমষ্টি (between Sum of Square) বা BSS.

$\therefore$ WSS = TSS - BSS.

এখন $TSS = \sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{N} = ১৫৫৮ - \frac{১৯৬০০}{১৫} = \frac{৩৭৭০}{১৫} = ২৫১.৩৩$

$\therefore$ WSS = ২৫১.৩৩ - ২০৩.৩৩ = ৪৮

অন্যদলীয় স্বাধীনতা মাত্রা = মোট স্বাধীনতা মাত্রা বহিঃদলীয় স্বাধীনতা মাত্রা = N - ১) - (K - ১) = N - K

অন্যদলীয় ভেদাক = $\frac{WSS}{N-K} = \frac{৪৮}{১২} = ৪$

∴ F Ratio or, F অভীক্ষ = $\frac{\text{বহিঃদলীয় ভেদাঙ্ক}}{\text{অনন্যঃ দলীয় ভেদাঙ্ক}} = \frac{১০১.৬৭}{৪} = ২৫.৪১$

পার্থক্যের উৎস	বর্গ সমষ্টি	স্বাধীনতা মাত্রা	গড় বর্গ	F
বহিঃ দলীয়	২০৩.৩৩	K - ১ = ৩ - ১ = ২	১০১.৬৭	
অন্য দলীয়	৪৮	N - K = ১৫ - ৩ = ১২	৪	২৫.৪১
মোট	২৫১.৩৩	N - ১ = ১৫ - ১ = ১৪		

আদর্শ সারণী থেকে ০.০৫ অর্থবহতা মাত্রা ২ এবং ১২ অনুসারে F এর ক্রান্তিমান ৩.৮৮। এখানে তুলনা করলে F এর নির্ণীত মানটি বড়।

সুতরাং F এর মান অর্থবহ।

কাই বর্গ টেস্ট বা x^2 – test (Chi Square test) :

সূত্র $x^2 = \sum \frac{(fo - fe)^2}{fe}$

এখানে, fo = পর্যবেক্ষিত বা প্রাপ্ত সংখ্যা (Observed frequency)

fe = প্রত্যাশিত পৌনঃপুন্য সংখ্যা (expected frequency)

কাই বর্গ টেস্টের ব্যবহার

কাই বর্গ টেস্ট শিক্ষা ও গবেষণার নানাবিধ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। সমান সম্ভাবনা প্রকল্প (Equal probability hypothesis) অনুপেক্ষ প্রকল্প (Independent Veriables) পৌনঃপুন্য বন্টনের স্বাভাবিক আকৃতি সম্পর্কিত প্রকল্পসহ এসব ধরনের প্রকল্প (Hypothesis) যাচাইয়ের জন্য কাই বর্গ অভীক্ষার ব্যবহার রয়েছে। কাই বর্গের হিসাবকৃত প্রাপ্তমান কাইবর্গের ক্রান্তিমানের (Critical Value) চেয়ে বড় বা সমান হলে নাস্তি প্রকল্প বাতিল হয়ে যায়। আবার কাইবর্গের প্রাপ্তমান উহার ক্রান্তিমানের চেয়ে ছোট হলে নাস্তি প্রকল্পটি বাতিল করা যায় না। তখন অর্থবহ কোন পার্থক্য থাকে না।

উদাহরণ - ১ ঃ

একটি নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষায় নিম্নোক্ত পাঁচটি সম্ভাব্য উত্তরের মধ্যে একটিকে নির্বাচন করতে হবে। একটি মাত্র প্রশ্নের উত্তরের বন্টন থেকে ১০০ জন ছাত্র সম্পূর্ণ অনুমানের ভিত্তিতে উত্তরগুলো নির্বাচন করছে।

	সম্ভাব্য উত্তর					সর্বমোট
	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	
প্রদত্ত উত্তরের সংখ্যা	২৩	১৮	২৪	১৭	১৮	১০০

সমাধান ঃ ছাত্ররা অনুমানের ভিত্তিতে উত্তর দিয়েছে। এক্ষেত্রে প্রত্যাশিত পৌনঃপুন্য

$fe = \frac{১০০}{৫} = ২০$

সম্ভাব্য উত্তর	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	
প্রাপ্ত পৌনঃপুন্য বা fo	২৩	১৮	২৪	১৭	১৮	= ১০০
প্রত্যাশিত পৌনঃপুন্য বা fe	২০	২০	২০	২০	২০	= ১০০
fo - fe	৩	- ২	৪	- ৩	- ২	
$(fo - fe)^2$	৯	৪	১৬	৯	৪	
$\frac{(fo - fe)^2}{fe}$	০.৪৫	০.২০	০.৮০	০.৪৫	০.২০	

$\therefore \chi^2$ (কাই বর্গ) $= \sum[\frac{(fo - fe)^2}{fe}]$

$= ০.৪৫ + ০.২০ + ০.৮০ + ০.৪৫ + ০.২০$

$= ২.১০$

স্বাধীনতা মাত্র (df) $= (r - ১) \times (c - ১)$

$= (৫ - ১)(২ - ১) = ৪ \times ১ = ৪$

আদর্শ সরণিতে χ^2 - কাইবর্গের ৪ স্বাধীনতা সভায় ক্রান্তিমান ২.১৯৫। প্রাপ্ত মান ২.১। এক্ষেত্রে χ^2 এর মান তাৎপর্যপূর্ণ নয়, ছাত্ররা অনুমানের ভিত্তিতে উত্তর নির্বাচন করেছে তা বর্জনযোগ্য নয়।

উদাহরণ - ২

একজন গবেষক প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পাঠ্যসূচিতে সেট তত্ত্বের অন্তর্ভুক্তির কার্যকারিতা সম্পর্কে বিভিন্ন পর্যায়ের ১০০ জন শিক্ষকের নিকট থেকে নিম্নোক্ত মতামত সংগ্রহ করেছেনঃ

	কার্যকরী	মোটামুটি কার্যকরী	মোটেই কার্যকরী নয়
প্রাথমিক স্তর	১৮	১০	২
মাধ্যমিক স্তর	২৪	২১	৩
উচ্চ মাধ্যমিক স্তর	৮	৯	৫

x^2 - টেস্টের মাধ্যমে উপরোক্ত মতামতের মধ্যে কোন অর্থবহ পার্থক্য আছে কিনা বের করতে হবে।

নাস্তি প্রকল্প ঃ তিন পর্যায়ের শিক্ষকদের মধ্যে কোন অর্থবহ পার্থক্য নেই।

সমাধান ঃ

এক্ষেত্রে প্রতিটি পর্যবেক্ষিত পৌনঃপুণ্যের (fo) বিপরীতে প্রত্যাশিত পৌনঃপুণ্য (fe) বের করার জন্য সূত্রটি হলো ঃ

$$fe = \frac{\text{কলামের স্কোরের যোগফল} \times \text{সারির স্কোরের যোগফল,}}{\text{সর্বমোট স্কোর}}$$

	কার্যকরী		মোটামুটি কার্যকরী		মোটেও কার্যকরী নয়	
	fo	fe	fo	fe	fo	fe
প্রাথমিক স্তর	১৮	১৫	১০	১২	২	৩
মাধ্যমিক স্তর	২৪	২৪	২১	১৯.২	৩	৪.৮
উচ্চ মাধ্যমিক স্তর	৮	১১	৯	৮.৮	৫	২.২

fo	fe	fo - fe	$(fo - fe)^2$	$\frac{(fo - fe)^2}{fe}$
১৮	১৫	৩	৯	০.৬০
২৪	২৪	০	০	০.০০
৮	১১	- ৩	৯	০.৮২
১০	১২	- ২	৪	০.৩৩
২১	১৯.২	১.৮	৩.২৪	০.১৭

৯	৮.৮	০.২	০.০৪	৪.৫৫
২	৩	১	১	০.৩৩
৩	৪.৮	- ১.৮	৩.২৪	০.৬৮
৫	২.২	২.৮	৭.৮৪	৩.৫৬

$\sum fo = ১০০ \sum fo = ১০০$ $\sum \frac{(fo - fe)^2}{fe} = ১১.০৪$

স্বাধীনতা মাত্র df = (r - 1) (c - 1) = (৩ - ১) (৩ - ১) = ৪

আদর্শ সারণী = x^2 - এর অর্থবহতা মাত্রা ০.০৫ এবং স্বাধীনতা ৪ এর জন্য x^2 এর ক্রান্তিমান = ৯.০৯, x^2 এর প্রাপ্তি = ১১.০৪

∴ প্রাপ্তমান > ক্রান্তিমান,, অর্থাৎ প্রাপ্ত মান ক্রান্তি মানের চেয়ে বড়। ফলে নাস্তি প্রকল্প বাতিল হল। প্রদত্ত তিনটি স্তরের শিক্ষকদের মধ্যে মতামত অর্থবহ পার্থক্য রয়েছে।

অনুশীলনী - ৪.১৩

১। শিক্ষাক্ষেত্রে অনুরন্ধের ব্যবহারগুলো উল্লেখ করুন। ১১ জন ছাত্রের গণিত ও ভূগোল বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বরের গুণগত অনুবন্ধ ০.৫৭ হলে, ফলের যথার্থতা বিচার করুন যখন ১ স্বাধীনতা ০.০১ এবং ০.০৫ বিশ্বস্ততার স্তরের 't' এর মান যথাক্রমে ৩.২৫ এবং ২.২৬।

২। স্কোর ফরমের নির্ভরণ সমীকরণ দু'টি লিখুন, চারজন ছাত্র ক, খ, গ, ও ঘ, বাংলা বিষয়ে যথাক্রমে ৫৫, ৬০, ৭২, ৭৫ নম্বর পেয়েছে। উহাদের ইংরেজি বিষয়ে সম্ভাব্য নম্বর কত হবে। নিচের তথ্য থেকে তা বের করুনঃ

বাংলা ঃ গড় (Mx) = ৭০ আদর্শচ্যুতি (σx) = ১০

ইংরেজী ঃ গড় (My) = ৩০ আদর্শ বিচ্যুতি (σy) = ৫

অনুরন্ধ (r) = ০.৮৮

৩। পার্থক্যের যথার্থতা নির্ণয়ের জন্য কি কি পরীক্ষা করা হয়? ৯ম শ্রেণীর ৮৪ জন ছাত্রের উপর পাঠপূর্ব ও পাঠোত্তর মূল্যায়নের ফলাফলের উপাত্ত দেয়া হল। t - অভীক্ষার সাহায্যে তাদের পাঠোন্নতি যথার্থ হয়েছে কিনা তা ব্যাখ্যা করুন।

পাঠপূর্ব উপাত্ত (x) ঃ গড় (Mx) ৪০.৫, আদর্শ বিচ্যুতি = ৭.০০

পাঠোত্তর উপাত্ত (y) ঃ গড় (My) ৪৭.৫ আদর্শ বিচ্যুতি = ৫.০০

যখন ৬ স্বাধীনতা মাত্রায় .০৫ ও .০১ বিশ্বস্ততরে t এর মান যথাক্রমে ২.০০ এবং ২.৬৬।

৪। x^2 (কাইবর্গ) অভীক্ষা কি? একজন দোকানদার মালিক তার দোকানের ৯০ জন বিক্রেতা কে যোগ্যতার ভিত্তিতে নিম্নরূপ শ্রেণী বিভাগ করেন, যদি বিক্রয় ক্ষমতা বিক্রেতাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে বন্টিত হয়। তবে ঐ শ্রেণি বিভাগটি গুরুত্বপূর্ণ পথ নির্দেশ করে কি?

খুব দক্ষ	দক্ষ	চলন সই	কম দক্ষ	অদক্ষ
১২	১৮	৩৬	১৫	৯

যখন ৪ স্বাধীনতা মাত্রায় বড় .০৫ ও .০১ বিশ্বস্তাস্তরে x^2 এর মান যথাক্রমে ৯.৪৮৮ ও ১৩.২৭৭।

৫। Z স্কোর কি? উহার ধর্মগুলো উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন। Z স্কোর নির্ণয়ের অসুবিধা কি? উহা আদর্শ স্কোরে কি ভাবে দুর করা যায়? ব্যাখ্যা করুন।

৬। ১০০০ জন ব্যক্তিকে ক, খ, গ, ঘ ও ঙ এ ৫টি ভিউকার্ড বাছাই করতে বলা হয়েছে। তাদের মধ্যে ২৫৫ জন ক, ২০৩ জন খ, ১৬২ জন গ, ২১২ জন ঘ এবং ১৯৮ জন ঙ কার্ডটি পছন্দ করে। কাইবর্গ নির্ণয় করতে হবে।

৭। একটি শ্রেণির দু'দল ছাত্র সংখ্যা যথাক্রমে ১০ জন ও ১৫ জন। একজন শিক্ষক তাদেরকে যথাক্রমে পদ্ধতি 'ক' এবং পদ্ধতি 'খ' - এ শিক্ষাদান করলেন, পাঠ্যক্রমটি শেষ করার পর পরীক্ষা নিয়ে তিনি দেখলেন যে প্রথম দলের ছাত্ররা গড়ে ৬৫ এবং দ্বিতীয় দলের ছাত্ররা গড়ে ৬০ নম্বর পেল। আদর্শ বিচ্যুতি যথাক্রমে ১.১ এবং ১.৪। এ পদ্ধতি দু'টো কি সমমূল্য হতে পারে?

(২৩ ডিগ্রী স্বাধীনতায় ৫% যথার্থ মাত্রায় 't' এর মান ২.০৬)

৮। জাতীয় সংসদে পেশ করা কোন এটি বিল সম্পর্কে সরকারী ও বিরোধী উভয় দলের ১০০ জন সাংসদের মনোভাব অনুসারে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে দেয়া হল, উক্ত বিলটি সম্পর্কে তাদের মনোভাবের কোন অর্থবহ পার্থক্য আছে কিনা যাচাই করুন।

দল	পক্ষে	নিরপেক্ষ	বিপক্ষে	মোট
সরকারি দল	৬৪	৮	২৮	১০০
বিরোধী দল	৩৬	২৫	৩৯	১০০

পঞ্চম অধ্যায়

শিক্ষা গবেষণা

গবেষণার অর্থ ও শ্রেণি বিভাগ

গবেষণার পটভূমি ঃ সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারা ধাবমান, সমাজ সংগঠনের অগ্রগতি, উন্নতি জীবন-যাত্রা, আর্থ-সামাজিক সুষম ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য, মানসিকতা, সৃজনশীলতা, শৃঙ্খলাবোধ, নৈতিক ও সামাজিক মূলবোধ এ সব কিছুর বাস্তবতাই আজকের দিনে সভ্য সমাজের চিত্ররূপ, এ কোন রূপকথা বা কল্পকাহিনীও নয়, এটি মানব সভ্যতা ক্রমবিকাশের ইতিহাস। অতীতের সামাজিক চাহিদা পূরণের ইতিহাস, শতাব্দীর পর শতাব্দীর নিরলস কর্মকাণ্ডের ইতিহাস, এ ভাবেই অতীত ও বর্তমানের অবকাঠামোর উপরই পরিলক্ষিত হয় ভবিষ্যৎ কর্মসূচি। সভ্যতার বাহক গবেষণা, জ্ঞানকে কাজে লাগাবার কৌশল বা শক্তি অর্জনেই শিক্ষা, আর সভ্যতা নির্মাণের বা সামাজিক চাহিদা পূরণের বা সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কোন কোন ধরনের জ্ঞান আহরণ প্রযোজ্যতা একমাত্র 'গবেষণা' দ্বারা সঠিকভাবে জানতে পারা যায়। গবেষণালব্ধ জ্ঞান উদ্দেশ্যভিত্তিক, যুক্তিবাদী, মননশীল ও বিজ্ঞানভিত্তিক। প্রকৃত জ্ঞান অজানাকে জানতে সাহায্য করে। নতুন নতুন জ্ঞানের বাস্তব প্রভাব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করে। নতুন নতুন প্রযুক্তির সন্ধান দেয়। অনাদিকালের প্রাকৃতিক ও সামাজিক অজ্ঞতার প্রতিকূল অবস্থা থেকে মানুষ তার অস্তিত্বকে অক্ষুণ্ন রেখেই বর্তমানে পদার্পণ করেছে, তার জিজ্ঞাসুমন জীবন ও জগতের অপার রহস্যের আবরণ উন্মোচন করছে, সত্যের সন্ধানে প্রতিনিয়তই অনুসন্ধানী মনে অগ্রসর হচ্ছে। যুক্তি চিন্তার প্রয়োগক্ষেত্র তৈরি করছে, আর তার আগ্রহী ও উৎসুকী প্রচেষ্টার উৎস কি? এর উৎস চিরন্তন কর্মশালা। এর নাম গবেষণা। বিবর্তন প্রক্রিয়ার একটি সংশোধিত কর্মকাণ্ড। আত্মজিজ্ঞাসার সুনিশ্চিত একটি দর্পণ। শিক্ষাই দেশ, জাতি বা সমাজের মেরুদণ্ড। শিক্ষা ও গবেষণা পরস্পর অপ্রতিদ্বন্দ্বী সামাজিক নিরবিচ্ছিন্ন কর্মকাণ্ড। জন্মের পর থেকেই মানব শিশুর যেমন শিক্ষাগ্রহণ শুরু, অর্থাৎ শিক্ষা প্রতিনিয়তই শিশুকে সংক্রমিত করে, অভিজ্ঞতাকে বাড়িয়ে দেয়। জানা থেকে অজানা আঙ্গিকে সে অগ্রসর হতে থাকে। তার শিক্ষার প্রক্রিয়াকে প্রয়োগমুখী বা ব্যবহার উপযোগী করতে বা লাগসই প্রযুক্তির সন্ধান পেতে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে আজ যে পদ্ধতির উত্তরণ ঘটছে তা শিক্ষাগবেষণা। গ্রিক পণ্ডিত এ্যারিস্টটল থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দীর জন ডিউই পর্যন্ত বহু মনীষী শিক্ষা

ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধনের জন্য যে চিন্তা, দিক নির্দেশনা, পদক্ষেপ আবিষ্কার করেছেন, তা গবেষণামূলক মৌলিক তথ্য বা সত্য। ইহাই শিক্ষা গবেষণার অবদান, শিক্ষাকে যুগোপযোগী তথ্য প্রয়াগমুখী করার প্রয়াসে বহু বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞানী ঐকান্তিকভাবে সচেষ্ট ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণার প্রচলন ঘটে। বিভিন্ন দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর উপর ভিত্তি করে শিক্ষাগবেষণা মানবজাতির সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম হয়। শিক্ষাব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। মানবজাতির সঠিক কল্যাণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগক্ষেত্র দ্রুত সম্প্রসারিত হয়।

প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন মতবাদের দার্শনিক, সমাজ সংস্কারক, ধর্মীয় নেতা বৈজ্ঞানিক প্রমুখের নানা মতবাদ, যুক্তি, পাল্টা যুক্তি প্রদানের ফলে সার্বিকভাবে চিন্তারাজ্যে একটা জটিল আবর্তন সমস্যা সৃষ্টি হয়। ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টির কারণে কোপারনিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩) এর মত একজন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী সূর্য এক কেন্দ্রিক মতবাদের জন্য মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পান নি। আধুনিক সৌরজগতের গ্রহ উপগ্রহ সম্পর্কিত চিন্তাধারার তিনিই জনক। এ ধরনের প্রতিকূল অবস্থাকে উপেক্ষা করে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার আলোকে একশ্রেণির সংকীর্ণ ও বিভ্রান্তিকর ধর্মীয় মতবাদের সঙ্গে বিরোধিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে করতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এগিয়ে চলেছে। ধাপে ধাপে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে অনুসন্ধান কার্যক্রমের প্রচলন ঘটছে। গবেষণা কার্যক্রম ক্রমশ যুক্তির যুগে প্রবেশ করে। গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সারবস্তু বা আবরোহ পদ্ধতিতে অনুসন্ধান কার্যাবলি শুরু করেন। এরপর ফ্রান্সিস বেকন, অবরোহ পদ্ধতি ব্যবহার করেন, উভয় পদ্ধতিকে সমন্বয় করে চার্লস ডারউইন সমন্বিত পদ্ধতিতে গবেষণা কার্যক্রম চালু করেন। এ ভাবেই শিক্ষার জন্য গবেষণা, চিন্তার জন্য গবেষণা, প্রকৃতিকে বশে আনার জন্য গবেষণা, উন্নয়নের জন্য গবেষণা, রোগ মুক্তির জন্য, দারিদ্রবিমোচনের জন্য, লাগসই প্রযুক্তির জন্য ইত্যাদি বহু ধরনের প্রয়োজনেই আজকের দিনে গবেষণার বর্তমান বিকল্প কোন কিছু চিন্তা করা যাচ্ছে না।

শিক্ষা ক্ষেত্রে গবেষণার ভূমিকা

শিক্ষাজীবন সামাজিক জীবনেরই একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। নানাবিধ সমস্যা ও প্রতিকূল পরিবেশে জর্জরিত, সামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রস্তুতির ক্ষেত্রই শিক্ষা। শিক্ষা প্রক্রিয়াকে তিনটি প্রধান প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়।

প্রথম ভাগ ঃ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা,

দ্বিতীয় ভাগ ঃ শিক্ষার উপযুক্ত বিষয়বস্তু ও শিক্ষাদান পদ্ধতি নির্বাচন করা,

তৃতীয় ভাগ ঃ শিক্ষা কার্যক্রমের ফলাফল যাচাই করা বা মূল্যায়ন করা।

পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু আয়তন ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বা সামাজিক সুযোগ সুবিধা সে অনুপাতে বাড়ছে না। এটি একটি মানবজাতির জন্য বড় ধরনের সমস্যা। কিন্তু আজকের দিনে এ সমস্যাকে যেমন অনেক উন্নত দেশ জনসংখ্যা শিক্ষার মাধ্যমে সমাধান করছে। আবার অনেক দেশ জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তর করে জীবন যাত্রাকে আরো সচল করে তুলছে। এ কারণেই পরিবর্তনশীল সমাজের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষাকে গতিশীল ও সমাজের পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সঙ্গতি বিধান করে নতুন প্রেক্ষাপটে কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এ ধরনের ব্যাপক কাঙ্খিত পরিবর্তনের জন্যই প্রয়োজন গবেষণা। শিক্ষার নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন করা কতটুকু প্রযোজ্য বা গ্রহণযোগ্য তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা, শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে সক্রেটিস মানবজীবনের আচরণ নিজে নিজেই তথা শিক্ষার্থীর সচেষ্ট প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে শেখাতে চেষ্টা করছেন। প্লেটো তিন ধরনের শিক্ষাক্রমের কথা বলেছেন। রুশো প্রকৃতিবাদী শিক্ষা কার্যক্রমের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। পেষ্টালৎসী মনোবিজ্ঞান সম্মত শিক্ষাদান পদ্ধতি অনুসরণ করতে বলেছেন। হকিট শিক্ষাদান ক্ষেত্রে পর্বত সোপান পদ্ধতি চালু করেছেন। এভাবেই ফ্রোয়েবেল, মন্টেসরি, জনডিউই, হোয়াইট হেড, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ দার্শনিক, মনোবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদগণ সামগ্রিকভাবে শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে নিজ নিজ দর্শন, পদ্ধতি ও মতামত রেখে গেছেন। এগুলো প্রয়োগমুখী ও গবেষণামূলক শিক্ষা কার্যক্রম। আজকাল তাদের এসব মূল্যবান তত্ত্ব ও তথ্যসমূহকে গবেষণার মাধ্যমে সঠিক মূল্যায়ন করা হচ্ছে। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নতুন নতুন সংযোজন এনে উন্নত ও সমৃদ্ধশালী করা হচ্ছে। শিক্ষা গবেষণার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, দার্শনিক, মনোবিজ্ঞানী, বৈজ্ঞানিক সমাজচিন্তাবিদগণ শিক্ষাকে বাস্তবমুখী, যুগোপযোগী ও কর্মমুখী করতে সক্ষম হয়েছেন। শিক্ষা গবেষণার একটা গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য আধুনিক বিশ্বে সুপরিচিত। বিগত ষাট দশকে সোভিয়েট ইউনিয়ন যখন মহাকাশে প্রথম ভূ-উপগ্রহ প্রেরণ করে, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মহাকাশ প্রযুক্তিতে অনেক পিছনে ছিল। ১৯৬২ সনের ১২ এপ্রিল গ্যাগারিন মহাশূন্যযানে পৃথিবীর চতুরদিকে যখন পরিভ্রমণ করলেন, স্বাভাবিকভাবেই তখনকার দিনের বিশ্বের দুই পরাশক্তির প্রযুক্তিগত উন্নয়ন বিশ্ববাসীর কাছে প্রামাণ্য নমুনা সৃষ্টির প্রয়োজনীতা দেখা গেল। ঠিক এ অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে এক গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যর্থতার কারণকেই চিহ্নিত করা হয় এবং ঐ গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করেই গবেষণালব্ধ সুপারিশ জাতীয়ভিত্তিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রমের দ্রুত আমূল পরিবর্তন ঘটাতে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। উন্নতর পাঠদান পদ্ধতি, উপস্থাপন, উপকরণ তথা বিজ্ঞান শিক্ষার সকল ধরনের সহায়ক সুবিধাদির মাধ্যমে সমগ্র

দেশব্যাপী বিজ্ঞান শিক্ষায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন বাস্তবায়ন করা হয়। বিশ্ববাসী ১৯৬৯ সালেই মার্কিন নভোচারীদের চাঁদের পৃষ্ঠে অবতারণ দৃশ্য অবলোকন করতে সুযোগ পান। এটি কোন লিখিত ইতিহাস নয়, নয় রূপকথা। শিক্ষা গবেষণার সঠিক প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন মাত্র।

শিক্ষা গবেষণার প্রত্যক্ষ প্রভাবে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় নতুন তত্ত্ব ও তথ্যের সমাহার সংযোজিত হয়েছে। গবেষণালব্ধ জ্ঞানের বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞানের ও সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় নতুন শিক্ষা ও শিখন পদ্ধতির বাস্তবায়ন সমস্যা সম্পর্কিত সমাধান করা হচ্ছে। এর একমাত্র উপায় শিক্ষা গবেষণা। শিক্ষাক্রম, পাঠ্যক্রম, পাঠদান পদ্ধতি, মূল্যবোধ, ধ্যানধারণা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই শিক্ষাগবেষণা সরাসরি সাহায্য করছে। পরিবর্তিত আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে ছাত্র কেন্দ্রিক পদ্ধতি, পরীক্ষামূলক পদ্ধতি, শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতি, প্রশ্ন উত্তর পদ্ধতি, প্রদর্শন পদ্ধতি ইত্যাদি নানা ধরনের শ্রেণিকক্ষ পাঠদান পদ্ধতির প্রচলন ঘটেছে। অধুনা দূর শিক্ষণ পদ্ধতি উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বেশ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। ইংল্যান্ড, ভারত, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে আজকাল দূর শিক্ষণেই অধিকাংশ শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ নিচ্ছে। এসবই ঘটছে গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতেই। শিক্ষা গবেষণার ক্ষেত্রে উন্নত দেশে ব্যাপক প্রচলনের ফলে জীবন ও শিক্ষা বা শিক্ষা ও জীবন অভিন্নভাবে চিন্তা করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীর সার্বিক কল্যাণেই শিক্ষাসূচিকে সাজানো হচ্ছে। সমাজ ব্যবস্থাকে শিক্ষাগবেষণার মাধ্যমে এগিয়ে নেয়া হচ্ছে। জাতীয় বুদ্ধি বৃত্তি, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই গবেষণালব্ধ মৌলিক সুপারিশ বাস্তবায়িত হচ্ছে। দরিদ্রতা, অপুষ্টি কুসংস্কার প্রভৃতি সমস্যাগুলোকে বিশেষ সংস্কার কর্মসূচির মাধ্যমে দ্রুত সমাধানের উপায় হিসাবে উন্নয়নশীল দেশসমূহে ব্যাপক গবেষণা কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এক কথায় গোটা বিশ্ব মানবের জীবন মাত্রার বৈষম্যমান অভিন্ন পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার প্রথম ও প্রধান পদক্ষেপ সবার জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা, আজকের দিনে এসব কিছুই শিক্ষা গবেষণারক্ষেত্র হিসাবে বিবেচিত এবং সঠিক কার্যক্রম বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশসহ গরীব দেশগুলোতে এর সুফল অচিরেই পাওয়া যাবে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বৃত্তিমূলক ও কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার তথা মানবিক কল্যাণ সাধন করতে আন্তর্জাতিক বেসরকারি গবেষণা সংস্থাগুলো তৎপর রয়েছে।

বাংলাদেশে শিক্ষা গবেষণার প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর দেশ হিসাবেই পরিচিত বাংলাদেশ। দারিদ্র্য, অপুষ্টি সামাজিক অস্বচ্ছলতা তথা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। অপরিকল্পিত

জনসমষ্টির বিকাশ ঘটছে, ইহা জনসম্পদ না হয়ে জনসংখ্যা সমস্যায় পরিণত হয়েছে এবং হচ্ছে। সনদপত্র সর্বস্ব শিক্ষাকার্যক্রম চলছে। শিক্ষার পরিবেশ দারুণভাবে বিঘ্নিত। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার যুগে এদেশের নিম্নমানের শিক্ষিত তরুণেরা কমংসংস্থানের অভাবে হতাশাগ্রস্ত কর্মহীনভাবে বা নিম্নমানের কর্মকান্ডে জড়িত থেকে জাতীয় লক্ষ্য, উদ্দেশ্য বা আশা আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য মূলস্রোতে নিজেদেরকে সংযোজন করতে পারছে না। বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজের হতাশা বা ব্যর্থতার কারণ জানা প্রয়োজন। দেশ গড়ার কাজে যুব শক্তি ঐক্যবদ্ধ না থেকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। উন্নয়ন কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন বা অপরাধ মাদক বা সহিংস্রতার প্রতি নেশাগ্রস্থ হচ্ছে। একটি দেশ বা জাতির দক্ষকর্মী বাহিনীর এ ধরনের চিত্র পাওয়া খুবই দুঃখজনক। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র পথ সঠিক শিক্ষা সূচির প্রবর্তন। বেকার, অলস, ভিক্ষুক বা সন্ত্রাসীর হাতকে দক্ষ কর্মীর হাতে রূপান্তরিত করা। এর একমাত্র পথ জাতীয়ভাবে শিক্ষাগবেষণা পরিচালনা করে সঠিক ধারণগুলো চিহ্নিত করা, আশু সমাধানের পথ খুঁজে বের করা। আজকের দিনে যে কোন দেশেরই দক্ষ জনগণই সবচেয়ে বড় জাতীয় সম্পদ। প্রত্যেক নাগরিককে দক্ষকর্মী হিসাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সার্বজনীন গণস্বাক্ষরতা, বয়স্ক শিক্ষা অনানুষ্ঠানিক, আনুষ্ঠানিক বৃত্তিমূলক, কারিগরি ইত্যাদি সব ধরনের শিক্ষা সূচির প্রবর্তন করা। শিক্ষার মান উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও দক্ষ কর্মীদল সৃষ্টি, দেশের প্রাপ্ত সকল সম্পদ ও সুযোগ সুবিধার সদব্যবহার। এ সব কিছুর জন্য দরকার জাতীয় উন্নয়নের কর্মসূচি। আর এ কর্মসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষাগবেষণার বিকল্প কিছু নাই। দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে জনবহুল দেশ হিসাবে দেশ গড়ার কর্মকান্ডে শিক্ষা ও সামাজিক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। এজন্য রাষ্ট্রীয় বাজেটে শিক্ষা, গবেষণা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ ক্ষেত্রে কৃষি শিল্প, ইত্যাদি খাতে বেশি অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দ্রুত উন্নয়নশীল দেশগুলোর দিকে লক্ষ্য রেখেই এ বক্তব্যের সঠিক জবাব মিলবে। উচ্চ শিক্ষা গবেষণাভিত্তিক কাম্য। যা আজকের দিনের শিক্ষাসূচির অপরিহার্য প্রত্যাশা। দেশজ কর্মকাণ্ডে সকল স্তরের শিক্ষাসূচির অংশ হওয়া উচিত গ্রামীণ জীবন যাত্রা। প্রান্তিক দারিদ্র্যসীমা থেকে শুরু করে প্রযোজ্য শিক্ষাসূচির প্রচলনই দেশ গড়ার ইতিকথা। সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যই গবেষণার বিকল্প কিছু চিন্তা করা যায় না।

শিক্ষার প্রশাসনিক অবস্থা, শিক্ষাদান প্রদ্ধতি, শিক্ষা সহায়ক উপকরণ, পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন, শিক্ষার মান উন্নয়ন আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার সম্পর্ক চিহ্নিত ইত্যাদি সমস্যা নিয়ে সঠিক সমাধান চিহ্নিতকরণ, জাতীয় কর্মসূচি, সময়, শক্তি অর্থ, মেধা ইত্যাদির অযথা অপচয়রোধে দ্রুত দেশগড়ার কর্মকাণ্ডে দিক-নির্দেশনা তৈরি করতেই শিক্ষা গবেষণা অপরিহার্য। উৎপাদনমুখী ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাসূচি প্রবর্তন করে শতকরা

আশিজন দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানকারী জনগণকে দক্ষ শ্রমিক হিসাবে তৈরি করতে এখনই প্রয়োজন গণশিক্ষার প্রসার ও অদক্ষ বয়স্কদেরকে শিক্ষার মাধ্যমে কর্মভিত্তিক জনসম্পদে পরিণত করা। এ ধরনের জাতীয় কর্মসূচির জন্যই প্রয়োজন জাতীয়ভিত্তিক শিক্ষা গবেষণা পরিচালনা করা।

"No system of education is better than its teacher"– এ বক্তব্যের সার কথা উপলব্ধি করার সময় এসেছে। কোন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা যে ধরনের হোক, শিক্ষিতসমাজকে অবশ্যই শিক্ষাদানে ব্রতী হতে হয়। নিষ্ঠাবান ও নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক তৈরি করতে প্রয়োজনসর্বস্তরের শিক্ষক প্রশিক্ষণ। শিক্ষণ প্রশিক্ষণে গবেষণা এবং গবেষণার নিয়মকানুন উভয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ। আর শিক্ষা ব্যবস্থা সংক্রান্ত এবং শিক্ষাদান সংক্রান্ত সমস্যাবলীর সমাধানকল্পে ব্যাপকভিত্তিক শিক্ষা গবেষণায় মনোনিবেশ করা আবশ্যক। একজন গবেষণামনস্ক শিক্ষকই আদর্শ শিক্ষক। শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাসী কার্যকলাপমুক্ত করতে শিক্ষার পরিবেশ অক্ষুণ্ন রাখতে এ ধরনের কার্যক্রম এখনই বাংলাদেশে জাতীয় ভিত্তিক গ্রহণ করতে হবে, তা'হবে শিক্ষা গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষক সমাজ তথা শিক্ষার সার্বজনীন কর্মসূচি বাস্তবায়ন সম্ভব। যাতে করে দেশ গড়ার কর্মকাণ্ডে দ্রুতগতি সঞ্চার করে এগিয়ে নেয়া যায় কেবল দক্ষ জন সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে। দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন তথা স্বাধীনসার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা রক্ষা করার একমাত্র উপায়। মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে অভিজ্ঞতা ভিত্তিক সামাজিক শিক্ষা কোর্স চালু করা প্রয়োজন। ১৯৮১ সনে এ ধরনের একটা কোর্স চালু করে আবার বন্ধ করা হয়। গবেষণার মাধ্যমে সঠিক পদ্ধতিতে ফলপ্রসূ কর্ম অভিজ্ঞতা কোর্স প্রচলন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রাক প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক বা উচ্চ শিক্ষা সহ সকল পর্যায়ে মূল্যায়ন ব্যবস্থার আশু সংস্কার, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাদান পদ্ধতি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের গবেষণালব্ধ ভিত্তিতে কর্মসূচি গ্রহণ করার প্রয়োজন রয়েছে। অকারণে জনগণের উপর শিক্ষা সংক্রান্ত কোন কর্মসূচি চাপিয়ে দেয়া ঠিক নয়। কিন্তু বাংলাদেশ তথা সাবেক পাকিস্তানী আমলেও এ ধরনের কর্মকাণ্ড শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রহণ করে আর তা আন্দোলনের সূত্রে বাদ দেয়া হয়, ফলে অর্থ ও সময়ের অপচয়ের চেয়েও বেশি অপচয় ঘটে জনসম্পদের। চাহিদার ক্ষেত্রে দেশের সব ধরনের পরিকল্পনা ও উন্নয়নের কর্মসূচি প্রণয়নে প্রত্যক্ষ ভূমিকায় থাকবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ গবেষক ও পরিকল্পনাবিদ। কিন্তু নিম্নোক্ত কারণে গবেষণা কর্মসূচি বিঘ্নিত। এ অবস্থার পরিবর্তন অপরিহার্য।

শিক্ষা গবেষণা ক্ষেত্রে অসুবিধাসমূহ

(১) সামাজিক অবস্থা

(২) অর্থনৈতিক সমস্যা

BANBEDOC Library Dhaka

(৩) দক্ষ গবেষক বিশেষজ্ঞের অভাব

(৪) দক্ষ গবেষক সৃষ্টিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের অভাব

(৫) প্রকাশনা ব্যবস্থার পশ্চাৎপদতা

(৬) গবেষণার ক্ষেত্রে আধুনিক তথ্যাদির অভাব

(৭) গবেষণা কার্যক্রমের প্রতিষ্ঠানিক সুষ্ঠু ব্যবস্থার অভাব

(৮) গবেষণার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতির অভাব।

গবেষণা কি

গবেষণা বলতে কি বুঝায়? তা বিভিন্ন জনের অসংখ্য আরোপিত অর্থ দ্বারা প্রকাশ করা যায় সকলের বক্তব্যে একটি সাধারণ মিল থাকছে তা সাধারণ অর্থে সত্য ও জ্ঞানের অনুসন্ধান কার্যক্রম। এটিই গবেষণা নামে পরিচিত। তবে কোন সুনির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে পরিকল্পিত ও প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহের জন্য বৈজ্ঞানিক ও সুসংবদ্ধ অনুসন্ধানকে গবেষণা বলা হয়। বৈজ্ঞানিক চিন্তন ও পদ্ধতির একটি ধারাবাহিক কার্যক্রম হিসাবে গবেষণা অভিহিত। The Advanced Learner dictionary of Current English অভিধান অনুসারে গবেষণার সংজ্ঞা হচ্ছে জ্ঞানের যে কোন শাখায় নতুন তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যাপক ও সযত্ন তথ্যানুসন্ধান। রাস্ক (Rusk) এর মতে "গবেষণা হল একটি অভিমত মানস কাঠামোর এক অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি ভঙ্গি"। গবেষণা সেসব প্রশ্নের অবতারণা করে যার অবতারণা এর আগে কোন দিন হয় নি এবং কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে। গ্রিন (Green) বলেন, "জ্ঞানানুসন্ধানের আদর্শায়িত বা মানসম্মত পদ্ধতির প্রয়োগই গবেষণা"। অনুরূপভাবে সুসংগঠিত জ্ঞানের আবিষ্কারও বিকাশের ক্ষেত্রে নিবেদিত পদ্ধতিগত কার্যক্রমকে গবেষণা বলা যায়। আবার কোন সমস্যার যথার্থ সমাধান লাভের জন্য ব্যবহৃত কৌশলকেও গবেষণা বলা যেতে পারে। অনেক বিজ্ঞজনের মতে নতুন জ্ঞান আহরণের সুসংবদ্ধ প্রচেষ্টাকে গবেষণা বলা যেতে পারে। জন ডব্লিউ বেষ্ট বলেন "বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ দ্বারা বিশ্লেষণের আরো আনুষ্ঠানিক সুসংবদ্ধও ব্যাপক প্রক্রিয়াকেই গবেষণা বলা যায়।"

ফ্রান্সিস রুমেল (Rummel) বলেন "গবেষণা জ্ঞানের আবিষ্কার, বিকাশ ও যাচাইয়ের একটি প্রচেষ্টা। এটি এমন একটি বুদ্ধিদীপ্ত প্রক্রিয়া যা শত শত বছরে বিকাশ লাভ করেছে। এর উদ্দেশ্য কাঠামো চিরকালই পরিবর্তিত হয়েছে কিন্তু সর্বদাই করেছে সত্যের অনুসন্ধান"।

নতুন সত্য, নতুন তথ্য, নতুন জ্ঞানের সন্ধান করার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে ধারাবাহিক গভীরতার ব্যাপকতর এবং অধিকতর আনুষ্ঠানিক

প্রক্রিয়াকেই গবেষণা নামে অভিহিত করা হয়। সত্য উদঘাটনের জন্য কয়েকটি বিজ্ঞান সম্মত প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রক্রিয়ার সাহায্যে সম্পাদিত কার্যক্রমকে গবেষণা বলা যেতে পারে।

"Research should always denote careful, critical and exhaustive investigation to discover new facts which will test a hypothesis, revise accepted conclusions, or contribute positive values to society in General."*

পরীক্ষানিরীক্ষা, সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ, তথ্য অনুন্ধান, পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি এক একটি প্রক্রিয়ার গবেষণার কিছু কিছু মিল থাকলেও এদের কোনটিই গবেষণা শব্দের অর্থবহ নয় বা প্রতি শব্দও নয়। প্রকৃতপক্ষে গবেষণার জন্যই পরীক্ষানিরীক্ষা, গবেষণা, সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা তথ্য অনুসন্ধানের এসব কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হয়, এক কথায় নতুন সত্য বা তথ্য বা জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করতে যা যা দরকার তাই করতে হয়। গবেষণা লব্ধ জ্ঞান সাধারণত দুই প্রকার ব্যবহারিক (Practical) ও তাত্ত্বিক (Theoretical)। গবেষণা লব্ধ সিদ্ধান্ত গভীর অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রমাণিত না হলে সত্য বলে স্বীকৃতি পায় না। তবে কর্মসূচিভিত্তিক চিন্তা, কল্পনা, অনুমান বা গবেষণার প্রাথমিক ভিত্তি হিসাবে গবেষককে সাহায্য করে। সাধারণত গতানুগতিকভাবে বা কাকতালীয়ভাবে যা সত্য বলে মনে করা হয়। কিন্তু একজন গবেষক তা স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করে। প্রাপ্ত তথ্যকে তিনি পরীক্ষানিরীক্ষা পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ বিশ্লেষণ সংশ্লেষণ ইত্যাদি যুক্তিসম্মত প্রক্রিয়ার সাহায্যে নির্ভুলভাবে যাচাই করে থাকেন। উপযুক্ত প্রমাণাদি এবং পর্যাপ্ত যুক্তির মাধ্যমে তথ্য বা সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত না হলে গবেষক কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না।

অজানাকে জানা বা সত্যকে উদঘাটন করাই গবেষণার লক্ষ্য। জ্ঞান ভাণ্ডারকে নতুন নতুন সম্ভারে সমৃদ্ধ করা তা আবার গবেষণা লব্ধ সত্য চিরন্তন সত্য নাও হতে পারে, একটি সত্যের উপর গবেষণা না করে নতুন নতুন সত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু ঐ সত্য চূড়ান্ত সত্য নয়। এগুলো আপেক্ষিক এবং অস্থায়ী। যে কোন গবেষণার ফলাফলের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নতুন গবেষণা চলতে পারে। পুরাতন প্রতিষ্ঠিত সত্যের উপর নতুন দিক উদঘাটিত বা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। পুরাতনকে বাতিল করতে পারে। আবার এমনও হতে পারে পুরাতন সত্য নতুন আঙ্গিকে দৃঢ়ভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে।

---

* Hildreth Hoke McAsham, "Elements of educational research" P, 4

কোন সমস্যার সমাধান প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত পদ্ধতিতে ও পরিশীলিত কৌশলকে গবেষণা বলা যায়। ইহা একটি সমস্যা নিয়ে যাত্রা শুরু করে উপায় বা সত্য সংগ্রহ করে এবং সংগৃহীত তথ্য যথার্থ ও পর্যাপ্তভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে এবং প্রকৃত সত্য বা তথ্যের উপর ভিত্তি করে একটা সিদ্ধান্তে পৌছে। ইহা সর্বদাই নতুন সত্যের অনুসন্ধান করে। এ জন্য নির্ভুল পর্যবেক্ষণ, সঠিক বর্ণনা, কুশলী ও পদ্ধতিগত অনুসন্ধান প্রয়োজন। কারণ, ইহা জ্ঞান অনুসন্ধানের আর্দশায়িত বা মানসম্মত পদ্ধতির প্রয়োগ, সংগঠিত তথ্যের বা জ্ঞানের আবিষ্কার ও বিকাশের ক্ষেত্রে চিরন্তন বুদ্ধিদীপ্ত একটি প্রক্রিয়া।

(Research) শব্দটির প্রত্যেকটি বর্ণের এক একটা তাৎপর্য নির্ণয় করা যায় ঃ

R = Rational way of thinking বা যুক্তিগত চিন্তন পদ্ধতি।

E = Expert and exhaustive treatment বা সুদক্ষ বা ব্যাপক আলোচনা।

S = Search for solution বা সমাধানের অনুসন্ধান।

E = Exactness বা যথার্থতা বা নির্ভুলতা।

A = Analytical analysis of adequate data বা পর্যাপ্ত উপাত্তের গাণিতিক বিশ্লেষণ।

R = Relationship of tacts বা সত্য বা ঘটনার পারস্পর্য বা সম্পর্ক।

C = Careful recording বা সতর্কতাসহ রেকর্ডকরণ।

= Critical Observation বা সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ।

= Constructive attitude বা গঠনমূলক মনোভাব।

= Condensed and compactly stated generalisation বা সুসংগতভাবে বিবৃত সার্বিকীকরণ।

H = Honesty বা সততা।

= Hard work বা কঠোর পরিশ্রম।

গবেষণার বৈশিষ্ট্য

১। গবেষণা একটি সুনিপুণ, ধারাবাহিক ও সঠিক অনুসন্ধান পদ্ধতি।

২। গবেষণা কোন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নিবেদিত।

৩। নতুন জ্ঞানের সন্ধান দেয়াই উন্নতমানের গবেষণার একটি বৈশিষ্ট্য।

৪। গবেষণা তথ্যের প্রসার ঘটনায়। প্রাথমিক বা প্রধান উৎস থেকে গবেষণা জ্ঞান বা উপাত্ত সংগ্রহ করে। অনেক ক্ষেত্রে বর্তমান উপাত্ত নতুন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।

৫। গবেষণা পর্যবেক্ষণযোগ্য অভিজ্ঞতা বা পরীক্ষালব্ধ তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

সংগৃহীত তথ্য এবং ব্যবহৃত পদ্ধতি যুক্তি প্রয়োগ করে পরীক্ষানিরীক্ষার পর আবার যাচাই করা হয়।

৬। গবেষণা সময় সাপেক্ষ, শ্রম সাপেক্ষ ও কষ্টকর, এটি ব্যয়বহুল।

৭। এক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত ও নৈর্ব্যক্তিক সমস্যার সমাধানে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে যুক্তি প্রয়োগ করতে হয়।

৮। অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরে নিরপেক্ষভাবে সঠিক ও যথার্থ কৌশল অনুসরণ করে উপাত্ত সংগ্রহ করতে হয়।

৯। গবেষককে সাহসী ও নিরপেক্ষ হতে হয়।

১০। নিরপেক্ষভাবে সর্তকতার সাথে গবেষণার ফলাফলকে রেকর্ড ও বর্ণনা করতে হয়

১১। সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সার্বিকীকরণের ক্ষেত্রে সর্তকতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হয়।

১২। গবেষককে একজন সৃজনশীল ও কল্পনা শক্তির অধিকারী হতে হয়।

১৩। গবেষককে একজন জ্ঞানী ও বুৎপত্তিশীল ব্যক্তি হতে হয়। দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সত্য ও অসত্যের তুলনামূলক বিচার করতে হয়। ভাবপ্রবণতা ও পক্ষপাতিত্বে মুক্ত থাকতে হয়। উদ্দেশ্যভিত্তিক সজাগ ও সচেতন থাকতে হয়।

গবেষণার প্রকার ভেদ

আনুষ্ঠানিকভাবে এবং গবেষণা কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে গবেষণাকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

১. মৌলিক গবেষণা (Fundamental Research)

২. ফলিত বা ব্যবহারিক গবেষণা (Applied Research)

১. মৌলিক গবেষণা (Fundamental Research) ঃ মৌলিক গবেষণা হল আদি বা মূল (Original) গবেষণা। একে বিশুদ্ধ গবেষণাও বলা হয়। এর প্রধান লক্ষ্য জ্ঞান আহরণ। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ধারাবাহিক ও যথাযথভাবে প্রয়োগ করে মৌলিক গবেষণা পরিচালনা করা হয়। এ গবেষণার কাঠামো বা অবয়ব পদার্থ বিজ্ঞানের ধরন থেকে নেয়া হয়েছে। ইহা ধারাবাহিক নিয়ন্ত্রিত কঠোর বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি। পদ্ধতির সার্বজনীন প্রয়োগ ও সততা যাচাইয়ের ক্ষমতা রয়েছে। অধিকাংশ উন্নতমানের গবেষণা এ পদ্ধতিকে অনুসরণ করে তত্ত্বের প্রসারও বিস্তৃতির অবস্থান নিশ্চিত করে। এ ধরনের

গবেষণার ক্ষেত্রে নমুনায়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে তথ্য বিশ্ব থেকে নমুনা দল গঠন করা হয়। নমুনা দল থেকে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করা হয়। আবার সার্বিকীকরণের মাধ্যমে তথ্যের প্রসার ঘটনানো হয়। বিজ্ঞানাগারেই বেশিরভাগ এ জাতীয় গবেষণা পরিচালনা করা হয়।

উদাহরণ

নিউটনের মাধ্যকর্ষণ তত্ত্ব। এ তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে অসংখ্য গবেষণা পরবর্তীকালে নতুন নতুন তত্ত্বের সন্ধান দিয়েছে বা নতুন নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করেছে। সৌরচুল্লি কার্যক্রম মহাকাশ অভিযান ইত্যাদি মৌলিক গবেষণার প্রত্যক্ষ ফল। নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার ও প্রচলিত তত্ত্বের উন্নয়ন বা সংশোধন পরিমার্জন এ গবেষণার প্রধান কর্মকান্ড। এ জন্য জটিলতর সমস্যা নিখুঁত পদ্ধতি উপকরণ, সঠিক নিয়ন্ত্রণ ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

২। **ফলিত গবেষণা ঃ** সমাজ ও সভ্যতা নির্মাণের ক্ষেত্রে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সেগুলোর তাৎক্ষণিক সমাধান বের করাই ফলিত গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এ গবেষণাকে মাঠ পর্যায়ের গবেষণা (Field Study) বলা হয়। অর্জিত জ্ঞানকে মানব ও সমাজ কল্যাণে প্রয়োগ করার বাস্তব ক্ষেত্রে এ গবেষণা পরিচালনা করা হয়। আবার মানব কল্যাণে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করার গবেষণাকে ফলিত গবেষণা বলা যায়। উন্নয়নশীল দেশসমূহে ফলিত গবেষণার উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রচলিত তত্ত্বসমূহ প্রয়োগ করে লাগসই প্রযুক্তি বিকাশের ক্ষেত্রে এ গবেষণা কর্মক্ষেত্রে অধিক সাহায্য করেছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের আচার আচরণমূলক তত্ত্বের উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে পরীক্ষানিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ, সমীক্ষা সংশ্লেষণ বিশ্লেষণ অধিকাংশই ফলিত গবেষণা। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে শিক্ষা সংক্রান্ত সম্যাবলীতে ফলিত গবেষণা প্রয়োগ করে প্রত্যাশিত সমাধান পেতে চেষ্টা করা হয়। দ্রুত গবেষণা কার্যক্রম শিক্ষা বিভাগীয় যাবতীয় কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে উঠে। শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা; বৃদ্ধি, শিক্ষণ প্রক্রিয়ার উৎকর্ষসাধন নানাবিধ শিক্ষা উপকরণ উদ্ভাবন তথা লাগসই শিক্ষা প্রযুক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে ফলিত গবেষণা যথার্থ অবদান রাখছে। শিক্ষার্থীদের চাহিদা প্রকৃত সমস্যা চিহ্নিত করা ও তার সঠিক সমাধানের জন্য এ ধরনের কার্যক্রম আবশ্যক। ছাত্র শিক্ষকদের সম্মিলিত চিন্তা শক্তির বিকাশ, দলবদ্ধভাবে কাজ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি, শিক্ষানীতি, পাঠ্যক্রম, শিক্ষাদান পদ্ধতি, পাঠ্য বই প্রণয়ন, নতুন নতুন শিক্ষা সহায়ক কলাকৌশলের উদ্ভাবন প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই ফলিত গবেষণাই সহায়ক পদক্ষেপ যে

কোন শিক্ষকই একজন বিশেষজ্ঞ। আর বিশেষ কথাটির আসল অর্থ হল তিনি একজন গবেষকও বটে। ফলিত গবেষণার ক্ষেত্রে প্রত্যেক শিক্ষককেই প্রস্তাব অভিজ্ঞতা নিয়ে অগ্রসর হইতে হয়। জ্ঞানের ভিত্তি ব্যবহারিক কার্যক্রমে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে, সে শুধু পেশাগত কর্মকাণ্ডে কর্মকার্যকরি ফলিত গবেষণা সমাজ সংগঠনের নিম্নোক্ত কাজ সমূহের মাধ্যমে অবদান রাখতে পারে।

ক) সমাজ সংস্কারমূলক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ সন্দেহাতিতভাবে জনমানসে বিশ্বাস জন্মানের ব্যবস্থা করা।

খ) মৌলিক গবেষণার ব্যবহৃত কৌশলসমূহের উন্নয়ন ঘটাতে সহায়তা করা।

গ) সাধারণিকরণ (Generalization) প্রক্রিয়াকে সহজ ও গ্রহণযোগ্য করতে সহায়তা করা।

শিক্ষা গবেষণা ঃ বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই শিক্ষা ক্ষেত্রে গবেষণার প্রচলন ঘটে। কোন দেশ, জাতি বা সমাজ কতটা উন্নত, সুখী সমৃদ্ধশালী তার একমাত্র মাপকাঠি হচ্ছে সে দেশ বা জাতির শিক্ষা ব্যবস্থা। যে কোন দেশ বা জাতির উন্নয়নের চাবিকাঠি শিক্ষা। উন্নততর শিক্ষা ও প্রযুক্তি জ্ঞান মানব সমাজকে আদি যুগ থেকে বর্তমান যুগে নিয়ে এসেছে। এক কথায় যে জাতি যতবেশি উন্নত সে জাতি ততবেশি মান ও গুণগত শিক্ষায় উন্নত। শিক্ষার মান ও গুণগত উন্নয়নের জন্যই প্রয়োজন শিক্ষা গবেষণা।

শিক্ষাগবেষণাকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

১) ঐতিহাসিক গবেষণা।

২) বর্ণনামূলক গবেষণা।

৩) পরীক্ষামূলক গবেষণা।

গবেষণা কার্যক্রমকে নিম্নোক্ত ভাগেও (Categories) ভাগ করা হয়।

ক) জরিপ গবেষণা (Survey Research)

খ) কার্যোপযোগী গবেষণা (Action Research)

গ) মূল্যায়ন গবেষণা (Evaluation Research)

ঘ) মাঠ পর্যায়ে অনুসন্ধানমূলক গবেষণা (Field investigation Research)

ঙ) বিগতকালীন বিষয়ের গবেষণা (Ex-post facto Research)

চ) পরীক্ষণমূলক গবেষণা (Experimental Research)

(ক) জরিপ গবেষণা ঃ সামাজিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসাবে আজকাল জরিপ গবেষণা বেশ জনপ্রিয়। ইহা ছোট নমুনা নিয়ে বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি। সামাজিক গবেষণার ক্ষেত্রে জরিপ গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জরিপ গবেষণা কার্যক্রমের ধাপসমূহঃ

১. জরিপের লক্ষ্য স্থির করা।
২. নমুনার জন্য জনসংখ্যা সীমানা নির্ধারণ করা।
৩. উপাত্ত/তথ্য সংগ্রহ সম্পর্কে আকার নির্ধারণ করা।
৪. পরিমাপ পদ্ধতি নির্বাচন করা।
৫. নমুনায়নের একক নির্বাচন।
৬. নমুনা নির্বাচন।
৭. মাঠ পর্যায়ে কাজের সংগঠন।
৮. প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ।
৯. প্রাপ্তি তথ্যের ব্যবহার।

(খ) কার্যোপযোগী গবেষণা ঃ আধুনিক সমাজবিজ্ঞানে সাম্প্রতিক সংযোজন হিসাবে কার্যোপযোগী গবেষণা পরিচালনা করা হচ্ছে। দার্শনিক বা চিন্তাবিদগণ এ ধরনের গবেষণা ব্যবহার করে থাকেন। নতুন তত্ত্বের বিকাশ বা বিদ্যমান তত্ত্বের সহজও সরল ব্যাখ্যাদান এ গবেষণার একটা বিশেষ তত্ত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ গবেষণাকে বর্ণামূলক (Descriptive) বিশ্লেষণমূলক (Analytical) গুণবাচক (Qualitative) পরিমাণ বাচক (Quantitative) ধারণাভিত্তিক (Conceptional) ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক (Empirical) হিসাবে ভাগ করা যায়।

(গ) মূল্যায়ন গবেষণা ঃ আজকাল বিভিন্ন দেশে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চলছে। এ সব উন্নয়ন প্রকল্পের সাফল্য মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এ কারণেই মূল্যায়ন গবেষণা নামে বিশেষ ধরনের গবেষণা কার্যক্রমের প্রচলন ঘটছে। অর্থনৈতিক ও উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সাফল্য বা অকৃতকার্যতা নিরূপণের জন্য এ ধরনের গবেষণার প্রয়োজনীয়তা দ্রুতবৃদ্ধি পাচ্ছে। উন্নয়ন কাঠামো বা প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি চাহিদা সমাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রভাব, জনগণের মনোভাব, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট ইত্যাদি নানাবিধ পরিসরে মূল্যায়ন গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে।

মূল্যায়ন গবেষণা প্রধানত তিন প্রকারের

১. সহগামী মূল্যায়ন।

২. পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন।

৩. প্রান্তিক মূল্যায়ন।

(ঘ) **মাঠ পর্যায়ে অনুসন্ধানমূলক গবেষণা ঃ** কোন বাস্তব পরিস্থিতিকে সতর্কতার সঙ্গে পরিস্থিতি অনুমোদন সাপেক্ষে বা পরিস্থিতি প্রেক্ষাপটে মাঠ পর্যায়ের অনুসন্ধানমূলক গবেষণা পরিচালনা করা হয়।

(ঙ) **বিগতকালীন বিষয়ে গবেষণা ঃ** অনির্ভরশীল চলের উপর গবেষকের নিয়ন্ত্রণহীন পদ্ধতিগত পরীক্ষামূলক গবেষণাকে বিগত কল্যাণ বিষয়ে গবেষণা বলা যেতে পারে। এ ধরনের গবেষণা নির্ভরশীল ও অনির্ভরশীল চলের বিজ্ঞানসম্মত ও বিশ্লেষণধর্মী পরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত। সম্ভাব্য ও আপাত সঙ্গত সম্পর্ক জানার জন্যই এ ধরনের অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। গবেষকের অনুসন্ধানের প্রকৃতি এবং গবেষণা কৌশলের উপর নির্ভর করে এ ধরনের গবেষণা সীমিত বা বৃহদাকারে হতে পারে।

(চ) **পরীক্ষামূলক গবেষণা ঃ** সাধারণত নিয়ন্ত্রিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যতে কি ঘটনার সম্ভাবনা হতে পারে তা নির্ধারণ করাই হলো পরীক্ষণমূলক গবেষণা। পরীক্ষাগারে সীমাবদ্ধ অনুসন্ধানমূলক গবেষণাকে পরীক্ষামূলক গবেষণা বলা যেতে পারে। তবে এ পদ্ধতি গবেষণাগারে যেমন প্রয়োগ হচ্ছে তেমনি শ্রেণিকক্ষে বা কৃষি তথা উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডেও ব্যবহার করা হচ্ছে। এ পদ্ধতি নানাভাবে শিক্ষা গবেষণায় প্রয়োগ করা যেতে পারে। শিক্ষানীতি, শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে এটি ব্যবহৃত হচ্ছে। এ গবেষণায় নতুন চিন্তা বা উদ্ভাবিত সৃজনশীল পদক্ষেপগুলো সম্ভাবনা তত্ত্বের সাহায্যে অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা বর্জন সম্পর্কে সরাসরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রকারের গবেষণা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এগুলোর সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনা করা হল।

১. বর্ণনামূলক (Descriptive)

২. পরীক্ষামূলক (Experimental)

৩. সংশ্লেষনমূলক (Correlation)

৪. কার্যকরণ সম্পর্কিত (Cadusal Comparative)

বর্ণনামুলক শিক্ষা গবেষণা ঃ সীমিত সংখ্যক বিষয়ক নিয়ে জরিপ পদ্ধতিতে কাজ করা যায়। উপকরণ হিসাবে প্রশ্নমালা ও সাক্ষাৎকার ব্যবহার করতে হয়।

পরীক্ষামূলক শিক্ষা গবেষণা ঃ এ ধরনের গবেষণা পরিচালনা করা খুবই কষ্টসাধ্য। নিয়ন্ত্রিত দল এবং পরীক্ষাধীন দল উপযুক্ত নমুনায়ন পদ্ধতিতে গঠন করে শিক্ষণ-শিখনের বিশেষ পদ্ধতি বা পরীক্ষাধীন দলের আচরণিক পরিবর্তন বিশেষ কৌশলের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করতে হয়।

সংশ্লেষমূলক শিক্ষাগবেষণা ঃ সহ-সম্পর্কযুক্ত পরিসংখ্যাত্মক অভীক্ষার মাধ্যমে দু'টি চলকের বিশ্লেষণ পদ্ধতি এ ধরনের শিক্ষা গবেষণায় অনুসরণ করা হয়, এ ধরনের গবেষণায় কেবল সম্পর্ক নির্দেশ করে।

কার্যকরণ সম্পর্কিত শিক্ষা গবেষণা ঃ এ ধরনের গবেষণায় কোন সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা এলাকা থেকে কেবল উপাত্ত সংগ্রহ করতে হয়, প্রকাশিত ফলের বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণা কার্য সমাধা করতে হয়।

উপরোক্ত পদ্ধতিগুলোর কোনটি কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করলে গ্রহণযোগ্য ফলাফল পাওয়া যাবে কোন কারণেই তা পূর্ব নির্ধারিত হতে পারে না। গবেষককে নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, নিজ এলাকা বা কোন সমস্যার প্রকৃতি অনুসারে পদ্ধতি ঠিক করে নিতে হয়। শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা চিহ্নিত করে গবেষণা পরিচালনায় কিছু পদক্ষেপ নিতে হয়। এ পদক্ষেপগুলো হল গবেষক নিজেই গবেষণার কার্যকর প্রক্রিয়া ও পরিকল্পনা তৈরি করবেন, এর পরে তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল নির্বাচন করবেন এবং সংগৃহীত উপাত্ত বিশ্লেষণ করবেন।

শিক্ষা গবেষণাকে আরো এক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণিকরণ করা হয়, এগুলো হল ঃ

১. মৌলিক গবেষণা (Fundamental Research)

২. ব্যবহারিক গবেষণা (Applied Research)

৩. কার্যোপযোগী গবেষণা (Action Research)

শিক্ষায় মৌলিক সত্য আবিষ্কার বা উদঘাটন করাই মৌলিক গবেষণা। আর ব্যবহারিক শিক্ষা গবেষণার মাধ্যমে একটি সহ-সম্পর্কযুক্ত কার্যকলাপ যাচাই করা বুঝায়। বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষায় কার্যোপযোগী গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গবেষক নিজের কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে উদ্যোগী হয়ে নিজেই একক বা দলগতভাবে স্থানীয় কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে নিয়ে কাজ করবেন। এগুলো দৈনন্দিন শিক্ষা সম্বন্ধীয় কোন সমস্যা বা ঘটনা হতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা সামাজিক

প্রতিষ্ঠানের কর্মরত শিক্ষক বা কর্মীগণ নিজেরাই একটি সমস্যা সমাধানের নিমিত্তে [illegible] ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নমুনা নিয়ে কাজ করতে পারেন। শিক্ষকসহ সকল পেশাজীবীগণ নিজ নিজ পেশায় নিয়োজিত থেকে কার্যোপযোগী গবেষণা করতে পারেন। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার যে কোন উপাংশ নিয়ে বিদ্যালয় ভিত্তিক স্থানীয়ভাবে শিক্ষকগণ নিজ নিজ উৎকর্ষ সাধনে একটি করে কার্যোপযোগী গবেষণায় কাজ করে যেতে পারেন। এর ফলে একজন শিক্ষক একজন গবেষক এবং একজন পেশাজীবী হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেন। শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতির উপর নির্ভর করে শিক্ষকগণ শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা কাজ করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন। শিক্ষকগণ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিদ্যালয়ভিত্তিক কার্যোপযোগী গবেষণার নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহ থেকে বিবিধ সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতে পারে।

গবেষণার ক্ষেত্রসমূহ

শিক্ষাক্রম বিতরণ, পাঠ্যপুস্তক উন্নয়ন, বিদ্যালয় উন্নয়ন কর্মসূচি, বিদ্যালয় প্রশাসন, শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া, পাঠদান পদ্ধতি ইত্যাদি।

কার্যোপযোগী গবেষণা চক্র

বিদ্যালয়ভিত্তিক গবেষণার মূল কর্মকাণ্ডও পরিকল্পিত লক্ষ্যসমূহ চক্রাকারে প্রবর্তন করেন প্রখ্যাত গবেষক ও শিক্ষাবিদ কুট লিউইন।

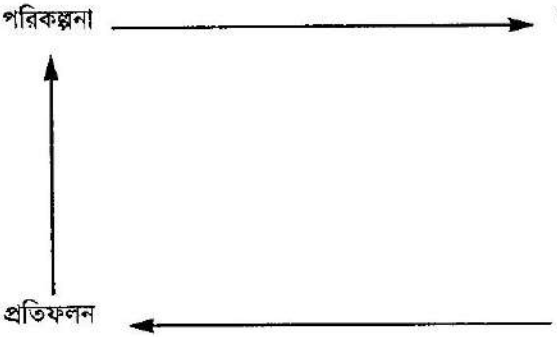

এ ধরনের গবেষণা শিক্ষক গবেষকগণ নিজেস্ব শিক্ষণ অনুশীলন পাঠশেষে নিজের উপস্থাপন পদ্ধতির সফলতা বা ব্যর্থতা নিয়ে নিজেই পর্যালোচনা বিচার বিশ্লেষণ করতে পারেন। বিষয় শিক্ষক নিজ শিক্ষণ পদ্ধতি, শিক্ষার্থীদের প্রতি তাঁর আচরণ বা গ্রহণযোগ্যতা, দৈনন্দিন শ্রেণিকক্ষ তা বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা, পাঠদানের অসঙ্গতি সমগ্র অবস্থান চিহ্নিতকরণ, ভবিষ্যত কাজের পদ্ধতি নির্ধারণ, উপাত্ত সংগ্রহকরণ, পর্যবেক্ষণ

কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন এবং সমগ্র পরিস্থিতি পর্যালোচনাপূর্বক পরিশোধিত কর্মপন্থা নির্ধারণ।

কার্যোপযোগী গবেষণার কার্যপদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ

১. সমস্যা চিহ্নিতকরণ

২. উপাত্ত সংগ্রহকরণ

৩. উপকরণ প্রস্তুতকরণ

৪. সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি মাধ্যমে কাজ সম্পাদনকরণ

৫. ফলাফল বিশ্লেষণপূর্বক এর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

একজন শিক্ষক-গবেষক হিসাবে সমস্যা চিহ্নিতকরণ পর্যায়ে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা যেতে পারে।

১. এমনভাবে সমস্যাটি চিহ্নিত করতে হবে যেন এর একটি সম্ভাব্য সমাধান খুঁজে বের করা যায়।

২. সম্পূর্ণ কাজটি শেষ করতে যেন শিক্ষকের নিয়মিত শিক্ষণ কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়।

৩. পরিকল্পনা অনুযায়ী সময়মত যেন উপাত্ত সংগ্রহ করা যায়।

৪. গবেষণালব্ধ ফলাফলের যেন নির্ভরশীলতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় থাকে।

৫. নীতিগত দিকসমূহ যেন সীমারেখা লঙ্ঘন না করে।

শিক্ষক গবেষক শিক্ষা ক্ষেত্রে যে ধরনের গবেষণা কাজ পরিচালনা করতে সক্ষম হবেন তার কিছু গুণাবলী ঃ

১. সমস্যাটি প্রশ্নের আকার তুলে ধরতে হবে।

২. বিভিন্ন চলকের মধ্যে সম্পর্ক চিহ্নিত করতে হবে।

৩. পরীক্ষণ কাজ পরিচালনা করার সম্ভাব্য সুযোগ থাকবে।

আমাদের দেশে বেশ কিছু শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা কাজ ঢাকাসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, এম.এড ডিগ্রি অর্জন কালীন সময়ে ঢাকাসহ অন্য কয়েকটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় ও আই.ই.আর এ সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু ঐ সকল গবেষণার কোনটির প্রকৃতি কার্যোপযোগী গবেষণা নয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে কোন গবেষণা করেন না। তাঁদেরকে কার্যোপযোগী গবেষণা পরিচালনা করতে অনুপ্রাণিত করতে হবে।

গবেষণা পদ্ধতি

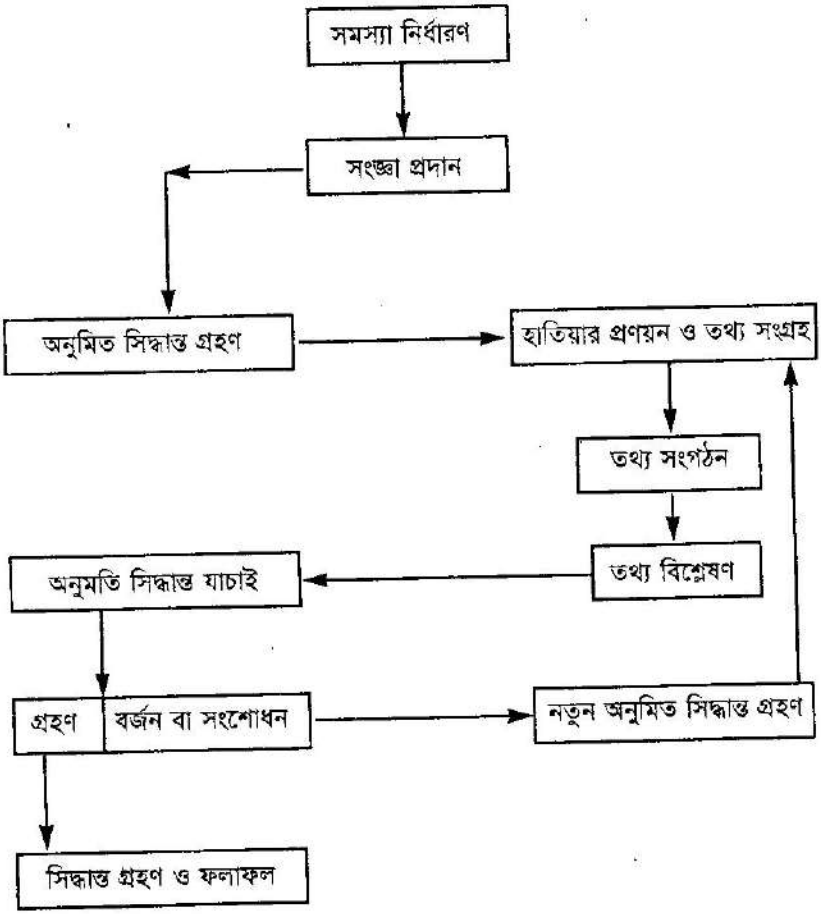
সমস্যা নির্ধারণ
সংজ্ঞা প্রদান
অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ
হাতিয়ার প্রণয়ন ও তথ্য সংগ্রহ
তথ্য সংগঠন
তথ্য বিশ্লেষণ
অনুমতি সিদ্ধান্ত যাচাই
গ্রহণ
বর্জন বা সংশোধন
নতুন অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ
সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ফলাফল

গবেষণার প্রস্তাবপত্র

সাধারণত গবেষণার প্রস্তাবপত্রে নিম্নরূপ বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে। তবে গবেষণা ভেদে ভিন্নরূপও হতে পারে।

১। গবেষণার শিরোনাম (Title of the problem)

২। গবেষণার ভূমিকা (introduction)

৩। গবেষণার সমস্যার বিবৃতি (Statement of the problem)

৪। যৌক্তিকতা ও তাৎপর্য (The rationale and significance of study)

৫। সংশ্লিষ্ট গবেষণায় ব্যবহৃত পদসমূহের সংজ্ঞা দান (Definition of term used)

৬। অনুমিত সিদ্ধান্ত (Hypothesis)

৭। গবেষণা পদ্ধতি (Methodology of the study)

৮। সময় বন্টন (Time Schedule)

৯। বাজেট (Budget)

১০। থিসিসের সংগঠন (Organisation of thesis)

১১। তথ্যপঞ্জি (Bibliography)

অনুমিত সিদ্ধান্ত (Hypothesis)

অনুমিত সিদ্ধান্ত একটি প্রতিজ্ঞা (Proposition) যার সত্যতা নিরূপণের জন্য বিভিন্ন ধরনের অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। গবেষক যা খুঁজেছেন তার অনুমিত সিদ্ধান্ত। এটি কোন ঘটনার প্রতিভাস বা বর্তমান অবস্থার আলোকে আপাতভাবে গৃহীত সত্য। সব ধরনের বিজ্ঞান সম্মত গবেষণায়ই অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। কারণ অনুমিত সিদ্ধান্তই বিজ্ঞানীর প্রধান যন্ত্র। পরীক্ষামূলক গবেষণায় নির্ভরশীল ও অনির্ভরশীল চলের সম্পর্ক অনুমিত সিদ্ধান্ত থেকেই প্রতিফলিত হয়। সাধারণ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে অনুমিত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অনুমানকে আশ্রয় করেই অনুমিত সিদ্ধান্ত রূপ লাভ করে। নিম্নোক্ত কারণে বিজ্ঞান সম্মত গবেষণার জন্য এটা অতি প্রয়োজনীয়।

১. সমস্যার ব্যাখ্যার মাধ্যমে সমস্যার প্রকৃতি সহজ করে দেয়।

২. সম্ভাব্য সমাধানের দিক নির্দেশনা দেয়।

৩. অনুসন্ধান কার্যক্রমের যুক্তির ধারণা দেয়।

৪. তথ্যের উৎস এবং সংগ্রহের পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দেয়।

৫. নীতি নির্ধারক হিসাবে কাজ করে।

৬. গবেষণা কার্যক্রমকে সীমাবদ্ধতা দান করে।

উত্তম সিদ্ধান্তের বৈশিষ্ট্য

১. যুক্তিসঙ্গত

২. কোন তত্ত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত

৩. তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সহজলভ্য

৪. প্রচলিত ঘটনাবলীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ

৫. সত্যতা যাচাই-এর ক্ষেত্রে সহজ দিক নির্দেশক।

৬. সুনির্দিষ্ট ও বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত।

৭. সহজভাবে বিবৃতি।

৮. সম্ভাব্যভাবে সত্য বা মিথ্যা সনাক্তকরণ।

অনুমিত সিদ্ধান্তের প্রকারভেদ

সাধারণত অনুমিত সিদ্ধান্তকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

ক. হ্যাঁ সূচক বা বর্ণনামূলক (Positive or literary) এটি ব্যাখ্যামূলক বা পরিসংখ্যানগত হতে পারে।

উদাহরণ ঃ শিক্ষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অনুশীলনী পাঠদানের সফলতায় যারা শিক্ষক নন তাদের চেয়ে শিক্ষকরা ভাল।

খ. না সূচক বা নাস্তি (Null or Negative) নাস্তি অনুমিত সিদ্ধান্তে দুই বা ততোধিক ব্যবস্থার কার্যকারিতার মধ্যে কোন তাৎপর্যপূর্ণ তফাৎ নেই। সংগৃহীত কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে এ ধরনের অনুমিত অবস্থা বিশেষভাবে গৃহীত বা বাতিল বলে গণ্য হয়।

উদাহরণ ঃ শিক্ষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অনুশীলনী পাঠদানের সফলতায় যাঁরা শিক্ষক নন এবং যারা শিক্ষক উভয় দলের মধ্যে সফলতার কোন পার্থক্য নেই।

অনুমিত সিদ্ধান্তের পরীক্ষা

অনুমিত সিদ্ধান্তের যথার্থতা নির্ণয় করার জন্য পরীক্ষানিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ তথ্য সংগ্রহ বিশ্লেষণ করে অনুমিত সিদ্ধান্তের সাথে তুলনা করা হয়। অনুমিত সিদ্ধান্ত পরীক্ষা করার পদ্ধতি দুই ভাগে বিভক্ত। একটি প্রত্যক্ষ এবং অপরটি পরোক্ষ পদ্ধতি। পরিমাপও পর্যবেক্ষণযোগ্য সমস্যার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

উদাহরণ

একটি টর্চ লাইটের সুইচ টিপে দেখা গেল লাইটটি জ্বলছে। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার অনুমিত সিদ্ধান্ত নেয়া যায়। যেমন -

ক. বাল্বটি অকেজো বা জ্বলে গেছে।

খ. ব্যাটারির চার্জ শেষ হয়ে গেছে।

গ. টর্চ লাইটটির অভ্যন্তরীণ সংযোগ বিচ্ছিন্ন ।

ঘ. বাল্বের সংযোগ বিচ্ছিন্ন।

প্রত্যেকটি অনুমিত সিদ্ধান্তই পর্যায়ক্রমে পরীক্ষাযোগ্য। সমস্যাটির কারণ ও সমাধান সহজেই বের করা যায়।

অপরদিকে বিমূর্ত (abstract) বিষয় সম্বলিত সমস্যার অনুমিত সিদ্ধান্তের পরিমাণ ও পর্যবেক্ষণযোগ্য নয়। এ ক্ষেত্রে বিকল্প পদ্ধতি অনুসরণ করতে ইচ্ছে। সমস্যার কারণ অনুধাবনের জন্য সংশ্লিষ্ট বা আনুষঙ্গিক পরিবেশ বা অবস্থা সৃষ্টি করে সেখান থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এভাবেই কল্পিত সিদ্ধান্তের যথার্থতা নিরূপণ করা হয়। উদাহরণ হিসাবে আচরণগত সমস্যার অনুমিত সিদ্ধান্ত নিয়ে অগ্রসর হওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে অনুমিত সিদ্ধান্ত এর সাথে বিকল্পভাবে গৃহীত পরীক্ষার ফলাফল সরাসরি তুলনা করতে হয়। সামঞ্জস্যপূর্ণ অসামঞ্জস্যপূর্ণ যুক্তিনির্ভর ফল অনুমিত সিদ্ধান্তের জন্য কাজে লাগান যাবে। এভাবে গবেষক সত্য বা মিথ্যা কোন আচরণের ফল থেকেই সামঞ্জস্য বা অসামাঞ্জস্য ধরে নেবেন। এটিই অনুমিত সিদ্ধান্ত পরীক্ষার পরোক্ষ পদ্ধতি।

সাধারণত গবেষণার সমস্যা চিহ্নিত করে গবেষক অনুমিত সিদ্ধান্ত গঠন করেন। তবে এ কাজটি সব ক্ষেত্রে সহজ নয়। অনেক সময় অনুমিত সিদ্ধান্ত স্থির করা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। তখন অনুমিত সিদ্ধান্তে স্থির না করে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণের পর যে, ফলাফল পাওয়া যাবে তার উপর ভিত্তি করে অনুমিত সিদ্ধান্ত গঠন করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে গবেষককে ভাব প্রবণতাও পক্ষপাতিত্বের উর্ধ্বে থাকতে হবে।

যে কোন গবেষণা পরিচালনা, পর্যবেক্ষণ, পরিমাপ করতে এবং নিয়ন্ত্রণাধীন রাখতে হয় অবস্থা বা উপাদানের বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করতে হয়। এদেরকে চল বলা হয়। চল দুই প্রকার স্বাধীন বা নিরপেক্ষ বা আত্মনির্ভরশীল চল ও নির্ভরশীল বা অপেক্ষ চল। স্বাধীন বা নিরপেক্ষ চল বলতে ঐ সকল উপাদান শর্ত বা অবস্থাকে বুঝায় যা গবেষক নিজের প্রয়োজন অনুসারে নিয়ন্ত্রণ করেন। যে সকল উপাদান বা শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কোন পরিলক্ষিত ঘটনাবলী উপাদানসমূহের অন্তর্নিহিত সম্পর্কাবলি নির্ণয় করে সেগুলোই নিরপেক্ষ বা আত্মনির্ভরশীল চল। আত্মনির্ভরশীল বা নিরপেক্ষ চলের পরিবর্তনের ফলে অবস্থা বা আচরণের যে পরিবর্তন দেখা যায় তাকে অপেক্ষ বা নির্ভরশীল চল বলে। এক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক চলের মধ্যকার সম্ভাব্য সম্পর্ক অনুমিত সিদ্ধান্তে বর্ণনা করা হয়। এবং তা প্রমাণসাপেক্ষে শিক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষা উপকরণ যে কোন প্রতিযোগিতামূলক পুরস্কার প্রাপ্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ চল হিসাবে ধরে নিয়ে শিক্ষা গবেষণা পরিচালনা করা হয়। আর পরীক্ষার নম্বর এবং ভুলভ্রান্তির সংখ্যাকে অপেক্ষ বা নির্ভরশীল চল হিসাবে বিবেচনা করা হয়। নির্ভরশীল চল থেকে শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞানের উপর অনির্ভরশীল চলের বিস্তারিত প্রভাব। জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে স্বাধীন চলের প্রভাবই শিক্ষার্থীদেরকে বেশি সচল করে রাখে। এক্ষেত্রে শিখন ফল বেশি।

তাৎপর্য পরিমাপক দণ্ড

কোন অনুমতি সিদ্ধান্তের দুইটি চলের পরিবর্তনের মধ্যে পার্থক্য আছে কি না তা নির্ধারণের জন্য একটি নির্ণয়ক (citerion) বা মানদন্ড ঠিক করে নিতে হয়। ইহা তাৎপর্য পরিমাপক দণ্ড (Level of significance) নামে পরিচিত। শিক্ষা এবং মনোবিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা ক্ষেত্রে শতকরা ৫ ভাগ ভুলের জন্য তাৎপর্য পরিমাপক দণ্ড ধরা হয় ০.০৫। পরীক্ষণ দল এবং নিয়ন্ত্রিত দলের পরীক্ষা পরিচালনায় বিভিন্ন কারণে শতকরা ৫ ভাগ ভুল ধরে নেয়া হয়। 'না' সূচক অনুমিত সিদ্ধান্তের (Level of significance) ০.০৫ এর জন্য টেবিলে একটি মান দেয়া থাকে। যদি নির্ণয়কৃত মান টেবিলে দেয়া মানের সমান বা বড় হয় তা হলে না সূচক অনুমিত সিদ্ধান্তকে অকার্যকর বা বাতিল বলে গণ্য করা হয়। বস্তুত দুইটি দলের মধ্যে চলের পার্থক্যের কারণে ক্রিয়াকলাপের পার্থক্য ঘটে।

তথ্য (Data)

যে কোন গবেষণা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা, কোন সমস্যার সমাধান করা এবং অনুমিত সিদ্ধান্ত পরীক্ষানিরীক্ষা করার ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট দিক থাকে। তা হল তথ্য সংগ্রহ। এ তথ্য বিভিন্ন পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয়। সাধারণত প্রাথমিক উৎস থেকে

প্রত্যক্ষ বা সরাসরি এবং মাধ্যমিক উৎস থেকে পরোক্ষ বা বই পুস্তক রেকর্ড পত্রের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ আদমসুমারি কর্তৃপক্ষ নিজেরাই সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করে বিবরণী প্রকাশ করলে বা সম্পূর্ণ মৌলিক তথ্য থাকবে। আর যদি পূর্বের প্রকাশিত বিবরণী এবং মূল তথ্য থেকে সংগৃহীত তথ্য বিবরণী নতুনভাবে প্রকাশ করলে তা মাধ্যমিক তথ্য হিসাবে বিবেচিত হবে। সাধারণত বিভিন্ন পত্র পত্রিকা, বই, রেকর্ড ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত সন্ধানসমূহ মাধ্যমিক তথ্য হিসাবে ধরা হয়।

সংগৃহীত তথ্য দুই প্রকার। যথা পরিমাণগত ও গুণগত। পরিমাণগত তথ্য দ্বারা কোন কিছুর পরিমাণ প্রকাশ করে। যেমন- বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১২ কোটি বা এক ব্যক্তির উচ্চতা ৬ ফুট বা তার ওজন ৬০ কেজি ইত্যাদি গুণগত তথ্য দ্বারা তথ্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা গুণ বোঝায়। যেমন দক্ষ শ্রমিক বা উন্নয়নশীল দেশ। সংগৃহীত তথ্যকে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাস যোগ্য করার জন্য পরিমাণে (Quantitication of data) প্রকাশ করতে হয়। পরিমাণে প্রকাশ করার জন্য নানা প্রকার পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। শতকরা রেটিং স্কোর বোর্ড মেধাভিত্তিক স্থান সংখ্যা রাশি ইত্যাদির মাধ্যমে পরিমাণে প্রকাশ করা হয়।

তথ্য সঞ্চালন শৃংখল (Information transfer chain)

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন কিছু আবিষ্কার বা নতুন তথ্য উদঘাটন হলে তা অন্যান্য বিজ্ঞানী বা আবিষ্কারকদের কাছেও প্রচারিত হয়। এবং এর ব্যবহার জ্ঞানের সৃষ্টিকে একটি চক্রের মাধ্যমে দেখানো যায়। এ চক্রটিকে তথ্য সঞ্চালন শৃঙ্খল বলা হয়। নিম্নরূপ স্তরসমূহের দ্বারা এ শৃঙ্খলটি গঠিত ঃ

১। একজন বা একদল বিজ্ঞানী নতুন তথ্য সৃষ্টি বা আবিষ্কার করেন।

২। নতুন তথ্য ছাপানো হয় এবং রেকর্ড বন্টন করা হয়।

৩। কোন প্রকাশনা কর্তৃক তথ্যসমূহ তালিকাভুক্ত করা হয়।

৪। তথ্যগুলো প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় প্রকাশনায় গ্রন্থাগারের ন্যায় সংরক্ষণাগারে সংগৃহীত হয়।

৫। সংরক্ষিত তথ্য আবার একদল বা একজন বিজ্ঞানী কর্তৃক বিক্ষিপ্ত হয় ও নতুন তথ্য ও তত্ত্ব সৃষ্টির কাজে ব্যবহৃত হয়।

৬। নতুন তথ্য সৃষ্টি হয় এবং নতুন চক্র শুরু হয়।

[illegible]করণ (Generalization)

[illegible] একটি ছোট দলে (Sample group) পরীক্ষণ কার্য পরিচালনা করে [illegible] পরীক্ষিত দলের বাইরে একটি বিশেষ শ্রেণির জনসংখ্যার ক্ষেত্রে প্রয়োগ [illegible] পারে। এ ধরনের নমুনা দল থেকে প্রাপ্ত গবেষণার ফলাফলকে বৃহত্তর [illegible] ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাকে সাবিকীকরণ (Generalization) বলা হয়। এক্ষেত্রে [illegible] দলটিকে সমগ্র দলের প্রতিনিধিত্ব করতে হয়। পরিবেশ শিক্ষারমান আর্থসামাজিক [illegible] ইত্যাদি সকল দিক থেকে নমুনা দলটিতে বৃহত্তর দলে আনুপাতিক হার সদস্য [illegible] থাকতে হবে।

[illegible] ভূমিকা (Role of Theory)

জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে বা সভ্যতার অগ্রগতির ক্ষেত্রে তত্ত্বের ভূমিকাই প্রধান। [illegible] জ্ঞানকে তত্ত্বের সাথে একত্রিত করে দেখা গেল জ্ঞানকে অধিকতর অর্থপূর্ণ [illegible] মনে হবে। জ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে তত্ত্ব ও গবেষণা নতুন জ্ঞান-সন্ধান কার্যক্রমকে [illegible] করে। তত্ত্ব গবেষণা কর্মকাণ্ডে গবেষককে উৎসাহিত ও প্ররোচিত করে। ফলে [illegible] যায় তত্ত্ব ও গবেষণা একে অপরের পরিপূরক। প্রচলিত তত্ত্ব গবেষণার মাধ্যমে [illegible] নিরীক্ষা করে নতুন তত্ত্ব প্রবর্তন করা হয়। আবার গবেষণার ফলাফল [illegible] ভাবে তত্ত্ব প্রবর্তনে সহায়তা করে। অনেক ক্ষেত্রে তত্ত্ব গঠনের জন্য পরিকল্পিত [illegible] গবেষণা পরিচালনা করতে হয়।

সৌরজগত কার্যক্রমের ঘূর্ণায়মান তত্ত্বের জানা অবস্থান থেকে মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন নতুন সম্ভাবনার দ্বার উদঘাটন হয়। এমনিভাবে আণবিক গঠন জানা না থাকলে আণবিক শক্তির আবিষ্কার হয়তো বিলম্বিত হত। বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্যই হল তত্ত্বের প্রবর্তন করা। আবার বিজ্ঞানের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পুরানো আবিষ্কারের উপর ভিত্তি করে। নতুন কিছু সংযোজন বা আবিষ্কার করা। এভাবে একটা আবিষ্কারের মাঝে অসংখ্য নতুন নতুন তত্ত্বের সন্ধান মিলে যায়। যেমন মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কারের ফলে আজকের দিনে নানা ধরনের কর্মকাণ্ডে এর ব্যবহার এবং নতুন নতুন জীবানু বা অণু পরমাণু নিয়ে গবেষণা ইত্যাদি সব কিছুই সম্ভবপর হয়েছে। পরিশেষে বলা যায় বাস্তব জীবন ও জগতে তত্ত্বের ভূমিকা অপরিসীম। এখনো অনেক অজানাকে জানার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

গবেষণার সমস্যা চিহ্নিতকরণ

শিক্ষা ক্ষেত্রে গবেষণার উপযোগী সমস্যা নির্বাচনের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে গবেষণা কার্যক্রমে অগ্রসর হতে হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণার বিষয়বস্তুর

অভাব নেই। তবুও গবেষণার সবচেয়ে কঠিন পদক্ষেপ হল সমস্যা চিহ্নিত করা। নতুন গবেষককে সমস্যা বাছাই করতে বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। গবেষণা কার্যক্রমের সাথে সম্পূর্ণ পরিচিত হওয়ার পূর্বে গবেষণার সঠিক সমস্যা চিহ্নিত করা যায় না। গবেষণাকারীকে বিশেষ ক্ষেত্রে গবেষণা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে হয়। বিষয়বস্তুর নির্বাচনে আগ্রহ, মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি, কৌতূহল থাকা অপরিহার্য। অন্যের সাহায্যে গবেষণার সমস্যা নির্ধারণ করা ঠিক নয়। নিজে নিজের গবেষণার সমস্যা নির্বাচন করাই উত্তম। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে চূড়ান্ত নির্বাচনের জন্য উপদেষ্টা, বিষয় শিক্ষক, সহপাঠীদের সাথে আলাপ আলোচনা করা যেতে পারে।

গবেষণার সমস্যাটি সহজ সুনির্দিষ্ট ও গবেষণার উপযোগী হতে হবে। সমস্যাটির প্রয়োগ ক্ষমতা, মৌলিকতা এবং গুরুত্বপূর্ণতা থাকতে হবে। গবেষণার বাস্তবক্ষেত্র থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতাই গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন সবচেয়ে বেশি সহায়ক। তবে গবেষণা কার্যের সুষ্ঠু পরিচালনা অনেকাংশে অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। সহজ ও ছোট আকারের শিক্ষা গবেষণার কয়েকটি সমস্যা নিম্নে দেয়া হল ঃ

১. সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যাও সমাধান।

২. প্রাথমিক স্বাস্থ্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পুষ্টিহীনতার কারণ সমস্যাও সমাধান।

৩. শিশুর সার্বিক বিকাশে প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষা কতটুকু সহায়ক?

৪. প্রাথমিক স্তরে হাতেকলমে কৃষি শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে উদ্ভূত সমস্যাও তার সমাধান।

৫. মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা সহায়ক উপকরণের অভাব, মাধ্যমিক স্তরে হস্তনির্মিত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির উপযোগিতা কতটুকু।

৬. প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির ত্রুটিসমূহও সমাধান।

৭. রচনামূলক প্রশ্নোত্তরের ত্রুটি ও সংস্কার।

৮. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন পত্রের ত্রুটি ও সংস্কার।

৯. বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিকাশ

১০. কারিগরি শিক্ষার বিকাশ।

১১. মাধ্যমিক স্তরে কৃষি শিক্ষার প্রবর্তনের সমস্যা ও সমাধান।

১২. কম্পিউটার বিজ্ঞান পঠন, পাঠ ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে সমস্যাও সমাধান।

গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা একান্ত আবশ্যক। নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ঃ

ঙ সমস্যার নির্বাচন (Selection a topic)

চ থিসিসের সাথে সংশ্লিষ্ট বইপত্র গবেষণা প্রবন্ধ ইত্যাদির পর্যালোচনা Review of retated literature)

ছ গবেষণা কাঠামো (Design of the research)

জ অধ্যায়ের রূপরেখা (Outline of the chapter)

বিষয়বস্তু নির্বাচনের উৎস

১ সমাজ বিদ্যালয় শ্রেণিকক্ষ, সম্পর্কিতঃ যেমন শিক্ষাদান পদ্ধতি কি [redacted]? শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা কি যথেষ্ট ? শিক্ষার্থীদের চাহিদা কি পূরণ হচ্ছে? [redacted] পাঠ্যসূচি কি যথার্থ ? শিক্ষক কি প্রতিনিয়তই নতুন সমস্যার সম্মুখীন হন ?

২ শিক্ষা সহায়ক উপকরণের চাহিদা সম্পর্কিতঃ শিক্ষক কি শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করেছেন? রেডিও টেলিভিশন এর শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানমালায় কি ধরনের প্রভাব রয়েছে? শিক্ষাদান প্রক্রিয়া কিভাবে অধিকতর আকর্ষণীয় করা যায়? শিক্ষাদান কর্মসূচি কি ফলপ্রসূ ?

৩। শিক্ষাসংক্রান্ত অভিজ্ঞতাঃ পাঠ্যপুস্তক, প্রবন্ধ, সাময়িক, শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট, শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন ইত্যাদি।

৪। উপদেষ্টা, বিষয় শিক্ষক, অধ্যাপকদের সঙ্গে আলোচনা।

৫। কোন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষকদের সাথে আলোচনা।

বিষয়বস্তু নির্বাচনের নীতিমালা

১। গবেষণাটি স্তর অনুযায়ী উপযুক্ত কিনা?

২। বিষয়বস্তুটি যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক বা আগ্রহউদ্দীপক কিনা?

৩। সমস্যাটি তাৎপর্যপূর্ণ কিনা?

৪। বিষয়বস্তুটি নতুন কিনা?

৫। সমস্যাটি কি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা যাবে?

৬। বিষয়টি কি জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি করে?

৭। গবেষণাটির তথ্যসংগ্রহ ও অন্যান্য কাজের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ পাওয়া যাবে কিনা?

৮। লাইব্রেরির সুযোগ আছে কিনা?

৯। গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি আছে কিনা?

১১। যাদের উপর পরীক্ষানিরীক্ষা চালানো হবে তাদের পাওয়া যাবে কিনা?

গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট বইপত্র, গবেষণা, প্রবন্ধ ইত্যাদি পর্যালোচনা

উপযুক্ত সমস্যা বাছাই করার পর গবেষণা কাজের সংশ্লিষ্ট বইপত্র, প্রবন্ধ, গবেষণা, উপকরণ ইত্যাদির পর্যালোচনা ও পাঠের প্রয়োজন হয়। থিসিস এমন একটি কাজ যা গবেষককে বিষয়টির কতটুকু জানা আর কতটুকু অজানা তা পরীক্ষানিরীক্ষা করে অগ্রসর হতে হবে। তথ্য সংগ্রহণের জন্য প্রাথমিক উৎস (Primary source) মাধ্যমিক উৎস (Secondary source) অথবা তৃতীয় প্রকার উৎস (Tertiary Source) ব্যবহার করা যেতে পারে। যে কোন গবেষণার ক্ষেত্রে উপকরণের প্রাথমিক উৎস হারিয়ে যেতে পারে। সে কারণে দ্বিতীয় বা তৃতীয় উৎস কাজে লাগাতে হবে। প্রাথমিক উৎস পাওয়া গেলে দ্বিতীয় বা তৃতীয় উৎস কাজে লাগানো ঠিক নয়।

গবেষণার কাঠামো (Research Design)

যে কোন গবেষণার কাঠামোর মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে।

১। অনুমিত সিদ্ধান্ত বিবৃতি (Statement hypothesis)

২। অনুমিতির বর্ণনা (Definition of assumption)

৩। গবেষণার সীমাদ্ধতা (Limitation of the Problem)

৪। ব্যবহৃত শব্দের সংজ্ঞা (Definition of the term used)

৫। গবেষণার কাঠামোর যথোপযুক্ততা (Appropriateness of research design)

৬। সমগ্রক এবং নমুনার বর্ণনা (Description of population and sample)

৭। ত্রুটি নিয়ন্ত্রণ (Controlling unit error)

৮। নির্ভরযোগ্য ও যথার্থতা (Reliability and validity)

অধ্যায়ের রূপরেখা ঃ (Chapter out line)

থিসিসের খসড়া তৈরির প্রথম আবশ্যিক ধাপ হল অধ্যায়ের রূপরেখা। এ রূপরেখার উপর ভিত্তি করেই উপদেষ্টা বা বিষয় শিক্ষক গবেষণা কাজের নির্দেশ দিয়ে থাকেন. এটি নির্দেশিকা হিসাবে কাজ করে। গবেষকও ধারাবাহিকভাবে তার পেশাকৃত রূপরেখা অনুযায়ী কাজে অগ্রসর হয়ে থাকেন, প্রত্যেকটি অধ্যায়ের মধ্যে কতগুলো প্রধান উপশিরোনাম ও অপ্রধান উপশিরোনাম থাকে। তবে গবেষণার অনুসন্ধানে অগ্রসরের সাথে কোন কোন শিরোনাম হয়ত পরিবর্তিত হতে পারে। চূড়ান্ত কাঠামো গবেষণার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।

অধ্যায়ের রূপরেখার নমুনা

প্রথম অধ্যায় ঃ ভূমিকা (Introduction)

১.১ সমস্যার শিরোনাম ও সমস্যার বিবরণ (Title and statement of the problem)

১.২ সমস্যার গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা (Need of the study)

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য (Objective)

১.৪ অনুমিত সিদ্ধান্ত (Hypothesis)

১.৫ গবেষণার সীমাবদ্ধতা (Limitation of the study)

১.৬ ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ শব্দসমূহের সংজ্ঞা (Definition of the important terms used)

১.৭ গবেষণার তাৎপর্য (Significanece of the study)

দ্বিতীয় অধ্যায়

সংশ্লিষ্ট বইপত্র প্রবন্ধ গবেষণা ইত্যাদির পর্যালোচনা (Review of related literature)

তৃতীয় অধ্যায়

গবেষণা পদ্ধতি ঃ (Methodology of the study)

৩.১ ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতি (Methods used)

৩.২ তথ্যের উৎসসমূহ (Sources of information)

৩.৩ গবেষণার নমুনা (Sample of the study)

৩.৪ গবেষণার উপকরণ (Tools of the study)

৩.৫ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি (Technique of data collection)

৩.৬ তথ্য বিশ্লেষণের কৌশল (Technique of analysis of data)

চতুর্থ অধ্যায়

উপাত্ত উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

Presentation and Analysis of Data

৪.১ ভূমিকা (Introduction)

৪.২ সারণি (Tables)

৪.৩ চিত্র বা নকশা (Illustrations)

পঞ্চম অধ্যায়

৫.১ গবেষণার সারাংশ ও সিদ্ধান্ত (Summary and conclusion)

৫.২ সিদ্ধান্ত (Summary)

৫.৩ আলোচনা (Discussion)

৫.৪ পরবর্তী গবেষণার সুপারিশসমূহ (Recommendation for further research)

শিক্ষা গবেষণার পদ্ধতি

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষবর্ষ থেকে শিক্ষা ক্ষেত্রে গবেষণাকে ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব হতে থাকে। ইতিমধ্যেই শিক্ষা কার্যক্রমের সর্বত্রই গবেষণার প্রয়োগ বিস্তার লাভ করে। শিক্ষা ক্ষেত্রে গবেষণার মাধ্যমে ব্যাপক উন্নতি ঘটতে থাকে। শিক্ষা সার্বজনীন প্রভাব বিস্তার করছে। আর শিক্ষা গবেষণা নতুন তথ্য বা জ্ঞান বা লাগসই প্রযুক্তির বিকাশ ঘটিয়ে গোটা বিশ্ব-মানব কল্যাণের বিপুল উন্নতি সাধনে সহযোগিতা করছে। শিক্ষা গবেষণাকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

১. ঐতিহাসিক গবেষণা।

২. বর্ণনামূলক গবেষণা।

৩. পরীক্ষামূলক গবেষণা।

১ ঐতিহাসিক গবেষণা

ইতিহাস হল মানবজাতির কর্মকাণ্ডের সঠিক, সার্থক ও সম্পূর্ণ প্রমাণ। অতীত ঘটনাবলী পেক্ষাপটে বর্তমানকে জানাবার জন্য ইতিহাস পাঠ করতে হয়। অতীত ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করে রাখতে হয়। অতীত থেকে জ্ঞান আহরণ করা হয়। বর্তমানে যে ঘটছে তার সাথে অতীত ঘটনাবলীর সম্পর্ক নির্ণয় করতে হয়। যাতে করে ভবিষ্যতে কর্মসূচি প্রণয়ন করা যেতে পারে। দেশ জাতি বা সমাজের কল্যাণে কোন ব্যক্তি দল, আদর্শবাদ আন্দোলন বা প্রতিষ্ঠান অবদান রাখতে পারলেই তা ইতিহাসের অংশ বলে বিবেচিত হবে। এক কথায় বংশানুক্রমিক ঘটনাবলী ইতিহাসের অংশ নয়। ইতিহাস জানা বা বিশ্লেষণ করা অপরিহার্য, ভবিষ্যতে কি ঘটতে পারে তার একটা ইতিহাস পাওয়া যায়।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সঠিকভাবে অনুসরণ করে অতীত ঘটনাবলীর বর্ণনা এবং বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াকে ঐতিহাসিক গবেষণা বলে। এ ক্ষেত্রে পুরাতন রেকর্ডপত্র, দলিল পত্র পত্রে নতুন তথ্য ও নীতি উদঘাটন করা যায়। কোন ঘটনা একটা বিশেষ সময়ে একটা নির্দিষ্ট স্থানে ঘটছে, তার অস্তিত্বের সঠিক সন্ধান দেয়াই ইতিহাস গবেষণারই কার্যক্রম। বৈজ্ঞানিকগণ এ ধরনের গবেষণার সমস্যা চিহ্নিতকরণ, অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, তথ্য সংগ্রহ, বিন্যাস ও বিশ্লেষণকরণ ইত্যাদি কর্মসূচি অনুযায়ী অগ্রসর হতে থাকেন। অনেক পরীক্ষণ, নবায়ন ও গবেষণার পরে নতুন তত্ত্ব বা জ্ঞান তাঁরা আবিষ্কার করেন। শিক্ষাক্ষেত্রে এ ধরনের গবেষণা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিজ্ঞান বিষয় ছাড়াও ইতিহাস, সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, প্রযুক্তি মানবিক বিষয়সমূহে এর প্রচলন ঘটছে। তবে ঐতিহাসিকগণ এ পদ্ধতি এতবেশি ব্যবহার করেন বলেই এটা ঐতিহাসিক পদ্ধতি নামে সুপরিচিত, শীলাস্তর ও জীবন পৃথিবীর জন্ম সংক্রান্ত ঘটনাবলীর সাথে জড়িত। এগুলো প্রাগৈতিহাসিক জীবন সম্বন্ধে ধারণা দেয়। এসব তথ্য পাঠে বর্তমান যুগের মানুষের কৌতূহল থাকায় ও যুক্তিসংগত কারণ আছে, আজকের দিনে সঠিক জ্ঞান অর্জন অপরিহার্য। বিশ্ব প্রকৃতির অতীত ও বর্তমানকে যেমন বুঝাতে হবে তেমনি ভবিষ্যত অবস্থানকে জানার জন্যই গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হচ্ছে। প্রধানত তিনটি কারণ এখানে উল্লেখ্য।

১। অতীত ও বর্তমানকে সম্যক উপলব্ধি করা।

২। অতীত ঘটনাবলীর গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান আবিষ্কার করা।

৩। অতীতের লিখিত বা সৃজনশীল কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতি কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির, সমস্যা চিহ্নিত করা সহজ নয়। আবার অতিসচেতনা তার সঙ্গে অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। সঠিকভাবে অনুমিত সিদ্ধান্ত গৃহীত না হলে ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য সংগৃহীত তথ্যাদি ঘটনার বিবরণী হবে। তুলনা করা বা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণা নেয়া কিছুই সম্ভবপর হবে না, কারণ এ ধরনের গবেষণা পদ্ধতিতে তথা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা অন্যান্য গবেষণা পদ্ধতির চেয়ে বেশ কঠিন। কেননা এ পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করতে গবেষককে অন্যের বর্ণনা অভিজ্ঞতা বা লেখনীর উপর নির্ভর করতে হয়। নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহের জন্য অনেক ক্ষেত্রে গবেষককে ধ্বংসাবশেষের উপর নির্ভর করতে হয়। তখন যুক্তির প্রয়োগ তথ্যাদির বিন্যাস ও বিশ্লেষণ করা বেশ কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণে গবেষককে জ্ঞান সৃজনশীল তথ্য সমৃদ্ধ হতে হয়।

তথ্যের উৎস ঃ

ঐতিহাসিক সাক্ষ্য বা প্রমান সংগ্রহ করার উৎস দুই প্রকার ঃ

১। প্রাথমিক উৎস (Primary Source)

২। মাধ্যমিক উৎস (Secondary Source)

প্রাথমিক উৎস ঃ প্রত্যক্ষভাবে দর্শনকারী বা অংশগ্রহণকারীর লিখিত বা মৌখিক বিবরণকে প্রাথমিক উৎস এবং সংগৃহীত তথ্যকে মূল তথ্য বলা হয়।

প্রাথমিক উৎস বিভিন্ন প্রকার হতে পারে –

যেমন ঃ- ইচ্ছাকৃত বা ঐচ্ছিক সংবিধান, ছবি, গবেষণা রিপোর্ট, উইল, মানচিত্র, পেন্টিং, বিজ্ঞাপন, খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন, লিপি ইত্যাদি অনিচ্ছাকৃত বা অনৈচ্ছিকঃ- জীবাশ্ম, কঙ্কাল, জামা-কাপড় ছবি, মুদ্রা, আসবাবপত্র, চলচ্চিত্র, সমাধি, কোন দল কোন ফুল ইত্যাদি।

লিখিত ঃ অফিসের দলিলপত্র, রেকর্ড, সংবাদপত্র, সাময়িকী, চিঠিপত্র ব্যক্তিগত ডায়েরি, জীবনী, আত্মজীবনী,স্মৃতিকথা ইত্যাদি।

অলিখিত ঃ জীবনী, আত্মজীবনী স্মৃতিকথা।

ঐতিহাসিক সমালোচনা

ঐতিহাসিক গবেষণা কর্মকাণ্ডের জন্য সমালোচনা অপরিহার্য। নির্ভরযোগ্য ও ব্যবহারযোগ্য তথ্যকে ঐতিহাসিক গবেষণায় ঐতিহাসিক প্রমাণ (Historial evidence) হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এ ধরনের প্রমাণাদিই অনুমিত সিদ্ধান্ত যা

[illegible] তথ্যাদি বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় আর ঐতিহাসিক [illegible] একমাত্র উপায় হল ঐতিহাসিক সমালোচনা, ইহা দুই প্রকার ঃ-

. বহিঃক সমালোচনা ২। আভ্যন্তরীণ সমালোচনা ।

বহিঃক সমালোচনা

দলিলপত্র, রেকর্ড, রিপোর্ট বই, পুস্তক ইত্যাদির সঠিকতা যাচাই করাকে বাহ্যিক সমালোচনা বলা হয়। এজন্য নানা রকম পরীক্ষানিরীক্ষার সাহায্য নিতে হয়। তর্কাতীত ও আইনানুগ সন্তোষজনকভাবে প্রমাণ ব্যতিরেকে কোন ধরনের বইপত্র রেকর্ড দলিল তথ্যকে গ্রহণ না করাই গবেষকের অন্যতম পদক্ষেপ। আজকাল ভৌতিক ও রাসায়নিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সঠিকতা যাচাই করা হয়। এ ছাড়া সম্প্রতি অতি বেগুনি রশ্মি ও প্রতিপ্রভা আলোকচিত্রের সাহায্যে দলিলপত্র ও লিখিত যে কোন রেকর্ড বা রিপোর্ট পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়। অসমাঞ্জস্য হলে সেটা গ্রহণ যোগ্য হবে না।

আভ্যন্তরীণ সমালোচনা

ঐতিহাসিক গবেষণায় কোন ঘটনা সঠিক কিনা তা বাহ্যিক সমালোচনা দ্বারা নির্ধারণ করা হয়। আর ঘটনা নির্ভুল প্রমাণিত হলে তথ্যে কি বলা হয়েছে তা যাচাই করাই আভ্যন্তরীণ সমালোচনা। এ ধরনের সমালোচনার মাধ্যমে পরিবেশিত তথ্যের যথার্থতা নির্ভরযোগ্যতা, সঠিকতা, যৌক্তিকতা বা বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা যাচাই করা হয়। আভ্যন্তরীণ সমালোচনার বই বা দলিল পত্রের লেখকের বৈশিষ্ট্য নিয়েই আলোচনা করতে হয়। এখানে লেখকের সততা, আন্তরিকতা পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ও কারণ তথ্য সরবরাহ কি সঠিক বা নির্ভুল ছিল? ঐতিহাসিক গবেষণা পরিচালনা করতে বাহ্যিকও আভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার সমালোচনারই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

সংযোগ সাধন বা সংশ্লেষণ

বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সমালোচনার পর তথ্যমালাকে অর্থবোধক একীকরণের মাধ্যমে একক একটা উপাদানকেই সংশ্লেষণ বা সংযোগ সাধন বলা হয়। অনুমিত সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হলে ইতিহাস রচনা, ফলাফল প্রকাশ বা প্রতিবেদন তৈরির কাজ শুরু হয়। ধারাবাহিকভাবে গবেষককে নিজ সৃজনশীলতা, জ্ঞান উৎসাহও সততা কর্মকাণ্ডে কাজে লাগাতে হয়। সত্য উদঘাটনের জন্য তাকে আভ্যন্তরীণ ভাবেই অগ্রসর হতে হয়।

বর্ণনামূলক গবেষণা

বর্তমান সমস্যাবলীর উপর ভিত্তি করেই বর্ণনামূলক গবেষণা পরিচালনা করা হয়। এতে বর্তমান বিষয়ের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা থাকে। এ জাতীয় গবেষণার বিষয়বস্তু হল চলমান বর্তমান। বর্তমানের যে অবস্থা, রীতিনীতি, বিশ্বাস মনোভাব এসব কিছু নিয়েই বর্ণনামূলক গবেষণা। চলমান প্রক্রিয়া, দৃষ্টিভঙ্গি, প্রতিক্রিয়া, প্রবণতা যা কিছু পরিলক্ষিত হয়, তাই বর্ণনামূলক গবেষণার ভিত্তি। এ পদ্ধতিতে সংগৃহীত তথ্যের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করা গবেষণার একটা গুরত্বপূর্ণ দিক। বর্ণনার মাধ্যমে সম্পন্ন হয় শ্রেণি বিভাগ, পরিমাপন, ব্যাখ্যা মূল্যায়ন ইত্যাদি প্রক্রিয়া। সমাজ বিজ্ঞানের সবচেয়ে প্রচলিত পদ্ধতি হিসাবে এ ধরনের গবেষণায় মানুষের আচার-আচরণ বিশ্লেষণ করা হয়। এটা অনেক ক্ষেত্রে সহজ গবেষণা পদ্ধতি। একে অনেক সময় জরিপ ভিত্তিক গবেষণাও বলা হয়। বাসস্থান, বিদ্যালয়, শ্রেণিকক্ষ, শিল্প প্রতিষ্ঠান, কারখানা বিনোদন কেন্দ্র, সামাজিক কল্যাণমূলক, সংস্থা ইত্যাদি সম্পর্কিত মানুষের আচার আচরণ রীতিনীতি পরীক্ষা নিরীক্ষা, বিশ্লেষণ করার জন্যই এ পদ্ধতির প্রয়োগ। সমাজ কল্যাণে বিভিন্ন শিক্ষাদান বা প্রভাবের রূপান্তর নিয়ে অধিকতর ফলপ্রসূ কর্মসূচি বের করতে এ জাতীয় গবেষণা পরিচালনা করা হয়।

বর্ণনামূলক গবেষণার প্রকারভেদ

বর্ণণামূলক গবেষণা প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত

১. জরিপ গবেষণা (Survey Study)

২. বিষয়ী অনুধ্যান (Case Study)

জরিপ গবেষণা পদ্ধতি সাধারণত চার প্রকার

১. সামাজিক জরিপ (Social Survey)

২. জনমত জরিপ (Public Survey)

৩. স্কুল জরিপ (School Survey)

৪. বাজার জরিপ (Market Survey)

১. সামাজিক জরিপ ঃ সমাজের নানান সমস্যাবলি যেমন-বেকার সমস্যা, জনসংখ্যা-বিস্ফোরণ, যাতায়াত সমস্যা, কিশোর অপরাধ সমস্যা ইত্যাদি সমস্যার সমাধান সামাজিক জরিপ গবেষণা প্রয়োগ করে বের করা যেতে পারে। গাছপালা,

পশুপাখির মধ্যে ও সামাজিক জরিপ গবেষণা প্রয়োগ করা যায়। এ গবেষণার উপর ভিত্তি করেই ডারউইনের বিবর্তনের তত্ত্ব প্রবর্তিত। সমাজকল্যাণ ও গঠনমূলক কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

২. **জনমত জরিপ ঃ** চলমান যে কোন সমস্যার উপর জনমত যাচাই একটা সাধারণ প্রক্রিয়া। জনসভা, গণভোট, পত্রপত্রিকা, রেডিও টেলিভিশনের মাধ্যমে জনমত যাচাই করা যায় বটে। নির্ভরযোগ্য যথার্থতা সব ক্ষেত্রে থাকে না। এজন্যই সর্ব সাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি, মতামত, প্রক্রিয়া জানার জন্য এ গবেষণা অপরিহার্য। সঠিক নমুনা দল এবং নমুনা দলের বিভিন্ন শ্রেণির লোকজনের মতামত সততা ও নিষ্ঠার সাথে সংগ্রহ হলে ফলাফল বাস্তব অবস্থারই প্রতিচ্ছবি হিসাবে প্রতিফলিত হয়।

৩. **স্কুল জরিপ ঃ** শিক্ষা প্রশাসন পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচি, শিক্ষাপোকরণ, পাঠাগার আর্থিক অনুদান, বাজেট, বিনোদন ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য এ পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকর বিগত দশকে বাংলাদেশের বেসরকারি স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসা সমূহের কর্মরত শিক্ষক শিক্ষিকাদের আর্থিক অনুদানের প্রয়োজনে এ গবেষণা অনেক বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন ফলাফল দিয়ে সরকারি অনুদানের অপচয় রোধ করতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নয়ন বাস্তবায়ন করতে এ ধরনের গবেষণার উপযোগীতা উল্লেখযোগ্য।

৪. **বাজার জরিপ ঃ** উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার চাহিদা, জনপ্রিয়তা, ক্রেতার সাধারণের মনোভাব যাচাই করা এ জরিপের উদ্দেশ্য, উৎপাদনকারী, বিতরণকারী ব্যবহারকারী বিজ্ঞাপন সংস্থা সকলের জন্যই পরিকল্পিত চাহিদার প্রেক্ষাপটে এ জরিপের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আজকের দিনে উৎপাদনকারী ঝুঁকি এড়ানোর জন্য বাজারে নতুন কোন দ্রব্য ছাড়ার আগে বাজার জরিপ করে নেন। শিক্ষা ক্ষেত্রেও শিক্ষাপোকরণ পাঠ্যপুস্তক প্রভৃতি ক্ষেত্রে এ ধরনের জরিপ চালানো যায়। এ পদ্ধতির নমুনা দল থেকে সাক্ষাৎকার এবং প্রশ্নমালার সাহায্যে তথ্যসংগ্রহ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সমাধা করতে হয়।

২। **বিষয়ী অনুধ্যান (Case study) ঃ** কোন বিশেষ ব্যক্তি, কোন বিশেষ দল, অথবা কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত অনুসন্ধান কার্যক্রমকে বিষয়ী অনুধ্যান বলা হয়। শিক্ষা

সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যাবলীর প্রকৃতি ধারা ও বিকাশ উদ্‌ঘাটন করার জন্য এটি একটি উপর্যুক্ত পদ্ধতি। তাছাড়া নানাবিধ বিস্তৃত এলাকা থেকে গভীর অনুসন্ধানের মাধ্যমে, বিষয়ী পরিচালনা করে মানুষের আচরণ সম্পর্কে নতুন এবং প্রচুর জ্ঞান লাভ করা যায়।

এক্ষেত্রে লব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে সার্বিকীকরণ সম্ভবপর হয়।

বিষয়ী অনুধ্যান সাত প্রকার

১. লোক গোষ্ঠী বিশ্লেষণ (Community studies)

২. কারণসমূহের তুলনামূলক বিশ্লেষণ (Causal - Comparative study)

৩. সময় ও গতি বিশ্লেষণ (Time & motion study)

৪. ঘটনা প্রবাহ বিশ্লেষণ (Trend studies)

৫. অনুসরণমূলক বিশ্লেষণ (The follow-up study)

৬. কার্যকলাপ বিশ্লেষণ (Activity analysis)

৭. দলিল বা বিষয়বস্তু ভিত্তিক বিশ্লেষণ (Document or content Analysis)

১। **লোক-গোষ্ঠী বিশ্লেষণ ঃ** একটি নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিতভাবে বসবাসকারী একটি বিশেষ লোক সমাজের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করা যায়। যে কোন লোক গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অবস্থা, আকৃতি, জীবনের উদ্দেশ্য ভৌগোলিক অবস্থান, ঐতিহাসিক পটভূমি, জীবন যাপন পদ্ধতি, ধর্ম, শিক্ষা, সামাজিক রীতি-নীতি, সংস্কৃতি-বিনোদন, খাদ্য, আচার আচরণ ইত্যাদির উপর তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

চাকমা, সাঁওতাল, গারো, নাগা প্রভৃতি বাংলাদেশের উপজাতীয়দের উপর এ জাতীয় গবেষণা পরিচালনা করা যেতে পারে। জাতীয় মূল ধারার সাথে এদের সম্পর্ক স্থাপনের জন্য এ জাতীয় কর্মকাণ্ড অপরিহার্য।

২। **কারণসমূহের তুলনামূলক বিশ্লেষণ ঃ** বিভিন্ন ঘটনা অবস্থা এবং ব্যবহারের কারণ সমূহ চিহ্নিত করা, কারণসমূহের তুলনামূলক আলোচনা করে গুরুত্বের ক্রম অনুসারে সাজিয়ে প্রধান কারণ চিহ্নিত করাই পদ্ধতির উদ্দেশ্য। অপরাধ নিরসন ও শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা জানজট, যান বাহনের দুর্ঘটনার কারণ ইত্যাদি সম্পর্কিত কারণ সমূহের তুলনামূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে নির্ণেয় সমাধান চিহ্নিত করা হয়। এ বিশ্লেষণ পদ্ধতি দ্বারা উপরোক্ত সমস্যাবলীর প্রধান প্রধান কারণ চিহ্নিত করে তার সমাধান

সহজতর। যে কোন ঘটনাই একাধিক কারণে সংঘটিত হতে পারে এজন্যই প্রধান কারণ চিহ্নিত করাই এ পদ্ধতির অন্যতম পদক্ষেপ।

৩। **সময় ও গতি ঃ** এ পদ্ধতি শিক্ষা ও শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রয়োগ যোগ্য। পরীক্ষার সময় পাঠ্যক্রম পাঠ্যসূচি নির্বাচন করতে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে উন্নতমানের যন্ত্রপাতির ব্যবহার, কাঁচামালের সদ্ব্যবহার, কম সময় এবং কম শক্তি প্রয়োগ করে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা।

৪। **ঘটনা প্রবাহ বিশ্লেষণ ঃ** এ পদ্ধতির মাধ্যমে পরিবর্তন এবং বিবর্তন প্রবাহ পর্যালোচনা ও অনুসন্ধান করা হয়। অতীতের ঘটনাবলীর প্রেক্ষাপটে ও বর্তমান ঘটনার অবস্থার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে কি ঘটতে পারে তা নির্ধারণ করা হয়। এ পদ্ধতির মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র/ছাত্রী বৃদ্ধির হার শিক্ষা ও কৃষি খাতে উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদার হার মূল্যের হার, রাজস্ব, যানবাহন রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি সকল ধরনের কর্মকাণ্ডের ভবিষ্যত সম্ভাব্যতা ঠিক করা হয়, এ গবেষণা সব ধরনের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অর্থনৈতিক মন্দা যুদ্ধ কারিগরি পরিবর্তনসহ এ জাতীয় সমস্যার ক্ষেত্রে আগু বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার দ্বারা সঠিক সমাধান কাজে লাগানো হয়।

৫। **অনুসরণমূলক বিশ্লেষণ ঃ** শিখন, শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া কতটুকু ফলপ্রসূ হচ্ছে তা অনুসরণমূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে জানা যায়। শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং কোন চিকিৎসা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের থেকে তথ্য সংগ্রহ এ জাতীয় বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কার্যকারিতা যাচাই বা মূল্যায়ন করা হয়। এ বিশ্লেষণ দ্বারাই প্রচলিত কর্মসূচি পাঠক্রম, পাঠ্যসূচির যথার্থতা নির্ধারণ করা এবং সে অনুসরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়। কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত শিক্ষক ও চিকিৎসক এ পদ্ধতির মাধ্যমেই নিয়োগ করা হয়।

৬। **কার্যকলাপ বিশ্লেষণ ঃ** কার্যক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও দক্ষতা পরিমাপ করে তা কাজে লাগানোর জন্য এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। শিল্প প্রতিষ্ঠানে এ পদ্ধতির গবেষণা দ্বারাই উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা পরিচালক দক্ষ বা অদক্ষ শ্রমিক চিহ্নিত করা হয়। বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মীদের তথ্য সংগ্রহ করে বিশ্লেষণের মাধ্যমে যোগ্যতা ও দক্ষতা

মূল্যায়ন করা হয়। বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীদের দক্ষতাবৃদ্ধি করে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নযনের কর্মসূচি নেয়া হয়। এ ধরনের কার্যকলাপ বিশ্লেষণ পদ্ধতি সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োগযোগ্য। সকল শিক্ষকের যোগ্যতা ও দক্ষতা মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অধিকতর প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যায়। এ জাতীয় গবেষণা দ্বারা মানব সম্পদ উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা যায়। যে কোন চাকুরির ন্যূনতম যোগ্যতা, বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, কর্মদক্ষতা ও প্রয়োজনীয়তা অনুসারে বিভিন্ন কাজের জন্য ভাড়া নির্ধারণ চাকুরিজীবীদের কাজ অনুযায়ী প্রদেয় বেতন ভাতার বৈষম্য দূর করা যায়।

৭। দলিল বা বিষয়বস্তু ভিত্তিক বিশ্লেষণ ঃ তথ্য অনুসন্ধান বা জ্ঞান অন্বেষণের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে সমসাময়িক দলিলপত্রের বিশ্লেষণ কর্মসূচি দেয়া হয়। ঐতিহাসিক গবেষণার ন্যায় এ বিশ্লেষণ পদ্ধতির দলিলপত্র সমালোচনার মাধ্যমে যাচাই বা মূল্যায়ন শেষে ব্যবহৃত হয়। এ পদ্ধতিতে অন্যের উৎসাহ হিসাবে বই, সাময়িকী, খবরের কাগজ, আত্মজীবনী, পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচির রেকর্ড রিপোর্ট ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। শিক্ষা গবেষণার জন্য দলিল ভিত্তিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির গবেষণা কার্যক্রম প্রত্যক্ষ গুরুত্বপূর্ণ সংগৃহীত তথ্য সামাজিক ও শিক্ষামূলক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ব্যবহৃত হয়। প্রচলিত রীতি নীতির ত্রুটি চিহ্নিত করে কর্মসূচি নেয়া হয়।

মনোভাব নির্ধারণ ঘটিত গবেষণা ঃ (Motivation Research)

বর্ণনামূলক গবেষণার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ধরনের গবেষণার নাম উল্লেখ্য করা যেতে পারে। এটি মনোভাব নির্ধারণ ঘটিত গবেষণা ইহা সাম্প্রতিককালে ব্যবহৃত একটা পদ্ধতি, ব্যবসার বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য, উৎপাদনকারী ক্রেতা সাধারণের অবস্থা যাচাই করে কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এটি একটি পরোক্ষ পদ্ধতি উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া দ্রব্যের চাহিদা মূল্য, আকার, গঠন ঠিক করা হয়। পরোক্ষভাবে মনোভাব জেনে কর্মসূচি নেয়ার একটা উত্তম পদক্ষেপ শিক্ষা ক্ষেত্রেও মনোভাব পরিমাপ করে শিক্ষার্থীদের কৌতূহল ও আগ্রহের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়, এ পদ্ধতি শিখন (Learning) এবং শিক্ষণ (Teaching) প্রক্রিয়াকে অধিকতর ফলপ্রসূ করতে সাহায্য করে।

বর্ণনামূলক গবেষণার তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি

বর্ণনামূলক গবেষণা পদ্ধতিতে সাধারণত তিন প্রকারের তথ্য সংগৃহীত হয়ে থাকে।

১. প্রথম পর্যায়ে তথ্যসমূহ বর্তমান অবস্থার উপর নির্ভর করে সংগ্রহ করা হয়। এখানে বর্তমানের প্রয়োজ্য দিকগুলো বিশ্লেষণ করা হয়।

২. দ্বিতীয় পর্যায়ের তথ্যসমূহ সমস্যাটির কোন কোন দিক সম্পর্কিত তা নির্ধারণ করে অনুসন্ধান করা। সমস্যাটির কোন দিকটির উপর গুরুত্ব দিব? কোন দিকের সমস্যা দূর? এটি ভাল উপস্থাপনা কি হওয়া উচিত? কি ধরনের বক্তব্যে পৌছা যাবে।

৩. তৃতীয় পর্যায়ের তথ্য কিভাবে গন্তব্যে পৌছাবে এবং সমস্যার সমাধান সম্ভবপর কিনা এ সম্পর্কিত তথ্যানুসন্ধান এ বিশ্লেষণ পদ্ধতির পর্যায়ভুক্ত হতে পারে। লক্ষ্যে পৌছার উপায় সম্পর্কে অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ মতামত বিবেচিত হতে পারে।

পরীক্ষণমূলক গবেষণা

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসরণের মাধ্যমে সুনিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতিতে কোন গবেষণা কার্য পরিচালনা করে তার ফলাফল যে পদ্ধতির দ্বারা বিশ্লেষণ এবং বর্ণনা করা হয় তাকে পরীক্ষণমূলক গবেষণা বলে। এ পদ্ধতিতে গবেষক নিয়ন্ত্রিত শর্তাধীনে পরীক্ষানিরীক্ষা পরিচালনা করেন এবং বিষয়বস্তু কিভাবে পরিবর্তিত হয় তা পর্যবেক্ষণ করেন। এ নিয়ন্ত্রিত কর্মকাণ্ড রীতিসিদ্ধ এবং ইচ্ছাকৃত নিয়ন্ত্রিত উপাদানসমূহের প্রভাব লক্ষ্য এবং পরিমাপ করার পর তিনি অনুমান গ্রহণ বা বর্জন করেন। এ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ নির্ভুল হিসাবে গ্রহণ না করে সম্ভাবনা তত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গণনা করা হয়। বিজ্ঞান গবেষণাগারের একটি প্রচলিত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ গবেষণা পদ্ধতি হল পরীক্ষণমূলক গবেষণা। এটা অত্যন্ত কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ পদ্ধতি। এর ফলাফল অধিকতর সঠিক। বিজ্ঞান গবেষণাগারের জন্য এটি একটি অত্যন্ত উপযোগী পদ্ধতি। এ পদ্ধতি সব ধরনের গবেষণার সমস্যায় প্রয়োগযোগ্য নয়।

পরীক্ষণমূলক গবেষণার সূত্রাবলী

ইংরেজ দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিলের উদ্ভাবিত পাঁচটি সূত্রের উপর পরীক্ষণমূলক পদ্ধতির যুক্তির ভিত্তি নির্ভরশীল। পরীক্ষণ পদ্ধতিতে কোন ঘটনার বা অবস্থার ফলাফল এ কারণের সম্পর্ক বিশ্লেষণের জন্য স্টুয়ার্ট চারটি সূত্র প্রণয়ন করেছেন। এ চারটি প্রধান সূত্রের সঙ্গে পঞ্চম সূত্র যোগ করে দেয়া হয়। পঞ্চম সূত্রটি প্রথম এবং দ্বিতীয় সূত্রের

সংমিশ্রণে গঠিত। এ পাঁচটি সূত্র জন ষ্টুয়ার্ট মিলের সূত্রাবলী নামে সুপরিচিত। এ সূত্রগুলো পরীক্ষা পদ্ধতির গবেষণার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

১। ঐক্যের পদ্ধতি (Method of Agreement)

প্রথম সূত্রের নাম ঐক্যের পদ্ধতি।

কোন বিশেষ উপাদানের উপস্থিতিতে যদি কোন একটি ঘটনা কোন বিশেষ অবস্থায় ঘটে তাহা হলে ঐ ঘটনার জন্য সংশ্লিষ্ট সে উপাদানই দায়ী।

উদহারণ ঃ

মনে করি E একটি ঘটনা এবং তা নিম্নের প্রত্যেকটি অবস্থায় ঘটে।

১। উপাদান a, b, c, d এর উপস্থিতিতে

২। উপাদান e, f, c, g এর উপস্থিতিতে

৩। উপাদান a, b, c, d এর উপস্থিতিতে

৪। উপাদান h, i, c, k এর উপস্থিতিতে

এখানে মিলের ঐক্যের পদ্ধতি (Method of Agreement) অনুযায়ী c উপাদানই e ঘটনার জন্য দায়ী। এ সূত্র বিভিন্ন গবেষণায় প্রয়োগ করে অত্যন্ত চমৎকার ফল পাওয়া যায়।

পার্থক্যের পদ্ধতি ঃ (Method of Difference)

মিলের দ্বিতীয় সূত্রটির নাম পার্থক্যের পদ্ধতি ঃ যদি একটি উপাদান ছাড়া অন্য সব উপাদান দুই বা ততোধিক ঘটনায় উপস্থিত থাকে তা হলে ঐ ঘটনাটির জন্য অনুপস্থিত উপাদানটিই দায়ী হলে তাকে পার্থক্যের পদ্ধতি বলে।

মনে করি E একটি ঘটনা,

১। a, b, c, d ------ এদের উপস্থিতিতে e ঘটে না।

২। a, b, c, f----- এদের উপস্থিতিতে e ঘটে না।

৩। a, b, c, h এদের উপস্থিতিতে e ঘটে।

এক্ষেত্রে এ ঘটনার জন্য দায়ী h এ সূত্র বিভিন্ন গবেষণায় ব্যবহৃত হয়। সঠিক ফল পাওয়া যায়।

ঃ যুক্ত পদ্ধতি (Joint Method)

এ সূত্রটি মিলের ঐক্যের পদ্ধতি ও পার্থক্যের পদ্ধতি এই দুই সূত্রে সমন্বয়ে গঠিত। একে যুক্ত নামে নামকরণ করা হয়েছে। যদি প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্রের শর্তাবলী অনুসরণ করা হয় তা হলে কারণ সম্পর্কে তৃতীয় সূত্রানুযায়ী সিদ্ধান্ত অধিকতর নির্ভরযোগ্য হয়। এ প্রক্রিয়ার প্রথমত ঐক্যের পদ্ধতি (Method of Agreement) প্রয়োগ করে অনুমিত সিদ্ধান্তে সত্যতা যাচাই করে নেয়া হয়। এক্ষেত্রে যে সাধারণ উপাদানের উপস্থিতিতে কোন ঘটনা ঘটে তা সে ঘটনার জন্য দায়ী কিনা সেটা নির্ধারণ করে। এরপর পার্থক্যের পদ্ধতি (Method of difference) প্রয়োগ করে দেখা যায়। যে, সে সাধারণ উপাদানটির অনুপস্থিতিতে ঘটনাটি ঘটে না এভাবে উভয় ক্ষেত্র থেকেই একই সিদ্ধান্ত নেয়া যায়। এর ফলে নিশ্চিতভাবে ঘটনাটি সত্য বলে ধরে নেয়া যায়। বিখ্যাত বিজ্ঞানী লুইপ্তর এ পদ্ধতি অনুসরণ করে তার গবেষণার সফলতায় পৌঁছেছিলেন।

৪. অবশিষ্টাংশ পদ্ধতি (Method of Residues)

মিল তার চতুর্থ সূত্রটি সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, যে সকল গবেষণা উপরের উল্লেখ্য তিনটি সূত্রই পর পর ব্যর্থ হয়, সে সব ক্ষেত্র প্রয়োগ করা যেতে পারে। এটি একটি অনুসরণ পদ্ধতি। কোন ঘটনার জন্য এককের একটা অংশ দায়ী হলে, উপাদানগুলোর অপর অংশের জন্য অবশিষ্ট উপাদান সূত্রে দায়ী হবে। এটাও নিশ্চিত মতামত বা সিদ্ধান্ত।

সহগামী বিভিন্নতার পদ্ধতি ঃ (Method of Concomitant Variations)

মিলের পঞ্চম সূত্রটি সহগামী বিভিন্নতার পদ্ধতি (Method of Concomitant Variations) নামে অভিহিত। উপরিউক্ত মিলের চারটি সূত্রই যে সব ক্ষেত্রে কার্যকরী বা প্রযোজ্য নয় সেসব ক্ষেত্রে পঞ্চম সূত্রটি প্রযোজ্য। দুটি ঘটনা একই সঙ্গে পরিবর্তিত হয় বা ঘটে সে সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এখানে একটির পরিবর্তনের জন্য অন্যটির পরিবর্তন ঘটে। উভয়ে কোন সাধারণ কারণে সংঘটিত হয়। উদাহরণ হিসাবে পৃথিবীর জোয়ার-ভাটা কার্যক্রমে চন্দ্রের আকর্ষণ উল্লেখ করা যায়। চন্দ্রকে বাদ দিয়ে জোয়ার-ভাটা কার্যক্রম পরীক্ষা করা সম্ভবপর নয়, পৃথিবী এবং চন্দ্রের আপেক্ষিক অবস্থানের পরিবর্তনের সাথে সাথে জোয়ার-ভাটা হয়।

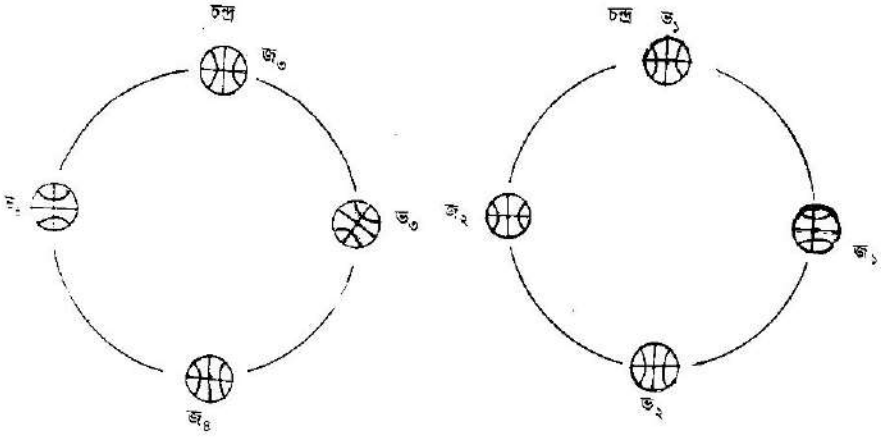

পরীক্ষণ পদ্ধতি

শ্রেণিকক্ষ গবেষণা পদ্ধতি

জনস্টুয়ার্টমিলের পাঁচটি সূত্রের অন্তর্ভুক্ত একটি মাত্র বিভিন্নকের সূত্রের (Law of single variable) উপর শ্রেণিকক্ষের গবেষণা নির্ভরশীল। দুটি সর্ব অবস্থায় একটির সংগে কোন উপকরণ (বিভিন্নক) সংযুক্ত করলে বা উপকরণ নিযুক্ত করলে যদি অবস্থাদ্বয়ের মধ্যে কোন তারতম্য দেখা দেয় তাহলে সংযুক্ত বা নিযুক্ত উপকরণই উক্ত তারতম্যের জন্য দায়ী। শিক্ষা গবেষণার বিষয়বস্তু মানব শিশু। গবেষকের ইচ্ছা অনুসারে এ সব মানব শিশু নিয়ন্ত্রণ রাখা অসম্ভব এ কারণে অধিকাংশ শ্রেণিকক্ষ গবেষণার কয়েকটি উপাদানকে আয়ত্তাধীনে রেখে গবেষণা কার্যপরিচালনা করা হয়। ঐ সকল উপাদান হল শিক্ষার্থীর বয়স, বুদ্ধি, আর্থসামাজিক অবস্থা, গোত্র, গঠন দক্ষতা, কৃতিত্ব ইত্যাদি। গবেষণার জন্য শ্রেণিকক্ষের স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কোনক্রমেই ব্যাহত করা যায় না। শ্রেণিকক্ষের সাধারণ অবস্থাকে বজায় রেখে এবং অনিয়ন্ত্রিত উপাদানগুলো গবেষণার ফলাফলের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না এ ধারণা নিয়ে পরীক্ষামূলক গবেষণা পরিচালনা করা যেতে পারে। এ পদ্ধতিতে শিক্ষাদান প্রক্রিয়া, শিক্ষা উপকরণ, শিক্ষণীয় বিষয়, শিক্ষা প্রশাসন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করা যেতে পারে। শ্রেণিকক্ষ গবেষণায় গবেষককে অবশ্যই তার ব্যবহৃত পরিমাপক যন্ত্রে আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জিত হবে, এ ধরনের অবস্থাই শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান পরিমাপের সাহায্যে অগ্রসর হতে হবে।

শিক্ষা গবেষণার প্রকারভেদ

১। একক ব্যক্তি বা একদলীয় নকশা

২। দুই বা ততোধিক সমকক্ষদল বা দলীয় নকশা।

৩। আবর্তনমূলক পদ্ধতি।

১. একক ব্যক্তি বা এক দলীয় নক্শা ঃ একটি বিষয় নির্বাচন করে একই দল শিক্ষার্থীকে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে পড়ানোর ফলাফলকে অন্য একটি পদ্ধতিতে পড়ানোর ফলাফলের তুলনা করা হয়। একই দল শিক্ষার্থীকে দুই পদ্ধতিতে পড়ানোর ফলাফলের তুলনামূলক যাচাই অনুসারে গবেষণার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে একটি উপাদান যুক্ত বা বিযুক্ত করা হয়। ফলাফল পরিমাপ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উভয় ক্ষেত্রে একই ধরনের পরিমাপক যন্ত্র বা অভীক্ষা ব্যবহার করতে হয়।

২. দুই বা ততোধিক সমকক্ষ দল

ক. নির্বাচিত সমান দল

খ. শ্রেণিগড় দ্বারা সমানকৃত সমান দল।

গ. সমান জোড়া থেকে গঠিত সমান দল।

ঘ. সমান জোড়া থেকে গঠিত সমান দল।

উপরোক্ত দুই বা ততোধিক সমকক্ষ দল পদ্ধতি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নতুন একটি পদ্ধতির আপেক্ষিক কার্যকারিতা পরীক্ষানিরীক্ষা করার জন্য বিশেষভাবে উপযোগী।

এক্ষেত্রে নির্বাচিত সমকক্ষ ২টি দলের একটিকে প্রচলিত পদ্ধতিতে এবং অন্যটিকে উদ্ভাবিত বা পরীক্ষণমূলক পদ্ধতিতে একই শিক্ষকের পাঠদানের পর একটি অভীক্ষা উভয় দলে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথমোক্ত দলটিকে নিয়ন্ত্রিত দল এবং অপরটিকে পরীক্ষামূলক দল ধরা হবে। নিয়ন্ত্রিত দলের অর্জিত গড় অপেক্ষা যদি পরীক্ষণমূলক দলের গড় অধিক হয় তবে ধরে নিতে হবে নতুন পদ্ধতি ফলপ্রসূ। এভাবে তথ্যের ভিত্তিতে একটা সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে।

৩। আবর্তনমূলক পদ্ধতি ঃ আবর্তনমূলক পদ্ধতি অন্য দুটি পদ্ধতি থেকে পৃথক। পদ্ধতি বা দল পরিবর্তন করে এ গবেষণা পরিচালনা করা হয়। এ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হল এর নিজস্ব কোন রূপ বা প্রয়োগ ক্ষমতা নেই। বার বার প্রয়োগ করে কোন বিশেষ পদ্ধতি প্রযোজ্য তা নিশ্চিত করা। এভাবে অনিয়ন্ত্রিত উপাদানগুলোকে আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

একদলীয় নকশার ক্ষেত্রে আবর্তনমূলক কার্যক্রম

আবর্তন এক ঃ প্রথমে নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি পরে পরীক্ষণমূলক পদ্ধতির উপস্থাপন, আবর্তন দুই ঃ প্রথমে পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি এর পরে নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতির উপস্থাপন, দুই দলটার নকশার ক্ষেত্রে আবর্তনমূলক।

কার্যক্রম

আবর্তন এক ঃ 'ক' দল পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি

'খ' নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি

আবর্তন দুই ঃ 'ক' দল নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি

'খ' দল পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি।

এভাবে পরীক্ষানিরীক্ষার শেষে যদি কোন বিশেষ পদ্ধতির পাঠদানের ফলাফল বরাবরই ভাল দেখা যায় তবে সে পদ্ধতিটির শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চিত করতে যে কোন দল বা ক্রমে প্রয়োগ করে তার উৎকর্ষতা প্রমাণসাপেক্ষে আবর্তনমূলক কলাকৌশল প্রয়োগের ফলে অনিয়ন্ত্রিত উপাদানের দ্বারা গবেষণার ক্ষেত্রে তেমন কোন প্রভাব থাকতে পারে না।

নমুনায়ন তত্ত্ব পদ্ধতি

নমুনায়ন কি? নমুনায়ন পরিসংখ্যানের একটি গুরত্বপূর্ণ পদ্ধতি। শিক্ষা গবেষণাসহ সব গবেষণার ক্ষেত্রে নমুনায়ন পদ্ধতির প্রয়োগ দেখা যায়। শিক্ষা গবেষণার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের কারণে বুদ্ধিসত্তা মনোভাব দৃষ্টিভঙ্গি ও আর্থসামাজিক অবস্থা ইত্যাদি সকল বৈশিষ্ট্যের জন্য নমুনা নির্বাচন করা হয়। গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের জন্য সমগ্রকের ভেতর থেকে একক বেছে নেয়ার পদ্ধতিটিই নমুনায়ন। আর তথ্য বিশ্ব বা সম্পর্ক বলতে গবেষণার তথ্য সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন গবেষণার সব উপাদানকে বুঝায়। এখন সম্পূর্ণ তথ্য বিশ্ব বা সম্পর্ক তথ্য সংগ্রহ করা অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে

[illegible] কিন্তু সম্পূর্ণ সামগ্রিক থেকে তথ্য সংগ্রহ করলে তাকে শুমারি বলা হয়। শুমারির [illegible] কথা চিন্তা করেই পরিসংখ্যানবিদগণ নমুনায়ন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন।

[illegible] বস্তু বা সংখ্যা গবেষণার ক্ষেত্রে সমগ্রক বা তথ্য বিশ্ব, নমুনা তথ্য বিশ্বের [illegible] যা গবেষণার জন্য বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়। আর যে [illegible] সাহায্যে এ নমুনা নির্ধারণ করা হয়। সে পদ্ধতিকেই নমুনায়ন পদ্ধতি বলে। [illegible] নমুনা দল নামে পরিচিত হয়।

নমুনার বৈশিষ্ট্য

গবেষকের সার্বিকীকরণের ধরন অনুযায়ী নমুনাদলের ব্যক্তি, বিষয়, এবং পদ্ধতি [illegible] করা হয়। গবেষকগণ নমুনাদল থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন। সংগৃহীত তথ্যের [illegible] উপর ভিত্তি করে সার্বিকীকরণ করা হয়। নমুনাদল অধিকতর সীমিত [illegible] থাকে বলে গবেষণা পরিচালনার সময় শক্তি এবং ব্যয় কম হয়। নমুনায়ন [illegible] তিনটি স্তর -----

(ক) সমগ্রক নির্বাচন (খ) সমগ্রক থেকে নমুনা নির্বাচন এবং (গ) নির্বাচিত [illegible] বৈশিষ্ট্য থেকে সমগ্রকের অজানা বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে পরিসংখ্যানমূলক [illegible] পরিসংখ্যানমূলক সিদ্ধান্ত থেকে পরিমাণ সম্পর্কে জানা যায়।

নমুনায়নের প্রকারভেদ

নমুনায়ন পদ্ধতিকে সম্ভাবনা তত্ত্বের ভিত্তিতে সাধারণত দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১. সম্ভাবনা নমুনায়ন (Probability Sampling)

২. নিঃ সম্ভাবনা নমুনায়ন (Non- Probaility Sampling)

১. **সম্ভাবনা নমুনায়ন ঃ** সম্ভাবনা নমুনায়নের প্রত্যেকটি এককের নমুনা দলে অন্তর্ভুক্ত থাকার সমান সম্ভাবনা থাকে। তথ্যবিশ্বের প্রতিটি এককে এ সম্ভাবনাকে পরিসংখ্যান পদ্ধতির সাহায্যে নির্দিষ্ট করা যায় এবং প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনাদল গঠিত হয়ে থাকে।

সম্ভাবনা নমুনায়নের প্রকারভেদ

ক. দৈবচয়িত নমুনায়ন (Random Sampling)

খ. স্তরিত নমুনায়ন (Stratified Sampling)

গ. গুচ্ছ চয়ন (Cluster Sampling)

ঘ. নিয়ম ক্রমিক নমুনায়ন (Systematic Sampling)

ঙ. বহু পর্যায়ী নমুনায়ন (Multistage Sampling)

চ. পর্যায়ক্রমিক নমুনায়ন (Sequential Sampling)

ছ. ভূমিগত নমুনায়ন (Area Sampling)

দৈবচয়িত নমুনায়ন

যে নমুনায়ন পদ্ধতিতে তথ্য বিশ্বের প্রতিটি এককের নির্বাচিত হওয়ার সমান সম্ভাবনা ও দলভূক্ত হবার সমান সুযোগ থাকে তা দৈবের উপর নির্ভর করে এ পদ্ধতিকেই দৈবচয়িত নমুনায়ন বলে। দৈবচয়ন করার উপায় বিবিধ। সীমিত এবং অবাধ এ দুই ধরনের দৈবচয়িত হতে পারে। কম সময়ে ও কমব্যয়ে কোন অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করার ক্ষেত্রে সীমিত দৈবচয়িত নমুনায়ন পদ্ধতির সাহায্যে নমুনা গঠন করা হয়। অবাধ দৈবচয়িত নমুনায়ন পদ্ধতি অধিকতর বিজ্ঞান সম্মত। নমুনা দল গঠনে কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব হবার সম্ভাবনা থাকে না।

খ. স্তরিত নমুনায়ন ঃ এ পদ্ধতিতে তথ্য বিশ্বকে একাধিক ভাগে বিভক্ত করা হয়। এ ভাগগুলোকে উপসমগ্রক এবং প্রতিটি ভাগকে স্তর বলা হয়। উদাহরণ হিসাবে বাংলাদেশের একটি গ্রামের আয়ের হিসাব বের করা। গ্রামবাসীদেরকে আর্থসামাজিক অবস্থার দক্ষশ্রমিক ২৫%, অদক্ষ শ্রমিক ৫০%, পেশাজীবী শ্রমিক ১৫%, দোকানদার-১০% ভিত্তিতে কয়েকটি উপবিভাগে ভাগ করা হল। এভাবে প্রত্যেকটি উপ-বিভাগ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এভাবে দল গঠন করার পদ্ধতিতে স্তরিত নমুনায়ন বলে।

গ. গুচ্ছ চয়ন ঃ তথ্য বিশ্বের আকার ভৌগোলিক দিক দিয়ে বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে থাকলে এবং বৃহদাকারে হলে তখন যে নমুনায়ন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় সেটাকে গুচ্ছ চয়ন বলে। ইহা দৈবচায়িত নমুনায়নের আর একটি রূপ। উদাহরণ বাংলাদেশের বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়ে একটি নমুনা দল গঠন করতে হলে একটা কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। প্রত্যেক জেলা থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক বিদ্যালয় নিয়ে ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তথ্য সংগ্রহ করা যায়। কাজ অনেকটা সহজ হয়। এ ধরনের নমুনাকে গুচ্ছ চয়ন বলে।

ঘ. নিয়ম ক্রমিক নমুনায়ন ঃ এ পদ্ধতি তথ্য বিশ্বকে N/n (N = সমগ্রহেক সমষ্টি, n = নমুনা সমষ্টি) ভাগে ভাগ করা হয়। এখানে K = N/n ধরিলে k=একটি আসন্ন পূর্ণ সংখ্যা এখন K এর জন্য দৈব সংখ্যা ধরতে হবে K এর সমদূরবর্তী সংখ্যা পর পর নিতে হবে সংখ্যা পূর্ণ করতে হবে। এভাবে প্রথম নির্বাচিত সংখ্যক P ধরলে পরবর্তী সংখ্যা P+2k, P+3k ইত্যাদি। ইহার নির্বাচিত সংখ্যক P ধরলে পরবর্তী সংখ্যাগুলো হবে খুবই সহজ সাধ্য পদ্ধতি নমুনায়নের জন্য বেশ গুরত্বপূর্ণ।

ঙ. বহু পর্যায়ে নমুনায়ন ঃ এ পদ্ধতিতে পর্যায়ক্রমে নমুনা একক নির্বাচন করা হয়। প্রথম একটি নমুনা নেয়া হয় পরে আবার ঐ নমুনা থেকে আর একটি নমুনা নেয়ার প্রয়োজন হয়। এ ধরনের পদ্ধতিকে বহু পর্যায়ী নমুনায়ন বলে। প্রথম পর্যায়ের চয়িত অংশগুলোকে প্রাথমিক চয়ন বলে। দ্বিতীয় পর্যায়ের চয়িত অংশগুলোকে দ্বিতীয় পর্যায়ী একক। এভাবে তৃতীয় চতুর্থ ইত্যাদি বহু পর্যায়ী চয়ন প্রয়োজন হয়। বহু বিস্তৃত বা বিরাট আকারের গবেষণা কর্মকাণ্ডের জন্য এ নমুনায়ন প্রযোজ্য।

চ. পর্যায় ক্রমিক নমুনায়ন ঃ কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত দ্রব্যের মান নির্ণয় করার জন্য যে, নমুনা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় তাকেই পর্যায় ক্রমিক নমুনায়ন বলে। ইহা শিল্প কারখানার প্রতিষ্ঠানিক পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য। এ পদ্ধতির সাহায্যে উৎপাদিত দ্রব্যের গুণগত মান নির্ণয় করা হয়।

ছ. ভূমিগত নমুনায়ন ঃ এ পদ্ধতি কৃষি সংক্রান্ত জরিপ গবেষণার দেশ ভিত্তিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হয়। দেশের মানচিত্রের কেন্দ্র বিন্দু থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে দৈবচায়িত ভাবে এ বিন্দুর মাধ্যমে বিভিন্ন দিকে রেখা আঁকা হয়। রেখার মধ্যে যে সকল স্থান থাকে সেগুলোর নমুনায়ন গঠন করা হয়। এ ভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

২। নিঃসম্ভাবনা নমুনায়ন ঃ সম্ভাবনা নমুনায়ন পদ্ধতি যে সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য নয় সে সব ক্ষেত্রে গবেষকগণ নিঃসম্ভাবনা নমুনায়ন ব্যবহার করছেন। সার্বিকীকরণের ক্ষেত্রে এ জাতীয় নমুনা মোটেই প্রযোজ্য নয়।

নিঃসম্ভাবনা নমুনায়ন পদ্ধতি দুই প্রকার

ক. আকস্মিক নমুনায়ন (Accidental Sampling)

খ. উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন (Purposive Sampling)

ক. আকস্মিক নমুনায়ন ঃ গবেষককে অনেক ক্ষেত্রে নমুনায়নের প্রচলিত পদ্ধতিগুলো ব্যবহার না করে নিজের সুবিধামত নমুনা তৈরি করে গবেষণা কর্ম পরিচালনা করতে হয়। এ ধরনের নমুনা প্রতিনিধিত্বশীল এবং বিজ্ঞানসম্মত না হলেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে গবেষণার উপযোগী।

উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন

গবেষক সম্ভাবনা তত্ত্ব প্রয়োগ না করে নিজের পছন্দ বা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে দল গঠন করেন। এ ক্ষেত্রে গবেষকের বিচার বিবেচনাই নমুনা নির্বাচনের ভিত্তি। তবে সংগৃহীত তথ্যগুলোতে ভাব প্রবণতা বা পক্ষপাতিত্ব মুক্ত রাখতে গবেষককে যথেষ্ট সচেতন থাকতে হয়। গবেষকের বুদ্ধি ও যুক্তি প্রয়োগ করে নমুনা দল গঠন করতে হয়।

নমুনা দলের আকৃতি নির্ধারণ

ক. নির্বাচিত নমুনা দলের অন্তর্গত ন্যূনতম সংখ্যা গবেষণার প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল।

খ. বর্ণনামূলক গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্য বিশ্বের শতকরা ১০ জনকে দিয়ে নমুনা দল গঠন করা হয়।

গ. সীমিত বা ছোট আকারের তথ্য বিশ্ব থেকে শতকরা কমপক্ষে ২০ জনকে নিয়ে নমুনাদল গঠন করা যায়।

ঘ. সহ-সম্পর্কিত গবেষণার ক্ষেত্রে শতকরা ৩০ জনকে নিয়ে নমুনা দল গঠন করা যেতে পারে।

ঙ. পরীক্ষণমূলক গবেষণায় নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় প্রতিটি নমুনা দলে নিয়ন্ত্রিত এবং পরীক্ষণমূলক ১৫ জন শিক্ষার্থীই যথেষ্ট।

তথ্য সংগ্রহক উপকরণ ও হাতিয়ার

বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতি ও উপকরণের সাহায্যে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। বিশেষ বিশেষ ধরনের তথ্যের প্রয়োজন উপযোগী উপকরণ ও হাতিয়ারের প্রয়োগ হয়ে থাকে। পদ্ধতি মাফিক উপকরণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে হয়। গুণগত পরিসংখ্যানগত উভয় প্রকার তথ্যের জন্য পৃথক পৃথক উপকরণ ব্যবহৃত হয়। আবার তথ্যের পরিমাণগত ও পরিসংখ্যানগত বিবরণ অত্যন্ত আবশ্যক। ক্ষেত্রভেদে তথ্যের পরিসংখ্যানগত ও পরিসংখ্যানগত উপস্থাপনা ভিন্ন ভিন্ন কাঠামো অনুযায়ী প্রকাশ করা হয়। নানা প্রকার পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে সংগৃহীত তথ্যকে পরিমাণে প্রকাশ করা হয়। মেধাভিত্তিক অবস্থান, জোড়ার তুলনা, পৌনঃপুন্য সংখ্যা, সারিবিন্যাস, শতকরা সমষ্টিমূলক বন্টন, ক্রমসমষ্টিমূলক বন্টন, আদর্শায়িত মান, কোন স্কেলের স্কোর নির্ণয় ইত্যাদি দ্বারা উপযোক্ত তথ্যরাশিকে অধিকতর উপযোগীও অর্থবহ হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

শিক্ষা গবেষণার ক্ষেত্রে অনুসন্ধানকারীদের মাধ্যমে নমুনাদলের আচার আচরণ পরিমাপ করা হয়। ইহা নানা প্রকার হতে পারে।

১। তালিকা (Schedule)

২। ইনভেন্টরি (Inventory)

৩। প্রশ্নমালা (Questionnaire)

৪। মতামত সংগ্রহকারীপত্র (Opinionnaire)

৫। এছাড়া অতিরিক্ত পদ্ধতিগুলো

৬। পর্যবেক্ষণ (Observation)

৭। সাক্ষাৎকার (Interview)

৮। সমাজনীতি (Sociometry)

৯। মনোবিজ্ঞানের অভীক্ষা (Psychological tests)

১। তালিকা ঃ একটি প্রশ্নমালার মাধ্যমে অনেকগুলো উক্তি সন্নিবেশিত থাকবে। উক্তিগুলোর উত্তর প্রশ্নকারীর উপস্থিতিতেই পূরণ করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে উত্তরকারীর সহযোগিতায় প্রশ্নকর্তা নিজেই পূরণ করতে পারেন। সাধারণত ব্যক্তির উপর এ ধরনের

প্রশ্নমালা প্রয়োগ করা হয়। এ জাতীয় প্রশ্নমালাকে তালিকা নামে অভিহিত করা হয়। বিভিন্ন ধরনের ঘটনা সম্পর্কে তালিকার মাধ্যমে সঠিক তথ্যের সন্ধান পেতে সহজ হয়।

সুবিধা

ক. গবেষণার উদ্দেশ্য সহজেই প্রকাশ করা যায়।

খ. সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

গ. উত্তর দাতাকে প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহৃত উক্তির জবাব দিতে হচ্ছে, এর ফলে গবেষক সহজেই তথ্য সংগ্রহ করতে পারছেন।

ঘ. তালিকার কোন উক্তির অর্থ উত্তরদাতা বুঝতে না পারলে তা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করার সুযোগ থাকে।

ঙ. তথ্যের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা গবেষণা কার্যক্রমের ফলাফল গ্রহণে পূর্ণ সহযোগিতা করে।

চ. সময়, শক্তি ও অর্থের ব্যয় তুলনামূলকভাবে কম।

অসুবিধা

ক. সঠিক উত্তরদাতার অভাব ঘটতে পারে।

খ. তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত জটিলতা ঘটতে পারে।

গ. সময় ও ব্যয় বাড়তে পারে।

২। **ইনভেনটরি ঃ** শিল্প বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের বিশেষ প্রকারের তালিকা ব্যবহৃত হয়। প্রতিষ্ঠানে কি কি আছে বা নেই তা ইনভেনটরির সাহায্যে সংগ্রহ করা হয়। ইহা তথ্য সংগ্রাহক একটি উত্তম পদ্ধতি। পরিমাণগত বা ঘটনা জড়িত তথ্যের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

৩। **প্রশ্নমালা ঃ** তথ্য সংগ্রহের একটি সহজ উপকরণ। সম্ভবত গবেষণার ক্ষেত্রে এটা সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। সঠিকভাবে প্রস্তুতকৃত প্রশ্নমালা উন্নতমানের তথ্য সংগ্রহকারী উপকরণ হিসাবে গণ্য করা যায়। এর ভাষা সহজ ও বোধগম্য হওয়া উচিত। প্রশ্ন সাধারণত ডাকযোগে প্রেরিত হয়। উত্তরদাতা এটা পূরণ করে পাঠিয়ে দেন। তবে এটা যেন দীর্ঘ না হয়। এর মাধ্যমে উত্তর দাতার তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এখানে সুনির্দিষ্ট

বিষয় সম্পর্কিত প্রশ্নের সমন্বয় ঘটান হয়, যাতে করে উত্তর দাতার অভিজ্ঞতা অনুভূতি বিশ্বাস এবং কার্যকলাপের সঠিক তথ্য সংগৃহীত হয়। অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্নমালা এবং সাক্ষাৎকারের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়।

প্রশ্নমালা দুই প্রকার

ক. উন্মুক্ত প্রশ্নমালা (The open form)

খ. নির্ধারিত প্রশ্নমালা (The closed form)

ক. উন্মুক্ত প্রশ্নমালা ঃ উত্তর দাতার নিজের ইচ্ছা বা ভাষা অনুযায়ী উত্তর দানের সুযোগ থাকে। উত্তর দানে উত্তর দাতার অবাধ স্বাধীনতা থাকে। প্রাপ্ত তথ্যের বিন্যাস বিশ্লেষণ ও সংক্ষিপ্ত করণের জন্য গবেষককে যথেষ্ট সময় ও শ্রম দিতে হয়। এ ধরনের প্রশ্নমালার উত্তর ও উত্তর সংকেত দেয়া থাকে না।

উদহারণ

১। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪র্থ বা ৫ম শ্রেণিতে ছাত্র/ছাত্রীদের সংখ্যা কমে যায় কেন?

২। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়মিত ছাত্র/ছাত্রীদের তুলনায় অনিয়মিত ছাত্র/ছাত্রীদের সংখ্যা কম নয় কেন?

খ. নির্ধারিত প্রশ্নমালা

এ ধরনের প্রশ্নমালায় 'হাঁ' না টিক চিহ্ন সংক্ষিপ্ত উত্তর বা প্রত্যেকটি প্রশ্নের প্রদত্ত উত্তরগুলোর যে কোন একটিতে চিহ্ন দিয়ে উত্তর দেয়ার সুযোগ থাকে। গবেষকের প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট ধরনের তথ্যের জন্য নির্ধারিত প্রশ্নমালার উত্তর পেতে উপযুক্ত সুযোগ ঘটে। এটা অতি সহজেই কম সময়ে পূরণ করা যায়। উত্তর দাতাকে সহজেই বিষয়বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট করা যায়। এ ধরনের প্রশ্নমালা থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে সহজেই তালিকা আকারে বিন্যাস বা সাজানো ও বিশ্লেষণ করা যায়।

উদাহরণ

বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে পাবলিক পরীক্ষা নেয়া উচিত কোন শ্রেণি থেকে?

ক. পঞ্চম শ্রেণি, খ. অষ্টম শ্রেণি, গ. দশম শ্রেণি, ঘ. দ্বাদশ শ্রেণি।

মিশ্র প্রশ্নমালা (The mixed form)

নির্ধারিত এবং উন্মুক্ত উভয় ধরনের প্রশ্ন সম্বলিত প্রশ্নমালাকে মিশ্র প্রশ্নমালা বলে।

প্রশ্নমালা তথ্য সংগ্রহকারী উপকরণ হিসাবে সর্বাধিক ব্যবহৃত ও সমালোচিত হয়ে থাকে। প্রশ্নমালার অপব্যবহারের কারণেই সমালোচনা হয়। দীর্ঘ প্রশ্নমালা, ত্রুটিপূর্ণ প্রশ্নমালা, বিষয়বস্তুর গুরুত্বহীন প্রশ্নমালা উত্তরদাতার কাছে বিরক্তিকর এবং বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

প্রশ্নমালার বৈশিষ্ট্য

১। সুস্পষ্ট সহজবোধ্য ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নমালাই গবেষণার তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

২। সংগৃহীত তথ্যাদি ছকে বিন্যস্ত বিশ্লেষণ এবং সহজে ছকবদ্ধ করার সুবিধার্থে প্রশ্নমালা তদরূপ প্রস্তুত এবং শ্রেণি বিভাগ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৩। উত্তর দাতার উত্তর প্রদানের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য প্রশ্নপত্রে প্রশ্নমালা ক্রম অনুসারে সাজানো দরকার, যাতে সাধারণ থেকে বিশেষ, সহজ থেকে কঠিন আইটেম সন্নিবেশিত হয়।

৪। প্রত্যেকটি প্রশ্ন স্পষ্টাক্ষরে সুবিন্যস্তভাবে সাজানো ও লিখার দরকার যাতে করে উত্তরদাতার কাছে প্রশ্নমালা আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

৫। প্রশ্নমালা এমনভাবে প্রণয়ন করতে হয় যাতে উত্তরদাতার ভাব প্রবণতা আবেগ, উদ্দীপনা বা কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করার সুযোগ না থাকে।

৬। গবেষণার বিষয়টি বর্তমান সমস্যাকেন্দ্রিক এবং গুরুত্বপূর্ণ হলে সঠিক উত্তর পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। কারণ উত্তরদাতা এ ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ সাড়া দিয়ে নিজেরই চাহিদা পূরণ মনে করে অগ্রসর হয়ে থাকেন।

৭। প্রশ্নমালার সাথে উত্তর দাতার জন্য একটি নির্দেশনা সংযুক্ত করা যেতে পারে। উক্ত নির্দেশাবলীতে গুরুত্বপূর্ণ শব্দের সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা থাকতে পারে।

৮। প্রশ্নমালা এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে করে প্রশ্নগুলো সহজ, সঠিক ও সম্ভাব্য শব্দ দ্বারা গঠিত হয় এবং বিরক্তিকর বা দ্বিধাযুক্ত প্রশ্ন বর্জন করে মনোবিজ্ঞান সম্মত করা যেতে পারে।

৯। প্রশ্নমালার সাথে সম্ভাব্য উত্তরমালাও থাকবে যাতে উত্তরদাতার উত্তর সীমাবদ্ধ থাকে।

প্রশ্নমালার সুবিধা

১ প্রশ্নমালার প্রধান সুবিধা হল ডাকযোগে বা বাহকের মাধ্যমে প্রেরণ করা যায়। [illegible] কম ব্যয় হয়।

২ প্রশ্নমালার সাহায্যে অধিক সংখ্যক উত্তরদাতার কাজ থেকে সহজেই তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

৩ প্রশ্নমালার সাহায্যে সংগৃহীত তথ্যাদি অন্য যে কোন উপায়ে প্রাপ্ত তথ্য থেকে [illegible] নির্ভরযোগ্য হয়।

৪ প্রশ্নমালার প্রশ্নগুলোকে আদর্শায়িত করা যায়। আদর্শায়িত প্রশ্নাবলী অনেক [illegible] নির্ভরযোগ্য, কার্যকর ও মুক্ত।

৫। প্রশ্নমালা সাহায্যে সংগৃহীত তথ্যাদিতে কোন প্রকার পক্ষপাতিত্বের সুযোগ [illegible] না।

৬। প্রশ্নমালার সাহায্যে যে কোন সংখ্যক নমুনাদলের তথ্য সহজেই সংগ্রহ করা [illegible] বাইরের মাধ্যমে বা ডাকযোগে খুবই কষ্টকর ব্যবস্থা গড়ে উঠে।

৭। তথ্য প্রদানের জন্য উত্তর দাতাকে ব্যক্তিগতভাবে গবেষকের কাছে উপস্থিত [illegible] হয় না।

৮। প্রশ্নমালার উত্তর দানে উত্তরদাতার কোন ধরনের প্রভাব বা চাপের সম্মুখীন হতে হয় না।

৯। শিক্ষা ও সমাজ বিজ্ঞান ক্ষেত্রেই প্রশ্নমালার সাহায্যে সহজ উপায় তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়।

প্রশ্নমালার অসুবিধা

১। উত্তর দাতার অসহযোগিতা।

২। উত্তর দাতাকে শিক্ষিত ব্যক্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৩। সঠিক নমুনা দল গঠন করা অনেক ক্ষেত্রে কঠিন। সেক্ষেত্রে ভাব প্রবনতা বা পক্ষপাতিত্বের সুযোগ ঘটে।

৪। অনেক সময় নির্দিষ্ট উত্তর দাতার কাছে প্রশ্নপত্র ঠিক সময়ে পৌঁছে না। অথবা উত্তরদাতা সময়মত ওটা ফেরত পাঠাতে ব্যর্থ হয়।

প্রশ্নমালা প্রণয়ন ও প্রয়োগ

দক্ষতা, ধৈর্য, শক্তি ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে একটি উত্তম প্রশ্নমালা প্রণয়ন করা যায়। ইহা সহজ বোধগম্য ও যথাযথ হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রশ্নমালার পরিকল্পনা গ্রহণ এবং

প্রণয়ন করার সময় অভিজ্ঞ দক্ষ বিশেষজ্ঞদের সম্ভাব্য সাহায্য নেয়া প্রয়োজন। প্রশ্নমালা প্রণয়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল গবেষককে সর্বদা তার মুল প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে সচেতন থাকা। তিনি যে ধরনের তথ্য সংগ্রহ বা যে তথ্যের বিন্যাস ও বিশ্লেষণ করবেন ঠিক তার ধারাবাহিকতা অনুযায়ী তিনি প্রশ্নমালা সাজাবেন ও তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করবেন। প্রশ্নমালা প্রাক-প্রয়োগ বিশুদ্ধতা যাচাই করে প্রয়োজনে এটি আবার পরিমার্জন সংযোজন বা সংশোধন করা যেতে পারে।

মতামত সংগ্রহকারীপত্র

মতামত সংগ্রহকারীপত্র বলতে বুঝায় যে প্রশ্নমালার কেবল উদ্দেশ্য থাকে মতামত সংগ্রহ করা বা মনোভাব যাচাই করা। কোন একটি বিশেষ বিষয় সম্পর্কে ব্যক্তির নিজস্ব অনুভব বা বিশ্বাস কি? তাই হল তার মনোভাব। মনোভাব পরিমাপ করা বা বর্ণনা করা খুবই কঠিন। কতগুলো উক্তির মাধ্যমে উত্তরদাতার প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করে তার মতামতের একটি নমুনা সংগ্রহ করা হয়। এ প্রশ্নোত্তরের তার প্রকৃত মতামত যাচাই করা যায়। মনোভাব পরিমাপের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি দু'টি উল্লেখ যোগ্য।

১। থার্স্টোন পদ্ধতি।

২। লিকার্ট মনোভাব মানক বা পদ্ধতি।

১। থার্স্টোন পদ্ধতি

বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী থার্স্টোন মনোভাব পরিমাণ করার জন্য যে পদ্ধতিটি উদ্ভাবন করেন সে পদ্ধতিটিই থার্স্টোন পদ্ধতি নামে পরিচিত। মনোভাব পরিমাপ করার প্রশ্নমালা প্রণয়ন খুবই জটিল। প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে উত্তরদাতার প্রকৃতি মনোভাব নির্ণয় করা হয়। এ পদ্ধতিতে ২০ বা ততোধিক উক্তি সম্বলিত একটি প্রশ্নমালা ৫০ বা ততোধিক বিচারকের কাছে উপস্থাপন করা হয়। গ্রহণযোগ্য প্রত্যেকটি উক্তির জন্য মধ্যম স্কেল বা পরিমাপক ধরে নেয়া হয়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে অসুবিধা হল যে সকল সামাজিক সমস্যা নিয়ে উত্তর দাতার প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হয়, সেগুলোর ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ উত্তরদাতার অভিমত নাও থাকতে পারে। গবেষক তখন তথ্যসংগ্রহ তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সফলকাম হতে বেশ সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন।

২। লিকার্ট মনোভাব মানক বা পদ্ধতি ঃ

লিকাট মনোভাব মানক বা পদ্ধতির প্রচলন অত্যন্ত ব্যাপক। এ পদ্ধতিটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। এটি অনেকটা সহজে ও কম সময়ে প্রণয়ন করা যায়। বিভিন্ন ব্যক্তির মতামতযুক্ত করে কতকগুলো মত সংকলন করাই এ পদ্ধতির প্রথম পদক্ষেপ। সংকলিত

উক্তির প্রাথমিকভাবে বাছাইয়ের জন্য একাধিক ব্যক্তির মতামত নেয়া হয়। এরপর উচ্চ সহ-সম্পর্ক সম্পন্ন (+০.৯২) উক্তিগুলোকে নির্বাচন করে সন্দেহ জনকগুলোকে বর্জন করে একটি পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করা হয়।

উদাহরণ

বাংলাদেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়সমূহে একাদশ/দ্বাদশ শ্রেণি চালুর প্রতি মনোভাব স্কেল।

ক. এ উক্তিটির সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত

খ. এ উক্তিটির সাথে আমি একমত।

গ. এ উক্তির সম্পর্কে আমি নিরপেক্ষ।

ঘ. এ উক্তিটির সাথে আমি একমত নই।

ঙ. এ উক্তির সাথে আমি মোটেই একমত নই।

১। উচ্চ শিক্ষার প্রসার ঘটনোর জন্য এটা একটা সঠিক পদক্ষেপ।

২। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির জন্য কলেজগুলোতে শিক্ষার পরিবেশ ঠিক থাকছে না।

৩। বিদ্যালয়গুলোতে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণি পুরোপুরি চালু হলে কলেজগুলোতে অনার্স ও মাষ্টার্স শ্রেণিতে আরো অধিকসংখ্যক ছাত্রের স্থান সংকুলান করা যাবে।

৪। বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার পরিবেশ সুষ্ঠুভাবে অক্ষুণ্ন রাখা কষ্টসাধ্য হবে।

৫। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির জন্য বিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষার কাঠামো উপযোগী নয়।

ক	খ	গ	ঘ	ঙ

লিকার্ট পদ্ধতির মাধ্যমে বিতর্কমূলক বিষয়ে সঠিক মতামতের পরিমাপ করা যেতে পারে। বিভিন্ন উপায়ে এ ধরনের স্কেলের কৌশলগত বিন্যাস বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা যায়।

লিকার্ট স্কেলের প্রতিটি উক্তির জন্য এক একটি মানকমূল্য নির্ধারণ করা হয়। অনুকূল অভিমতের জন্য নিম্নোক্ত মানকমূল্য ধরা হয়ে থাকে।

উক্তি	মূল্যায়নের মাপক
ক. সম্পূর্ণ একমত ----------	৫
খ. একমত ----------	৪
গ. নিরপেক্ষ ----------	৩
ঘ. একমত নই ----------	২
ঙ. মোটেই একমত নই ----------	১

প্রতিকূল অভিমতের জন্য নিম্নোক্ত মানকমূল্য ধার্য করা হয়।

উক্তি	মূল্যায়নের মাপক
ক. সম্পূর্ণ একমত ----------	১
খ. একমত ----------	২
গ. নিরপেক্ষ ----------	৩
ঘ. একমত নই ----------	৪
ঙ. মোটেই একমত নই ----------	৫

প্রদত্ত কোন একটি বিষয়ে সবগুলো উক্তি থেকে প্রাপ্ত স্কোরের যোগফল দ্বারা দাতার মনোভাবের পরিমাপ নির্ধারণ করা হয়। একটি লিকার্ট মনোভাব স্কেলে উক্তি থাকলে, নিম্নোক্ত স্কোরমান দ্বারা মনোভাব নির্ধারণ করা যায়।

৫০ X ৫ = ২৫০ অনুকূল মনোভাবের স্বপক্ষে পরিমাণ

৫০ X ৩ = ১৫০ নিরপেক্ষ মনোভাব

৫০ X ১ = ৫০ প্রতিকূল মনোভাবের সর্বোচ্চ পরিমাণ।

কোন উত্তর দাতার স্কোর সমষ্টি ৫০ থেকে ২৫০ এর মধ্যে থাকবে। অ মনোভাবের স্কোর সমষ্টি অবশ্যই ১৫০ এর অধিক হতে হবে। আবার প্রতি মনোভাবের স্কোর সমষ্টি ১৫০ এর কম হতে হবে।

৫। **পর্যবেক্ষণ** ঃ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে একটি প্রধান ধাপ হল পর্যবে প্রকৃতপক্ষে পর্যবেক্ষণ সব ধরনের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিত্তি। তথ্য সংগ্রাহক উপ হিসাবে পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বর্ণনামূলক গবেষণাক্ষেত্রে এটি অ

সংগ্রহ : বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসাবে পর্যবেক্ষণ গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য [illegible]ভাবে ও সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবহৃত হয়। প্রাপ্ত তথ্যাদি রেকর্ড করে এর নির্ভর [illegible] ও সঠিকতা নির্ধারণ করা হয়। প্রত্যক্ষও পরোক্ষ এই দুই প্রকারের পর্যবেক্ষণ [illegible] হয়। যেমন - কোন বাস্তব বিষয় থেকে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ [illegible] হয়। সাধারণত গণনা ও পরিমাপ প্রক্রিয়াই এ ধরনের পর্যবেক্ষণ। এজন্য নানা [illegible] যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়। ঘড়ি, তাপমানযন্ত্র, চাপমানযন্ত্র, বিভিন্ন পরিমাপক যন্ত্রপাতি [illegible] প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি। কিন্তু মানুষের আচার আচরণ [illegible] অত্যন্ত জটিল ও পরিবর্তনশীল। পরোক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এ [illegible] আজকাল নতুন নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন ঘটছে।

পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাদির নির্ভুল লিপিবদ্ধ করণের বিভিন্ন পদ্ধতি

১। তালিকা পরীক্ষা হ্যাঁ/না
২। স্কোর বোর্ড
৩। স্কেলড স্পেসিমেন
৪। রেটিং স্কেল
৫। দলিল বিশ্লেষণ
৬। তালিকা প্রস্তুতকরণ
৭। চিত্র গ্রহণ ও মানচিত্র প্রস্তুতকরণ।

পর্যবেক্ষণের বিভিন্ন প্রকার ব্যবহার

১. সংগঠিত পর্যবেক্ষণ
২. অসংগঠিত পর্যবেক্ষণ
৩. নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ
৪. অনিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ
৬. সাক্ষাৎকার ঃ

মৌখিক প্রশ্নমালার সাহায্যে ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ প্রকৃতি এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সামনা সামনি সংগ্রহ করার পদ্ধতিকে সাক্ষাৎকার বলা হয়। উত্তর দাতার কাছ থেকে সরাসরি উত্তর সংগ্রহ করার একটি যথার্থ এবং নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি এটি। যে কোন ধরনের সামনা সামনি কথোপকথনকেও এক প্রকার সাক্ষাৎকার বলা যেতে পারে। গবেষণার ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার কথা বলার চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার

উদ্দেশ্যমূলক আলাপ আলোচনাকেই বুঝায়। গবেষক তথ্য সংগ্রহের জন্য সাক্ষাৎকারীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে থাকেন। এভাবে এক বা ততোধিক উত্তরদাতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করায় প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য সাক্ষাৎকার একটি অত্যন্ত প্রচলিত পদ্ধতি। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব দৃষ্টিভঙ্গি আচার আচরণ চিন্তাধারা আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে সাক্ষাৎকারের ধারণা লাভ করা যায়। উন্নয়নশীল দেশসমূহে তথ্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার একটি পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করা যায়। শিক্ষার হার যে সকল দেশে অত্যন্ত কম সেখানে সাক্ষাৎকার বেশ উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি। কারণ এর মাধ্যমে সমস্যাবলী সমাধানের জন্য প্রত্যক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করা সহজ হয়। দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করলে তা একটি উন্নতমানের পদ্ধতি হিসাবে গণ্য করা যায়। কম শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাছে লেখার চেয়ে কথাবার্তার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ বেশি কার্যকর।

৭। **সমাজমিতিমূলক পদ্ধতি ঃ** মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। জীবন ধারণের প্রচেষ্টা এবং পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সামাজিক সংগঠন এবং সমাজে ব্যক্তি বিশেষের স্থান নির্ণয়ের জন্য নানা পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। সমাজ মিতিমূলক পদ্ধতি এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। একটি দলের এক ব্যক্তির সঙ্গে অন্য ব্যক্তির সামাজিক সম্পর্ক এক ব্যক্তির সঙ্গে অন্য ব্যক্তির আকর্ষণ ও বিকর্ষণ দলের ব্যক্তিত্ব (Syntality) এবং ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সমাজমিতিমূলক পদ্ধতির সাহায্যে জানা যায়। সমাজ বিজ্ঞানী জে, এল, মরেনো (J. L. Moreno) একটি চিত্রের মাধ্যমে কোন দলের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে গড়ে উঠা সামাজিক সম্পর্ক প্রদর্শন করেছেন। এ চিত্রটিই সোসিও গ্রাম নামে পরিচিত।

কিন্তু বিদ্যালয়ের একটি বিশেষ শ্রেণির ছাত্রদেরকে একটি কাজ সম্পন্ন করার জন্য শ্রেণির প্রত্যেক ছাত্রকে তার পছন্দমত সঙ্গী বেছে নিতে সুযোগ দিলে একটি বিশেষ সম্পর্ক সৃষ্টি হবে। ছাত্রদের পছন্দভিত্তিক পারস্পরিক সম্পর্কে চিত্র রূপটি নিম্নে দেয়া হলো।

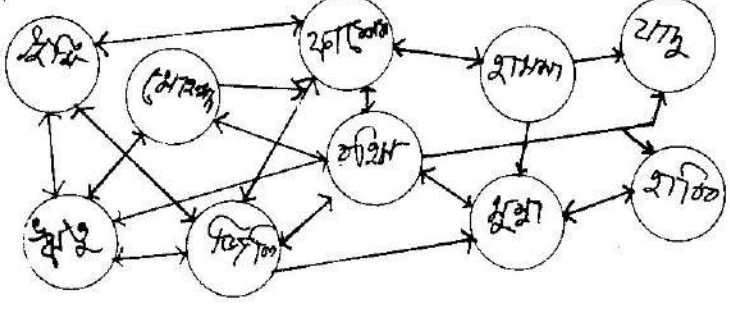

সোসিওগ্রামের একটি চিত্ররূপ

সরলরেখা ও তীরের সাহায্যে ছাত্রদের পারস্পরিক সম্পর্ক দেখানো হল। শিক্ষা গবেষণায় এ চিত্র অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ এর সাহায্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

৮। **মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষা ঃ** শিক্ষা গবেষণার তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষা ব্যবহৃত হয়। মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষা ব্যক্তির আচরণের নৈর্ব্যক্তিক ও আদর্শায়িত পরিমাপ। ব্যক্তির আচার আচরণ পরিমাপ করতে বিভিন্ন ধরনের মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষা ব্যবহৃত হয়। এ পরিমাপ থেকে তার মানসিক অবস্থা এবং অবস্থার মাত্রা নির্ণয় করা হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহৃত সকল অভীক্ষাই মনোবিজ্ঞান সম্মত। কারণ শিক্ষা মানুষের মনোবৃত্তির পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করে।

মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষার বৈশিষ্ট্যাবলী

মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষা উন্নতমানের পরিমাপক যন্ত্র এবং এর মাধ্যমে ব্যক্তির আচার আচরণ পরিমাণ করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়, শিক্ষা গবেষণায় মানুষের আচার আচরণ পরিমাপ করতে হয়। কিন্তু পদার্থ বিজ্ঞানের পরিমাপক নামক যন্ত্রের ন্যায় শিক্ষা গবেষণা কোন পরিমাপক যন্ত্র নেই। সে কারণেই মানুষের জটিল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ আচরণ পরিমাপ করতে মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষার সাহায্য নিতে হয়। এ ক্ষেত্রে পরিমাপক যন্ত্রগুলোও জটিল। এ সকল পরিমাপক যন্ত্রগুলোতে সুঅভীক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলো প্রতিফলিত থাকবে। আজকের দিনে যে কোন মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষার ঐ সকল বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান থাকায় নির্ভরযোগ্য পরিমাপক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষার প্রকারভেদ

মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষার প্রকারভেদ বিভিন্ন মনোবৈজ্ঞানিকগণ বিভিন্ন ধরনের চিহ্নিত করেন। মোটামুটিভাবে নিম্নরূপ অভীক্ষা ঃ

১। বুদ্ধির অভীক্ষা (Intelligent test)

২। কৃতিত্বের অভীক্ষা (Achievement test)

৩। দক্ষতার অভীক্ষা (Aptitude test)

৪। ব্যক্তিসত্তার অভীক্ষা (Personality test)

৫। আগ্রহের অভীক্ষা (Interest test)

৬। মনোভাবের অভীক্ষা (Attitude test)

থিসিস বা গবেষণা পত্রের সম্পাদনা ও মূল্যায়ন

চূড়ান্ত খসড়ার সম্পাদনা

থিসিস বা গবেষণা পত্রের চূড়ান্ত খসড়া টাইপ করার পূর্বে সতর্কতার সঙ্গে সম্পাদনা করতে হয়। সম্পূর্ণ খসড়াটি ব্যাকরণগত বা বানানগত ত্রুটিমুক্ত করতে হবে। ভাষার (যে গবেষণাপত্র লেখা হয়েছে) ব্যবহারিক স্বীকৃতি নিয়মাবলি মেনে শিরোনাম, উপশিরোনাম উদ্ধৃতি, পাদটীকা, সহায়ক তথ্যপঞ্জি, পরিশিষ্ট, সারণি চিত্র ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে।

কাঠামো যাচাই পত্র

১। থিসিস বা গবেষণা পত্রটি ভূমিকার প্রধান অংশ, সাহায্যকারী বস্তু ইত্যাদি ভাগে সঠিকভাবে সাজানো কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

২। প্রারম্ভিক পর্বের অংশ -----

ক. সঠিক ধারাবাহিকতা আছে কিনা ?

খ. সঠিক গঠন আছে কিন ?

গ. ছোট রোমান বা বাংলা বর্ণে নম্বর লেখা হয়েছে কিনা ?

৩। নামকরণ পৃষ্ঠা -----

ক. রচনার নামকরণ

খ. লেখকের নাম

গ. কোর্স বিভাগ, অনুষদের নাম, (প্রয়োজন অনুসারে)

ঘ. প্রতিষ্ঠানের নাম

ঙ. জন্ম দেয়ার তারিখ

চ. ডিগ্রির নাম (যে ডিগ্রির জন্য থিসিস জমা দিতে হবে)

৪। সূচিপত্র ----

ক. রচনার বিশ্লেষণমূলক পর্যবেক্ষণ,

ঘ কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ঙ সংক্ষিপ্ত তালিকা

চ. চিত্র তালিকা

ছ. গ্রন্থপঞ্জি

জ. পরিশিষ্ট।

২ মূলপর্ব

ক. সূচিপত্রের শিরোনাম অনুসারে উপশিরোনাম বিন্যস্ত কিনা ?

খ. সূচিপত্রের অধ্যায়ের নামগুলো ক্রমানুসারে লিখিত হয়েছে কিনা ?

গ. ভূমিকা ও উপসংহার সযত্নভাবে লেখা হয়েছে কিনা ?

৬। সাহায্যকারী উপাদান

ক. সুস্পষ্ট ও যথোপযুক্তভাবে প্রধান প্রধান অংশে বিভক্ত করা হয়েছে কিনা ?

খ. তথ্যপুঞ্জির মধ্যে সাহায্যকারী উপাদান (রেফারেন্সগুলো) বিভক্ত কিনা ?

গ. প্রয়োজন অনুসারে নামকরণ হয়েছে কিনা ?

৭। প্রতিষ্ঠানের জন্য নিচের প্রয়োজনীয় শর্তগুলি পূরণ করা হয়েছে কি ?

ক. কপির সংখ্যা

খ. বাঁধাই

গ. মলাটের রঙ

ঘ. মলাটের ওপরের লিখার সঠিকতা।

গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়নের যাচাইপত্র

ক. সমস্যা

১। সমস্যা কি স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়েছে ?

২। সমস্যা কি তাৎপর্যপূর্ণ ?

৩। অনুমিত সিদ্ধান্তে কি সঠিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে ?

৪। সমস্যার যুক্তিপূর্ণ অনুমিত সিদ্ধান্ত কি নেয়া হয়েছে ?

৫। সংশ্লিষ্ট গবেষণার সঙ্গে সম্পর্ক যাচাই করা হয়েছে কি?

খ. কাঠামো --

৬। পর্যবেক্ষণের ধারণা কি স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে?

৭। পর্যবেক্ষণের সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করা হয়েছে কিনা?

৮। পর্যবেক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো কি বর্ণিত হয়েছে?

৯। গবেষণার পরিকল্পনা কি উপযুক্ত?

১০। গবেষণার বিষয় ও নমুনা কি বর্ণনা করা হয়েছে?

১১। নমুনা পদ্ধতি কি সঠিক?

১২। গবেষণার পরিকল্পনা কি ত্রুটিমুক্ত?

গ. পদ্ধতি

১৩। তথ্য সংগ্রহের উপায় কৌশল বর্ণিত হয়েছে কি?

১৪। তথ্য সংগ্রহের উপায় কৌশলগুলো কি সঠিক ছিল।

১৫। তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিগুলি কি সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

১৬। তথ্য সংগ্রহের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা গৃহীত হয়েছে কি?

ঘ. বিশ্লেষণ

১৭। বিশ্লেষণের পদ্ধতিগুলোর যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা আছে কি?

১৮। বিশ্লেষণের ফলাফল কি সঠিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে?

ঙ. উপসংহার

১৯। উপসংহার স্পষ্টভাবে বর্ণিত কিনা?

২০। উপস্থাপিত যুক্তির মাধ্যমে উপসংহার গুলো প্রমাণিত কিনা?

২১। যে তথ্যবিশ্ব থেকে নমুনা নেয়া হয়, তার মধ্যেই কি সার্বিকীকরণ সীমাবদ্ধ ?

২২। গবেষণা রিপোর্ট কি যথার্থভাবে সংগঠিত ও লিখিত হয়েছে?

২৩। রিপোর্ট এর প্রকৃতি কি বিজ্ঞান সম্মত এবং নিরপেক্ষ ?

শিক্ষামূলক গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়নের যাচাইপত্র ঃ

ক উদ্দেশ্য ঃ	অগ্রহণযোগ্য	নগণ্য	মধ্যম	উত্তম	অতিউত্তম
১. গবেষণার উদ্দেশ্যের বিবৃতি					
২. জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণাটির অবদান					
৩. গবেষণাটির পটভূমি					
৪. সংশ্লিষ্ট গবেষণার বর্ণনা					
খ পদ্ধতি ঃ					
১. অনুমিতির বর্ণনা					
২. গুরুত্বপূর্ণ শব্দের সংজ্ঞা চল নিয়ন্ত্রণ ও সীমাবদ্ধতা					
৩. তথ্য সংগ্রহের জন্য উৎস সমূহ					
৪. উৎসের নির্বাচন					
৫. উৎসগুলির প্রমাণ					
গ) বিশ্লেষণ ঃ					
১০। তথ্য ও তত্ত্বের মূল্যায়ন					
১১। তথ্য ও তত্ত্বের বিশ্লেষণ					
১২। যুক্তিযুক্ত উপস্থাপনা					
১৩। তত্ত্বের স্পষ্টতা					
ঘ) উপসংহার					
১৪। ফলাফলের বর্ণনা					
১৫। উপসংহার সংগতি পূর্ণকরণ					
১৬। আনুসাঙ্গিক গবেষনায় সুপারিশমালা					
১৭। প্রতিবেদনের যুক্তিসম্মত উপস্থাপনা					
১৮। লেখার মান মূল্যায়ন					

অনুশীলনী ৫.১

১। শিক্ষা গবেষণা বলতে কি বোঝায় ? বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও শিক্ষা গবেষণার সম্পর্ক কি ?

২। গবেষণার পদ্ধতির সোপান বা ধাপগুলো কি কি বর্ণনা দিন?

৩। অনুমিত সিদ্ধান্ত কি? গবেষণা কাজে অনুমিত সিদ্ধান্ত? প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা-এর করুন। কেন এবং কিভাবে অনুমিত সিদ্ধান্ত পরীক্ষা নিতে হয়।

৪। শিক্ষা গবেষণার সমস্যা নির্বাচনের মূলনীতি গুলি কি কি? নীতিগুলোর আলোকে আপনার নির্বাচিত সমস্যাটি কি?

৫। বাংলাদেশের শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে শিক্ষাগবেষণার ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

৬। গবেষণা বলতে কি বোঝেন ? বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গবেষণার শ্রেণি বিভাগ করুন। শিক্ষা গতানুগতিক গবেষণা ও কর্মভিত্তিক গবেষণার পার্থক্য নিরূপন করুন।

৭। গবেষণার মাধ্যমে কোন ধরনের সমস্যা সম্ভাব্য সমাধান করা যায়? সম্পর্ক নির্বাচনের পদ্ধতি প্রধান উপাদান ও উৎসগুলো আলোচনা করুন। শিক্ষামূলক গবেষণার উপযোগী সমস্যা নির্বাচনে যে সমস্ত মান বিবেচনা করতে হয়। তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

৮। নমুনায়ন বলতে কি বোঝেন ? নমুনায়নের বিভিন্ন পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন, আপনার নির্বাচিত গবেষণার জন্য নমুনায়নের কোন পদ্ধতিটি উপযোগী এবং কেন ?

৯। ঐতিহাসিক গবেষনার প্রাথমিক, মাধ্যমিক উৎসগুলোর পার্থক্য উদহারণের সাহায্য বুঝিয়ে দিন। এসব উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্যের সমালোচনা আবশ্যক কেন? আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সমালোচনার দ্বারা কি কি বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায় আলোচনা করুন।

১০। শিক্ষাগবেষণার ক্ষেত্রে পরীক্ষণ পদ্ধতির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন এ পদ্ধতির প্রধান প্রধান ধাপ ও বৈশিষ্ট্যগুলো উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

১১। প্রশ্নমালা সম্ভবত সর্বাধিক ব্যবহৃত গবেষণা উপকরণ" আলোচনা করুন উত্তর প্রশ্নমালার বৈশিষ্ট্য সুবিধা অসুবিধাগুলো আলোচনা করুন।

১২। মতামত সংগ্রহকারী পত্র কি? মনোভাব যাচাই এর জন্য লিকার্ট মনোভাব মানক বা পদ্ধতি উপযুক্ত উদাহরণসহ আলোচনা করুন। এ পদ্ধতিতে সংগৃহীত তথ্য কিভাবে বিশ্লেষণ করা যায়?

১৩। গবেষণা প্রস্তাবনা বলতে কি বোঝায় ? শিক্ষাক্ষেত্রে কোন একটি সমস্যা চিহ্নিত করে তার উপর একটি গবেষণা প্রস্তাবনা প্রনয়ন করুন।

১৫ প্রচলিত নিয়ম অনুসারে একটি গবেষণা সম্পর্কের গঠন ও আকৃতি সম্বন্ধে উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

১৬ তথ্য সংগ্রহক উপকরণ বলতে কি বোঝায় ? গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য যে, পদ্ধতিগুলি ব্যবহৃত হয় তাদের তালিকা দিন। সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো আলোচনা করুন।

১৭ জরিপ পদ্ধতি বলতে কি বোঝেন ? এ পদ্ধতিতে গবেষণা পরিচালনা করতে হলে কি কি কর্মক্রম গ্রহণ করতে হয় বর্ণনা দিন।

১৮ ঐতিহাসিক গবেষণা বলতে কি বোঝেন ? এ ধরনের গবেষণা পরিচালনা করার কয়টি পদ্ধতি আছে উহাদের ব্যাখ্যা দিন।

ঐতিহাসিক পরীক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগের সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা করুন।

১৯ টীকা লিখুন

ক. নাল হাইপথিসিস

খ. সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা

গ. সমাজমিতিমূলক পদ্ধতি

ঘ. অবরোহী ও আরোহী

ঙ. গবেষণার সমস্যা নির্বাচন পদ্ধতি

চ. বিষয়ী অনুধ্যান

ছ. উপাত্তের শ্রেণি বিভাগ ও গবেষণার্থে ইহার প্রয়োজনীয়তা

জ. গবেষণা রিপোর্ট লিপিবদ্ধকরণ ও মূল্যায়ন

ঝ. পর্যবেক্ষণ

ঞ. গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়ন

ট. ইনভেনটরী

ঠ. তালিকা বা চেকলিস্ট।

ষষ্ঠ অধ্যায়

নির্দেশনা

নির্দেশনার স্বরূপ

নির্দেশনার সাধারণ অর্থ হলো ব্যক্তির উপকার করা ও তার অভাব দূরীকরণে সাহায্য করা, তার সমস্যা সমাধানের পথ বাৎলে দেয়া ও সংকট মুক্ত পথ নির্দেশ করা। কিন্তু আধুনিক নির্দেশনার জন্য এ অর্থ মোটেই প্রযোজ্য নয়। এর অর্থ ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী। নির্দেশনার সঠিক অর্থ বুঝতে হলে কয়েকজন মনোবিজ্ঞানির মন্তব্যগুলি বিশ্লেষণ করা দরকার। এ, জে, জোনস (Jones A.J.) বলেন - "Guidance is the help given by one person to another in making choices and adjustments and in solving problems."

সমাজ ও পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান এবং সমস্যা সমাধানের জন্য একজন ব্যক্তি অন্যকে নির্দেশনা দিয়ে সাহায্য করেন। সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে প্রত্যেকের জন্যই এটি স্বাভাবিক ও সার্বজনীন। এ নির্দেশনা কেবল বিদ্যালয় পরিবারের নির্দিষ্ট গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ থাকছে না। জীবনের সর্বক্ষেত্রে এ ধরনের নির্দেশনা সচল। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সকল কর্মকাণ্ডসহ অফিস,আদালত,শিল্প,বাণিজ্য,কলকারখানা, হাসপাতাল, জেলখানা প্রভৃতি সকল পর্যায়ে-এ নির্দেশনা কার্যক্রম চলছে। যেখানেই একজন লোক সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে অন্য এক জনের সাহায্যপ্রার্থী হয়, সেখানেই নির্দেশনার কাজ চলে। ন্যাপ (Knapp) বলেন - "The process of learning, helping and effective changes in an individual is guidance."

কোনো ব্যক্তি নিজের চেষ্টায় ও কর্মদক্ষতার মাধ্যমে তার সৃজনশীল গুণাবলীর উন্মেষ ঘটিয়ে নিজের স্বাধীন চিন্তাধারা লালন ও পালন করতে পারে। সমাজের এ ধরনের ক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ ও সামাজিক মূল্যবোধ বজায় রাখতে নির্দেশনার ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। Ruth strang বলেন," Guidance is,process of helping every individual through his own efforts." Crow and Crow বলেছেন," Guidance is an assistance given to an individual to develop,make and carry out his decisions". উপরে বর্ণিত বিভিন্ন মনীষীদের প্রদত্ত সংজ্ঞা থেকে নির্দেশনার বিশ্লেষিত রূপ একজন শিক্ষার্থীকে তার সামর্থ্য, প্রবণতা, কৃতিত্ব, এবং

ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন উপাদানের ভিত্তিতে নিজ লক্ষ্যে পৌঁছতে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করাকে নির্দেশনা বলা হয়। Kiston, H.D. এর মতে "Guidance is individualised education",

কৈশোর এবং বয়ঃসন্ধিকালে বিপরীতধর্মী কার্যাবলী

মানব জীবনের কৈশোর এবং বয়ঃসন্ধিকাল একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ সময়েই মানব সন্তানের জন্য নানা প্রকার বিপরীতধর্মী কার্যাবলীর সমাবেশ ঘটে। অনেক মনোবিজ্ঞানী এই সময়কে মানব জীবনে ঝড় ঝঞ্ঝার কাল বলেও অভিহিত করেছেন। এ বয়সের ছেলেমেয়েরা সব কাজে যেন কর্মঠ হয়ে উঠে। তারা সমাজে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। অন্যের চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করতে চায়। তাদের ধারণা কোনো কাজে তারা অপারগ নয়। নানা ধরনের কাজ করার উদ্দীপনা ও প্রয়াস তাদের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে অন্য চিত্র ফুটে উঠে। অনভিজ্ঞতা তাদের প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তারা পদে পদে ভুল করতে থাকে। এক সময় তারা ব্যর্থতার গ্লানিতে নিরাশ হয়ে পড়ে। এর পর তারা কি করবে বা কি করা তাদের দরকার সে ভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। গভীর হতাশায় নিমজ্জিত হয়। কোনো কিছু নিরূপণ করতে না পেরে তারা হাল ছেড়ে বসে থাকে। এধরনের পরিস্থিতিতে তাদেরকে উৎসাহদানের মাধ্যমে জীবন চলার নানান পথের নির্দেশনা দিতে হয়। এ সময় তাদেরকে সঠিকভাবে গতিশীল করতে পারলে তারা অবশ্যই সাফল্যের দ্বারে পৌঁছে যাবে। অকৃতকার্যতাই সাফল্যের সোপান তা তারা নতুন চিন্তায়,কর্মে ও কাজে প্রমাণ দিতে সক্ষম হবে। ভুল ত্রুটি দেখিয়ে দিয়ে সঠিক পথের সন্ধান করতে সাহায্য করতে হবে। চলমান জীবনের যে কোনো সমস্যার আবির্ভাব কি ভাবে মোকাবেলা করতে হয়, তা তাদের বুঝতে দিতে হবে। জীবন শুধু ফুলশয্যা নয়। চলার পথে আছে অনেক কাঁটাও। তাদের জীবন চলা কঠিন বাধা দূর করতে সহায়তা করতে হবে।

বয়ঃসন্ধিকাল শিক্ষার্থীর এক সংকটময় সময় কেন?

মানবজীবনের এক ক্রান্তিলগ্ন হচ্ছে বয়ঃসন্ধিকাল। এ সময়ে যদি সঠিক পথে যে কোন ছেলে বা মেয়ে চলে, তবে সে জীবন চলার পথে সব ধরনের বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে সাফল্যের স্বর্ণদ্বারে পৌঁছাতে পারবেই। আর সঠিক পথ খুঁজে পেতে ব্যর্থ হলে জীবনে নেমে আসবে শুধু ব্যর্থতা। জীবন হয়ে দাঁড়াবে কঠিন দুর্বিষহ। রবীন্দ্রনাথ এ বয়সের ছেলেমেয়েদের প্রভুহীন পথের কুকুরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। শিক্ষার্থীদের কাছে এ সময়টা সংকটময়। বহু বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে শিক্ষার্থীদেরকে এ কালটা অতিক্রম করতে হয়। তারা প্রথমত বয়স্কদের তুল্য মনে করে। কিন্তু বয়স্কদের মত নিজেরা অভিজ্ঞ না হওয়ায়, কোনো কাজে হাত দিলেই ব্যর্থ হয়। আবার যৌবনের

ভূমিকার জন্য কাজে ব্যর্থ হয়েও সফলতার জন্য বয়স্কদের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয় না। এটা এ বয়সের চরিত্র বৈপরীত্য। সঠিক পথ ধরিয়ে দিতে হবে। যদিও তারা সাহায্য প্রত্যাশী নয়, এজন্য তাদের নিয়ে বড় সতর্কতার সাথে কাজ করতে হয়। স্বভাবত তারা বয়স্কদের আদেশ নিষেধ এড়িয়ে যাবেই। এটাই এ বয়সের প্রকৃতি, এটাই তাদের ধর্ম। কিন্তু বয়স্কদেরকে তাদের এড়িয়ে যাওয়ার প্রবৃত্তিকে বেয়াদবি বা খারাপ বলে চিহ্নিত করলে চলবে না। এক্ষেত্রেই সত্যিকার বয়স্কদেরকে সঠিক নির্দেশনা দিতে হবে যাতে করে তাদের ভবিষ্যৎ এক অনিশ্চিয়তার অমানিশার ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত না হয়। এজন্য বয়স্কদেরকে কান্ডারী হিসেবে হুঁশিয়ার থাকতে হবে। আন্তরিকভাবে এদের সমস্যা বিচার করতে হবে।

বয়ঃসন্ধিকালের যুবক যুবতীর জন্য নির্দেশনা কেন অপরিহার্য?

বয়ঃসন্ধিকালের তরুনেরাই সকল ধরনের কর্মোদ্যোগ শক্তির প্রতীক। এ বয়সের কর্ম হলো ন্যায়, সত্য, ত্যাগ বা সেবামূলক যে কোনো মহৎ কাজ চিন্তা বা কর্মের স্বপ্ন দেখা। তাদের এ স্বপ্নীল মন মানসিকতাকে সঠিক ভাবে পরিচালনা করতে পারলে যে কোনো মহৎ বা কঠিন কাজ বাস্তবায়িত করা যায়। যুগে যুগে পৃথিবীর সর্বত্রই সকলজাতির তরুনরা দেশের জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠাবোধ করে নাই। 'এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তারই সময়' এই বাক্যটি এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। হাসিমুখে তারা দেশ মার্তৃকার জন্য প্রাণ দিতে কসুর করে নাই। এদের কর্ম প্রচেষ্টায় দেশ ও জাতি উন্নতির মনি কোঠায় পৌছাতে সক্ষম। তাই কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এদের জয়গান গেয়েছেন, আয়রে সবুজ আয়রে অবুঝ আয়রে আমার কাঁচা । তাদের বিভিন্নমুখী কর্মস্পৃহাকে সঠিকভাবে সচল রাখাই এক গুরুতর সমস্যা। তাদেরকে সঠিক বৃত্তি নির্বাচনে সাহায্য করাই সুপরিচালনার অন্যতম অংশ। কারণ তারা তাদের প্রবণতা ও স্বকীয়তা অনুযায়ী যা চাচ্ছে তা পাচ্ছে না। আবার তাদের সহনশীলতা ও সামর্থ অনুযায়ী যা পাচ্ছে তা তারা চাচ্ছে না। এটা এক রকম বৈপরীত্যের সাথে টিকে থাকার সংগ্রাম। এক্ষেত্রে বিপরীত ধর্মী দ্বিমুখী আচরণের দ্বন্দ্ব তাদের বড় জটিল করে তোলে। এ অবস্থায় তারা বড় অসহায়। তারা নিজেদেরকে পরিচালনা করতে অপারগ। এ কারনেই বয়ঃসন্ধিকালে যুবক-যুবতীদের জন্য নির্দেশনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ সময়ের সঠিক নির্দেশনা তাদের জীবনের সাফল্যের জন্য অনেকাংশে নির্ভরশীল।

বয়:সন্ধিকালের তরুণ-তরুণীদের নানাবিধ সমস্যার সমাধান

বয়:সন্ধিকালের তরুণ-তরুণীদের সাধারণত মানসিক স্থিতিশীলতার অভাব ঘটে। এ সময়ে তাদের বিচিত্র চাহিদা তাদেরকে মানসিকভাবে অস্থির করে তোলে। তারা যা

হয় হয়তো তা পায়না, আবার যা পায় তা তারা চায়না। কবির ভাষায় 'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই। যাহা পাই তাহা চাই না'। এ কারণেই দৈনন্দিন জীবনের চাহিদার অতিরিক্তনিত সমস্যা প্রতিদিনই তাদেরকে আহত করে, করে বিক্ষুব্ধ। তারা যে সব সমস্যার কারণে পদে পদে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তা মোকাবিলার ক্ষেত্রে সহায়তা করা প্রয়োজন। তাদের শারীরিক, মানসিক, আবেগিক অবস্থা ও রুচিসম্মত সহমর্মি পারিবারিক পরিবেশের ভিত্তিতে লক্ষ্য হাসিলের জন্য সক্রিয় সহায়তাদান আবশ্যক। মানসিক ও পরিবারিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরকে নিজেদের সমস্যা সমাধান করার ব্যবস্থা নিতে হবে। বয়:সন্ধিকালে তাদের অসামঞ্জস্য ও খেয়ালি আচরণসমূহ যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে উদ্দেশ্য প্রণীত লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য সহযোগিতা করতে হবে। এ ধরনের আচরণকে বয়সের প্রবৃত্তি বা ধর্মরূপ বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে। প্রত্যেকটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও হেঁয়ালিপূর্ণ আচরণকে গঠনমূলক আচরণে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টা নিতে হয় । তার চাহিদা রুচি এবং সামাজিক প্রয়োজনের নিরিখে কর্মসূচি প্রণয়ন আবশ্যক। এ সব কর্মসূচিতে শিক্ষক, অভিভাবক, নির্দেশনায় নিযুক্ত ব্যক্তিগণ সহানুভূতির সাথে এ বয়সের তরুণ ও তরুণীদেরকে বিবেচনা করলে অবশ্যই প্রচেষ্টা সফল হবে। ফলে তাদের সম্ভাবনাময় জীবনের ব্যর্থতার করালগ্রাস থেকে মুক্ত করা যাবে। এজন্য সর্বস্তরের শুভার্থীদের সম্ভাব্য সকল প্রকার সহায়তা প্রদান দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থকে সাফল্যমণ্ডিত করবে। একটি সুখি সমৃদ্ধশালী সুনাগরিক সম্পন্ন প্রজন্মের আবির্ভাব ঘটবে।

শিক্ষা ও নির্দেশনা

শিক্ষা ও নির্দেশনা অনেকটা একই ধরনের কাজ। তবে শিক্ষার ক্ষেত্র অনেকটা ব্যাপক। আর নির্দেশনার ক্ষেত্র তুলনামূলকভাবে সীমাবদ্ধ। সকল নির্দেশনাই শিক্ষা । কিন্তু সকল শিক্ষা নির্দেশনা নয়। মনোবিজ্ঞানী জোনস এর মতে,"All guidance is education but some aspects of education are not guidance, their objectives are the same development of the individual but the methods used in education are by no means less those used in guidance". তবুও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য হলো নির্দেশনা ব্যতিরেকে শিক্ষার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। শিক্ষার পরিপূরক হিসেবে নির্দেশনা কাজ করে যায়। এ কারণেই শিক্ষা ক্ষেত্রের সব ধরনের সমস্যা নির্দেশনার মাধ্যমে সফল সমাধান করা যায়। এ কারণেই শিক্ষা ও নির্দেশনা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উভয়েরই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রত্যেকটি মানুষের আচরণে পরিবর্তন এনে তার সর্বাঙ্গীন বিকাশ নিশ্চিত করা। আবার দেখা যায় কোনো কোনো ব্যক্তি নির্দেশনা ছাড়াই শিক্ষালাভে সমর্থ হয়। কিন্তু নির্দেশনা অধিক প্রত্যক্ষভাবে অপরের নিকট থেকে সাহায্য নিতে সুযোগ করে দেয়।

শিক্ষা ও নির্দেশনা উভয়ই ব্যক্তি জীবনের একটা ফলপ্রসূ খণ্ডিত সময়ের চিত্র নয়, বরং সমস্ত জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। ব্যক্তির দৈহিক,মানসিক আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক অবস্থানকে শিক্ষা উন্নয়নের যে প্রচেষ্টা চালু করে, নির্দেশনা তাকে ফলপ্রসু, সুন্দর ও সাফল্যমন্ডিত করে তোলে। শিক্ষা ব্যক্তির আচরণের বাঞ্ছিত পরিবর্তন ঘটায়। আর নির্দেশনা ব্যক্তির জীবন সম্পৃক্ত সমস্যাবলী সমাধানের সহায়ক উপায় খুঁজে নিতে সাহায্য করে। নির্দেশনা শিক্ষার্থীর জীবনের নানাবিধ সমস্যা অপসারণ করে তার জীবনের পরিবর্তন আনায়নে নিশ্চয়তা বিধান করে। ব্যক্তি স্বাতন্ত্রই নির্দেশনার ভিত্তি ভূমি। মনোবিদগণের মতে দুটি শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে হুবহু অভিন্ন নয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতেই শিক্ষা ও নির্দেশনার সকল কর্মসূচি আজকাল বাস্তবায়ন করতে চেষ্টা করা হয়। ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করেই তার জীবনকে সুন্দর, স্বার্থক ও ফলপ্রসূ করতে সহায়ক কর্মসূচি প্রবর্তন করা হচ্ছে।

বিদ্যালয়ে নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দৈহিক, মানসিক ও চারিত্রিক গুণাবলীর বৈচিত্র পর্যবেক্ষণ করে থাকেন। শিক্ষার্থীদের মাঝে লুক্কায়িত বিশেষ গুণাবলি শিক্ষক জানতে ও বুঝতে চেষ্টা করেন। শিক্ষকের পর্যবেক্ষণে শিক্ষার্থীদের মেধার প্রকৃতি ও ব্যক্তিত্বের সংরক্ষণের ভিত্তিতে পরস্পর ভিন্ন ও অন্যান্য সমাবেশ লক্ষ্য করলে শিক্ষকের অন্তদৃষ্টি খুলে যায়। একটু মনোনিবেশ সহকারে শিক্ষক শিক্ষার্থীর প্রতি আন্তরিকভাবে যত্নবান হলে এখান থেকে তিনি নিজে শিক্ষা লাভ করতে পারেন। বিদ্যালয়ের নির্দেশনা কার্যক্রমের ফলে শিক্ষকের পক্ষে শিক্ষার্থীদেরকে অধ্যয়নের সুযোগ ঘটে। শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবিষয়ক সমস্যা সম্বন্ধে শিক্ষকের অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ তরান্বিত হয়। ভারতীয় শিক্ষাবিদ ডাঃ কেজি রামরাও এর মতে "প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবনে নানাবিধ কার্যধারায় তার শারীরিক মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বৃত্তিগুলোকে সুষম বিকাশ সাধনেই বস্তুত: শিক্ষা নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা নিহিত।" নির্দেশনার দ্বারা কেবলমাত্র শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ নির্বাচনের কাজই সুসম্পন্ন হয়না, তার ব্যক্তিগত জীবনের বিকাশমুখী পরিবর্তনের সূচনা ঘটে। সাধারণভাবে বহু বিপরীত ধর্মী চারিত্রিক গুণাবলির সমাহার নিয়ে এক একজন মানুষ জন্মলাভ করে। সচরাচর নির্দেশনার অভাবে সবগুণের পরিবর্তে খারাপ দিক গুলোর বিস্তার ঘটতে থাকে। কিন্তু নির্দেশনা কার্যক্রমের প্রভাবে দোষগুলো চেপে রেখে গুণগুলোর বিকাশ ঘটানোর প্রচেষ্টা চালালে তা বহুলাংশে ফলপ্রসূ করা যায়। নির্দেশনার দ্বারাই শিক্ষার্থীর সুপ্ত গুণাবলির বিকাশ সাধন সম্ভব । শিক্ষার্থীরা কোন বিষয়ে কিভাবে শিক্ষা লাভ করবে তাদের মানসিক ক্ষমতা, প্রবণতা, বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদির ভিত্তিতে নির্বাচন করা হলে সুফল লাভ করা যাবে। এ ক্ষেত্রে নির্দেশনার প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের ফলাফলই সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে পারে। প্রত্যেকের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ তার মেধা ও আগ্রহ ইত্যাদির ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন হওয়া আবশ্যক।

প্রত্যেক শিক্ষার্থী মেধা, প্রবনতা, ব্যক্তিত্ব আগ্রহ ইত্যাদির দিক দিয়ে স্বতন্ত্র। সময় তাদের নিজ নিজ প্রচেষ্টায় শিক্ষণীয় বিষয় নির্বাচন সঠিক হয় না। পরিনামে তাদের হেসারত দিতে হয়। অকৃতকার্যতার বোঝা জীবনব্যাপী বহন করতে হয়। এ কারণে মনোবিজ্ঞানিদের মতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রতি নজর রাখা প্রয়োজন:-

(ক) শিক্ষার কৌশল আয়ত্বকরণ, (খ) শিক্ষাপোকরণের ব্যবহার, (গ) সঠিক শিক্ষণ পদ্ধতির অনুসরণ, (ঘ) নিয়মিত হাজিরা অনুসরণ, (ঙ) কার্যক্রম ও সহপাঠক্রমিক কর্মসূচির সমন্বয় সাধন, (চ) সাক্ষাৎকার দান ও কথার ভঙ্গি আয়ত্বকরণ, (ছ) বিদ্যালয় নির্বাচনে সহায়তাকরণ, (জ) বিজ্ঞান বা শিল্পকলা বা কলা বিষয়ের প্রতি সর্থক আগ্রহসৃষ্টি করণ, (ঝ) কর্ম ও পাঠে সুঅভ্যাস গঠন, (ঞ) শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ পুনমূলক কর্মসূচি সম্পর্কিত বিবেচনাকরণ এবং (ট) দৈনন্দিন কার্যক্রম ও শিক্ষাক্রম নিয়মিত অনুসরণ।

অনুশীলণী ৬.১

১। নির্দেশনা বলতে কি বুঝায় ?

২। শৈশব এবং বয়ঃসন্ধিকালে পদে পদে ভুল হয় কেন ?

৩। বয়ঃসন্ধিকাল শিক্ষার্থীদের নিকট সংকটময় কেন ?

৪। বয়ঃসন্ধিকালের যুবক-যুবতীর পক্ষে নির্দেশনা কেন অপরিহার্য ?

৫। তরুণ তরুণীদের সমস্যা মোকাবিলার জন্য কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে মনে করেন ?

৬। শিক্ষা ও নির্দেশনার মধ্যে পার্থক্য কি কি ?

৭। বিদ্যালয়ে নির্দেশনার প্রয়োজন কেন ?

৮। সকল নির্দেশনাই শিক্ষা, সকল শিক্ষা কিন্তু নির্দেশনা নয়-ব্যাখ্যা করুন ।

৯। নির্দেশনা কিভাবে শিক্ষকের অন্তর্দৃষ্টি খুলে দেয় ?

১০। "বয়ঃসন্ধিকাল মানব জীবনের এক ক্রান্তিলগ্ন"-ব্যাখ্যা করুন।

১১। নির্দেশনার স্বরূপ ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

নির্দেশনার প্রকারভেদ

নির্দেশনার প্রকারভেদ নিয়ে মনোবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতাকে প্রাধান্য দিয়ে মনোবিদগণ নির্দেশনাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানিদের মতামত নিম্নে দেয়া হলো ঃ

ক. জোনসের মতে নির্দেশনা চার প্রকার :

(১) শিক্ষামূলক নির্দেশনা, (২) বৃত্তি ও পেশামূলক নির্দেশনা, (৩) অবসর বিনোদনমূলক নির্দেশনা এবং (৪) নেতৃত্বমূলক নির্দেশনা।

খ. Koos এবং Kowrtz এর মতে নির্দেশনা পাঁচ প্রকার ঃ

(১) শিক্ষামূলক নির্দেশনা, (২) বৃত্তিমূলক নির্দেশনা, (৩) অবসর বিনোদনমূলক নির্দেশনা, (৪) স্বাস্থ্যবিষয়ক নির্দেশনা এবং (৫) নাগরিক, সামাজিক ও নৈতিক নির্দেশনা।

গ. Berdie এর মতে নির্দেশনা দশ প্রকার ঃ

(১) শিক্ষা নির্দেশনা, (২) বৃত্তি নির্দেশনা, (৩) ধর্ম বিষয়ক নির্দেশনা, (৪) নাগরিকত্বের নির্দেশনা, (৫) বাড়িঘর সম্পর্কিত নির্দেশনা, (৬) অবসর ও চিত্ত বিনোদন মূলক নির্দেশনা, (৭) ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য নির্দেশনা, (৮) সঠিক কর্ম সম্পাদনমূলক নির্দেশনা, (৯) চিন্তা, বিবেচনা ও সহযোগিতামূলক নির্দেশনা এবং (১০) জনহিতকর ও সংস্কৃতি কার্যমূলক নির্দেশনা।

ঘ. Porter, E.A. এর মতে নির্দেশনা ছয় প্রকার ঃ

(১) শিক্ষামূলক নির্দেশনা, (২) বৃত্তিমূলক নির্দেশনা, (৩) সামাজিক ও নাগরিক নির্দেশনা, (৪) স্বাস্থ্যবিষয়ক নির্দেশনা, (৫) অবসরমূলক নির্দেশনা এবং (৬) চরিত্রগঠন নির্দেশনা।

ঙ. নির্দেশনার প্রকারভেদ সম্পর্কিত চূড়ান্ত অভিমত

বিভিন্ন শিক্ষাবিদ নির্দেশনার সমগ্র ক্ষেত্রকে কাজের বিভিন্নতা অনুযায়ী নানাভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তাদের সুচিন্তিত যুক্তি ও আলোচনার সার সংক্ষেপ অনুযায়ী নির্দেশনাকে মোট ছয়টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা- (১) শিক্ষা বিষয়ক নির্দেশনা, (২) বৃত্তিমূলক নির্দেশনা, (৩) স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশনা, (৪) ধর্ম বিষয়ক নির্দেশনা, (৫) অবসর বিনোদনমূলক নির্দেশনা এবং (৬) আমোদ প্রমোদবিষয়ক নির্দেশনা।

১. শিক্ষাবিষয়ক নির্দেশনা ঃ শিক্ষা এবং নির্দেশনা অনেকক্ষেত্রে প্রায় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে এবং পদ্ধতিতে এদের মধ্যে বেশ পার্থক্য দেখা যায়। তবে এদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অভিন্ন।

প্রকৃত শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবনে, শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, আবেগিক বৃত্তি-সমূহের যথাযথভাবে বিকাশ সাধনের প্রচেষ্টাকে ব্যাপক অর্থে শিক্ষা নির্দেশনা বলা যায়। হ্যারি ট্রুম্যান এর মতে, "শিক্ষা নির্দেশনা প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নিজের অনুরাগ সম্বন্ধে, পরগতা ও ব্যক্তিত্বের গুণাবলীকে বুঝতে দেয় এবং সেগুলির উন্নতির বিধান করে ও তার শিক্ষা ও ভবিষ্যত কর্মজীবনের লক্ষ্য সঙ্গতিবিধান করে।"

রুথ ষ্ট্রেং (Ruth Strang) বলেন, "শিক্ষা নির্দেশনা শিক্ষার্থীকে নিজ ক্ষমতানুসারে শিক্ষনীয় বিষয় নির্বাচনে সাহায্য করে এবং নির্বাচিত বিষয়ে চরম উৎকর্ষ সাধনে ও সর্বোচ্চ অর্জনে সাহায্য দান করে"। ক্রুয়ান এর মতে শিক্ষা নির্দেশনা নিম্নোক্ত কাজগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখে ঃ-

(১) শিক্ষণীয়বিষয় ভালরূপে শিক্ষা লাভ।

(২) শিক্ষা উপকরণের যথাযথ ব্যবহার।

(৩) বিদ্যালয়ের সকল কর্মসূচির সমন্বয় সাধন।

(৪) নিয়মানুবর্তিতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, শৃঙ্খলাবোধ, সাক্ষাৎদান ও কথাবার্তা শেখানো এবং

(৫) লেখা পড়া ও পরীক্ষা পদ্ধতি শেখানো।

মেয়রের (Myere) মতে, "শিক্ষার্থীর মধ্যে যা নিহিত আছে সেগুলোর স্ফূরণ ও বিকাশ দ্বারা সুসঙ্গত ব্যক্তিত্ব গঠন ও বাস্তব রূপায়নই শিক্ষা নির্দেশনার কাজ।"

শিক্ষা নির্দেশনার সহায়তায় শিক্ষাকে বাস্তবমুখী করা যায়। শিক্ষা নির্দেশনার সঠিক কার্যক্রমের অভাবে শিক্ষার্থীরা পথ খুজে পায় না। ফলে ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষার্থীরা বিফল হয়। আবার সমষ্টিগতভাবে গোটা সমাজ ব্যবস্থা অপচয় ও সংকটের সম্মুখীন হয়। কিন্তু সঠিক নির্দেশনা ও কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে এবং সামর্থ্য অনুযায়ী তার ব্যক্তিগত জীবনে চরম উন্নতি সাধন করে। কর্মজীবনে সুদক্ষকর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। সৃজনশীল ব্যক্তি এবং চরিত্রবান নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে সুযোগ পায়। পক্ষান্তরে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য ও অনুরাগের প্রতি নজর না রেখে কেবল অভিভাবকদের ইচ্ছানুযায়ী বিষয় নির্বাচন করা হলে পেশা নির্বাচনে এরা ভবিষ্যতে এক বিভ্রাটের সম্মুখীন হন। বিষয়ের প্রতি সঠিক আগ্রহের অভাবে এ সব শিক্ষার্থীরা অবশেষে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করতে থাকে। আবার অনেক শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে উত্তীর্ণ হয়ে মানসিক উত্তেজনায় নিজ সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ্য না রেখে কলেজ শিক্ষা পর্যায়ে এমন সব বিষয়ে ভর্তি হয়, যেখানে সে কিছুদিন পরেই পড়াশুনায় আর অগ্রসর হতে পারে না। পরিণামে লেখা পড়ার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

অনুরূপভাবে অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে বা পেশাভিত্তিক শিক্ষাসূচি যেমন চিকিৎসা বিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান বা প্রকৌশল বিজ্ঞানে ভর্তি হয়ে কিছুদিন পর আর পড়াশুনায় মন

দিতে পারছে না। অকৃতকার্যতার বোঝা বহন করতে হচ্ছে। এ ধরনের সবকিছু ঘটছে একমাত্র শিক্ষা নির্দেশনার সঠিক কার্যক্রমের অভাবে। এসকল শিক্ষার্থীরাই ভবঘুরে জীবন যাপন থেকে একসময় নানা রকম অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে। শিক্ষা নির্দেশনার দ্বারা যুবকদের এ ধরনের অপরাধ রোধ করা সহজ। সঠিকভাবে শিক্ষা বা পেশা গ্রহণে সাহায্য করতে পারলে ওরাই দেশের দক্ষ জনশক্তি হিসেবে প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করে আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। দেশের সার্বিক উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তির প্রস্তুতি ও কর্ম ক্ষেত্রের সাফল্য নিশ্চিত করতে শিক্ষা নির্দেশনার ভূমিকা অপরিহার্য।

শিক্ষা নির্দেশনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর হলো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদেরকে নির্দেশনা দেয়া। এ স্তরের শিশুকে নির্দেশনা দেয়া বড় জটিল কাজ। কারণ বিদ্যালয়ে প্রবেশের পূর্বে পরিবারের সকলের আদুরে স্বাধীন শিশুটিকে বিবেচনা করতে হবে। বিদ্যালয়ের নতুন পরিবেশে সে নানা সমস্যার বেড়াজালে আবদ্ধ হবে। এ স্তরে স্নেহ ও ভালবাসা দিয়ে বৃহত্তর জগতের সঙ্গে তাকে পরিচিত করতে পারলে অচিরেই সে সব কিছু মানিয়ে অগ্রসর হবে। আত্মীয়স্বজন পরিবেষ্টিত মধুময় জীবনের চেয়ে সে অধিকতর এক আনন্দের পৃথিবী খুঁজে পাবে। যদি তাকে আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়োজিত করা যায়। নতুনকে গ্রহণ করার অদম্য আকাঙ্ক্ষা শিশু মনে সদা জাগ্রত থাকে। ফলে, শিশুদেরকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারলে বিদ্যালয়ের বিধি, নিয়ম কানুন বা শৃঙ্খলা সবকিছুই সে হাসি মুখে মেনে নেবে। আনন্দ ও কাজের মাধ্যমে পাঠ্যক্রম ও সহপাঠক্রমিক শিক্ষাসূচির সমন্বয় ঘটালে বিদ্যালয় শিশুদের কাম্য পরিবেশ হবে।

শিশুরা কখনও লজ্জায়, ভয়ে সংকুচিত ও ম্রিয়মান হয়ে পড়বে না। নির্দেশনা মোতাবেক চলতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। পর্যবেক্ষণের সাহায্যে প্রত্যেকটি শিশুর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ভাল করে জেনে নিলে অবশ্যই সে বিদ্যালয়ের পরিবেশের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বে না। এক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদেরকে শিশুদের কল্যাণার্থে বিদ্যালয় কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নির্দেশনার এ সব কাজ করতে হবে। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে তিনটি কারণে নির্দেশনার কাজ আরও গুরুত্বপূর্ণ। যেমন (১) শিক্ষার্থীরা বহুমুখী শিক্ষার সম্মুখীন, (২) বিষয় শিক্ষক শ্রেণীর সকলের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে তাদের কৃতিত্ব মানের উন্নতি অবনতি লক্ষ্য করার সুযোগ পান না এবং (৩) শিক্ষার্থীরা বিষয় নির্বাচনের বা পেশা নির্বাচন ব্যাপারে চরম উত্তেজনার মধ্যে সময় কাটায়। অতএব শিক্ষার্থীরা দৈহিক গঠন, মানসিক বিকাশ ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সঠিকভাবে নির্দেশনার প্রয়োজন। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা যাতে ব্যক্তিগত সামর্থ্য, অনুরাগের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিষয় নির্বাচনে ভুল না করে এবং তাদের যাবতীয় সমস্যা সমাধান ও চাহিদা পূরনের জন্য সঠিক নির্দেশনার

প্রয়োজন। অন্যথায় এরা ক্লাস বর্জনের চিন্তা ভাবনায় মগ্ন থাকে। পড়া শোনায় পেছনে পড়ে গেলে অকৃতকার্য ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। একবার পেছনে পড়ে গেলে কনিষ্ঠদের সঙ্গে হীনমন্যতায় ভোগে। অকালেই পাঠ্য জীবনের যবনিকা ঘটে। এসব ছাত্ররা সমাজ জীবনের বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। কারণ এ স্তরেই দক্ষ বা আধাদক্ষ কর্মী বাহিনী তৈরি হওয়ার ক্ষেত্র। দেশ ও জাতির অগ্রগতির জন্য এ ধরনের কর্মী বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। আবার উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও এ স্তর থেকেই শিক্ষার্থীরা পদার্পণ করবে।

২. বৃত্তিমূলক নির্দেশনা ঃ আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৃত্তি গ্রহণে তেমন কোনো বাছাই বা যাচাই নেই। বৃত্তি নির্বাচনেরও কোনো সঠিক রীতি নীতি নেই বললেই চলে। এ কারণে বৃত্তি নির্দেশনা জাতীয় কোনো সংস্থা গড়ে ওঠে নি। এর প্রধান কারণ বেকার সমস্যা। অন্যদিকে কর্মসংস্থানের অভাবজনিত সমস্যাও বলা চলে। উন্নত দেশসমূহে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় ত্যাগ করার পূর্বেই বৃত্তিমূলক নির্দেশনা লাভ করে। নিজ নিজ যোগ্যতার ভিত্তিতে পেশার জন্য পূর্বপ্রস্তুতি নেয়। যারা উচ্চ শিক্ষার যোগ্য নয় তারা কোনো না কোনো পেশায় যোগ্যতা অর্জন করে। এক্ষেত্রে বৃত্তিমূলক নির্দেশনা তাদের সহায়তা করে। কোনো ব্যক্তিকে বৃত্তি নির্বাচনে প্রস্তুতি গ্রহণপূর্বক করতে বৃত্তিতে প্রবেশ ও উন্নতি লাভের সহায়তা দানের পদ্ধতিকেই বৃত্তিমূলক নির্দেশনা বলা হয়। ১৯০৭ সালে আমেরিকার জাতীয় নির্দেশনা সমিতি বৃত্তিমূলক নির্দেশনার ব্যাপারে যে সংজ্ঞা দেন তা হচ্ছে, এটি ব্যক্তিকে পেশা গ্রহণে সহায়তা করার একটা পদ্ধতি। যে পদ্ধতি অবলম্বনে ব্যক্তিকে পেশার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণে পেশাতে প্রবেশের সহায়তা করা হয় এবং পরবর্তী কালে উন্নতির মাপকাঠি নিরূপণ করা হয়। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা বৃত্তিমূলক নির্দেশনা সম্পর্কে বলেন- এটি ব্যক্তিকে পেশা নির্বাচনের ব্যাপারে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে এবং ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে পেশাগত সুযোগ সুবিধা ও পদোন্নতির জন্য সহায়তা করে।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে বৃত্তিমূলক নির্দেশনা বলতে বৃত্তি নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য অভিজ্ঞতা ও পরামর্শকে বুঝায় এবং বৃত্তি গ্রহণে পূর্ব প্রস্তুতি ও বৃত্তিতে পদোন্নতি বুঝায়। বৃত্তিমূলক নির্দেশনাকে কোনোভাবেই শিক্ষামূলক নির্দেশনা থেকে পৃথকভাবে বিবেচনা করা যায় না, কেননা প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই শিক্ষা জীবন শেষ করে কর্ম জীবনে পদার্পণ করতে হয়।

ব্যক্তির উপযুক্ততার ভিত্তিতে তার জন্য বৃত্তি নির্বাচন করে দেয়া এবং ভুল বৃত্তি নির্বাচনের দ্বারা পেশাগত জীবনে যেন অকৃতকার্য না হয় বা পদোন্নতি বন্ধ না হয় তার ব্যবস্থা করাই বৃত্তিমূলক নির্দেশনার লক্ষ্য। নির্দেশনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক যথার্থতা এবং আগ্রহ, প্রবনতা ইত্যাদির ভিত্তিতে যে কোনো ধরনের পেশার

উপযোগিতা নিরূপণ করা এবং তাকে সমাজ সেবামূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করা। এ ছাড়া আরেকটি উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তির সাথে বৃত্তির সমন্বয় সাধন। বৃত্তি গ্রহণে তৃপ্তি লাভ এবং নিয়োগ কর্তার উপযুক্ত কর্মলাভ। বৃত্তি নির্দেশনার বিশেষ লক্ষ্য হলো বৃত্তির জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিকে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন পেশায় সাধারণ ও বিশেষ যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবগত করানো। বিভিন্ন পেশা ও পারিশ্রমিক সম্পর্কে অবহিত করলে চাকুরিতে উন্নতি করা সহজ হয়। পেশায় যোগদানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পূর্বে সে কাজের প্রকৃতি সম্বন্ধে অবহিত করানো এবং পদোন্নতি সম্পর্কে পর্যালোচনার অভ্যাস গড়ে তোলা। উন্নত দেশে বিদ্যালয় পর্যায়ে নির্দেশনা কার্যক্রমের অধীনে বিদ্যালয় পরামর্শ দাতা থাকেন। তিনি শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ করেন এবং শিক্ষার্থীদের বৃত্তি নির্বাচনের সময় নানা বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি শিক্ষার্থীদের পিতা মাতার সংগেও আলোচনা করে তাদের বৃত্তি নির্বাচন করে থাকেন। এ ব্যাপারে বৃত্তির অনুকূলে শিক্ষার্থীদের উপযুক্ততা যাচাই ও সহযোগিতা গ্রহণ করেন। বিখ্যাত মনোবিদ জোনস এর মতে কোনো শিক্ষার্থীর জন্য বৃত্তি নির্বাচন কালে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে।

১। শিক্ষার্থীর শারীরিক মানসিক সংরক্ষণ, সাফল্য , অনুরাগ, অভিরুচির প্রেক্ষিতে যে যে পেশার জন্য উপযোগী তা নিরূপণ করা ।

২। শিক্ষার্থী যেন স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক না হয়, তার পেশায় যেন সমাজ সেবার কিছুটা সুযোগ থাকে, অর্থোপার্জন ছাড়াও জনকল্যাণমূলক কাজেও তাকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৩। শিক্ষার্থীর পেশা নির্বাচনের পূর্বে পরামর্শদাতাকে চাকুরির বেতন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে।

৪। বর্তমানে বেতন, ভবিষ্যৎ আয়ের সম্ভাবনা পদোন্নতি ইত্যাদি সম্পর্কে সর্বাগ্রে বিবেচনা করতে হবে।

৫। প্রারম্ভিক বেতন কম হলেও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা এবং ঘন ঘন পদোন্নতি ইত্যাদি সম্পর্কে পরামর্শদাতা শিক্ষার্থীকে পূর্বেই অবহিত করবেন।

৬। পরামর্শদাতা শিক্ষার্থীর কর্মতৎপরতা ও ব্যক্তিত্বের স্বরূপ পর্যালোচনা করে তাকে পেশার ও কর্মদক্ষতার উপর বেতন বৃদ্ধি, পদোন্নতি, বোনাস ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান দান করবেন।

৭। পেশা গ্রহণ কালে পেশার ধরন ও পারিপার্শিকতা, ব্যক্তির সামাজিক ও পারিবারিক ঐতিহ্যের প্রতি সংহতি, সহকর্মীদের সাথে সামাজিকতা ও ভাষাগত মিল, আচার-অনুষ্ঠান রীতি নীতি ইত্যাদি বিষয় সমূহ বিবেচনা করা।

- ব্যক্তির স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে কাজের প্রকৃতি তার মেজাজ বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা, কাজের অনুপাতে পারিশ্রমিকের হার বা কাজের ধারণা তার মনোপূত কিনা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করা উচিত।

মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার পূর্বে যে সকল ছাত্র/ছাত্রীরা বিদ্যালয় ত্যাগ করে তাদের জন্য বৃত্তিমূলক নির্দেশনা আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশেও জাতির স্বার্থে অবশ্যক। কারণ আমাদের দেশের আধা দক্ষ বা দক্ষ শ্রমিকদের সংখ্যা খুবই কম। মাধ্যমিক স্তর থেকে আগতদেরকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিতে পারলে তারাই দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হতো। কিন্তু এ স্তর থেকে ত্যাগ করা তরুণেরা জাতির জন্য এক বিরাট সমস্যা। এ ধরনের শিক্ষার্থীদের জন্য আধাদক্ষ শ্রমের কাজ যোগাড় করে দিতে হবে। এ কার্যক্রমে প্রত্যেকটি স্কুলে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা উভয়ই জোরদার করতে হবে।

মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট লাভকারী তরুণেরা পলিটেকনিক, কৃষি, বাণিজ্য, নার্সিং ইত্যাদি ভর্তি হতে ইচ্ছুক বা আগ্রহ দেখাচ্ছে, এটি দেশ ও জাতির জন্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বৃত্তি নির্বাচনে বৃত্তিমূলক নির্দেশনার গুরুত্ব অপরিহার্য। আমাদের দেশের অসংখ্য ছাত্র/ছাত্রী কেবল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার সাধারণ বিষয়গুলোতে অকারণে ভিড় করছে। পাস করে এরা বেকার সমস্যা আরো বাড়িয়ে তুলছে। অথচ বৃত্তিমূলক যে কোনো প্রশিক্ষণ নিয়ে সঠিক পেশা নির্বাচন করতে পারলে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত ভাবে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই উপকার হতো। কিন্তু এ জাতীয় সমস্যার অন্যতম প্রধান বাধা বৃত্তিমূলক যোগ্যতার অভাব। আমাদের দেশের প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষা ব্যবস্থায় বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনার কার্যক্রম সংযোজন করা অত্যন্ত জরুরি কাজ। বিদ্যালয় নির্দেশনা সংস্থা থাকলেই বিদ্যালয় ত্যাগকারী বা বিদ্যালয় হতে এস.এস.সি সনদ লাভকারী সকলের জন্যই বৃত্তিমূলক বা নির্দেশনা কর্মসূচি পেশা নির্বাচনে সহায়ক শক্তি হিসেবে দ্রুত কাজ সম্পন্ন করা যেত। বেকার সমস্যা হতে দেশ ও জাতি পরিত্রাণ পেত এবং দেশের সর্বত্র সফলতা বয়ে আনত।

৩. স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশনা ঃ স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যা সমাধানে নির্দেশনা ব্যক্তিকে সহায়তা করে তাকেই স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশনা বলা যায়। সকলের স্বাস্থ্যের সুস্থতা বজায় রাখতে যে উপদেশ বা সাহায্য দেয়া হয়, তাই এ ধরনের নির্দেশনা স্বাস্থ্য সুস্থ রাখার জন্য নিয়মিত পুষ্টিকর আহার, পরিমিত ব্যায়াম ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার আয়োজন প্রয়োজন। সাধারণ স্বাস্থ্য বিধি সার্বজনীন ভাবে সকলকেই জানা উচিৎ। রোগ প্রতিরোধ বা রোগ প্রতিসেধক ব্যবস্থা সকলকেই জানতে হয়। আজকের দিনে দেশ ও জাতির স্বার্থে জন স্বাস্থ্যের প্রতি সকলকেই যত্নশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়। স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশনা সম্পর্কে সকল নাগরিককে অবহিত করা একান্ত প্রয়োজন।

৪. ধর্ম বিষয়ক নির্দেশনা ঃ যে নির্দেশনা ব্যক্তিকে তার ধর্ম পালনে, জীবন যাপনে, ধর্ম অনুসরণে সাহায্য দিয়ে থাকে, তাকেই ধর্মবিষয়ক নির্দেশনা বলে। ধর্মের মূল কথা সৃষ্টিকর্তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা। সততা, ন্যায়পরায়নতা, মানবতা প্রেম-প্রীতি-ভালবাসাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সুখী ও সুন্দর নিয়মশৃংখলাবদ্ধ জীবন যাপন করা ধর্মীয় নির্দেশনার লক্ষ্য। জন্ম সূত্রে শিশুর নিজস্ব কোন ধর্ম নেই। মাতা পিতা ও পরিবেশ হতে অনুকরণ ও অনুসরণে ধার্মিক কি অধার্মিক হয়। উপযুক্ত নির্দেশনা দিয়ে শিশুর মধ্যে ধর্মবোধ ও মানবতা বোধ জাগ্রত করা যায়। যার ফলে সামাজিক নিয়ম শৃংখলা, সুখ, সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা যায়।

৫. অবসর বিনোদনমূলক নির্দেশনা ঃ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কষ্টার্জিত অবসর সময় সার্থকভাবে স্বাস্থ্যপ্রদ, আমোদ প্রমোদের মাধ্যমে উপভোগ করতে সাহায্য করাই অবসর বিনোদনমূলক নির্দেশনা।

পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি। কিন্তু কোন ব্যক্তি একটানা অনেকক্ষণ পরিশ্রম করতে পারে না। তার শক্তি বা সামর্থ্যের নির্দিষ্ট সীমা থাকছে। তার কর্মক্ষমতা ও উৎপাদন ক্ষমতা ঠিক রাখতে হলে তাকে বিনোদনের সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। মানুষকে বেচে থাকার জন্য বিনোদন একান্ত প্রয়োজন। ফলপ্রসূ ও সার্থক অবসর বিনোদনের জন্য নির্দেশনা গঠনমূলক সাহায্য দিতে পারে। মানুষের দেহ ও মন সুন্দর সুষমভাবে কাজ করলেই কর্মক্ষেত্রে উন্নতি হবে। আর এ দেহ ও মনকে সঠিক নিয়ন্ত্রণ করতে হলে প্রয়োজন নির্দিষ্ট সময়ান্তে অবসর বিনোদন।

বিদ্যালয়ের সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই অবসর বিনোদনের আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এ কারণেই সার্থক জীবন যাপনের জন্য বিনোদনমূলক নির্দেশনা অপরিহার্য।

৬. আমোদ প্রমোদবিষয়ক নির্দেশনা ঃ আমোদ প্রমোদ বিষয়ক নির্দেশনা সমাজ জীবনের একটা অঙ্গ বিশেষ। আমোদ প্রমোদের ক্ষেত্রে শালিনতা রক্ষা করা জাতীর ঐতিহ্য। কৃষ্টি বজায় রেখে সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে প্রতিটি মানুষকে নির্মল আনন্দ দানের নির্দেশনা দিয়ে আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করে সমাজ জীবনকে সুষ্ঠ ও সবল রাখার অন্যতম উপায়। অশ্লীল বা কলুষিত আনন্দ সমাজকে রুগ্ন করে দেয়। শিশু বা যুব সমাজকে উপযুক্ত বা সার্থক নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে আধুনিক শিক্ষা ধারার সুস্থ সাবলীল, সাংস্কৃতিক, মননশীল আমোদ প্রমোদ ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

শিক্ষা সফর, সাংস্কৃতিক সপ্তাহ, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ইত্যাদি উপায়ে বিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনায় আমোদ প্রমোদমূলক কর্মসূচি নেয়া যায়। এটি অনেকটা

সহপাঠক্রমিক পর্যায়ের কার্যক্রম। সামাজিক আনন্দমূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ জাতীয় কর্মসূচি নেয়া যেতে পারে। শিক্ষা গ্রহণ অবসর বিনোদন আনন্দ উপভোগ এ সবগুলোই প্রতিটি শিক্ষার্থীর দেহ, মন সুস্থ রেখে সার্বিক কর্ম সম্পাদনের পাথেয় হিসেবেই গণ্য।

অনুশীলন ৬.২

১ নির্দেশনা কত প্রকার ও কি কি?
২ শিক্ষামূলক নির্দেশনা বলতে কি বুঝেন?
৩ বৃত্তিমূলক নির্দেশনা বলতে কি বুঝেন?
৪ বিদ্যালয়ে শিক্ষামূলক নির্দেশনা ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
৫ বিভিন্ন প্রকার নির্দেশনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

সর্বাত্মক পরিচয়পত্র (Cumulative Record card)

দীর্ঘ সময় ধরে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থী সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যাবলী লিপিবদ্ধ করা হয় বলে এ তথ্যপত্রকে সর্বাত্মক পরিচয়পত্র বলা হয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ে অগ্রগতি থেকে শুরু করে তার দৈহিক, মানসিক, নৈতিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক ইত্যাদির উপর নিয়মিত ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাদের উন্নতির মাত্রা ও পরিচয় লিপিবদ্ধ করা হয়। এ পরিচয় পত্রে কেবলমাত্র আহরিত সত্য তথ্যাবলী পত্রের আকারে ধারণকৃত হয়। প্রত্যেক বিদ্যালয় তার নিজের প্রয়োজনে পরিকল্পিত পরিচয় পত্র তৈরি করতে পারে।

Lester D. Crow এবং Alice Crow এর মতে, "The term Cumulative record is a recent addition to the terminology used in identifying the various types of records that have been used through the years."

পরিচয়পত্র শিক্ষার্থীদের নিকট গোপন রাখা যাবে না। তারা নিজেদের পরিচয়পত্র থেকে তাদের পঠনকালীন উন্নতি অবনতি বা ত্রুটি বিচ্যুতির কারণ অনুসন্ধান করার সুযোগ পাবে।

সর্বাত্মক পরিচয়পত্রের উপযোগিতা

সর্বাত্মক পরিচয় পত্রের উপযোগিতা বহুমুখী। এটি শুধু তথ্য সংগ্রহ ও তার সংরক্ষণ নয়। শিক্ষার্থীর অগ্রগতির মূল্যায়ন ছাড়াও বিদ্যালয়ে এটি নানান কাজে ব্যবহৃত হয়। নিম্নে এর কয়েকটি উপযোগিতা আলোচনা করা হলো ঃ

১। পরিচয়পত্রের সাহায্যে কোন পরীক্ষা পদ্ধতির নির্দিষ্ট সময় বিন্দুতে শিক্ষার্থীর পঠিত বিষয়বস্তুর পারদর্শিতার পরিমাপ করা হয় না। বরং তার সম্পূর্ণ শিক্ষা বর্ষের অর্জিত

জ্ঞানের পরিমাপ করার সুযোগ এ পরিচয়পত্রে থাকছে। শিক্ষার্থীর দৈনিক বা সাপ্তাহিক অনুষ্ঠিত বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান ও কৌশলের ক্রমোন্নতি এ পরিচয় পত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়।

২। শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও কৌশল আহরণের পরিমাপের পাশাপাশি তার ব্যক্তিসত্ত্বার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপও পরিচয় পত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ কোনো শিক্ষার্থীর শারীরিক ও প্রাক্ষোভিক বিকাশ আগ্রহ, সামাজিকতা, বন্ধুপ্রিয়তা, কল্পনাপ্রবণতা, দৃঢ়চিত্ততা ইত্যাদি সকল ধরনের বৈশিষ্ট্যের প্রকৃতি ও ক্রমপরিবর্তন এতে সংরক্ষণ করা হয়।

৩। প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির কৃত্রিম পরিবেশের তুলনায় এ পদ্ধতিতে স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় থাকে। শিক্ষকের পর্যবেক্ষণ ও রেটিং (Rating) এর উপরই বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। প্রচলিত পরীক্ষা ও আধুনিক পরীক্ষার ফলাফলও এতে অঙ্গীভূত করা হয়।

৪। সর্বাত্মক পরিচয়পত্রে শিক্ষার্থীর সম্পূর্ণ সত্তার একটি সামগ্রিক চিত্র ফুটে উঠে। শিক্ষাবর্ষের যে কোনো সময়ে তার বিভিন্ন পঠনীয় বিষয়সহ সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি, অপরের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন, প্রক্ষোভমূলক সমন্বয়, ইত্যাদি সকল প্রকার ক্ষেত্রে কতটা উন্নতি হয়েছে এ রূপ পূর্ণাঙ্গচিত্র এতে পাওয়া যায়।

৫। এতে ব্যক্তি সত্তার কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের ক্রমবিকাশ লিপিবদ্ধ করা হয়। শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রক্ষোভমূলক ও আচরণমূলক কোনো অসঙ্গতি যাতে না ঘটে সে কারণে পূর্বাহ্নে সর্তকতা অবলম্বনসহ প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা বা চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয়।

৬। অনেক সময় প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। কিন্তু পরিচয়পত্রে শিক্ষক পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপনের প্রয়োজনে তাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ট ও প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে অনেক নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করেন।

৭। সর্বাত্মক পরিচয়পত্রের ব্যবহার একদিকে যেমন শিক্ষার্থীরূপে শিশুর পরিমাপ করা হয়। অন্যদিকে তেমনই ক্রমবিকাশমান একজন মানুষরূপে তার পরিমাপ হয়ে থাকে।

৮। এতে শিক্ষার্থীর অতীত বর্তমান সাফল্যের পূর্ণ ও বিশদ বিবরণ সব সময়েই পাওয়া এবং তা থেকে সে ভবিষ্যৎ কি ধরনের সাফল্য অর্জন করবে তাও বলা সম্ভবপর হয়। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎবাণী করা সম্ভব হয়।

১ এটি শিক্ষার্থীকে তার ভবিষ্যৎ কর্মসূচি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দিয়ে থাকে।

২ এটি শিক্ষার্থীকে আত্মপরিমাপন করার সুযোগ এনে দেয়। সে নিজেই তার সর্বাঙ্গীন বিকাশ প্রক্রিয়ার একটি ছবি দেখতে পায় এবং তার ফলে সে নিজেই নিজেকে পরিমাপ করতে শেখে।

৩ তা ছাড়া এর দ্বারা অভিভাবক শিক্ষক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। শিক্ষার্থীর কার্যকলাপ সম্পর্কে পরিবারের সদস্যরা সম্যক ধারণা লাভ করে।

পরিচয় পত্রের বিষয়বস্তু

শিক্ষার্থীর বিভিন্নমুখী বিকাশের সাথে পরিচিত হতে যে সমস্ত তথ্যের একান্ত প্রয়োজন তা নিম্নে দেয়া হল ঃ

(১) পারিবারিক পরিচয়, (২) পাঠোন্নতির পরিচয়, (৩) সামাজিকতার পরিচয়, (৪) ব্যক্তিত্বের পরিচয়, (৫) আগ্রহের পরিচয়, (৬) কারুশিল্পের পরিচয়, (৭) ঝোঁকের পরিচয়, (৮) সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির পরিচয়, (৯) স্বাস্থ্যের পরিচয়, (১০) চারুশিল্প প্রবণতার পরিচয়, (১১) বিদ্যালয়ে দায়িত্ব পালনে শিক্ষার্থীর অবস্থান, পুরস্কার প্রাপ্তি ইত্যাদির পরিচয় এবং (১২) বিদ্যালয়ের উপস্থিতির পরিচয়।

পরিচয় পত্র সংরক্ষণের নিয়মাবলি

(১) প্রত্যেক শিক্ষার্থীর তিন বছরের রেকর্ড এক সাথে রাখতে হয়। সাধারণত ষষ্ঠ শ্রেণিতে যে রেকর্ড রাখা শুরু করা হয়, তা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত চলবে।

(২) দ্বিতীয় পরিচয়পত্র রাখা শুরু হবে নবম শ্রেণি থেকে এবং তা দশম শ্রেণি পর্যন্ত চলবে।

(৩) বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীর পরিচয়পত্র দেখতে পারবেন এবং পরামর্শদাতার অনুমতিক্রমে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীও তার নিজের পরিচয়পত্র দেখতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে কিছু কিছু অংশ অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে রাখা হয় যা নির্ধারিত সময়ের আগে দেখানো হয় না।

(৪) একজন শিক্ষার্থীকে অন্যজনের পরিচয় পত্র দেখার অধিকার দেয়া যাবে না।

(৫) পরিচয়পত্রে একাধিক তথ্য বার বার থাকবে না।

(৬) পরিচয়পত্রটি এমনভাবে পরিকল্পিত থাকবে যাতে করে যে কোন শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় তথ্য এক নজরে চোখে পড়ে।

(৭) পরিচয় পত্র সংরক্ষণের দায়িত্বপালন করবেন কেবল পরামর্শদাতা।

পরিচয় পত্রের ব্যবহার

১। পরিচয়পত্রের সাহায্যে শিক্ষার্থীর পারিবারিক পরিবেশ, সামাজিক অবস্থান, পিতা-মাতার জীবন যাত্রার মান ও জীবন যাপন প্রণালী সংশিষ্ট তার ব্যক্তিগত কার্যকলাপ ও নানা ধরনের প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়।

২। এটি শিক্ষার্থীর মৌলিক চাহিদার স্বরূপ নির্ণয়ে সাহায্য করে।

৩। এটি শিক্ষা কোর্স ও বৃত্তি নির্বাচনে যথেষ্ট সাহায্য করে।

৪। এটি অতি মেধাবী ও স্বল্পমেধার শিক্ষার্থীকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করে।

৫। এটির সাহায্যে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীর সম্বন্ধে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক সংস্থায় সুপারিশ করতে বা পরামর্শ দিতে পারেন।

৬। এটি শিক্ষক ও অভিভাবকের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে।

৭। এটির সাহায্যে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীর সম্বন্ধে যথোপযুক্ত তথ্য সরবরাহ দ্বারা বিভিন্ন প্রকার সমাজ সেবামূলক সংস্থাকে সহযোগিতা করে থাকেন। সেখানে এতিম অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীর জন্য বিশেষ বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়।

৮। কোনো শিক্ষার্থী বিদ্যালয় বদল করলে নতুন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে সনাক্ত করতে, বুঝতে ও তদানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে এটি সাহায্য করে।

৯। শিক্ষার পরবর্তী স্তরে এই সর্বাত্মক পরিচয়পত্র ব্যবহারের মাধ্যমে তার সমস্যা প্রয়োজন, চাহিদা, ঝোঁক সনাক্ত করা সম্ভব হয়। তাছাড়া দীর্ঘ মেয়াদী পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থী সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা যায়।

একটি সর্বাত্মক পরিচয়পত্রের নমুনা ঃ

১। শিক্ষার্থীর পরিচয়

নাম ----------

বয়স ----------

ঠিকানা ----------

২। পারিবারিক তথ্যাদি

পিতা/মাতার নাম ----------

তাদের পেশা ----------

সন্তান সংখ্যা ----------

৩। **শারীরিক তথ্যাদি**

উচ্চতা ঃ

ওজন

বুকের মাপ

স্বাস্থ্যের অবস্থা

রোগের ইতিহাস

৪। **শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্যাদি**

বিদ্যালয়ের নাম

শ্রেণি

শাখা

ক্রমিক নং

বুদ্ধাঙ্ক

৫। **পাঠ অগ্রগতির বিবরণী**

বিষয়	খুব ভাল	ভাল	মোটামুটি	মন্দ নয়	অনগ্রসর
(ক) বাংলা					
(খ) ইংরেজি					
(গ) গণিত					
(ঘ) বিজ্ঞান					
(ঙ) সামাজিকবিজ্ঞান					
(চ) ভূগোল					
(ছ) অন্য কোনো বিষয়					

৬। **বিশেষ শক্তির পরিমাপণ ঃ**

বিষয়	খুব ভাল	ভাল	মোটমুটি	মন্দ নয়	অনগ্রসর
(ক) ভাষামূলক					

(খ) যন্ত্রমূলক

(গ) অবস্থিতিমূলক

(ঘ) সংখ্যামূলক

(ঙ) বিচারকরণমূলক

(চ) স্মৃতিমূলক

৭। **আগ্রহের পরিমাপ ঃ**

বিষয়	খুব ভাল	ভাল	মোটমুটি	মন্দ নয়	অনগ্রসর
(ক) সঙ্গীত					
(খ) চারুকলা					
(গ) সাহিত্য					
(ঘ) বস্তু সংগ্রহ					
(ঙ) শিল্প অনুসরণ					
(চ) ভাস্কর					

৮। **সহপাঠ ক্রমিক কার্যাবলির পরিমাপ ঃ**

বিষয়	খুব ভাল	ভাল	মোটমুটি	মন্দ নয়	অনগ্রসর
(ক) খেলাধুলা					
(খ) বির্তক সভা					
(গ) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান					
(ঘ) প্রদর্শনী					
(ঙ) অভিনয়					
(চ) সমাজ সেবা					
(ছ) ভ্রমণ/শিক্ষা সফর					
(জ) বিদ্যালয় পরিশাসন					
(ঝ) শরীর চর্চা					

৯। **ব্যক্তিসত্তা সংলক্ষণের পরিমাপ ঃ**

বিষয়	খুব ভাল	ভাল	মোটমুটি	মন্দ নয়	অনগ্রসর
(ক) সামাজিকতা					

(খ) দায়িত্ববোধ

(গ) চারিত্রিক দৃঢ়তা

(ঘ) শ্রমশীলতা

(ঙ) অন্তর্বর্তীতা

(চ) সততা

অনুশীলনী-৬.৩

১ সর্বাত্মক পরিচয়পত্র বলতে কি বুঝেন? সর্বাত্মক পরিচয়পত্রের উপযোগিতা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২ সর্বাত্মক পরিচয়পত্রের তথ্য সংগ্রহের উপায়সমূহ ও এর ব্যবহার বিধি আলোচনা করুন।

৩ একটি সর্বাত্মক পরিচয়পত্রের নমুনা তৈরি করুন।

পরামর্শ দান

পরামর্শের সংজ্ঞা ও স্বরূপ ঃ

সমস্যা পীড়িত মানুষের জীবন। একটি সমস্যার সমাধান হলে অন্য একটির উদ্ভব ঘটে। কর্মবহুল পৃথিবীতে নানা রকম সমস্যার সমাধান করতে না পারলে মানুষকে অন্য কোনো অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির শরণাপন্ন হতে হয়।

পরামর্শ বলতে নির্দেশনার সেই কৌশলকে বুঝায় যা ব্যক্তিকে তার ক্ষমতা, বৈশিষ্ট্য পরিবেশ ও সুবিধা ইত্যাদি অনুযায়ী তার মনঃপুত ও সার্থক জীবন লাভে সাহায্য করে। পরামর্শ কাজে দুইজন ব্যক্তির ভূমিকাই সক্রিয়। একজন পরামর্শ গ্রহণ করেন তিনি গ্রহিতা। গ্রহিতা সমস্যায় জর্জরিত জীবন থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে দাতার নিকট গমন করেন। দাতা তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে তাকে সমস্যামুক্ত হবার জন্য সম্ভাব্য উপদেশ প্রদান করেন, এটিই পরামর্শ। এ সম্পর্কে কয়েকজন শিক্ষাবিদ ও মনোবিদদের অভিমত নিম্নে দেয়া হল।

রবিনসন (Rabinson) বলেন, "একজন আশ্রয় দাতা ও আরেকজন আশ্রিত ব্যক্তির মধ্যে সংঘটিত যাবতীয় অবস্থাকে পরামর্শ বলা হয়। আশ্রয় দাতার পরামর্শে আশ্রিত ব্যক্তি তার নিজের ও পরিবেশের সাথে সুন্দরভাবে খাপ খাইয়ে নেয়ার সুযোগ লাভ করে।"

রুথ স্ট্রেং (Ruth Strang) এর মতে "পরামর্শ দ্বারা ব্যক্তির আত্মোপলব্ধি ঘটে, যা দ্বারা তার মধ্যে নিহিত ক্ষমতাগুলো শক্তিশালী হয়, যার ফলে তার নিজের সমস্যা নিজেই সমাধান করতে সমর্থ হয়।"

কাল রোগার (Rogers C.R.) বলেন, "এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের মধ্যে যে পরিবর্তন আনায়নের ব্যবস্থা, তাই পরামর্শ"।

ট্রাকসলার (Traxler A.E.) বলেন, "ব্যক্তির সমস্যায় ব্যক্তি নিজে ও কোন সংস্থার যৌথ চেষ্টার অবস্থাকে পরামর্শ বলা হয়।"

এ্যালড্রিউ এর মতে, "পরামর্শ একটি পারস্পরিক ক্রমোন্নতির ব্যবস্থা। এটা দুই ব্যক্তির মধ্যে একটা সম্পর্কের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে থাকে তাদের একজন নিজের সার্বিক উন্নতির দ্বারা জীবনের লক্ষ্যে পৌছবার জন্য অপর একজন দক্ষ জ্ঞানী ব্যক্তির সাহায্য কামনা করে।"

রেন (Wrenn) বলেছেন, "পরামর্শ হচ্ছে এই ব্যক্তির মধ্যে একটা ব্যক্তিগত গতিশীল পরিস্থিতি। তাদের একজন বেশি বয়স্ক, জ্ঞানী, গুণী, অভিজ্ঞ ও বিশ্বাসী। অপরজন অল্প বয়স্ক, অনভিজ্ঞ ও সমস্যা গ্রস্ত একজন পরামর্শ গ্রহীতা, অপরজন পরামর্শ দাতা।"

জোনস (Jones) এর মন্তব্য, "দুই ব্যক্তির মধ্যে পরামর্শ দ্বারা সমস্যার একটা পরিস্কার চিত্রাঙ্কন ও পরিকল্পনা গ্রহণ করাই পরামর্শ। পরামর্শ হচ্ছে একটা সমবায় যৌথ প্রচেষ্টা। পরামর্শের অন্তর্গত শিক্ষার্থীগণের কর্তব্য হবে তাদের আত্মপ্রত্যয় লাভ করে উদ্ভব সমস্যা মোকাবেলা করা। নিজেকে ব্যক্ত করার সৎ সাহস অর্জন করা। নিজকে পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়া আর জীবনের লক্ষ্যে পৌছার জন্যে নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করা। অপরপক্ষে পরামর্শ দাতার কর্তব্য হবে অন্তর্দৃষ্টির সৃষ্টি করার চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করা এবং ব্যক্তির যাবতীয় চাহিদায় কার্যকরী ভাবে, অপকট ও নিরলসভাবে সাড়া দেয়া।" নিরবিচ্ছিন্নভাবে কোন মানুষ জীবন যাপন করতে পারে না। তাকে কোন না কোন বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এসব বাধা বিপত্তি অতিক্রম করা ছাড়া জীবন চলার পথে সফলতা আসে না। এসব ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি যখন নিজ বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার আলোকে সমস্যা সমাধানে বিব্রত হয়ে পড়ে, তখন তাকে জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ লোকের শরণাপন্ন হতে হয়। তখন সমস্যা বিজড়িত ব্যক্তি বিভিন্নভাবে জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে যে সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করে তাই পরামর্শ। অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য ও সহায়তামূলক কাজকে পরামর্শদান আর সমস্যা বিজড়িত ব্যক্তির কাজকে পরামর্শ গ্রহণ বলা যায়। এক্ষেত্রে দুই ব্যক্তি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন, একজন পরামর্শ দাতা, আর একজন পরামর্শ গ্রহিতা। পরামর্শ গ্রহিতা যখন পরামর্শ দাতার কাছ থেকে নিজের সমস্যা সমাধানের যে কৌশল গ্রহণ করে তা সে নিজের স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে হয় কার্যকরী করবে অথবা অন্যভাবে নিজের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চালাবে। এ ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা বলতে কিছু নেই। গ্রহিতা যদি

মনে করে পরামর্শ অনুযায়ী তার সুবিধা হবে, তবে সে তা অনুসরণ করবে। আবার পরামর্শ দাতার কাছেও তার সমস্যাবলীর সমাধানের উপায় যাচাই করে দেখতে পারে। পরামর্শ দেয়ার জন্য পরামর্শ দাতা সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে থাকেন। এ সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে যদি সমস্যার সমাধানের একটা উপায় খুঁজে বের করা যায়, তবেই পরামর্শ গ্রহিতা তা অনুসরণ করে থাকে।

অনেক সময় জটিল সমস্যাকে একাধিক সাক্ষাৎকারে বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাধান করতে চেষ্টা করা হয়। সাক্ষাৎকার সমস্যা সমাধানের পথ ত্বরান্বিত করে।

কার্টেলি পরামর্শের স্বরূপ উদঘাটন করতে গিয়ে বলেছেন, দাতা ও গ্রহিতার মধ্যে অবশ্যই ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকতে হবে। উভয়ের মধ্যে পরামর্শের জন্য যোগাযোগের সুবিধা থাকবে। পরামর্শ দাতাকে পদ্ধতি সম্বন্ধে ভাল ভাবে জানতে হবে। পরামর্শ দানের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম কালে পরামর্শ গ্রহিতার মধ্যে আচরণের পরিবর্তন লক্ষ্য করতে হবে এবং পরামর্শ কালে সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য সঠিক পরিকল্পনা পুবাহ্নেই গ্রহণ করতে হবে।

শিক্ষাবিদ ও মনোবিদগণ পরামর্শকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন, যথা নির্দেশিত পরামর্শ ও অনির্দেশিত পরামর্শ।

নির্দেশিত পরামর্শ ঃ সমস্যা বিজড়িত ব্যক্তিকে সমস্যা সমাধানের জন্য সরাসরি নির্দেশ দেয়াকে নির্দেশিত পরামর্শ বলে। পরামর্শ দাতার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে থেকে সমস্যাযুক্ত ব্যক্তিকে তার সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে হয়। এটি অনেকটা পরিকল্পিত পরামর্শদান কার্যক্রম। এক্ষেত্রে বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ পরামর্শদাতা কর্তৃক সমস্যা জর্জরিত ব্যক্তিকে তার সমস্যা সমাধানের উপায় সমন্ধে ইঙ্গিত দেয়া হয়। তবে কোন কারণেই পরামর্শদাতা নিজ হাতে সমস্যার সমাধান করে দেন না। বরং তার দায়িত্ব শুধু পরামর্শ গ্রহিতাকে নির্দেশ দেয়া। ব্যাক্তিকে নির্দেশ অনুসরণ করে সমাধানের উপায় খুঁজে বের করতে হয়। এ ধরনের নির্দেশিত পরামর্শকে নির্দেশনাও বলা চলে। নির্দেশিত পরামর্শের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যাবলী নিম্নরূপ ঃ

(ক) সাক্ষাৎকারের সময় সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয় সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যার প্রতি এবং সমাধানের উপর।

(খ) পরামর্শদাতা সাক্ষাৎকারের সময় সমস্যা জর্জরিত ব্যক্তির চেয়ে অধিক পরিমাণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

(গ) পরামর্শ দাতা পরামর্শ গ্রহিতার সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজে নিতে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুকূলে যাবতীয় ব্যবস্থা করে দেন। তিনি তথ্য সরবরাহ, ব্যাখ্যা,

উপদেশের মাধ্যমে বিষয়ীর চিন্তাধারাকে সমস্যামুখী করে দেন যাতে করে সমস্যার সমাধানের উপায় খুব সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়।

অনির্দেশিত পরামর্শ ঃ সমস্যা জর্জরিত ব্যক্তি সাহায্যের কামনায় পরামর্শ দাতার আশ্রয় গ্রহণ করে এবং পরামর্শ দাতাকে সরাসরি সমাধানের উপায় বলে না দিয়ে কেবল সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজে নেয়ার মত পরিবেশ সৃষ্টি করে দেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজেই তার সমস্যার সমাধানের উপায় খুঁজে নিতে প্রয়াস পান। এরূপ পরামর্শ বলতেই অনির্দেশিত পরামর্শ বুঝায়। প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী রোগার (Rogers C.R.) এর মতানুসারে অনির্দেশিত পরামর্শের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ঃ

১। পরামর্শ গ্রহিতা সমস্যা সমাধান কল্পে পরামর্শ দাতার সাহায্য কামনা করে।

২। পরামর্শ দাতা প্রত্যক্ষভাবে কোনো সমস্যা সমাধানের কোনো উপায় দেখিয়ে দেন না। কিন্তু তিনি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে দিতে পারেন যাতে করে পরামর্শ গ্রহিতার অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায় এবং সে নিজেই উপায় বের করতে সক্ষম হয়।

৩। পরামর্শ দাতা বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে গ্রহিতার মনোভাব বুঝার চেষ্টা করেন।

৪। পরামর্শ দাতা এমন সব বন্ধুসুলভ আচরণ করবেন যাতে করে পরামর্শ গ্রহিতার নির্দ্বিধায় খোলাখুলিভাবে নিজের সমস্যার কথা ব্যক্ত করার সুযোগ পায়।

৫। পারস্পারিক সহানুভূতি ও সহযোগিতার মাধ্যমে পরামর্শ গ্রহিতার পক্ষে সমাধানের পথটি সহজ হতে থাকে।

৬। আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের সুবিধা হয়।

৭। সমাধানের পথ বের হবার পর থেকেই সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশ কমে আসে এবং পরামর্শ গ্রহিতা পরামর্শ দাতার সাথে যোগাযোগের ব্যাপারটি কমিয়ে দেয়।

মরনশীল মানুষের চাহিদারও শেষ নেই। আবার সমস্যারও শেষ নেই। প্রত্যেকটি সমস্যা আকৃতি ও প্রকৃতির দিক থেকে অনন্য। সমস্যাগুলো একটি অপরটি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক নয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় একটির সঙ্গে অন্যটির যোগসূত্র রয়েছে। এক সমস্যা থেকে অন্য রকমের আর এক সমস্যার সৃষ্টি। আবার কোন সমস্যার অন্তর্গত কোন সমস্যা তা ঠিক করে বলা কঠিন। শিক্ষাগত ও অন্যান্য সমস্যার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে পার্থক্য নির্ধারণ করা খুবই কষ্টকর। শিক্ষা জীবন বৃত্তি নির্বাচন ও ব্যক্তিগত জীবনে নানারূপ সমস্যায় জড়িত হয়ে অনেকেই পরামর্শের প্রয়োজন অনুভব করে এক্ষেত্রে এমন সব সমস্যার সৃষ্টি হয় যা উপযুক্ত পরামর্শের প্রয়োজন অনুভব করে এক্ষেত্রে এমন সব সমস্যার সৃষ্টি হয় যা উপযুক্ত পরামর্শের সাহায্য ছাড়া ব্যক্তির পক্ষে

নিজে নিজে সমাধান করা সম্ভব নয়। প্রতিযোগিতামূলক এ পৃথিবীতে মানব জীবন সমস্যা পরিপূর্ণ। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই সমস্যা। শৈশব, ছাত্র জীবন, চাকুরীজীবন, সামাজিক জীবন, তথা রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অঙ্গন সবক্ষেত্রেই সমস্যায় ভরপুর। এ কারণেই সমস্যা মুক্ত হওয়ার জন্য পরামর্শের একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের জন্য নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে পরামর্শের প্রয়োজন ঃ

১ স্বাস্থ্যগত সমস্যা;

২ অর্থনৈতিক সমস্যা;

৩ সাথি নির্বাচন;

৪। ধর্মীয় ও নৈতিক আচরণ;

৫। সামাজিক পরিবেশে বাঞ্ছিত আচরণ;

৬। ভাইবোন ও সহপাঠিদের সঙ্গে আচরণ;

৭। পিতা-মাতা বয়োজ্যৈষ্ঠদের সাথে স্থান কাল ভেদে আচরণ;

৮। মানসিক ও আবেগিক সংগতিবিধান;

৯। বিদ্যালয়ের পাঠক্রমিক ও সহপাঠক্রমিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণপূর্বক পরিবেশের সাথে সঙ্গতিবিধান;

১০। জীবনের লক্ষ্য ঠিককরণ এবং

১১। আত্মকেন্দ্রিকতা, হীনমন্যতা, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি বর্জন।

পরামর্শদাতার দায়িত্ব, কর্তব্য ও গুণাবলী

পরামর্শতদাতার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি ক্ষেত্রে পরামর্শদাতাকে ন্যায়, সততা ও আন্তরিকতার সাথে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সঠিক ভাবে পর্যবেক্ষণ করে তার সমস্যার মান ও মাত্রা উপলব্ধি করতে হয়। আবার তা বিশ্লেষণপূর্বক তাকে পরামর্শ দেয়াই পরামর্শদাতার জন্য যথার্থ দায়িত্ব। তিনি যদি পরামর্শ গ্রহিতার প্রত্যেকটি সমস্যাকে স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা না করেন তবে প্রায় একই ধরনের সমস্যার প্রেক্ষিতে একই ধরনের আবর্তন সৃষ্টি হবে। তিনি সঠিকভাবে তার প্রজ্ঞা, আন্তরিকতা ও বিচক্ষনতা, সততা ও সক্রিয়তা দিয়ে প্রমাণিত হবেন যে, তিনি কদাচিৎ ভুল করবেন। এ কারণেই একজন পরামর্শদাতার দায়িত্ব কর্তব্য অত্যন্ত জটিল ও বিতর্কিত। তাকে সমস্যার বিচার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাদানে যথেষ্ট দক্ষ ও ধৈর্যশীল প্রমাণ করতে হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের সাথে বিভিন্ন কাজে কর্মে ভাবের আদান প্রদানে অত্যন্ত বন্ধু সুলভ আচরণ তাকে সব সময়ই করতে হবে। তাকে যদি কেউ যুক্তিতে মোকাবেলা করতে চায় তিনি

তাদের প্রতিটি আচরণ সহানুভূতির সাথে গ্রহণ করে নিজ যুক্তিতে অটল থাকবেন। অথচ সকলেরই মতামতের প্রধান্য স্বীকার করবেন। কারণ তার প্রতিটি আচরণ অর্থবহ হতে হবে। তিনি সদাসর্তক থাকবেন। যাতে করে স্থবির হয়ে না পড়েন।

একজন পরামর্শদাতার সঠিক কর্তব্য হলো তার কার্যক্রমে যাতে করে শিক্ষার্থীরা নিজেদের অভাবসমূহ পূরণ করতে এবং সমস্যা সমাধানের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে ও নানাভাবে পরস্পরকে সাহায্য করতে বিভিন্ন উপায়ে সংগঠিত হতে সুযোগ পায়। এজন্য তাকে মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষা প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের অবস্থান ও যোগ্যতা বুদ্ধিমত্তা জেনে নিতে হবে। পর্যবেক্ষণ ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর আচরণের পরিবর্তনের ধারা সম্পর্কে ধারণা নিতে হবে। তিনি পেশাগত বা বৃত্তিমূলক উপজীবিকা সম্পর্কে ধারণার সঠিক তথ্য সংগ্রহ করবেন। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন পেশা ভিত্তিক ধারণা পেয়ে অবশ্যই নিজেদেরকে সামর্থানুযায়ী প্রস্তুত করতে চেষ্টা করবে। এ স্তরেই একজন পরামর্শদাতার সার্থকতা। স্বাস্থ্যগত পরামর্শের জন্য চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করার ব্যবস্থা করে দিবেন। প্রয়োজনমতে শিক্ষার্থীদের বাসস্থান, পরিবেশে, আর্থিক সংগতি ইত্যাদি সম্পর্কিত সমস্যাবলি নিয়ে অভিভাবকদের সাথে আলাপ আলোচনা করবেন। তার অন্যতম প্রধান কর্মসূচি থাকবে যাতে করে শিক্ষার্থীরা আত্মপ্রত্যয়ী, আত্মমর্যাদাশীল ও আত্মনির্ভরশীল হয়ে গড়ে উঠে।

একজন বিজ্ঞ অভিজ্ঞ পরামর্শ দাতার নিম্নে বর্ণিত যোগ্যতা ও গুণাবলী অবশ্যই থাকতে হবে।

১। সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ মেধা।

২। বিভিন্ন পেশার অবস্থা, গুরুত্ব যোগ্যতা, চাহিদা ইত্যাদিতে জ্ঞান এবং নিয়োগকর্তা ও কর্মীদের সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান।

৩। শিক্ষানীতি ও পদ্ধতির উপর ব্যাপক ধারণা ও বিদ্যালয়ের কর্মসূচির উপর সুষ্ঠু ও সঠিক ধারণা।

৪। বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহ ও গভীর ধারণা।

৫। শিক্ষার্থীর সামর্থ্য অভিরুচি, অনুরাগ ব্যক্তিত্ব ইত্যাদির উপর গঠিত অভীক্ষা সমূহের প্রয়োগ বিধি ও মূল্যায়নের গভীর জ্ঞান ও ব্যাপক অভিজ্ঞতা।

৬। জনসাধারণের সাথে যোগাযোগের নৈপুণ্য।

৭। মনোবিজ্ঞানের উপর ব্যাপক ও সুস্পষ্ট ধারণা।

৮। দৃঢ় চিত্ততা, ধীর স্থিরতা এবং চারিত্রিক সংগতি।

৯। সকলের জন্য উদার দৃষ্টিভঙ্গি।

পরামর্শদান কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে অনুসরণ ও গবেষণা

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে পরামর্শদান, তার অনুসরণ ও তা নিয়ে গবেষণা এ ধরনের কোনো কর্মকাণ্ড নেই বললেই চলে। তবুও সমস্যা নিপীড়িত মানুষদের জন্য কিছু চিন্তাভাবনা প্রয়োজন। আমাদের দেশে তেমন কোনো সংস্থার ব্যবস্থা গড়ে না উঠলেও পরামর্শ দানের কাজ যে চলে না এমন কথা বলা চলে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমও আজকের তরুণদেরই ভবিষ্যতের সুনাগরিক গড়ে তুলতে এবং ওদের সঠিক পথের অনুসন্ধান দিতে অবশ্যই প্রয়োজন সঠিক নির্দেশনার কার্যক্রম।

পরামর্শদান খুবই জটিল কাজ। সঠিক পরামর্শ মানুষের সঠিক পথের নির্দেশনা চিহ্নিত করে। কাজের উন্নতির জন্য সকলেরই সঠিক পরামর্শের প্রয়োজন হয়। সঠিক পরামর্শের অভাবে অসংখ্য তরুণ-তরুণী আমাদের দেশে বিপথগামী হয়ে সমাজের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে পঙ্গু করে তুলছে। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, হত্যা, লুটতরাজ ইত্যাদি প্রতিদিন ঘটছে। অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের জানমালের নিশ্চয়তা নেই। কিছু সংখ্যক বিপথগামী তরুণরা আজকে সন্ত্রাস, নেশা গ্রহণসহ বিভিন্ন অসামাজিক কর্মকান্ডে জড়িত হয়ে পড়ছে। এদেরকে জীবন চলার সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার জন্য প্রয়োজন কোন পরামর্শদান সংস্থার সক্রিয় সহযোগিতা। প্রথমেই আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

শিক্ষার্থীদের তথাকথিত সনদপত্র সর্বস্ব বেকার হিসেবে তৈরি না করে কৃষি শিল্প, কুটির শিল্প, মৎস্য চাষ, গবাদিপশুর আধুনিক খামার সৃষ্টির পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কাজের দক্ষ ও আধাদক্ষ শ্রমিক তৈরি করা উচিত। অষ্টম শ্রেণীর পরীক্ষা পাশের পর অসংখ্য ছাত্র/ছাত্রীদেরকে কৃষিভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বল্প পুঁজির ছোট ছোট কৃষি ফার্ম, মৎস্য চাষ প্রকল্প, হাঁস মুরগী প্রজনন ক্ষেত্র, দুগ্ধ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাত ফার্ম, ফলমূলের বাগান তৈরি, আধুনিক শাকসব্জি উৎপাদন প্রযুক্তি প্রয়োগের কাজে লাগানো দরকার। দেশের সকল মানুষের শ্রমের সঠিক ব্যবহার করা না হলে বর্তমানের চরম দারিদ্রতার প্রকোপ আরো বাড়বে বৈ কমবে না। দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে কর্মমূখী শিক্ষার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক শিক্ষাসূচি অতি দ্রুত সম্প্রসারণ করা দরকার। যে সকল ছাত্র/ছাত্রীরা বিদ্যালয় থেকে অকালে ঝরে পড়ছে, তাদের কে পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মমুখী করে তোলা প্রয়োজন। আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় ও পরামর্শদান কর্মসূচি চালু রেখে বৃত্তিমূলক পেশাভিত্তিক কর্মকান্ডের পাশাপাশি আর্থ সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে কর্মমুখী শিক্ষাসূচি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। আমাদের দেশের যে সকল ছাত্র/ছাত্রী ৮ম শ্রেণীর পরে আর পড়াশোনা করতে পারছেনা বা এ স্তরে অনেকে উত্তীর্ণ হতে পারছে না, এসব শিক্ষার্থীর জন্য পেশাভিত্তিক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি থাকলে, এরা পড়াশুনার তুলনায় হাতে কলমে

কিছু কাজকর্ম করতে উদ্যোগী হতো। আবার বৃত্তিমূলক নির্দেশনার ব্যবস্থা থাকলে কে কি ধরণের পেশার উপযোগী তা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারলে এ সকল মানব সম্পদের সঠিক ব্যবহার থেকে দেশ বঞ্চিত হত না। উপযুক্ত নির্দেশনা ও পরামর্শের অভাবে এদের জীবন অনিশ্চয়তার দিকে এগিয়ে চলছে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় কেবলমাত্র মেধাবীদের জন্য উচ্চ শিক্ষা নেয়ার সুযোগ থাকছে। পাশ্চাত্যের দেশসমূহে কিন্তু সকলেই প্রাথমিক শিক্ষা নিচ্ছে, যারা মেধাবী কেবল তারাই উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন। অন্যরা সকলেই প্রাথমিক শিক্ষা বা একটা বিশেষ স্তরের শিক্ষার পর নিজ নিজ শিক্ষাকালীন সময়ের প্রোফাইল অনুসারে ইয়থ ইমপ্লয়মেন্ট ব্যুরোতে যোগাযোগ করেই চাকুরির ব্যবস্থা করতে পারে। অর্থাৎ ঐ সকল বিদ্যালয় ত্যাগকারীরা কে কি করবে এ ধরনের একটা ধারণা তারা বিদ্যালয় থেকেই পায় এবং তাদের শিক্ষাকালীন সময়ের প্রোফাইল তাদেরকে পেশা গ্রহণে সাহায্য করে। অনেক ক্ষেত্রে কোনো ইন্টারভিউ দিতে হয় না। সরাসরি নিয়োগপত্র পায়। ঐ সকল দেশে তরুণ তরুণীদের নিয়ে আমাদের মত এত সমস্যার সৃষ্টি হয় না। ঐ সকল দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও রাষ্ট্রীয়ভাবে পরামর্শদান কর্মকাণ্ড চালু আছে বলে যে কেউ নিজের সমস্যার একটা সমাধান খুঁজে বের করতে পারে।

আমাদের দেশে অনতিবিলম্বে সরকারীভাবে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরামর্শ সংস্থার প্রচলন করা উচিত। প্রতিটি বিদ্যালয়ে পরামর্শদাতা নিয়োগ করে সবধরনের শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত পরামর্শ দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া দরকার। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্য থেকে পরামর্শদান বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকেই পরামর্শদাতা হিসেবে নিয়োগ করা যায়। তাছাড়া যে সকল শিক্ষার্থী পরামর্শদান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক তাদেরকে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ থেকে পরামর্শের জন্য আলাদা প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করে দেয়া যায়। দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার কারণ খুঁজে নিয়ে তাদের মেধা, পারগতা , প্রবণতা, ইচ্ছা, আগ্রহ ইত্যাদি অনুযায়ী শিক্ষাসূচি চালু করলে এবং সঠিক নির্দেশনা দিতে পারলে অসংখ্য শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন কাজে লাগানো যেত এবং মানব সম্পদের অপচয় রোধ করা যেত। আধা দক্ষ বা শ্রমিক তৈরি করে দেশের উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ডে লাগানো যেত। আমাদের দেশে কেবল অদক্ষ বেকার শ্রমিকের সমাহার। এ চিত্রের পরিসমাপ্তি না ঘটলে দেশের পরিবল্পিত উৎপাদনমুখী ব্যবস্থাসমূহ অচিরেই দক্ষ বা আধাদক্ষ শ্রমিকের অভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। দেশব্যাপী অদক্ষ বেকার শ্রমিকদের মিছিল সৃষ্টি করে খাদ্য চাই, বস্ত্র চাই, শ্লোগান মুখরিত ভিক্ষুকের জাতি হিসেবে এ দেশ পরিণত হবে। অথচ শিল্পোন্নত জাপানে কৃষি যোগ্য জমির স্বল্পতা ও খনিজ সম্পদের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও শুধু দক্ষ বা কর্মক্ষম জনশক্তির কারণে পৃথিবীতে আজ শিল্পদৈত্য নামে পরিচিত। এ মুহূর্তেই এর প্রতিরোধ করা প্রয়োজন।

অনুসরণ পাঠ

অনেক শিক্ষাবিদ ও মনোবিদ অনুসরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছেন। তবে তাদের মধ্যে মতামতের বিভিন্নতা দেখা যায়। অনেকে অনুসরণ পাঠের চেয়ে নির্দেশনা কাজের স্থানীয় পরামর্শদাতার গুরুত্ব অনেক বেশি কার্যকরী বলে মনে করেছে।

অনুসরণ পাঠের উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় পাঁচটি নীতি নিম্নে আলোচনা করা হলো। ঃ

১। **পাঠক্রম সংশোধনের জন্য ফলাফল ব্যবহার ঃ** অনুসরণ পাঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠক্রম পরিকল্পনার জন্য পরিমাপের তথ্য সরবরাহ করে থাকে। বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফলাফল অনুসরণ করে প্রয়োজনবোধে ভবিষ্যৎ কর্মসূচির পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব হয়। অনুসরণ পাঠ শিক্ষার্থীদের চাহিদামাফিক বিভিন্ন ধরনের উপযোগী কাজের মূল্যায়ন বিচারের সাহায্য করে থাকে।

২। **নির্দেশনা কর্মসূচির উন্নয়নে ফলাফল ব্যবহার ঃ** বিভিন্ন কারণে বিদ্যালয় পরিত্যাগকারী শিক্ষার্থীদের জন্য অনুসরণ পাঠ সুপরিকল্পিত হলে নির্দেশনা কর্মসূচির ফলাফলের পরিমাপ পাওয়া যায়। বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান কাজে জড়িত ব্যক্তির তথ্য অথবা চাকুরিতে অথবা অন্য কোনো পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তির পেশাগত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। কর্মসূচিকে ফলপ্রসূ করার জন্য অনুসরণ পাঠ বিভিন্ন উপাত্ত প্রদান করে যার উপর ভিত্তি করে পরামর্শ কার্যক্রম চালু রাখা হবে। নির্দেশনা কর্মসূচি বিদ্যালয় ত্যাগকারি ও বিদ্যালয়ে অবস্থানকারী উভয় দলের উপর সমধিক গুরত্ব দিয়ে অনুসরণ পাঠের কার্যকারিতা ব্যবহৃত হয়। উভয় দল থেকেই বিস্তারিত তথ্য নেয়া সম্ভব।

৩। **পরবর্তী চাকুরি যাদের প্রয়োজন তাদের চিহ্নিতকরণ ঃ** নির্দেশনা কর্মসূচির অন্যতম একটি মহৎ কাজ হলো বিদ্যালয় ত্যাগকারী শিক্ষার্থীদের জন্য ভবিষ্যৎ উপযোগী পেশার নির্দেশ দেয়া। উদহারণস্বরূপ বলা যায় একটি বালক কৃষি সম্পর্কিত কাজ কর্মে উৎসাহ নিয়ে অপেক্ষায় রয়েছে। কিন্তু তাকে একটি যন্ত্রপাতি নির্মাণের ওয়ার্কশপে কাজ দিলে অচিরেই সে হতাশাগ্রস্ত হয়ে অদক্ষতার পরিচয় দিবে। অতএব এ ধরনের পেশা নির্বাচন সংশোধন করে অধিক সুবিধাজনক সুযোগ সৃষ্টি করাই শ্রেয়তম উপায়। বিদ্যালয়ের রক্ষিত সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান অনুসরণ পাঠের পূর্ণ মূল্যায়ন করতে হবে। এ জন্য শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত তথ্যাবলি অনুযায়ী অনুসরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা আরও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা দরকার।

শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলাফল দ্বারা

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য অনুসরণ পাঠ পরিসংখ্যান খুবই মূল্যবান অবদান রাখে। শিক্ষার্থীরা ইচ্ছানুযায়ী পেশা নির্বাচনে সক্ষম হলে, এটি আরো অর্থবহ গুরুত্ব বহন করে। অনুসরণ পাঠ একদিকে পরামর্শদান কাজে যেমন ব্যবহৃত হয়, অন্যদিকে এটি শ্রেণি পাঠদান কাজেও সমান কার্যকরি। শ্রেণি শিক্ষক যদি পাঠ দান কর্মসূচিতে অবদান রাখতে পারেন, তবে বিগত বছরের শিক্ষার্থীদের অনুসরণ পাঠ পরবর্তী বছরের শিক্ষার্থীদের জন্যও প্রচুর মূল্য বহন করে। এক বছরের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলাফল পরবর্তী বছরের শিক্ষার্থীদের ফলাফল মূল্যায়নে যথেষ্ট সহায়ক।

অনুসরণ পাঠ ব্যবহার দ্বারা

অনুসরণ পাঠের উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লিখিত উপাত্তগুলিতে ব্যবহার করা হয়। এসব উদ্দেশ্যে মনোযোগকে অনুসরণ পাঠের বিশেষ উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়।

প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বিবরণী

কোন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অনুসরণ পাঠের উপাত্ত সংগ্রহ করা যায়। এ পর্যায়ে বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থী সম্পর্কে শিক্ষকদের জানতে কোন অসুবিধা হয় না। কারণ দেখাশুনায় প্রত্যেকে প্রত্যেককে জানে। তাদের একটা বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়। বিদ্যালয় ত্যাগকারীরা সমাজে বাস করে। তারা তাদের সাবেক সহপাঠীদেরকে বন্ধুর মত বিবেচনা করে। ব্যক্তি জ্ঞানের উপর মূলধন প্রয়োগ করে সহপাঠীদের প্রত্যেকেই অনুসরণ পাঠের উপাত্ত যোগান দিয়ে পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে পারে। এ কারণে যে কোন বিদ্যালয় থেকে প্রশ্নমালা সম্বলিত চিঠি প্রাক্তন ছাত্রদের কাছে পাঠানো যায়। কে কোথায় অবস্থান করছে, তা সব সময় বিদ্যালয়ের সাথে যোগাযোগ রাখলে এভাবে যে সফলতা অর্জিত হয় তা যথেষ্ট। এভাবে সকল বিদ্যালয় অনুসরণ পাঠের উপাত্ত সংগ্রহ করতে পারে।

অনুসরণ পাঠের কোন ধরণের তথ্য একটি বিদ্যালয় সংগ্রহ করবে ঃ

বাস্তব ক্ষেত্রে প্রশ্নের সংখ্যা নির্ধারণ করা উচিত; যেমন

প্রথমত ঃ প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের উপর অনুসরণ অহেতুক অতিরিক্ত বোঝা না হয় দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

দ্বিতীয়ত ঃ সংগৃহিত তথ্য বিদ্যালয়ের কাজের পারদর্শিতা ও হিসাব রাখার জ সীমিত লক্ষ্য হওয়া দরকার।

তৃতীয়ত ঃ বিদ্যালয় ব্যবহার উপযোগী উপাত্ত দিয়ে বিদ্যালয় কর্মসূচিকে কার্যকরী করার জন্য দুটি বা তিনটি বিদ্যালয়ে পরবর্তী সমন্বয় দ্বারা এর অনুসরণ পাঠকে জোরালো করতে হবে।

চতুর্থ ঃ বিদ্যালয়ে যে গুলোর মূল্যায়ন প্রয়োজন সে গুলোর মধ্য থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

অনুসরণ পাঠ উপাত্ত সংগ্রহের উপরে বর্ণিত পাঁচটি মূলনীতি ছাড়াও আরও কিছু অতিরিক্ত উপায় রয়েছে। এদের মধ্যে প্রাক্তন ছাত্রদের কাছ থেকে চিঠির মাধ্যমে জনসংযোগ উন্নয়ন, ছাত্রদের প্রেষণা বৃদ্ধি এবং বিদ্যালয় কার্যক্রমের সম্ভাব্য পরিবর্তন আনা যায়। একটা তালিকা অনুযায়ী চিঠি আদান প্রদান করা হবে।

নির্দেশনা কার্যক্রমে গবেষণার গুরুত্ব

নির্দেশনা কার্যক্রমে অনুসরণ পাঠের মতই গবেষণার গুরুত্ব রয়েছে। এর ফলে বিদ্যালয় সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি হিসেবে সমাজের চাহিদা অনুযায়ী কর্মসূচি নিতে পারে। সামাজিক জরিপ বিভিন্ন প্রশ্নের তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত হয়।

বিভিন্ন প্রকার তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের জরিপ ঃ

(১) পেশাগত জরিপ, (২) পারিবারিক জরিপ, (৩) জনসংখ্যা জরিপ, (৪) সামাজিক সংগঠনের জরিপ, (৫) যুবসেবা সংস্থা জরিপ, (৬) বিনোদনমূলক সুযোগের জরিপ এবং (৭) স্থানীয় ও আঞ্চলিক কর্মসংস্থার জরিপ।

অনুশীলনী-৬.৪

১। শিক্ষা ক্ষেত্রে পরামর্শ বলতে কি বুঝেন? পরামর্শের স্বরূপ নির্ণয় করুন।

২। পরামর্শের প্রয়োজনীয়তা কি? এটি কত প্রকার ও কি কি?

৩। পরামর্শ দাতার যোগ্যতা, গুণাবলী, দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা করুন।

৪। অনির্দেশিত পরামর্শ কি? নির্দেশিত পরামর্শের প্রকৃতি বর্ণনা করুন।

৫। অনুসরণ পাঠের উপাত্ত সংগ্রহের মূলনীতিগুলো কি কি? বর্ণনা করুন।

৬। সামাজিক জরিপ কত প্রকার ও কি কি?

৭। নির্দেশনার ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রমের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

কর্মসংস্থান প্রক্রিয়া

কর্মসংস্থান নির্দেশনামূলক কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে নির্দেশনামূলক সংস্থাগুলি বিশেষ দায়িত্বপালন করতে পারে। কর্মসংস্থান ও তার প্রক্রিয়াগত কৌশলসমূহের গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রতিটি উপজেলায় একটি করে চাকুরি বিনিয়োগ কেন্দ্র খোলা সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্ত প্রশংসনীয়। এর সঠিক বাস্তবায়নে দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধিত হবে।

কর্মসংস্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা

ছাত্র ছাত্রীদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তৃপক্ষ কোনো গুরুত্ব দিচ্ছেন না। আসলে এ ব্যাপারে তাদেরকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করা উচিত। যদিও অনেকেই খুব আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে আসতে চান না। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা শেষে কর্মসংস্থানের দায় দায়িত্ব যে তাঁদের উপর বর্তাবে বা ন্যস্ত হবে এটা আমাদের দেশে সকলেরই কল্পনার বাইরে থেকে যায়। এ ব্যাপারে অনেক উন্নত দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তাগণও দ্বিমত পোষণ করেন। একদল মনে করেন তাদের একমাত্র কাজ ছাত্র-ছাত্রীদের সুষ্ঠু উপায়ে শিক্ষাদান করা। এ ছাড়া তাঁদের অন্য কোন কাজ থাকতে পারে না। শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের দায়িত্ব সরকার তথা সমাজের, শিক্ষকদের নয়। অন্যদল মনে করেন তাদের প্রতিষ্ঠান যেহেতু সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সে কারণে তাদের প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব কেবল বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনাসহ কর্মসংস্থানের ব্যাপারই সীমাবদ্ধ নয়। প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের কর্মসংস্থানের দায় দায়িত্ব তাদেরই উপর ন্যস্ত।

পরিশেষে নিরপেক্ষভাবে চিন্তা ভাবনা করলে দেখা যায় এরূপ দায়িত্ব যে কোনো দেশের যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত থাকলে শিক্ষার্থীরা যেমন পড়া লেখার প্রতি মনোযোগী হবে তেমনি প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থান গড়ে তুলতে আগ্রহী হবেন। এ ধরনের সংস্থা ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমূলক কর্মের প্রতি উৎসাহিত করে তুলবে। এর ফলে বিভিন্ন উপায়ে শিক্ষার্থীদেরকে যোগ্যতার ভিত্তিতে বিভিন্ন কর্মে নিয়োজিত রাখতে শিক্ষকবৃন্দ সফলতা লাভ করতে পারেন।

কিভাবে সংস্থাগুলি শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে?

নিম্নোক্ত উপায়ে সংস্থার সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণ ছাত্র-ছাত্রীদের কর্মসংস্থানের সাহায্য করতে পারেন।

১। নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে গঠিত কর্মসংস্থার বিভিন্ন ধরণের কার্যাবলির সাথে পরিচিত করা।

২। স্থানীয় এবং কেন্দ্রীয় "পাবলিক এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিস" সংস্থা সম্বন্ধে অবহিত করা।

৩। বেসরকারি সংস্থা সমূহ সম্বন্ধে জ্ঞাত করা।

৪। আধাসরকারি/সরকারি যুব কর্মসংস্থানসমূহ সম্বন্ধে অবহিত করা।

৫। চেম্বার অব কমার্স, লায়ন্স ও রোটারি ক্লাব, ট্রেড ইউনিয়ন, শ্রমিক সংঘ সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল করা এবং

৬। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহের চাকুরি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিসমূহ তাদের গোচরীভূত করা।

কিভাবে নির্দেশনা কার্যে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ ছাত্র-ছাত্রীদের কর্মসংস্থানের উপযোগী করে গড়ে তুলতে পারেন।

চারটি কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সময়ে মহড়া দিয়ে কর্মক্ষেত্রের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পারেন।

১। কৃত্রিম সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রকৃত সাক্ষাৎকারের সময়ের অসুবিধা ও ভয় ভীতিগুলি কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করা।

২। কিভাবে সুন্দর ও ফলদায়ক আবেদন পত্র লিখতে হয় তার নিয়মকানুন সম্বন্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রস্তুত করা।

৩। কিভাবে ছাপানো ফরমের আবেদন পত্র বা দরখাস্ত পূরণ করতে হয় তার কৌশলাদি শিক্ষা দেয়া।

৪। এ ছাড়া সুনির্দিষ্ট কোনো কাজকর্ম খালির খবরাখবর না জেনেও বিভিন্ন জায়গায় চিঠিপত্র লিখে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করা।

উপরে বর্ণিত প্রথম কৌশল হিসেবে নির্দেশনা কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ শিক্ষার্থীদেরকে দু'টি দলে ভাগ করে নিবেন। এক দল সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা আর অন্য দল সাক্ষাৎকার দান করা। শেষে সাক্ষাৎকার দান কারীদের ভুলত্রুটি আলোচনা করে সংশোধন করতে হবে।

সাক্ষাৎকার দানের প্রস্তুতি ও সাক্ষাৎকার দানের কৌশলাদি সমূহের পূর্ব প্রস্তুতি ঃ

১। যথেষ্ট সময় হাতে থাকতেই সাক্ষাৎকারের সুনির্দিষ্ট দিন সম্বন্ধে অবগত হতে হবে।

২। নিজস্ব অভিজ্ঞতা, পেশাগত আগ্রহ, বিশেষ ঝোঁক ইত্যাদি এবং এক দুই পৃষ্ঠার কাগজে সংক্ষেপে লিখে প্রস্তুতি নিতে হবে।

৩। চাকুরির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কি কি ধরণের সম্ভাব্য প্রশ্ন আসতে পারে তার প্রস্তুতি নিতে হবে।

৪। সাক্ষাৎকারের পূর্ব মুহূর্তে ব্যক্তিগত দিকে নজর দিতে হয়। এগুলো হচ্ছে যেমন পোশাক, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, মাথার চুল, অঙ্গ-ভঙ্গি ইত্যাদি।

৫। যে প্রতিষ্ঠানে চাকুরির জন্য সাক্ষাৎকার দেয়া হচ্ছে সে প্রতিষ্ঠানে সম্বন্ধে খবরাখবর জানা।

৬। সাক্ষাৎকার গ্রহণের অল্প সময় আগে উপস্থিত হওয়া উচিত। বেশি আগে উপস্থিত থাকা ঠিক নয়।

সাক্ষাৎকার দানের সময় কোন কোন দিক নজর রাখতে হয়।

১। চিন্তাশীল ও বিবেচকের পরিচয় দিতে হবে।

২। নম্রতা ও ভদ্রতা বজায় রাখতে হবে।

৩। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীদের কথোপকথনের সুযোগ দিতে হবে।

৪। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীদের সাথে তর্ক করা বা তোষামোদ করা ঠিক নয়।

৫। প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর সংক্ষিপ্ত, পরিস্কার প্রত্যক্ষ ও সম্পূর্ণভাবে দেয়ার চেষ্টা করতে হবে।

৬। বিশ্বস্ততার সাথে উত্তর দিতে হবে এবং নিজের উপর আত্ম বিশ্বাস রেখেই উত্তর দিতে চেষ্টা করতে হবে।

৭। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীদের মনোভাব বুঝবার মত মনোবল রাখতে হবে এবং অযথা বাজে বকে তাদের সময় নষ্ট করা ঠিক নয়।

সুন্দর ও ফলপ্রসু আবেদনপত্র লেখার কৌশলাদি ঃ

১। আবেদনপত্রটি অত্যন্ত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং সুস্পষ্টভাবে লিখতে হবে।

২। ব্যকরণগত, বানানগত ও যতিচিহ্নগত ভুল যেন না হয়।

৩। আবেদন পত্রের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সজাগ হতে হবে এবং বাক্য প্যারা, রচনা শৈলী ইত্যাদি সম্বন্ধে সুনিশ্চিত ও সচেতন থাকতে হবে।

৪। আবেদনপত্র যতদুর সম্ভব সংক্ষিপ্ত করতে হবে তবে প্রধান প্রধান অংশগুলো অবশ্যই লিখতে হবে।

৫। নিজের সম্বন্ধে সব সময় হ্যাঁ সূচক তথ্যাবলি আবেদন পত্রে লিখতে হবে।

৬। নিজের সম্বন্ধে পূর্ণ তথ্যাদি উল্লেখ করতে হবে যা নিয়োগ কর্তার কাজে লাগে।

৭। কোন পদটি নিজের জন্য উপযুক্ত এবং কেন এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট ধারণা নিতে হবে।

৮। প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা, জন্মতারিখ, জন্মস্থান, উচ্চতা, ওজন ইত্যাদি সম্পর্কিত নিজের সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্ণ বর্ণনা দিতে হবে।

৯। দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম রেফারেন্স হিসেবে দিতে হবে যাঁরা নাম দেয়ার পূর্বে সনাক্ত করতে সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

১০। নিজের অসাধারণ বলে বিবেচিত কৃতিত্বপূর্ণ কাজের বিবরন দিতে হবে।

১১। সদ্য তোলা দু'কপি সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজের ফটো আবেদন পত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিতে হবে।

১২। প্রয়োজন বোধে পরবর্তিতে আরো অন্য কোনো তথ্যাদি সরবরাহ করার প্রয়োজন দেখা দিলে তা যথাসময়ে সরবরাহ করা হবে সুনির্দিষ্ট মতামত দিয়ে।

১৩। নিজের স্বাক্ষর যতদুর সম্ভব সুস্পষ্টভাবে লিখতে হবে।

১৪। বিজ্ঞপ্তিতে যে সমস্ত দলিলপত্র যথা সনদপত্রে, সত্যায়িত কপি, নম্বরফর্দ, অভিজ্ঞতার সনদপত্র দরখাস্তে সংযুক্ত করার জন্য নির্দেশ থাকে, সে গুলি অবশ্যই সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করে অবশ্যই সংযুক্ত করতে হবে।

সরবরাহকৃত ফরম পূরণের কৌশলাদি

নিয়োগকারী সংস্থা অনেক অনেক সময় আবেদনপত্রের ছাপানো ফরম বা নমুনা সরবরাহ করে থাকে। এ ফরমগুলো বিশেষজ্ঞ দিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা করে তৈরি করা যায়। কাজেই ফরম পুরণকারীকে অত্যন্ত সতর্কভাবে সবগুলি আইটেমই পূর্ণ করতে হবে।

অতএব নির্দেশনাদানকারীর অন্যতম প্রধান কাজ হল কি ভাবে শিক্ষার্থীদেরকে এ ব্যাপারে দক্ষ করা যায়। সে ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পরামর্শগুলোর প্রতি নজর রাখতে হবে।

১। ফরমটি পূরণ করার পূর্বে খুব দ্রুত এবং যত্ন সহকারে একবার সম্পূর্ণ ফরমটি পড়ে নিতে হবে।

২। নিয়োগকারি সংস্থার কাছ থেকে দুই কপি ফরম সংগ্রহ করার চেষ্টা করতে হবে। প্রথমে এক কপি পেন্সিলের সাহায্যে পূরণ করে ভালভাবে দেখতে হবে সঠিক হয়েছে কিনা। তার পর কলমের সাহায্যে অন্যকপি পূরণ করে পাঠাতে হবে এবং আগের কপি নিজের কাছে রেখে দিতে হবে।

৩। স্পষ্টাক্ষরে ও পরিষ্কারভাবে প্রতিটি কথা লিখতে হবে, যাতে করে পড়তে ও বুঝতে কোনো অসুবিধা না হয়।

৪। প্রতিটি আইটেম পূরণ করতে হবে তবে কোনো আইটেম যদি প্রযোজ্য না হয়, তবে সে আইটেমের ফাঁকা জায়গায় একটি লাইন টেনে দিতে হবে কিংবা প্রযোজ্য নয় একথা লেখা যেতে পারে।

৫। কোনো আইটেমে (দফা) হ্যাঁ বা না এর প্রশ্ন দেখা দিয়ে হাঁ বা না দিয়েই উত্তর দিতে হবে।

৬। প্রতিটি দফার উত্তর সম্পূর্ণ, সংক্ষিপ্ত ও পরিষ্কার হতে হবে।

৭। নিয়োগকারী সংস্থার চাহিদা অনুসারে রেফারেন্সদের নাম দিতে হবে।

৮। যদি ফরমে অতীতের চাকুরিকালীন বৃত্তান্ত জানতে চাওয়া হয় (যদি থাকে) তবে বর্তমান থেকে আরম্ভ করে পূর্বের অভিজ্ঞতা অথবা প্রথম থেকে আরম্ভ করে বর্তমান দিয়ে শেষ করতে হবে।

৯। সম্পূর্ণ ফরম পূরণ করে সতর্কতার সাথে দেখে নিতে হবে। ফরমের যথাস্থানে তারিখ সহ স্বাক্ষর করা হয়েছে কি না।

সরাসরি চিঠি লিখে কর্মখালী সংস্থানের ব্যাপারে কি কি কৌশলাদি অবলম্বন করা যেতে পারে?

এ ক্ষেত্রে চাকুরী প্রার্থীদের কর্মখালি সম্বন্ধে কোন পূর্ব জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন নিয়োগকারী সংস্থার বরাবরে পত্র লিখালিখি করা যাতে পারে। পরবর্তী সময়ে এ সংস্থাগুলোতে কর্মখালি দেখা দিলে যথাসময়ে তা তাদের জানাতে পারে।

কর্মসংস্থান সংস্থার প্রকারভেদ

সাধারণত কর্মসংস্থান সংস্থা দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

১। সরকারি সংস্থা ও (২) বেসরকারি সংস্থা।

উভয় প্রকার সংস্থার মূল লক্ষ্য হচ্ছে নিয়োগকারি ও নিয়োগপ্রাপ্তদের সহায়তাদান।

পাবলিক সার্ভিস কমিশন ঃ

এটি একটি সরকারি কর্ম কমিশন। এর প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। অন্য বিভাগীয় সদর দফতরে এর আঞ্চলিক কার্যালয় আছে। এর কাজ চাকুরি দেয়া নয়, এর প্রধান কাজ সুযোগ্য প্রার্থী বাছাই করা এবং বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য সুপারিশ করা।

১। চাহিদা অনুসারে বিভিন্ন পদের শ্রেণি বিভাগকরণ;

২। সুনির্দিষ্ট পদের জন্য সুনির্দিষ্ট কার্যাবলির সুপারিশকরণ;

৩। বিভিন্ন পদের জন্য প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার মানদন্ড নিরূপণ করণ;

৪। বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন ধরনের আবেদনপত্রের ফরম ও প্রশ্নপত্র তৈরিকরণ;

৫। বিভিন্ন ধরনের ফরমের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো;

৬। পূরণকৃত ফরমসমূহের মূল্যায়নকরণ এবং লিখিত পরীক্ষা গৃহীত হলে তার উত্তর পত্র মূল্যায়নকরণ, পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা এবং সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা এবং

৭। পরিশেষে কৃতকার্য ও যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা প্রস্তুত করে নিয়োগের জন্য সুপারিশকরণ।

বেসরকারি সংস্থা

এটিকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

১। লাভজনক সংস্থা ২। অলাভজনক সংস্থা।

লাভজনক সংস্থা ঐগুলো যে গুলো তাদের কাজের জন্য কোনো ফিস থাকে, যেমন- বাণিজ্যিক সংস্থাসমূহ।

অলাভজনক সংস্থাগুলো তাদের কাজের জন্য কোন ফিস গ্রহণ করে না এবং যদি গ্রহণ করে তবে তা অতি সামান্য। ঠিকমত পরিচালনার জন্য বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোকে নিজ নিজ সরকারের কাছ থেকে ছাড়পত্র বা লাইসেন্স নিতে হয় এবং সরকার প্রদত্ত

আইনকানুন মেনে চলতে হয়। যাতে করে তারা ইচ্ছামাফিক ফিস গ্রহণ বা অন্য কিছু গ্রহণযোগ্য নয় তেমন কিছু করতে পারে।

উন্নত দেশের বিভিন্ন বড় বড় শহরগুলিতে বাণিজ্যিক কর্মসংস্থা বিদ্যমান। এসব সংস্থাগুলি অত্যন্ত সততা, যোগ্যতা এবং সুচারুরূপে তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। কতকগুলি বিশেষ ধরনের চাকরির ক্ষেত্রে এরাই কাজ চালিয়ে যায়। কারণ ঐ গুলো সরকারি কর্মসংস্থার আওতার বাইরে।

আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, মহাবিদ্যালয় সমূহ ও প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়সমূহে নির্দেশদানকারী সংস্থা গড়ে তুলতে পারলে সরকারি পর্যায়ে প্রতি উপজেলায় যে চাকরি সংস্থান কেন্দ্র স্থাপিত হতে যাচ্ছে তার সুফল সব শিক্ষার্থীরা ভোগ করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

বিদ্যালয় পর্যায়ের জন্য গঠিত নির্দেশনা সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাদের জন্য কিছু উপদেশাবলী ঃ

১। প্রত্যেকের ভালভাবে অবগত থাকতে হবে যে, তাদের সংস্থার ক্ষমতা বা যোগ্যতার সীমানা সম্পর্কে।

২। বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের সংস্থা সম্বন্ধে এবং নিয়োগকারী সংস্থাসমূহকে অবহিত করতে হবে।

৩। আলাদাভাবে ফাইল সংরক্ষণ করে বিভিন্ন ধরনের চাকরির তথ্যাবলী সুবিন্যস্তভাবে অবহিত করতে হবে।

৪। পত্রালাপ, টেলিযোগাযোগে বা ব্যক্তিগতভাবে নিয়োগকারী সংস্থা সমূহের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। কর্মখালি ও কর্মসংস্থানের সর্বশেষ ব্যাপারে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

৫। কর্মখালির বিজ্ঞপ্তিসমূহ নিয়োগকারী সংস্থার কাছ থেকে সংগ্রহ করে রাখতে হবে।

৬। প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, জন্ম তারিখ, বয়স, জন্মস্থান, বিদ্যালয় রেকর্ড, ঝোঁক, আগ্রহ, কাজের অভিজ্ঞতা ইত্যাদিসহ নাম রেজিস্ট্রারি খাতায় তালিকাভুক্ত করতে হবে।

৭। প্রত্যেক রেজিস্ট্রার্ড প্রার্থীর জন্য ফাইল ফোল্ডার খুলতে হবে।

৮। প্রার্থী কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্যাবলি নিখুঁত কিনা তা ভালভাবে জেনে নিতে হবে।

৯। কর্মখালীর বিজ্ঞপ্তির নিরিখে রেজিষ্টার্ড প্রার্থীদের মধ্য হতে উপযুক্ত প্রার্থীদের নাম বাছাই করে নিয়োগকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।

১০। কর্মখালি সম্বন্ধে রেজিস্ট্রার্ড প্রার্থীদের যথাসময় জানতে হবে। পরে তাদের অনুমতি পেলে কেবলমাত্র নাম অনুমোদন করে নিয়োগকারী সংস্থার কাছে পাঠাতে হবে।

১১। সুপারিশকৃত প্রার্থীদের চাকরি হয়েছে কিনা তা খোঁজ নিয়ে জানতে হবে।

১২। প্রত্যেকটি ফলাফল নিয়োগকারী সংস্থা ও প্রার্থীর ফাইলে রাখতে হবে।

১৩। প্রতি বছর শেষে নিজ নিজ সংস্থার কার্যাবলির একটি সারসংক্ষেপ রচনা করে কতটি শূন্য পদের জন্য প্রার্থীর নাম সুপারিশ করা হয়েছে এবং কতজনের কর্মসংকুলান হয়েছে। কর্মসংকুলান না হলে তার কারণসমূহ তৈরি করতে হবে।

অনুশীলনী ৬.৫

১। কর্মসংস্থানের ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা কিরূপে হওয়া উচিত বলে মনে করেন? আমাদের দেশে এ ধরণের ভূমিকা না থাকার কারণসমূহ ব্যাখ্যা করুন।

২। সাক্ষাৎকারের পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে কি কি পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে সংক্ষেপে লিখুন।

৩। কিভাবে নির্দেশনা কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ ছাত্র-ছাত্রীদের কর্মসংস্থানের উপযোগী করে তুলতে পারেন লিখুন।

৪। কিভাবে নির্দেশনামূলক সংস্থাগুলো কর্মসংস্থানের ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে।

৫। নির্দেশনামূলক কাজের অন্য কোনো গঠিত কর্মসংস্থানসমূহের কর্মকর্তাদের জন্য উপদেশাবলী সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

৬। কর্মসংস্থানের জন্য কি প্রক্রিয়াতে কোন ধরনের কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে।

৭। সাক্ষাৎকার দানের সময় কোন কোন দিকে বিশেষ নজর রাখা উচিত বলে মনে করেন?

নির্দেশনা ও পরামর্শদান কৌশল সমুহ ঃ

বিভিন্ন প্রকার অভীক্ষার মাধ্যমে নির্দেশনা ঃ নির্দেশনা কাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো বিভিন্ন প্রকার অভীক্ষা। বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষা, নির্দেশনা কাজকে অত্যন্ত সহজ, সরল, ও বাস্তবতার সাথে সঙ্গতি রেখে উপলব্ধি করার সুযোগ করে দিতে পারে। নিম্নে কয়েকটি গুরত্বপূর্ণ অভীক্ষা উদাহরণের সাহায্যে বুঝাতে চেষ্টা করা হল ঃ

১। জ্ঞান (Knowledge) পরিমাপক অভীক্ষা

উদাহরণ -১ ঃ এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদেরকে মোনালিসা ছবিটি দেখিয়ে বলা যেতে পারে ছবিটি থেকে যেটি সম্ভাব্য উত্তর বলে মনে কর সেটির নিচে দাগ দাও।

(ক) মোনালিসা কি হাসছে?

(খ) মোনলিসা কি কাঁদছে?

(গ) সে কি কারো প্রতীক্ষায় দাড়িয়ে আছে?

(ঘ) না, সে কিছু ভাবছে আপন মনে?

উদাহরণ -২ ঃ একটি রেলগাড়ি একটি মোটরগাড়ি অপেক্ষা থামানো শক্ত কেন?

(ক) রেলগাড়ির ব্রেক ভাল।

(খ) রেলগাড়ি বেশি ভারী।

(গ) রেলগাড়ি বেশি লম্বা।

(ঘ) রেলগাড়ি দ্রুত চলে।

২। দক্ষতা (Skill) পরিমাপক অভীক্ষা

উদহারণ -১ ঃ নিচে 'প' ও 'শ' দুটি স্তম্ভ আছে। প স্তম্ভের ভগ্নাংশটি শ স্তম্ভের যে ভগ্নাংশটির উত্তর বা সমান, তার পূর্বেই ক্রমিক অক্ষর টি প স্তম্ভের উত্তরের জন্য নির্ধারিত শূন্যস্থানে লিখ।

প	শ
১। $\frac{২}{৫}$	(ক) $\frac{১৪}{১৬}$
২। $\frac{৩}{৪}$	(খ) $\frac{৮}{২০}$
৩। $\frac{১}{৩}$	(গ) $\frac{৬}{১৮}$
৪। $\frac{২}{৩}$	(ঘ) $\frac{৯}{১২}$
	(ঙ) $\frac{২০}{১৫}$
	(চ) $\frac{৬}{৯}$

৪ : ধারনা (Concept) পরিমাপক অভীক্ষা

উদাহরণ -১ ঃ কয়েকটি জিনিসের নাম দিয়ে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে কোন মিটারের মাপে বিক্রি হয় তার নিচে দাগ দাও।

মাছ, দুধ, ফল, ফিতা, রুটি।

৪ উপলব্ধি (Understanding) পরিমাপক অভীক্ষা

নিচে কয়েকটি উক্তি দেয়া আছে। তাদের মধ্যে কোনটি সত্য কোনটি মিথ্যা আবার কোনটি সময় সময় সত্য। যেটি সত্য তার পাশে √ চিহ্ন মিথ্যার পাশে x চিহ্ন এবং যেটি সময় সময় সত্য তার পাশে চিহ্ন বসাও।

ক একটি চতুর্ভুজের চার সমকোণের সমষ্টি চার সমকোণ। ----------

খ. খবরের কাগজে সব সময় ছবি থাকে। ----------

গ. পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ব্রীজ বাংলাদেশে অবস্থিত। ---------

৫। প্রয়োগ ক্ষমতা (Application) পরিমাপক অভীক্ষা

উদাহরণ -১ ঃ বামদিকের প্রশ্নটির সমাধান করতে যে সকল সূত্র বা সমীকরণের প্রয়োজন হয় তা ডান দিকের শূন্যস্থানে লিখ।

১০০ টাকার ১ বছরে সুদ ৭ টাকা হলে ৫০০ টাকার ৩ বছরে সুদ কত?

৬। কার্যাবলি (Activity) ঃ পরিমাপক অভীক্ষা

উদাহরণ -১ ঃ নিচে কয়েকটি কাজ এবং তার কয়েকটি করে সম্ভাব্য উত্তর দেয়া আছে। যে উত্তরটি তোমার জন্য প্রযোজ্য হবে তার নিচে দাগ দাও।

আমি হাঁটার সময় (ক) স্বাভাবিক ভাবে হাঁটি।

(খ) খুব দ্রুত হাটি।

(গ) খুব ধীরে ধীরে হাটি।

(ঘ) কখনও দ্রুত হাঁটি আবার কখনও ধীরে ধীরে হাঁটি

৭। দৃষ্টিভংগি (Attitude) পরিমাপক অভীক্ষা

উদাহরণ -১ ঃ সম্ভাব্য সঠিক উত্তটির ডান পাশে টিক √ চিহ্ন দাও।

প্রশ্ন ঃ (ক) বই পড়ে জ্ঞান বৃদ্ধি করে

যে লোকটি সপ্তাহের সব কটি	(খ) হাউজি খেলতে যায়।
দিনেই নিজের কাজেই নিযুক্ত	(গ) বন্ধু বান্ধবদের সাথে গাল গল্প করে।
থাকে, সে শুক্রবারে সবচেয়ে	(ঘ) সিনেমাতে যায়।
ভালভাবে কাটাতে পারে যদি	(চ) কোনো প্রার্থনা সভায় যোগদান করে।

৮। আগ্রহ (Interest) পরিমাপক অভীক্ষা

উদাহারণ -১ ঃ যেটিতে তোমার আগ্রহ আছে তার ডান পাশে একটি (x) চিহ্ন দাও এবং যেটিতে তোমার আগ্রহ বেশি আছে তার ডান পাশে দুটিতে ক্রস (x x) চিহ্ন দাও

..... চিত্র শিল্পী ..... সৈনিক ..... অধ্যাপক

..... চিত্র আঁকা ..... প্রকৌশলী ..... কবি

..... ডাক্তার ..... অভিনেতা ..... ছবি তোলা

৯। সংগতি বিধান (Adjustment) পরিমাপক অভীক্ষা

সংগতি বিধানের প্রচেষ্টাকে দুই দিক থেকে দেখা হয়। প্রথমটি হল সামাজিক খাপ খাওয়ানো অর্থাৎ বাহ্যিক এবং দ্বিতীয়টি হল ব্যক্তির নিজের দিক থেকে খাপ খাওয়ানো অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ।

উদাহরণ -১ ঃ ভালভাবে চিন্তা করে সঠিক উত্তর দিতে চেষ্টা করতে বলতে হবে।

(ক) তুমি কি প্রায়ই দিবা স্বপ্ন দেখ? হ্যাঁ/না।

(খ) তোমার কি মাঝে মাঝে বিদ্যালয় থেকে অথবা বাড়ি থেকে পালাবার ইচ্ছা হয়? হ্যাঁ/না।

(গ) তোমার কি অনেক লোকের ভীড় ভাল লাগে? হ্যাঁ/না।

১০। রসবোধ (Appreciation) পরিমাপ অভীক্ষা

রসবোধ ক্ষমতাটি বিবিধ হতে পারে। এক প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্বন্ধে রসবোধ এবং দুই, মানুষের গড়া পরিবেশ সম্বন্ধে রসবোধ।

উদাহরণ ঃ ১ বাম দিকের কবিতার অংশটিতে শিশুর মনে যে ভাব জেগেছিল তার পাশে টিক চিহ্ন দাও।

"যদি খোকা না হয়ে আমি হতেম কুকুরছানা

তবে পাছে মুখ দিতে যাই ভাতে, আনন্দ

তুমি করতে আমায় মানা,	খুশী
সত্যি করে বল আমায় করিস নে মা ছল	
বলতে আমায় দূর, দূর, দূর	ঘৃণা
কোথা থেকে এল এ কুকুর?	ভয়
যা মা, তবে যা মা,	অভিমান
আমায় কোলের থেকে নামা	দুঃখ
আমি খাবোনা তোর হাতে	বিরক্তিও
আমি খাবোনা তোর পাতে"।	ঔদাসীন্য

অভীক্ষা ব্যতিরেকে বিভিন্ন প্রকার নির্দেশনা

বিভিন্ন প্রকার অভীক্ষার মাধ্যমে কেবলমাত্র নির্দেশনা প্রদানের কাজ সুষ্ঠুভাবে করার এমন কোন কথা নেই। বিশেষ কতকগুলো পদ্ধতির সাহায্যে অভীক্ষা ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার নির্দেশনা প্রদানের কাজ অত্যন্ত সহজভাবে সম্পন্ন করা যায়। পদ্ধতিগুলি হল ঃ

১। সর্বাত্মক পরিচয়পত্র পদ্ধতি,

২। প্রোফাইল পদ্ধতি,

৩। প্রোগ্রেস রিপোর্ট পদ্ধতি,

৪। রিপোর্ট কার্ড পদ্ধতি

৫। জীবনী পদ্ধতি,

৬। ক্ষুদ্র উপাখ্যান পদ্ধতি,

৭। ব্যক্তিগত তথ্যপূরণ পদ্ধতি

৮। ঘটনা অনুধাবন পদ্ধতি বা বিষয়ী অনুধ্যান,

৯। শ্রেনি গঠন পদ্ধতি বা রেটিং স্কেল,

১০। সমাজমিতিমূলক পদ্ধতি,

১১। কার্যসমস্যা পদ্ধতি এবং

১৩। কর্ম নির্বাচনীমূলক পদ্ধতি ইত্যাদি।

পদ্ধতিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে সচরাচর যেগুলো ব্যবহৃত হয়, সেগুলি নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

(১) ধারাবাহিক বা সর্বাত্মক পরিচয়পত্র পদ্ধতি ঃ এ পদ্ধতি নিয়ে তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কাজেই এ পদ্ধতি সম্বন্ধে আর কিছু আলোচনা করার প্রয়োজন নেই।

(২) প্রোগ্রেস রিপোর্ট পদ্ধতি ঃ যারা শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত তাঁরা শিক্ষার্থীদের প্রোগ্রেস রিপোর্ট সম্বন্ধে বিশেষভাবে পারদর্শী। এ কারণে এ পদ্ধতি সম্বন্ধে তেমন কিছু বর্ণনা করার নেই।

(৩) শ্রেণি গঠন পদ্ধতি বা রেটিং স্কেল ঃ রেটিং পদ্ধতির মৌলিক নীতি হলো কোনো ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অপরের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা বা তথ্য জানা। কোন একজন শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য, গুণ বা কার্যাবলি সম্পর্কে কারো পর্যবেক্ষণের মতামত বা ফলাফলকে একটি নির্দিষ্ট মাত্রা অনুযায়ী সুসংহতরূপে প্রকাশ করার বিশেষ পদ্ধতিটিকেই শ্রেণি গঠন পদ্ধতি বা স্কেল বলে। এ পদ্ধতিতে গুণের পরিমাপ অনুসারে ব্যক্তিত্ব বিচার করা হয়। ব্যক্তির কোনো একটি বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্যের ব্যক্তির পরিসর রেখার ঠিক কোন জায়গাতে অবস্থিত, তা দেখা হয়। উদাহরণস্বরূপ সামাজিকতার রূপ বৈশিষ্ট্যের একটি রেটিং স্কেল নিম্নে দেয়া গেল।

প্রশ্ন ঃ লোকটি সামাজিক না অসামাজিক?

ব্যক্তি	অতিরিক্ত সামাজিক	বেশ সামাজিক	মোটামুটি সামাজিক	বেশ অসামাজিক	অতিরিক্ত অসামাজিক
কাশেম					
যতিন					
রহিম					
জোসেফ।					

(৪) সমাজমিতিমূলক পদ্ধতি ঃ আধুনিক মনোবিদগণ সামাজিক সংগঠনের রূপ কি বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠির মধ্যে ব্যক্তির নিজের স্থান ঠিক করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। সামাজিক উপাদান এবং শক্তিগুলি পরিবেশের সাথে সার্থক সঙ্গতি বিধানের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। একটি বিশেষদলের অর্ন্তগত বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন সম্পর্ক থাকা সম্ভব। তাদের এ সম্পর্ককে একটি চিত্রের আকারে প্রকাশ করা যায়। এ চিত্রটিকে সোসিওগ্রাম বলা হয়। জে, এল, বেনো নামক একজন সমাজ বিজ্ঞানী এ পদ্ধতির আবিষ্কারক। দীর্ঘদিন ধরে পরস্পরের পরিচিত, বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী, কলকারখানার শ্রমিক, ক্লাবের সদস্য

ইত্যাদি ক্ষেত্রে যারা দীর্ঘদিন এক সাথে কাজ করেছেন, এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া যায়।

এ পদ্ধতির প্রয়োগ কৌশল খুবই সরল, কোন দলের প্রত্যেকটি সদস্যকে দল থেকে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে পছন্দ করতে বলা হলে ঐ দলের সোসিওগ্রাম তৈরি হবে। যার সঙ্গে বা যাদের সঙ্গে সে বিশেষ বিশেষ সম্পর্ক রাখতে ইচ্ছুক সে সেভাবে পছন্দ করবে। অভীক্ষার্থীকে ইচ্ছা মাফিক নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তিকে পছন্দ করতে বলা হয়। আবার কখনও কখনও ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, পছন্দের কথাও বলা হয়। আবার কখনও এ পছন্দ করা কাজটা বিশেষ গুণ ও অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখেই করা হয়। এগুলোর সাহায্যে সমাজ চিত্র বা সোসিওগ্রাম তৈরি হয়। সমাজতত্ত্বের বিভিন্ন গবেষণার ক্ষেত্রে সমাজ চিত্র কাজে লাগে। বিদ্যালয় শিক্ষকদের ও ছাত্রদের সম্বন্ধে একটা ধারনা গড়ে তোলার সহায়ক উপায় এ সমাজ চিত্র।

৫। **বিষয়ী অনুধ্যান** (Case study)

মানসিক বিকারগ্রস্ত, রোগী অপরাধ প্রবণ বালক বা অসাধারণ কাউকে জানতে হলে তার অতীত ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতাসহ বর্তমান অবস্থা পর্যন্ত সব কিছু জানতে হবে। এক্ষেত্রে জীবনের টুকরো টুকরো ঘটনাগুলির বিবরণ নানাভাবে সংগ্রহ করা হয়। এরূপ ঘটনাগুলিকে একত্রিত করে এর ক্রমবিকাশের একটি মোটামুটি পুরো ইতিহাস খাড়া করা যায়। এ প্রক্রিয়াটিকেই বিষয়ী অনুধ্যান (Case study) বলা হয়। সাধারণ পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে ব্যক্তির ক্রমবিকাশের ধারাকেও বিষয়ী অনুধ্যান (Case Study) বলা হয়। সাধারণ পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে ব্যক্তির ক্রমবিকাশের তথ্য সংগ্রহ করা হয় প্রত্যক্ষভাবে আর বিষয়ী অনুধ্যান পদ্ধতিতে সে কাজটি করা হয় পরোক্ষভাবে। এ ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ করা হয় নানা পন্থায়। ব্যক্তির চালচলন, কথাবার্তা, পরিবেশ, সমাজ জীবন প্রভৃতির প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে ব্যক্তির ক্রমবিকাশের ধারা পরোক্ষভাবে রেকর্ড করা হয়। সুষ্ঠু নির্দেশনা ও কার্যকরি পরামর্শের জন্য এ পদ্ধতি একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

বিষয়ী অনুধ্যান সম্পর্কে কোন কোন তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন

বিষয়ী সম্পর্কে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন তা নিম্নে দেয়া হল।

১। সাধারণ তথ্য ---- ব্যক্তির নাম, পিতার নাম, পিতার পেশা, ঠিকানা, জন্ম তারিখ, বয়স, জন্মস্থান ইত্যাদি।

২। যে সমস্যার জন্য পর্যবেক্ষণের কাজ করা হচ্ছে তার বিবরণ।

৩। পরিবার—মা বাবা, ভাই, বোন ও অন্যান্য আত্মীয়দের পরিচয়, বাড়িতে তার প্রতি অন্য সকলের কি ধরনের মনোভাব।

৪। শিক্ষা -- পরিবারে শিক্ষার মান, ব্যক্তির নিজস্ব আদর্শ ও তার পরিবারের শিক্ষার আদর্শের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব আছে কিনা।

৫। স্বাস্থ্য— শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও দেহগত অন্যান্য তথ্য, যৌন বিকাশের বিবরণ।

৬। বুদ্ধির মান ও বিকাশ।

৭। প্রক্ষোভগত বিকাশ

৮। সামাজিক বিকাশ, আচরণমূলক বিবরণ।

৯। বৃত্তি, আর্থিক সংগতি।

১০। অভ্যাসমূলক বৈশিষ্ট্যাদি, বিশেষ আগ্রহ, ঝোঁক বা ছবি ইত্যাদি।

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি

বিষয়ী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন প্রকারের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। প্রয়োজন অনুসারে একাধিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। মোটামুটি ভাবে যে সকল পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে তা নিম্নরূপ ঃ

(১) পরীক্ষা, (২) আবিস্কারমূলক অভীক্ষা, (৩) সাক্ষাৎকার, (৫) বিবরণী প্রণয়ন, (৬) সর্বাত্মক পরিচয়পত্র (৭) ঘটনা অনুধাবন, (৮) সভা ইত্যাদি।

বিষয়ী অনুধ্যানের উপকারিতা

১। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর ক্রমবিকাশের পরিমাপ করা সহজ হয়।

২। উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সুখী ও সার্থক জীবন গঠনে সহায়তা করা হয়।

৩। জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌছাতে গিয়ে বিষয়ীর সফলতা ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান শেষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়তা দান করা যায়।

৪। অনেক সময় অসাধ্য সাধনে লিপ্ত হয়ে শিক্ষার্থী যে সমস্যার সম্মুখীন হয় তা লাঘবের সুবিধা হয়।

৫। শিক্ষার্থীকে নিশ্চিতভাবে জানার পর তার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির প্রতি নজর দেয়া যায়।

৬। উপযুক্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আত্মতৃপ্তি ঘটনো সহজ হয়।

বিষয়ী অনুধানের সর্তকতা

১। শিক্ষার্থী সম্পর্কে খাটি ও নিখুত তথ্য সংগ্রহ করা অত্যাবশ্যক। এ কারনে তথ্য সংগ্রহ ও তালিকাভুক্ত করার পদ্ধতি ত্রুটিমুক্ত হতে হবে।

২। বাস্তব ও সত্য ঘটনা সংগ্রহ করতে হবে।

৩। বাস্তব কাজের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সংগ্রহ করতে হবে।

৪। অনুপযুক্ত ব্যবস্থা পরিহার করতে হবে।

৫। বিষয়ী সম্পর্কে সম্ভাব্য অসম্পূর্ণ তথ্য বাদ দিতে হবে।

৬। সম্ভাব্য উপায়ে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

৭। শ্রেণী কক্ষে, শ্রেণীর বাইরে সকল স্থানেরই তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

৮। সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক, আর্থিক সব ধরনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

৬। সাক্ষাৎকার

পরামর্শ কাজের প্রধান শর্ত ও উপকরণ হলো সাক্ষাৎকার। এর সার্থকতার উপর পরামর্শদানের সফলতা নির্ভর করে। সাক্ষাৎকার পরামর্শদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সংগ্রহ করার অন্যতম প্রধান উপায়। ব্যক্তির সামনাসামনি তার অভ্যন্তরীণ প্রকৃতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ভাবে জানার একমাত্র পদ্ধতিকে বলা হয় সাক্ষাৎকার। প্রখ্যাত মনোবিদ রুথ স্ট্রেং (Ruth Strang) এর ভাষায়, "সাক্ষাৎকার হচ্ছে পরামর্শের প্রাণ আর অন্যান্য পদ্ধতিগুলি হচ্ছে পরামর্শের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।" সাক্ষাৎকারের মাধ্যমেই ব্যক্তির অন্তর্দৃষ্টি সৃষ্টি খুলে যেতে পারে। ফলে, ব্যক্তি নিজের ও তার সমস্যার সমাধান সহজ ও আয়ত্বাধীন হবে। পরামর্শদাতা অতি অল্প কথায়, অল্প সময়ে ও অনায়াসে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ তথ্যসমূহ সংগ্রহ করতে পারেন। অতএব, এর সাহায্য ছাড়া পরামর্শ কার্যকরী করা সম্ভব নয়।

সাক্ষাৎকারের প্রকার ভেদ

১। নির্বাচনীমূলক সাক্ষাৎকার ঃ কোনো নির্দিষ্ট পেশায় বা শিক্ষাকর্মে নিয়োজিত করার জন্য এ ধরনের সাক্ষাৎকারে প্রার্থী বাছাই করা হয়।

২। নির্ণয়ক ও লক্ষণ নির্ধারণমূলক সাক্ষাৎকার ঃ ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার কারণে শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক কাজে অনগ্রসরতার কারণ নির্ণয় করা হয় এবং এ সাক্ষাৎকার থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

৩। তথ্য জ্ঞাপক সাক্ষাৎকার ঃ ব্যক্তির বিভিন্ন দিকের কৃতিত্ব ও পারগতা সম্পন্ন কাজের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ ও বিশ্লেষণ করা হয়।

৪। প্রাথমিক ও প্রস্তুতিমূলক সাক্ষাৎকার ঃ ব্যক্তিকে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ দ্বারা ভবিষ্যতের ব্যাপক ও জটিল সাক্ষাৎকারের প্রস্তুতি হলো এ ধরনের সাক্ষাৎকার।

৫। অনুসন্ধানমূলক সাক্ষাৎকার ঃ নানাবিধ অবস্থার সৃষ্টি করে ব্যক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মুখী তথ্য ও সত্যানুসন্ধান করা হয় এরূপ সাক্ষাৎকারে।

৬। শৃঙ্খলা সম্বন্ধীয় সাক্ষাৎকার ঃ কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রধান তার অধীনস্থদের অনিয়মানুবর্তিতা ও বিশৃঙ্খলার কারণ অনুসন্ধান, তাদের ক্রিয়াকলাপের সমন্বয় সাধন করা হয় এ ধরনের সাক্ষাৎকারে।

৭। পরামর্শমূলক সাক্ষাৎকার ঃ ব্যক্তি সমস্যার মূল কারণ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে ও সমাধান করতে এ ধরনের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা হয়।

সাক্ষাৎকারের প্রস্তুতি ও পদ্ধতি

সুষ্ঠু সাক্ষাৎকারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ নেয়া যায়।

১। শিক্ষার্থীকে সাক্ষাৎকারের প্রয়োজনীয়তা সম্যকভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ দেয়া।

২। শিক্ষার্থীর প্রয়োজনে সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হচ্ছে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়, এ উপলব্ধি শিক্ষার্থীর মধ্যে আগে ভাগেই জন্মাতে হবে।

৩। নির্জন ও অনুকূল পরিবেশযুক্ত স্থান সাক্ষাৎকারের জন্য নির্বাচন করতে হবে।

৪। শিক্ষার্থীর সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সংগ্রহের পর সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হবে।

৫। একটি প্রশ্ন সম্বলিত খসড়া তৈরি করে সাক্ষাৎকারে দেয়া উচিত।

৬। উদার মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিগণই সাক্ষাৎ গ্রহণকারী হওয়া উচিত।

৭। শিক্ষার্থীকে সঠিকভাবে পরিচালনা ও সাহায্যদানের ক্ষেত্র সৃষ্ট করাই সাক্ষাৎকারের একমাত্র উদ্দেশ্য।

সাক্ষাৎকারের পদ্ধতি

১। বিষয়ীর প্রতি পুরাপুরি সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করতে হবে।

২। ব্যক্তিকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সংগৃহীত তথ্যাদি গোপন রাখা হবে এরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

৩। বিষয়ীর সব কিছুকেই ভাল বলে উৎসাহ ব্যঞ্জক অনুমোদন দিতে হবে।

৪। ব্যক্তিকে হাল্কা রসিকতার মাধ্যমে সহজ, আগ্রহী ও আকৃষ্ট করতে হবে।

৫। ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকে নিজস্ব অভিজ্ঞতা মাঝে মাঝে তুলে ধরতে হবে।

৬। অনুরূপ ঘটনার ক্ষেত্রে অপর কোন ব্যক্তির অভিজ্ঞতার কথাও তুলে ধরতে হবে।

৭। বিষয়ী যা কিছু বলে ও করে তার সব কিছুতেই বিস্ময় প্রকাশ করতে হবে যাতে বিষয়ী বুঝতে পারে যে তার সব কিছুতেই সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর মনোযোগ রয়েছে।

৮। ব্যক্তির অবসাদগ্রস্ততা, মানসিক আবেগ, উত্তেজনা ও অস্বস্তিমূলক সকল আচরণকেই উপেক্ষা করে চলতে হবে,

৯। প্রারম্ভেই মধুর আলাপ আলোচনার মাধ্যমে পরিবেশকে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে।

১০। বিষয়ীর প্রধান সমস্যাকে সামনে রেখে এগোতে হবে।

১১। মূল বিষয়ের মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকলেও, প্রয়োজনে এদিক ওদিক করতে হবে।

১২। বিষয়ীকে পুনরাবৃত্তি ও অনুধাবনের সুযোগ দেয়ার জন্য কিছুক্ষণের জন্য আলোচনা স্থগিত করা যেতে পারে।

১৩। বিষয়ীর আত্মমর্যাদা যেন ক্ষুণ্ন না হয় এমন আচরণ করতে হবে এবং

১৪। যে কোন নৈতিক ও ধর্মীয় উদ্দেশ্য প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

সাক্ষাৎকারের মূল্যায়ন

১। সাক্ষাৎকারের জন্য পর্যাপ্ত সময়ের দরকার।

২। সাক্ষাৎকারের সময় কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করা।

৩। সাক্ষাৎ গ্রহণকারী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময়ে শারীরিক, মানসিক বা আবেগিক দিক থেকে সুস্থ ছিলেন কিনা, তা নিশ্চিত থাকা।

৪। সাক্ষাৎ গ্রহণকারী ও বিষয়ীর মধ্যে বন্ধু সুলভ পরিবেশ বিদ্যমান থাকতে হবে।

৫। বিষয়ী তার গোপনীয় তথ্যাদি প্রকাশ করতে আগ্রহী কিনা তা জেনে নিয়ে অগ্রসর হতে হবে।

৬। সাক্ষাৎকারের সময় নিরপেক্ষতা বজায় ছিল কিনা এবং

৭। বিষয়ীর অন্তর্দৃষ্টি পরিস্ফুটনের নিমিত্তে অনুকূল পরিবেশে সৃষ্টি করা হয়েছিল কিনা।

সাক্ষাৎকারের অসুবিধা

১। সঠিক উত্তর দেয়া না দেয়া নির্ভর করে ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর।

২। অনেক সময় ব্যক্তির সঠিক উত্তর দেয়ার জন্য ইচ্ছা থাকলেও লজ্জা সংকোচ বা ভয়ের জন্য সঠিক উত্তর দেয়া থেকে বিরত থাকে।

অনুশীলনী ৬.৬

১। বিষয়ী অনুধ্যান বলতে কি বুঝেন? বিষয়ী সম্পর্কে কোন কোন তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন বলে মনে করেন? এ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।

২। সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপের বিস্তারিত বিবরণ দিন। বিভিন্ন প্রকার সাক্ষাৎকারের বর্ণনা দিন।

৩। বিষয়ী অনুধ্যানের উপকারিতাগুলো কি কি?

৪। বিভিন্ন প্রকার অভীক্ষার মাধ্যমে কিভাবে নির্দেশনার কার্য চালানো যায়? বর্ণনা দিন।

৫। অভীক্ষা ব্যতিরেকে নির্দেশনা কার্যক্রমের পদ্ধতিগুলোর নাম লিখুন।

৬। টীকা লিখুন ঃ (ক) রেটিং স্কেল, (খ) সমাজমিতি, (গ) বিষয়ী অনুধ্যান, (ঘ) সাক্ষাৎকার

BANSDOC Library
Accession No. 18224

গ্রন্থপঞ্জি

১। অরুণ ঘোষ - মনোবৈজ্ঞানিক পরিমাপ ও পরিসংখ্যান।

২। শ্যামা প্রসাদ চট্টরাজ - মানসিক ও শিক্ষাগত মূল্যায়ন।

৩। Garrett. H.E. - Statistics in Psychology and Education.

৪। Noll, Victor, H. - Introduction to Educational Measurement.

৫। Lester. D. Crow and Alice Crow - An Introduction to Guidance.

৬। Jones, Arthur J. - Principles of Guidance.

৭। Wrenn, G.G. - The Counsellor in Changing World.

৮। Best John W. - Research in Education, New York. Engle wood Cliff, Prentice Hall, Inc. 1960.

৯। ডঃ শাহজাহান তপন - থিসিস ও অ্যাসাইনমেন্ট লিখন পদ্ধতি ও কৌশল।

১০। জিনাত জামান - শিক্ষা গবেষণা, পদ্ধতি ও কৌশল।